মাসিক

আলকাউসার

www.alkawsar.com

- কুরআনের পরিচয় কুরআনের ভাষায়
- কুরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক : কিছু দিক কিছু দৃষ্টান্ত
- কুরআনের আয়াত-সংখ্যা : একটি প্রামাণ্য পর্যালোচনা
- অর্থ ও অর্থনীতি : কুরআনের নির্দেশনা
- কুরআনের সংস্পর্শ ছাড়া মানবজনম অর্থহীন
- কুরআন অনুধাবন : কিছু করণীয়
- তত্ত্ব, তথ্য, চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কয়েকটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার

مجلة الكوثر الشهرية

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক

www.alkawsar.com

মাসিক আলকাউসার

কুরআনুল কারীম সংখ্যা

প্রকাশকাল : ১৪৩৭ হিজরী
২০১৬ ঈসায়ী

যোগাযোগ

মাসিক আলকাউসার
৩০/১২, পল্লবী
(মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬
E-mail : info@alkawsar.com

ফ্যাক্স : ৮০৩৪৫০৮
মোবা : ০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ২২

সার্কুলেশন

০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩ (এজেন্ট)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৪৪ (গ্রাহক)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৫৫ (হাতে হাতে)

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর

মাসিক আলকাউসার
চলতি হিসাব নং ১৬৪.১১০.১৭৯৩
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
মিরপুর-১০ শাখা, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

বিনিময়
১২০/= (একশত বিশ টাকা)
[হ্রাসকৃত মূল্য (প্রথম মুদ্রণ) ৯০/= (নব্বই টাকা)]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

মাসিক আলকাউসার মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে বের হচ্ছে ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ ঈসায়ী থেকে। আমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও এর ছাপানো সংস্করণ ও ওয়েব সংস্করণ উভয়টির পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আল্লাহর মেহেরবানীতে। আলকাউসার এখন ১২তম বছর পার করছে এবং বর্তমান সংখ্যাটি আলকাউসারের প্রথম বিশেষ সংখ্যা, যা নিয়মিত সংখ্যার পাশাপাশি আলাদাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই প্রথম বিশেষ সংখ্যার বিষয় 'কুরআনুল কারীম।'

একটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা অনেক গুরুত্বের দাবী রাখে। বিশেষত সংখ্যাটি যদি হয় কোনো তাহকীকী, ফিকরী ও দাওয়াতী পত্রিকার। এরপর বিষয়বস্তু যদি হয় 'আলকুরআনুল কারীম' তাহলে তো কথাই নেই। এ দিক থেকে বিচার করা হলে আমাদের এ বিশেষ সংখ্যার বড় কোনো বিশেষত্ব নেই। তারপরও আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে আশা করছি, আলকাউসারের জন্য প্রথম অভিজ্ঞতা হলেও সংখ্যাটি পাঠকের ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ।

একটি বিশেষ সংখ্যা 'সফল' হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাতে কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ-নিবন্ধ একত্রিত হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং আমরা যতটুকু বুঝি, একটি বিশেষ সংখ্যার ন্যূনতম সফলতার এক অনিবার্য শর্ত, তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো না কোনো শূন্যতা পূরণ হওয়া এবং এর প্রবন্ধ-নিবন্ধের দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ একটি দিক সম্পর্কে হলেও কিছু উত্তম পরিবর্তন ও চিন্তার ঐক্য তৈরি হওয়া।

আল্লাহর রহমতে বর্তমান সংখ্যায় এমন কিছু প্রবন্ধ এসেছে, যা কুরআনুল কারীমের মর্ম ও শিক্ষা অনুধাবন এবং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তাগত ঐক্য সাধনে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। উপরোক্ত বিষয়ে এখন চিন্তা ও কর্মে নানা প্রান্তিকতার বিস্তার ঘটছে। এ কারণে এ বিষয়ে সঠিক পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ সময়ের প্রয়োজন। আশা করি, বর্তমান সংখ্যায় কুরআনের মর্ম অনুধাবন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার এসেছে তার দ্বারা উক্ত প্রয়োজন কিছুটা হলেও পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। হযরত মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দামাত বারাকাতুহুমের সাক্ষাৎকার, মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম ও মাওলানা আব্দুল মতিন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের প্রবন্ধ দুটি এ বিষয়েই লিখিত। শিরোনামের বিচারে অধমের প্রবন্ধ–'কুরআনুল কারীম : *হেদায়েত গ্রহণ ও দলীল উপস্থাপন, কিছু নিবেদন*'ও এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আরো কিছু প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলোতে বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য থাকলেও এই ঐক্যের সুর আছে যে, দ্বীন-দুনিয়ার সব বিষয়েই সতর্কতা ও কর্ম-কুশলতা কাম্য। দ্বীনী বিষয়ে এটি আরও জরুরি। আর কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রে তা সবচে বেশি জরুরি। যদি কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে সতর্কতা ও কর্ম-কুশলতার সবক আমরা শিখে নিতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে আল্লাহর এক বড় নিআমত।

এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলোতে বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য থাকলেও এই ঐক্যের সুর আছে যে, দ্বীন-দুনিয়ার সব বিষয়েই সতর্কতা ও কর্ম-কুশলতা কাম্য। দ্বীনী বিষয়ে এটি আরও জরুরি। আর কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রে তা সবচে বেশি জরুরি। যদি কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে সতর্কতা ও কর্ম-কুশলতার সবক আমরা শিখে নিতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে আল্লাহর এক বড় নিআমত।

সংখ্যাটির সূচনা হয়েছে হযরত মাওলানা আবুল বাশার ছাহেবের প্রবন্ধ 'কুরআনের পরিচয় কুরআনের ভাষায়' এর মাধ্যমে। নাম, বিষয়বস্তু, স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য সর্ববিচারে 'সূচনা'ই ছিল এর যথোপযুক্ত স্থান। মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী ছাহেবের সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠ প্রবন্ধটি যেন এ প্রবন্ধেরই অনিবার্য ফল। কুরআনের সাথে পরিচয় ঘটলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে 'কোরআনের সংস্পর্শ ছাড়া মানবজনম অর্থহীন'। মাওলানা ইসহাক ওবায়দী দামাত বারাকাতুহুমের 'মানবজাতির হেদায়েতনামা হচ্ছে আলকুরআন' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে নতুন আঙ্গিকে কুরআনে কারীমের পরিচয় পেশ করা হয়েছে। এ ধরনের সহজবোধ্য

সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ কখনো কখনো পাঠকের চিন্তা-চেতনায় শক্তির প্রেরণা আনে।

কুরআনের পরিচিতি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন মারকাযুদ দাওয়াহর রচনা বিভাগের সদস্য মাওলানা আবদুল মজীদ ইবনে খলীলুর রহমান। এতে তিনি কুরআনুল কারীমের নাম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খোদ কুরআনুল কারীমের বক্তব্যের আলোকে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের আঙ্গিক অনেকটা তাহকীকী। বিশেষ সংখ্যার কলেবর ধারণার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ায় যে প্রবন্ধগুলো আমরা ছাপতে পারিনি তার শীর্ষে রয়েছে এ প্রবন্ধটি।

যিনি কুরআনের পরিচয় লাভ করেছেন এবং তার সামনে কুরআন বোঝার পথ খুলে গেছে তিনি যদি চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করতে থাকেন তাহলে তো কুরআনুল কারীমের নূর ও হেদায়েতের বিস্তৃত জগৎ তার সামনে। তিনি পাঠ করতে থাকবেন আর নূর ও আলো, শিক্ষা ও নির্দেশনা আহরণ করতে থাকবেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটি কুরআনুল কারীম সম্পর্কে প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিশেষ সংখ্যার ভূমিকাস্বরূপ।[১] ইনশাআল্লাহ আগামী কুরআনুল কারীম সংখ্যাগুলোর মূল প্রতিপাদ্য থাকবে কুরআনের হেদায়েত ও শিক্ষা। বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিভিন্ন শিরোনামে কুরআনুল কারীমের শিক্ষা ও নির্দেশনা পেশ করাই হবে ঐ সংখ্যাগুলোর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান সংখ্যাটিতেও এ ধরনের কিছু নমুনা প্রবন্ধ এসেছে। যার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে আলকাউসারের সম্পাদক সাহেবের প্রবন্ধ ও তাঁর সহকারী মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহর দুটি প্রবন্ধ। কারো মুখে শুধু শুনে নয় বরং মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেই এই তিন প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। সম্পাদক সাহেবের প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় অর্থ ও অর্থনীতি সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের দিক নির্দেশনার সারাংশ এবং এ সম্পর্কিত অনেক মৌলনীতি চলে এসেছে। *'ইহজাগতিকতা : একটি প্রাচীন বিকার'* শীর্ষক প্রবন্ধটি মূলত কুরআনুল কারীম থেকে হেদায়েত ও শিক্ষা গ্রহণের এমন এক দিক সম্পর্কে আলোকপাতের নমুনা, যার চর্চা এখন কম। কুরআনুল কারীমের হেদায়েত ও শিক্ষার একটি বড় অংশ রয়েছে অতীতের বিভিন্ন ঘটনা এবং বিচিত্র মানবীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাঝে। কুরআনুল কারীমে আমরা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ঘটনা, অবস্থা ও দোষ-গুণের বর্ণনা পাই। কুরআন যেমন নেককার লোকদের ভালো স্বভাব ও উন্নত গুণাবলী বর্ণনা করে তেমনি কাফের-মুশরিক, পাপী ও দুষ্কৃতিকারীর মন্দ স্বভাব ও মন্দ বৈশিষ্ট্যও বিস্তারিত বর্ণনা করে।

কুরআনে উল্লেখিত নেককার মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে তো আমরা কিছুটা হলেও উপকৃত হই। ঈমানের শাখা-প্রশাখা ও ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি। কিন্তু কুরআনে উল্লেখিত মন্দ লোকদের অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, কুফর ও শিরকের শাখা-প্রশাখা এবং কাফের মুশরিকদের বিভিন্ন বদ খাসলত সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেদের কর্ম ও স্বভাবকে তা থেকে পবিত্র করার চর্চা খুবই কমে গেছে। মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহর এ প্রবন্ধ কুরআনুল কারীম থেকে হেদায়েত ও শিক্ষা গ্রহণের এই বিশেষ পদ্ধতির একটি মৌলিক ও উজ্জ্বল নমুনা। তার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ঈমান ও আমলের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ঈমান-আমলে উন্নতির জন্য 'আসমায়ে হুসনা'র অযিফা আদায়, আসমায়ে হুসনার মর্ম ও শিক্ষার জ্ঞান অর্জন ও তা হৃদয় ও কর্মে ধারণের বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি তার প্রবন্ধে 'আসমায়ে হুসনা' বিষয়ে কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে মর্মসমৃদ্ধ তিনটি আয়াত সম্পর্কে অতি সাবলীল ও মনোরম আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে ঈমান ও ইহসান, ইলম ও আমল এবং দিল-দেমাগের অনেক খোরাক রয়েছে। গুরুত্বের বিচারে যদিও বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে আরও সময়ের দাবী করেছিল তবু এটি পড়লে কুরআনুল কারীমে চিন্তা-ভাবনার একটি বাস্তব অনুশীলনও হয়ে যাবে এবং পাঠক এতে قرآنا متشابها সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মূলনীতি কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের ব্যাখ্যা এরও একটি বাস্তব নমুনা দেখতে পাবেন।

কুরআনের শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকেই মাওলানা আবরারুয যামান লিখেছেন *'আলকুরআনে বুদ্ধিমানের পরিচয়'* আর মাওলানা শিব্বীর আহমদ লিখেছেন *'পবিত্র কুরআনে সফল মুমিনের বর্ণনা।'* উভয় প্রবন্ধই মূলত স্ব স্ব শিরোনামে আলোচনার একটি প্রারম্ভিক কাঠামো।

কুরআন বোঝা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি জরুরি বিষয়, পূর্ববর্তী কুরআন-ঘনিষ্ঠ আহলে ইলমের রচনাবলী থেকে উপকৃত হওয়া। এ লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য তাফসীর-গ্রন্থাদির পরিচয় তুলে ধরাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ড. আ ফ ম খালেদ হোসেন ছাহেব তাফসীরে মাজেদীকে তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বানিয়ে এ বিষয়ের একটি নমুনা পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মাওলানা যাইনুল আবেদীন ছাহেব যিনা মাজমুহম লিখিত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ প্রবন্ধটি সব শ্রেণির পাঠকের

১. প্রথম বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। তবে আশা করি, ভবিষ্যতে অন্তত প্রতি পাঁচ বছরে একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।—সম্পাদক

জন্য পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। আমাদের সমাজে এখন নিজেদের সন্তানদের কুরআন ও কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত করার এক ভয়ঙ্কর ব্যাধির বিস্তার ঘটেছে। এর বড় কারণ অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী ভবিষ্যতের পিছনে পড়ে নিশ্চিত ও চিরকালীন ভবিষ্যতের প্রস্তুতির ব্যাপারে উদাসীনতা। এ প্রবন্ধে এই উদাসীনতা ও গাফলতের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ করুন, এ আওয়াজে যেন আমাদের গাফলতের ঘুম ভাঙ্গে।

স্নেহাস্পদ আবদুল মুমিন ও ওলীউল্লাহ আবদুল জলীল দু'জনই মাশাআল্লাহ বেশ উদ্যমী তরুণ। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা মাসিক নেয়ামতের পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাই হয়ত সবচেয়ে বেশি। নিজেদের ব্যস্ততা সত্ত্বেও তারা উভয়ে বিশেষ সংখ্যায় লেখা দিয়ে শরীক হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। ইলম-আমল, যিকির-ফিকির এবং ঈমান ও ইসতিকামাতে তারাক্কী নসীব করুন।

কুরআনের এক বড় দাওয়াত, আমরা যেন কথার মানুষ না হয়ে কাজের মানুষ হই। কুরআনের সাথে শুধু ইলমী ও জ্ঞানগত সম্পর্ক স্থাপন কুরআন পছন্দ করে না। কুরআন চায়, মুমিন তার সাথে আমলী সম্পর্ক স্থাপন করুক এবং এ সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাক এবং একসময় তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করুক। এই কর্মগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজন কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত ও আদব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। মাওলানা আহমদ মায়মূন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের প্রবন্ধ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের পথ নির্দেশ করে। এ প্রবন্ধের একটি শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, ফযীলত সম্পর্কিত বিষয়েও 'মুনকার' রেওয়ায়েত পরিহার করা জরুরি।

কুরআনুল কারীমের সাথে আমলী ও কর্মগত সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায়, সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও কর্মকে জানা যে, কুরআনুল কারীমের সাথে তাদের কী গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। কুরআনের প্রতি ঈমান, কুরআনের পঠন-পাঠন, তেলাওয়াত ও তাদাব্বুর এককথায় 'ফানা ফিল কুরআন' অর্থাৎ কুরআনের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার যে নমুনা সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ও জীবনে পাওয়া যায় (যা মূলত নববী সীরাতেরই ঝলক) তা-ই আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিতে পারে এবং কুরআনের সাথে আমাদের জুড়ে থাকার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বেরাদরে আযীয মাওলানা সাঈদ আহমদ ইবনে গিয়াসুদ্দীনের প্রবন্ধে এরই কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে। আমি মনে করি, বিষয়বস্তুর বিচারে এ প্রবন্ধ বর্তমান বিশেষ সংখ্যার 'রূহ'। আল্লাহ তাআলা এ থেকে আমাদের যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সংখ্যাটির অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে আয়াত-সংখ্যা বিষয়ক লেখা প্রবন্ধ। কলেবরের দিক থেকে এটি বিশেষ সংখ্যার দীর্ঘতম প্রবন্ধ। ছোট একটি বিষয়ে এত বড় প্রবন্ধ- আসলেই আশ্চর্যের বিষয়, কিন্তু হিম্মত করে যদি তা পড়া হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ এটুকু কথা অবশ্যই স্পষ্ট হবে যে, বিভিন্ন কারণে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবিদার। এটি আলাদা কথা যে, এই প্রবন্ধ সেই শূন্যতা পূরণ করতে পেরেছে কি না। তবে তালিবে ইলম ও সহকর্মীদের ধারণা, এ প্রবন্ধও ইনশাআল্লাহ সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপকারে আসবে। বিশেষ করে তালিবে ইলমগণ এ থেকে 'উসূলে তাহকীক' ও 'আদাবে ইলম' বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সুধারণাকে কবুল করুন। আমীন।

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার দাওয়াহ বিভাগের শিক্ষক মাওলানা মুসাদ্দেকের প্রবন্ধ 'আলকুরআন : বিকৃতি যাকে স্পর্শ করে না' সংক্ষিপ্ত হলেও এতে খৃস্টানদের পক্ষ থেকে আরোপিত কিছু সংশয়ের (যার ভিত্তি কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের অর্থগত বিকৃতি) নিরসন এসেছে।

বাতিল ধর্মাবলম্বী, বাতিল মতবাদের অনুসারী, বিভিন্ন বাতিল ফের্কা ও বাতিল চিন্তাধারার ব্যক্তি এবং সব যুগের বেদআতপন্থীদের পক্ষ থেকে কৃত বিকৃতির তালিকা অতি দীর্ঘ। এ প্রবন্ধ তার একটি নমুনামাত্র। এ ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা আলকাউসারের নিয়মিত সংখ্যায় এবং বিশেষ সংখ্যায় জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ।

তিনটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে দু'টি সাক্ষাৎকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর সাক্ষাৎকারে পাওয়া যাবে একজন সাদাসিধা সাধারণ মুসলিমের কুরআনের প্রতি যে আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকা উচিত তার বাস্তব নমুনা। একইসাথে কুরআনের সাথে একজন মুমিন প্রফেসরের সম্পর্ক কেমন হতে পারে তাও অনুমান করা যাবে। এখান থেকে আমার মত শুষ্ক মওলবীর সবক নেওয়া উচিত যে, কীভাবে তোমার কুরআনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। এই শানদার সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং নৈপুণ্যের সাথে উপস্থাপনের জন্য শরীফ মুহাম্মদ ছাহেব আমাদের শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য।

হযরত মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দামাত বারাকাতুহুমের সাক্ষাৎকারে অনেক উপকারী বিষয় তো এসেছেই, তাছাড়া এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের নেসাবে তা'লীমে কুরআনুল কারীম সম্পর্কে যে পাঠ্য ও পাঠ্যক্রম রয়েছে তা আরো সহজ, সুন্দর ও মানসম্মত করার জন্য এতে চিন্তা-ভাবনার অনেক খোরাক রয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্ন মতের অবকাশ তো অবশ্যই রয়েছে কিন্তু কিছু মৌলিক বিষয় এমন আছে,

যা গভীরভাবে চিন্তা করলে সর্বসম্মতও হতে পারে। হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. এক জায়গায় বলেছেন–

کتب درسیہ کی تحصیل کے بعد دماغ میں اصطلاحات رچ جاتی
ہے، پھر طالب علم قرآن شریف کو انہی قواعد پر منطبق کرنے لگتا
ہے، اس لئے فنون کے درس سے پہلے قرآن شریف کا
ترجمہ پڑھا دینا مناسب ہے۔

-আলকালামুল হাসান, পৃষ্ঠা: ৬৫, মাজমুআয়ে মালফুযাতে হাকীমুল উম্মত, খণ্ড : ২৬

যাই হোক এগুলো দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের চিন্তা-ভাবনার বিষয় এবং তারা এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেও থাকেন। এটা আমার শাস্ত্র ও বিষয় নয়।

'কুরআন সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতা কাম্য'শীর্ষক সাক্ষাৎকারটি মূলত আয়াত সংখ্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধটির উপসংহার। প্রবন্ধটি পাঠের আগে কিংবা সাথে সাথে যদি তা পড়ে নেওয়া হয় তাহলে ভালো হবে।

সবশেষে আমরা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের শুকরিয়া আদায় করছি যারা নিজেদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং দুআ ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন। তাদেরও শুকরিয়া আদায় করছি যারা এ বিশেষ সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা তা এ সংখ্যায় ছাপতে পারিনি। ইনশাআল্লাহ এগুলোর কিছু প্রবন্ধ আলকাউসারের নিয়মিত সংখ্যায় আর কিছু আগামীতে কোনো বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হবে। মাওলানা আবদুল মজীদ ছাড়াও মাওলানা সাঈদ আহমদ ইবনে সিরাজ, মাওলানা আবদুল হাকীম, মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ, মাওলানা ইমরান, মাওলানা মুনশী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মাওলানা শাহাদাত সাকিব, মাওলানা মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ (নরসিংদী) ও মাওলানা আনাস বিন সা'দ (শহীদবাড়িয়া) এরা সবাই এ সংখ্যার জন্য লিখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। মাওলানা আবদুল গাফফার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম অনেক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এ সংখ্যায় লিখতে পারেননি। তিনি ওযরখাহী করে আগামীতে লেখার ওয়াদা করেছেন।

বিশেষ সংখ্যার সব লেখাই সব শ্রেণীর পাঠকের জন্য। যদিওবা একজনের জন্য এক লেখা বেশি উপযোগী হয় আরেক জনের জন্য অন্য লেখা। তারপরও ইচ্ছা ছিল, এতে শিশু-কিশোর ও পর্দানশীন পাতা থাকবে এবং তাদের উপযোগী করে কুরআন সংশ্লিষ্ট লেখা প্রকাশ করা হবে। সময় স্বল্পতার কারণে এ সংখ্যায় যদিও তা হয়ে ওঠেনি আগামীতে বিশেষ সংখ্যায় এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে। ইনশাআল্লাহ।

সূচিতে নজর দিলে বোঝা যাবে কুরআনুল কারীম সংক্রান্ত অনেক জরুরি ও প্রাথমিক বিষয় (সাধারণত কুরআন সংখ্যায় যা থাকবে বলে আশা করা হয়) এতে নেই। ইচ্ছাকৃতভাবেই এমনটি করা হয়েছে। এ ধরনের প্রাথমিক ও মৌলিক জরুরি আলোচনা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের কিতাব 'উলূমুল কুরআনে' অনেকটা চলে এসেছে। কিতাবটি বিভিন্ন ভাষায় তরজমাও হয়েছে। তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের ভূমিকাগুলোতে এবং আলকাউসারের নিয়মিত সংখ্যায়ও কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর কিছু বিষয় অন্যান্য কিছু পত্রিকার সাধারণ ও বিশেষ সংখ্যায় এসেছে। আমাদের এই সংখ্যাটিতে সেগুলো আবার ছাপানো মুনাসিব মনে হয়নি। তেমনি শুধু মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেব অনূদিত হযরত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.-এর একটি জরুরি ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের অনুবাদ ছাড়া। আরবী ও উর্দূ ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের অনুবাদও এখানে প্রকাশ করা হয়নি। যাতে পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় গুরুত্বের পর্যায়ক্রম অনুসারে পাঠকের সামনে নিয়ে আসা যায়।

এ সংখ্যার একটি বড় শূন্যতা হল, এর শুরুতে আলকাউসারের পৃষ্ঠপোষক উস্তাযুল আসাতিযা মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুমের অভিমত নেই। অনেক দিন যাবৎ হযরত অসুস্থাবস্থায় শয্যাশায়ী। হযরতের শিফায়ে কামেল ও আজেলের জন্য পাঠকবর্গের কাছে দুআর দরখাস্ত রইল।

ঘোষণা ছিল এপ্রিল মাসের মধ্যে বিশেষ সংখ্যা পাঠকের হাতে পৌঁছবে। সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অনিবার্য কারণে কয়েকদিন বিলম্ব হয়ে গেল। এজন্য আমরা পাঠকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে মাজেরাত করছি।

আল্লাহ তাআলা এ সংখ্যাটিকে এবং মারকাযুদ দাওয়াহর অন্য সকল কাজ ও নিয়তকে কবুল ও মাকবুল করুন। এ সংখ্যার মূল প্রেরণাদাতা আলকাউসারের সম্পাদক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ার মুদীর হযরত মাওলানা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুমকে আল্লাহ সুস্থ ও দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। তাঁর সকল সহযোগীকে হিম্মত ও উদ্যম দান করুন। বিশেষত এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য যারা লাগাতার পরিশ্রম করেছেন– শরীফ মুহাম্মদ, মুতীউর রহমান, যাকারিয়া আবদুল্লাহ, ফজলুল বারী, আবদুল্লাহ ফাহাদ, আনওয়ার হোসাইন, মুজীবুর রহমান, মুনশী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন এবং তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন এমন সকল বন্ধু। আল্লাহ প্রত্যেককে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
২০ রজব ১৪৩৭ হি., ২৮ এপ্রিল ২০১৬ ঈ.

কুরআনের পরিচয় কুরআনের ভাষায়

আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

দুনিয়ার সর্বাধিক পঠ্যমান গ্রন্থ কোনটি? শত-শত বছর ধরে মানুষ সবচে' বেশি পড়ছে কোন কিতাব? কোন্ কিতাবের প্রতি বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মন-প্রাণ নিবেদিত? মানুষ তার মেধা ও মননের ব্যবহার সবচে' বেশি করেছে কোন্ কিতাবকে কেন্দ্র করে? কোন্ সে গ্রন্থ, যা যুগ-যুগ ধরে অসংখ্য মানুষকে বহু বিচিত্র জ্ঞান-বিদ্যার চর্চায় উদ্দীপিত করে রেখেছে? যে-কোনও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি অকুণ্ঠ উচ্চারণে বলে উঠবে আল-কুরআন। কুরআন মাজীদই সেই গ্রন্থ, হাজারও বছর যাবৎ যা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক মানুষের আত্মায় প্রাণরস জুগিয়ে আসছে। এত বেশি লোক হররোজ হরদম ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে এ গ্রন্থ পড়ছে, এর তত্ত্ব-তথ্যে জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করছে এবং এর আলোয় জীবন বদলাচ্ছে ও জীবন গড়ছে, যার তুলনা অন্য কোনও কিতাব ও অন্য কোনও গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। তা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের এত নিবিড় সংশ্লিষ্টতা যে কিতাবের সংগে, তার সাথে পরিচিত হওয়ার কৌতূহল মানুষের না থাকবে কেন? এ কিতাব নাযিলের সূচনাকাল থেকেই এ কৌতূহল মানবমনে ছিল এবং তা মেটানোর নানাবিধ উপায়ও এ যাবতকাল মানুষ অবলম্বন করে আসছে। প্রত্যেকে নিজ-নিজ জ্ঞান ও উপলব্ধি অনুযায়ী এর পরিচয় দান করেছে এবং আপন-আপন রচনা ও ভাষণে এর বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছে। নিশ্চয়ই আমরা তা থেকে আলো নিতে পারি। কুরআন মাজীদের পরিচয় সন্ধানী তার সহায়তা গ্রহণ করতেই পারে।

তবে কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা সুন্দর, পূর্ণাঙ্গ ও তৃপ্তিদায়ক পরিচয় কুরআন নিজেই দান করেছে। যে-কেউ গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে, সে ধাপে-ধাপে তার পরিচয়ও পেয়ে যাবে।

কুরআন তার শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে, বিশেষ কোনও এক জায়গায় তার সবটা পরিচয় একত্রে খোলাসা করেনি। সে নিজেকে মেলে ধরেছে একটু-একটু করে। মানুষের প্রয়োজনে নাযিলকৃত এ গ্রন্থের প্রসংগ অনেক কিছু। প্রসংগ অনুযায়ী নিজের যখন যেই পরিচয় দেওয়ার দরকার হয়েছে সে তা দিয়েছে। এর পাঠক এক ছত্র হতে আরেক ছত্রে এগিয়ে যায় আর নতুন-নতুন জ্ঞান ও বোধে সমৃদ্ধ হতে থাকে। এক পৃষ্ঠার পর আরেক পৃষ্ঠা উল্টায় আর নবতর রূপের সন্ধান পায়। মাঝেমাঝেই কুরআন তার মুগ্ধ পাঠককে নিজ পরিচয় দিয়ে চমকে দেয়। যেন বলে ওঠে, তুমি এখনও চিনতে পারনি আমাকে? আমি তো এই! আমি তোমার জিজ্ঞাসার জবাব। আমি তোমার কৌতূহল নিবারক, তোমার ব্যথিত মনের সান্ত্বনা। আমি তোমার নিরুদ্দাম মনের উদ্দীপনা। এখনও চেননি তুমি আমাকে? আমি তোমার অন্ধকার পথের আলোকধারা, তোমার অচেনা গন্তব্যের নিশ্চিত দিশা। আমি আরও কত কি। তুমি আমাকে পড়। পড়তে থাক। যত পড়বে তত জানবে। আমি এক অন্তহীন পরিচিতির আধার। তবে তোমার যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু তুমি আমাকে জানতে পারবে। তোমার দরকার মাফিক নিজ পরিচয় আমি দিয়ে রেখেছি। তা সে দরকার তোমার নিজ বিস্তার ও সীমানা হিসেবে যত বিপুলই মনে হোক।

হিদায়াত-গ্রন্থ

কুরআন মাজীদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের সাথে নিজের যে পরিচয় দান করেছে, তা হচ্ছে– এটি এক হিদায়াত-গ্রন্থ। সারা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ পরিচয় 'নজরকাড়া'-রূপে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা ফাতিহায় দু'আর ভেতর দিয়ে এর প্রতি ইংগিত করার পর সূরা বাকারার একদম সূচনায় ঘোষণা করা হয়েছে– ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

'এটাই (সেই) কিতাব। এতে কোনও সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও পথনির্দেশ।' –সূরা বাকারা (২) : ১-২

অর্থাৎ হে বান্দা! তুমি যে আমার কাছে পথনির্দেশ চেয়েছিলে, বলেছিলে– اهدنا الصراط المستقيم 'আমাদের দেখাও সরল পথ'। এটাই তোমার জন্য সেই পথনির্দেশ সম্বলিত কিতাব। তোমাকে সত্য-সঠিক পথ দেখানোর জন্যই এ গ্রন্থ নাযিল করা হয়েছে, যেমন ইরশাদ–

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

'রমযান মাস– যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত

এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়।' –সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

বস্তুত এটা এক আদি ওয়াদার বাস্তবায়ন। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যখন মানবজাতিকে পাঠান, তখন তার মনে ছিল নানা অজানা ভীতির আলোড়ন। একবার সে জান্নাতের নিরাপদ ও পরম সুখের পরিবেশেও শয়তানী ছলনার শিকার হয়েছিল। এখন যেখানে তাকে যেতে হচ্ছে, না জানি সেখানে তাকে কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আজন্ম শত্রু শয়তান পেছনে লেগে থাকবে, নফসের কুমন্ত্রণাও সক্রিয় থাকবে, থাকবে কত যিম্মাদারি। পরস্পরের মধ্যে কত লেনাদেনা, বোঝাপড়া, জীবনযাপনের কত বিচিত্র প্রাসঙ্গিকতা, বিবিধ সংগত-অসংগতের টানাপড়েন ও অন্তহীন ঝক্কি-ঝামেলার সেই জীবনে নিজেকে সাধু-সজ্জন করে রাখা কতটুকু সম্ভব হবে! পারবে তো আল্লাহর মরজি মোতাবেক চলতে? নাকি আবারও কোনও ফাঁদে পা দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার গযব ও ক্রোধের পাত্রে পরিণত হবে! নতুন জগতে পাড়ি জমানোর প্রাক্কালে এই যে নানামুখী শঙ্কা মানুষকে ঘিরে ধরছিল, তার থেকে আশ্বস্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে আশার বাণী শোনান–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'অতঃপর আমার নিকট থেকে তোমাদের নিকট যদি কোনও হিদায়াত পৌঁছে, তবে যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' –সূরা বাকারা (২) : ৩৮

যেন এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক প্রচ্ছন্ন ওয়াদা যে, দুনিয়ার জীবনে তোমরা যাতে সঠিক পথে চলতে পার, সে লক্ষে আমি তোমাদের কাছে হিদায়াত ও পথনির্দেশ পাঠাব। সমস্ত আসমানী কিতাবই সেই প্রতিশ্রুত পথনির্দেশ, যা যুগে-যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। যেমন তাওরাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

'আমি নাযিল করেছি তাওরাত। তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো।' – সূরা মায়িদা (৫) : ৪৪

ইনজীল সম্পর্কে ইরশাদ– وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ.

'তাকে (ঈসাকে) দিয়েছিলাম ইনজীল। তাতে ছিল হিদায়াত ও নূর।' –সূরা মায়িদা (৫) : ৪৬

এভাবে যুগ-পরম্পরায় একের পর এক নবী-রাসূল আগমন করেছেন এবং সংগে নিয়ে এসেছেন হিদায়াতের বাণী। সবশেষে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয় কুরআন মাজীদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লক্ষ করে বলেন–

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

'জিবরীল আল্লাহর নির্দেশে এ কিতাব নাযিল করেছেন তোমার অন্তরে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, হিদায়াত এবং মু'মিনদের জন্য সুসংবাদরূপে।' –সূরা বাকারা (২) : ৯৭

গোটা মানবজাতিকে লক্ষ করে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

'হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে উপদেশবাণী, তোমাদের অন্তকরণের রোগ-ব্যাধির উপশম, পথনির্দেশ এবং মু'মিনদের জন্য রহমত।' – সূরা ইয়ূনুস (১০) : ৫৭

অন্যত্র ইরশাদ– هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى

'এটা মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা ও পথনির্দেশ।' –সূরা আলে-'ইমরান (৩) : ১৩৮

এভাবে কুরআন মাজীদ তার অসংখ্য আয়াতে নিজের এই সর্বপ্রধান পরিচয় তুলে ধরেছে। সুতরাং এটা এক হিদায়াত-গ্রন্থ সুস্পষ্ট পথনির্দেশ।

আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে প্রেরিত

কুরআন মাজীদ তার দ্বিতীয় পরিচয় দিয়েছে যে, সে কোনও মানুষের কথা নয়, মানব-রচিত কোনও গ্রন্থ নয়; বরং আল্লাহ রাব্বুল-'আলামীনের প্রেরিত কিতাব। মানুষ রাব্বুল-'আলামীন তথা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, তিনি যেন তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। তার জবাবে রাব্বুল-'আলামীন বলছেন– তোমাকে সরল পথের দিশা দিয়ে দেওয়া হল। এ কুরআনই সেই দিশারী কিতাব। কোনও সন্দেহ নেই এটা আমার প্রেরিত পথনির্দেশক কিতাব। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ – এ আয়াত স্পষ্টভাবেই জানান দিচ্ছে যে, এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। এর চেয়েও সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

'নিশ্চয়ই এ উপদেশবাণী আমিই নাযিল করেছি।' –সূরা হিজর (১৫) : ৯

আরও স্পষ্টভাবে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

'(হে রাসূল!) আমিই তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে।' –সূরা দাহর (৭৬) : ২৩

আরও বলেন– تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

'মহিমময় সেই সত্তা, যিনি নাযিল করেছেন ফুরকান' –সূরা ফুরকান (২৫) : ১

আরও ইরশাদ– كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ

'এটা এমন এক কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।' –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ১; সূরা সোয়াদ (৩৮) : ২৯; সূরা আ'রাফ (৭) : ২

আরও ইরশাদ–

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ

'তবে কি তোমরা এ কারণে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে?' –সূরা আ'রাফ (৭) : ৬৯

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে–

"এটা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত।" –সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ৫

সূরা যুমারে ইরশাদ– ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ

'এটা আল্লাহর হিদায়াত।' –সূরা যুমার (৩৯) : ২৩

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'এ কুরআন এমন নয় যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে রচনা করা হবে, বরং এটা (ওহীর) সেইসব বিষয়ের সমর্থন করে, যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ (লাওহে মাহফূজে) যেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।' –সূরা ইয়ূনুস (১০) : ৩৭

আরও ইরশাদ– وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ

'এবং (হে নবী!) নিশ্চয়ই এ কুরআন তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই সত্তার পক্ষ হতে যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' –সূরা নামল (২৭) : ৬

কুরআন মাজীদে এরূপ বেশুমার আয়াত আছে, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, এ কিতাব মহান রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতেই অবতীর্ণ এবং এ ব্যাপারে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

কিসের পথনির্দেশ

সূরা ফাতিহায় মানুষ দাবি করেছিল– اِيَّاكَ نَعْبُدُ 'আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদত করি'। তারপর প্রার্থনা করেছিল– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাও'। অর্থাৎ আমরা যাতে তোমার যথাযথ 'ইবাদত করতে পারি, জীবনভর তোমার আবেদ হয়ে থাকতে পারি এবং তোমার 'ইবাদত ও দাসত্বকে কেন্দ্র করে ও 'আবদিয়্যাতের চেতনার সাথেই যাতে ইহজীবনের সবকিছু নির্বাহ হয়, সেই লক্ষ্যে তুমি আমাদের পথ দেখাও– এমন পথ, যা হবে সরল-সঠিক, কোনওরকমের বক্রতা তার মধ্যে থাকবে না, যে পথ সরাসরি আমাদেরকে তোমার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, যে পথে চললে আমরা তোমার সোজাসাপ্টা বান্দা হয়ে যাব এবং যে পথের পান্থ হলে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি অনুসংগকে সর্বপ্রকার বক্রতা ও প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত রাখতে পারব। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শেখানো বান্দার এ দু'আ কবুল করে নেন এবং তাকে তার সেই কাঙ্ক্ষিত পথের দিশা দিয়ে দেন। বান্দার কাঙ্ক্ষিত সেই পথেরই হিদায়াত হল আল-কুরআন। ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ

'বস্তুত এই কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল।' –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৯

কুরআন যে পথ দেখায় এ আয়াতে তাকে 'আকওয়াম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন পথ, যা সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনুসরণযোগ্য, যা সকল পথ অপেক্ষা সহজ ও সরল এবং যা সর্বাপেক্ষা ন্যায়ানুগ (তাফসীরে মাজহারী)। এমন পথ, যা গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত (তাফসীরে কুরতুবী)। এবং এমন পথ, যা সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। সম্পূর্ণ ঋজু ও ভারসাম্যমান– অর্থাৎ কুরআন প্রতিটি বিষয়ে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করেছে। কোনও অন্যায় পক্ষপাতের স্থান তাতে নেই। সকল বিষয়ে তার দেখানো পথই মধ্যবর্তী পথ, মাত্রানিষ্ঠ ও ন্যায়ানুগ পথ। এমন নয় যে, একদিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যদিক উপেক্ষা করেছে; বরং সকল দিকের প্রতিই নজর রেখেছে এবং যে বিষয়ের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রাপ্য, তার সেই গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করেছে।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রাহ. বলেন–

"এর দ্বারা বোঝা যায়, কুরআন মাজীদ মানব-জীবনের জন্য যেসব বিধান দেয়, তা উল্লিখিত তিনও বৈশিষ্ট্যের ধারক। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত। কখনও কখনও মানুষ নিজ দৃষ্টির ত্রুটি হেতু এ পথকে কঠিন ও বিপজ্জনক মনে করে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রাব্বুল-'আলামীন জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যাবতীয় বিষয়েও পূর্ণ জ্ঞাত। ভূত-ভবিষ্যত তাঁর সামনে সমান পরিষ্কার। মানুষের পক্ষে কোন্ কাজ বেশি উপকারী এবং কিসে তার কল্যাণ, তার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলারই আছে (সুতরাং তাঁর দেখানো পথ ও তাঁর প্রদত্ত বিধানই যে মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও কল্যাণকর হবে তা বলাই বাহুল্য)।" –মা'আরিফুল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৯

সূরা আহকাফে জিন্ন জাতির একটি প্রতিনিধি দলের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শোনার পর নিজ সম্প্রদায়ের

কাছে গিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেছিল ও এই বলে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিল যে–

يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ

'হে আমাদের কওম! নিশ্চয়ই জেনে রাখ, আমরা এমন এক কিতাব (-এর পাঠ) শুনেছি, যা মূসা ('আলাইহিস-সালাম)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে, তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থকরূপে, যা পথনির্দেশ করে সত্যের ও সরল পথের।'– সূরা আহকাফ (৪৬) : ৩০

সত্যের পথ দেখানো একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা। এককথায় আল্লাহর পথই সত্যের পথ। আল্লাহ তা'আলাই হক ও পরম সত্য। যে পথে চললে তাঁকে পাওয়া যায় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় তাই সত্যের পথ। সত্য-সঠিক 'আকীদা-বিশ্বাস, সত্যিকারের 'ইবাদত-বন্দেগী, বিশুদ্ধ আখলাক-চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত যাবতীয় নির্দেশনাই এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদ এ সবকিছুরই হিদায়াত-সম্বলিত এক চিরসত্য কিতাব। এতে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ই সত্য ও বাস্তবসম্মত।

অপর এক আয়াত মতে কুরআন মানুষকে শান্তির পথ দেখায়। ইরশাদ হয়েছে–

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধান করে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।' – সূরা মায়িদা (৫) : ১৬

'শান্তির পথ দেখানো'– এর চূড়ান্ত ধাপ হল জান্নাতে পৌঁছানো। জান্নাতই পরম শান্তির স্থান। সেখানে কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই। জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশের পর এই বলে আল্লাহর শুকর আদায় করবে যে–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে সমস্ত দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী অবস্থানের নিবাসে এনে দাখিল করেছেন, সেখানে আমাদেরকে কখনও কোনও কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং কোন ক্লান্তিও আমাদের দেখা দেবে না।' –সূরা ফাতির (৩৫) : ৩৪-৩৫

কুরআন মূলত মানুষকে শান্তির সেই চূড়ান্ত ধাপ অর্থাৎ জান্নাতেরই পথ দেখায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

'আল্লাহ মানুষকে শান্তির আবাস (অর্থাৎ জান্নাত)-এর দিকে ডাকেন।'–সূরা ইয়ূনুস (১০) : ২৫

তবে কুরআন সেই শান্তির নিবাসে পৌঁছানোর জন্য মানুষকে যেই কর্মসূচি দিয়েছে, তা দুনিয়ার শান্তিও নিশ্চিত করে। বরং পার্থিব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারচে' উত্তম কোনও ব্যবস্থাই হতে পারে না। উদাহরণ– শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হল বর্ণবৈষম্য দূর করে সর্বাত্মক সাম্যের চেতনা সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথাটি কেবল কুরআনই বলেছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।' –সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১৩

বর্তমানকালে বহুমুখী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না, এর একটা বড় কারণ অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। কুরআন তার অনুসারীদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে এই চেতনা দান করে থাকে। মনোযোগী পাঠক কুরআনের ভেতর দেখতে পায় অন্যের অধিকারের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি এবং তা আদায়ের কঠোর তাগিদ। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

'এবং আল্লাহর 'ইবাদত কর ও তাঁর সংগে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগে বসা (বা দাঁড়ানো) ব্যক্তি, পথচারী এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও (সদ্ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।' –সূরা নিসা (৪) : ৩৬

অন্যত্র ইরশাদ–

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং

পুণ্য হল (সেই ব্যক্তির কার্যাবলী), যে ঈমান রাখে আল্লাহর, শেষ দিনের ও ফিরিশতাদের প্রতি এবং (আল্লাহর) কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদেরকে এবং দাসমুক্তিতে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং যারা কোনও প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে এবং সঙ্কটে, কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা, যারা সাচ্চা (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।' –সূরা বাকারা (২) : ১৭৭

এরূপ আরও বহু আয়াত আছে, যাতে পিতামাতার হক, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর হক, সন্তান-সন্ততির হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, বড়র হক, ছোটর হক, অধীনস্তের হক, ইয়াতীম-মিসকীনের হক, সমস্ত মানুষের হক, মানুষের জানমাল ও ইজ্জতের হক, পশু-পাখির হক মোটকথা যা-কিছুর সাথে মানুষের কোনও রকমের সংশ্লিষ্টতা আছে, তার কোনও না কোনও হকও মানুষের কাঁধে অর্পিত রয়েছে। কুরআন মাজীদ সে হক আদায়ের জোর নির্দেশ দেয়। বলা বাহুল্য সেসব হক আদায় করলে ব্যক্তির নিজ আত্মিক প্রশান্তির সাথে সাথে পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের শান্তিও আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মানুষ তার সংকীর্ণ স্বার্থের পেছনে পড়ে নিরন্তর অন্যের এসব হক খর্ব করে চলছে আর তারই পরিণামে সারা জাহান অশান্তির আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। কুরআন ঘোষণা করছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

'মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন বলে, হয়ত (এর ফলে) তারা ফিরে আসবে।' –সূরা রূম (৩০) : ৪১

শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ন্যায়বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষপাতদুষ্ট ও অন্যায় বিচার শান্তি নষ্ট করে ও প্রতিশোধস্পৃহাকে উসকে দেয়। তাই কুরআন মাজীদ সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচারের আদেশ দেয়। সে এ ক্ষেত্রে আপন-পর, শত্রু-মিত্র ও সাধারণ-বিশিষ্টের ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় না। কুরআন মাজীদের হুকুম–

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

'যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে।' –সূরা নিসা (৪) : ৫৮

ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (বিধানাবলী পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। –সূরা মায়িদা (৫) : ৮

অর্থাৎ সাক্ষ্যদান, বিচার-নিষ্পত্তি ও অন্যান্য আচার-আচরণ হবে সবরকম কমবেশি ও বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত একদম পরিমাপমত মাপাজোখা। এটা বান্দার হক। শত্রু-মিত্র কারও ক্ষেত্রেই এ হক আদায়ে গড়িমসি করার সুযোগ নেই। এমনকি আল্লাহর ঘোর দুশমন কাফের-অমুসলিমও যদি হয়, তার সাথেও ন্যায়-ইনসাফ রক্ষা করা অপরিহার্য। সে আল্লাহর দুশমন– এই ভাবনায় তার প্রতি বেইনসাফীর আচরণ করা হলে তা হবে কুরআনী বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। এবার চিন্তা করুন যারা আল্লাহর বন্ধুজন ও তাঁর প্রিয়পাত্র, সেই মু'মিন-মুসলিমের সাথে ইনসাফ রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ! যে সমাজ সেই গুরুত্বের সাথে ন্যায় ও ইনসাফ রক্ষায় যত্নবান থাকে, সেই সমাজে কখনও অশান্তি দেখা দিতে পারে না। বর্তমান সমাজে যত অশান্তি, নিঃসন্দেহে তার একটা বড় কারণ ইনসাফভিত্তিক বিচারের অভাব।

যেসব কাজে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হয়, কুরআন কঠোরভাবে সেগুলো নিষেধ করেছে। যেমন জুলুম করা। কুরআন বলছে–

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ.

'তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দকাজ ও জুলুম করতে।' –সূরা নাহ্‌ল (১৬) : ৯০

অন্যত্র ইরশাদ–

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

'বলে দাও, আমার প্রতিপালক তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজসমূহ– প্রকাশ্য হোক বা গোপন এবং সর্বপ্রকার গুনাহ, অন্যায়ভাবে (কারও প্রতি) সীমালংঘন।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ৩৩

যারা জুলুম করে, তাদের সম্পর্কে কুরআন হুঁশিয়ারী দিয়েছে– وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا;

'বাকি থাকল জালেমগণ, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।' –সূরা জিন্ন (৭২) : ১৫

উড়ো সংবাদ বা অসত্যায়িত খবরে কান দেওয়ার পরিণামেও সমাজে অশান্তি নেমে আসে। তাই কুরআন বলছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

'হে মু'মিনগণ! কোনও ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোনও সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।' –সূরা হুজুরাত (৪৯) : ৬

এমনিভাবে অন্যকে উপহাস বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, কু-ধারণা করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হওয়া, গীবত করা এবং অন্যের মান-সম্মানে আঘাত লাগে এমন যে-কোনও কাজই শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং কুরআন এ জাতীয় সকল তৎপরতাই নিষিদ্ধ করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

'হে মু'মিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোনও কোনও অনুমান গুনাহ। তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।' –সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১২

কুরআন মাজীদের এসব হিদায়াত অনুসরণ করলে ইহজগতেও মানুষ জান্নাতী সুখ-শান্তির কিছুটা আঁচ পেতে পারে। সেই শান্তির পথ দেখানোর জন্যই কুরআনের অবতরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

'স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর 'যিকর'-এর দ্বারাই অন্তরসমূহে প্রশান্তি লাভ হয়।' –সূরা রা'দ (১৩) : ২৮

'অন্তরসমূহ'– এই বহুবচন শব্দ ব্যবহার দ্বারা এ অর্থের প্রতিও ইংগিত হয় যে, আল্লাহর যিকর অর্থাৎ তাঁর উপদেশবাণী এই কুরআন অনুসরণ করে চললে ব্যাপকভাবে জনমনে শান্তি আসে। মোদ্দাকথা কুরআন মানুষকে শান্তির পথ-প্রদর্শন করে। আখিরাতের শান্তি তো বটেই এবং নিশ্চিতভাবে ইহজগতের শান্তিও কেবল কুরআনের অনুসরণ দ্বারাই নিশ্চিত হতে পারে।

কুরআন মানুষকে কিসের পথ দেখায়, সে সম্পর্কে আরও একটি আয়াতের প্রতি লক্ষ করুন– সূরা জিন্নে জিন্নদের জবানীতে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ.

'আমরা শুনেছি এক বিস্ময়কর কুরআন, যা দেখায় 'রুশদ'-এর পথ। সুতরাং আমরা তাতে ঈমান এনেছি।' –সূরা জিন্ন (৭২) : ১-২

এখানে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'রুশদ'। রুশদ ও রাশাদ-এর অর্থ– সুপথ, সুবুদ্ধি, কল্যাণ, সাধুতা, শুদ্ধতা ইত্যাদি। ইমাম রাগিব রাহ.-এর মতে রাশাদ অপেক্ষা রুশদ ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ 'রুশদ' দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগৎ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর কল্যাণ ও শুদ্ধতা বোঝায় আর 'রাশাদ' দ্বারা কেবল পারলৌকিক কল্যাণ ও শুদ্ধতাই বোঝানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ নিজ হিদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যাপারে উভয় শব্দই ব্যবহার করেছে। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় কুরআন মানুষকে দোজাহানের কল্যাণ ও শুদ্ধতার পথ দেখায়। ইহজীবনে মানুষের যা-কিছু অনুষংগ আছে, তার প্রতিটি সম্পর্কে কুরআন যে নির্দেশনা দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক ও সুবুদ্ধির অনুকূল। মানুষ যে বিশুদ্ধ স্বভাবের সাথে জন্মগ্রহণ করে, তা যদি কোনওভাবে ভ্রষ্ট-বিকৃত না হয়, তবে তার সে বিশুদ্ধ স্বভাব কুরআনী নির্দেশনাকেই গ্রহণ করবে। যাবতীয় কাজে সে কুরআনের শিক্ষাতেই স্বস্তিবোধ করবে। কুরআনের নির্দেশনামত কাজ করলে সে কাজে শুদ্ধতা আসে। কুরআনী নির্দেশনামত চললে সমগ্র জীবনই সুষ্ঠু ও সুচারু হয়, জীবনে পরিপূর্ণতা আসে এবং সার্বিক কল্যাণে জীবন ভরে ওঠে। সে সম্পর্কেই কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে বলা হয়েছে–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

'যে ব্যক্তিই সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী এবং সে মু'মিনও বটে, আমি অবশ্যই তাকে উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই দেব।' –সূরা নাহল (১৬) : ৯৭

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআনের হিদায়াত অনুসরণ করে না; বরং তা উপেক্ষা করে চলে, তার যাবতীয় কাজ হয় ত্রুটিপূর্ণ। ফলে তার ইহজীবনও হয়ে ওঠে সংকটাকীর্ণ। কুরআন মাজীদ ঘোষণা করছে–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ.

'আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে রব! তুমি আমাকে অন্ধ করে উঠালে

কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।' –সূরা ত্বহা (২০) : ১২৪-১২৬

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ.

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়। তারা (অর্থাৎ শয়তানেরা) তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে আর তারা মনে করে আমরা সঠিক পথেই আছি।' –সূরা যুখরুফ (৪৩) : ৩৬-৩৭

অর্থাৎ কুরআন-প্রদর্শিত পথ উপেক্ষা করার অনিবার্য ফল হল শয়তানকে নিজ পথপ্রদর্শক বানিয়ে নেওয়া। আজন্ম শত্রু শয়তান এরূপ ব্যক্তিকে সর্বদা কুপথেই পরিচালিত করে আর নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা তাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, সেটাই সঠিক পথ। কুপথকে কুপথ হিসেবে চিনতে না-পারাই তো মানব-জীবনের ব্যর্থতা। তদুপরি যদি সেই পথকে সঠিক পথ মনে করা হয়, তার মত দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। কুরআন মাজীদ বলছে–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

'বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব, কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেইসব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়-ঝাঁপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা খুবই ভালো কাজ করছে। এরাই সেইসব লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনে উপস্থিতির বিষয়টিকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। আমি কিয়ামতের দিন তাদের কোনও ওজন গণ্য করব না।' –সূরা কাহফ (১৮) : ১০৩-১০৫

সারকথা কুরআন মাজীদ মানুষের দোজাহানের মুক্তির দিশারী। যে পথে চললে পার্থিব জীবন সুন্দর, নিরাপদ ও শান্তিময় হয় এবং আখিরাতের জীবন হয় সাফল্যমণ্ডিত, কুরআন মানুষকে সে পথই দেখায়। উভয় লোকের এক নির্বিকল্প হিদায়াতরূপেই মানুষের কাছে এ পাক কালামের আগমন। কুরআন ঘোষণা করছে– قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

'বলে দাও, আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশই প্রকৃত হিদায়াত।' –সূরা বাকারা, (২) : ১২০; সূরা আন'আম, (৬) : ৭১

পরিপূর্ণ পথনির্দেশ

কুরআন যেহেতু স্থান-কাল ও ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে জগতের সমস্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে, তাই এর রয়েছে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যত রকমের অনুষঙ্গ আছে, সব ব্যাপারেই কুরআনের রয়েছে যথোপযুক্ত দিকনির্দেশ। তার সে হিদায়াত যেমন নাযিলের যুগে প্রযোজ্য ছিল, তেমনি আজও সমান প্রযোজ্য এবং ভবিষ্যতেও সমান প্রযোজ্য থাকবে। যেমন তা আরব জাতিকে পথ দেখানোর পূর্ণ যোগ্যতা রাখে, তেমনি তা অনারব জগতের সকলকেও নিজ হিদায়াত-বলয়ে ধারণে সক্ষম। পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ যত উৎকর্ষই সাধন করুক, তার জীবন থেকে কুরআনী নির্দেশনার প্রাসঙ্গিকতা কখনওই ফুরাবে না। মানুষ এমন কোনও সময়কালের সম্মুখীন কখনওই হবে না, যখন তার এ কথা বলার সুযোগ হবে যে, আমাদের জন্য কুরআন তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে, আমরা তার আওতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি এবং আমরা এমন এক সভ্যতায় পা রেখেছি, যেখানে কুরআনের দেওয়ার কিছুই নেই। বস্তুত কুরআন এক চির আধুনিক গ্রন্থ। এর বিধানাবলী সর্বকালোচিত। সকল যুগের সকল প্রয়োজন সমাধার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানব-জীবনের সম্ভাব্য সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ মূলনীতি এতে বিধৃত হয়েছে। কুরআন ঘোষণা করছে–

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.

'তিনিই তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন বিশদ বর্ণনা সম্বলিত কিতাব। পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারাও জানে এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যসহ অবতীর্ণ কিতাব। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' –সূরা আন'আম (৬) : ১১৪

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন এক কিতাব দিয়েছেন, যার ভেতর যাবতীয় প্রয়োজনীয় মূলনীতিসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীল সম্পর্কে যারা জ্ঞাত ছিল তারাও জানত। ফলে মনে মনে তারাও বিশ্বাস করত এটা সত্য কিতাব। অনেকে তো মুখেও স্বীকার করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। সুতরাং এ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের কালোত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

'আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এমন এক কিতাব, যার ভেতর (নিজ) জ্ঞানের ভিত্তিতে (প্রতিটি বিষয়ের) বিশদ ব্যাখ্যা করেছি, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমতস্বরূপ।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ৫২

অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যে-কেউ কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করবে, সে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর নির্দেশনা পাবে। কেননা তার জীবনপথের যাবতীয় বিষয়ের বিশদ নীতিমালা এতে বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনের দাবি–

كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

'এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ (দলীল-প্রমাণ দ্বারা) সুদৃঢ় করা হয়েছে, অতঃপর এমন এক সত্তার পক্ষ হতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।' –সূরা হূদ (১১) : ১

অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেহেতু হাকীম ও খাবীর, স্থান-কাল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, পরিবর্তনশীল বিশ্বের সব পরিবর্তন সম্পর্কে খবর রাখেন, বরং যে-কোনও পরিবর্তন তাঁর হুকুমেই ঘটে থাকে, আর কোন্ অবস্থায় মানুষের কোন্ নির্দেশনা দরকার এবং কখন কোন্ বিধান প্রযোজ্য তাও ভালোভাবে জানেন ও দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাই তিনি নিজ জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ী বিস্তারিত নির্দেশনা ও নীতিমালা সম্বলিত এ কিতাব তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন। এর বর্তমানে অন্য কোনও বিধান ও নির্দেশনার দ্বারস্থ হওয়ার কোনও প্রয়োজন তোমাদের নেই।

তোমরা যদি 'আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাও, তবে কুরআন খুলে বস, প্রতিটি 'আকীদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাবে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে তোমার যতটুকু জানা দরকার, কুরআন মাজীদ তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। কুরআন আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী এত সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে যে, নিজ মা'বূদ ও পরম মাহবুবের পরিচিতি লাভের জন্য বান্দার অন্যকিছুর দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন নেই। বরং কেবল কুরআন দ্বারাই সে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ সব গুণাবলীর সাথে পরিচিত হয়ে যায়। অতঃপর পরম আস্থা ও পূর্ণ নির্ভরতার সাথে সে তার মহামালিকের 'ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আজ্ঞানুবর্তনে লিপ্ত থাকার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে। কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে ইরশাদ করছে–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছুর জ্ঞাতা। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, সকল দোষ-ত্রুটির সংশোধনকারী, গৌরবান্বিত, তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, পরম প্রজ্ঞাবান।' –সূরা হাশর (৫৯) : ২২-২৪

অন্যত্র ইরশাদ–

فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۫ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖۗ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তো অভিভাবক। তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর তার মীমাংসা আল্লাহরই উপর ন্যস্ত। তিনিই আল্লাহ, যিনি আমার প্রতিপালক। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হয়েছি। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোনও জিনিস নয় তার অনুরূপ। তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কুঞ্জি তাঁরই হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছে করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য চান) সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর জ্ঞাতা।' –সূরা শূরা (৪২) : ৯-১২

কুরআন বলছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ۬ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

'বলে দাও– আল্লাহ সবদিক থেকে এক। আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমকক্ষ নেই কেউ।' –সূরা ইখলাস

এমনিভাবে কুরআন অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ

রাব্বুল-'আলামীনের পরিচয় তুলে ধরেছে। এছাড়া আখিরাত, রিসালাত, তাকদীর, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, মীযান প্রভৃতি 'আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে কুরআন সুস্পষ্ট জ্ঞান সরবরাহ করেছে।

তারপর আসে বিধানাবলীর কথা। কুরআন মাজীদ এ ব্যাপারেও কোনও অস্পষ্টতা রাখেনি। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত– এ চারটি মৌল 'ইবাদতের মৌলিক সব কথাই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে। হক্কুল্লাহ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধানাবলীর পাশাপাশি হক্কুল-'ইবাদ সংক্রান্ত আহকামও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছে। পিতামাতার হক, সন্তানের হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, অধীকর্তা ও অধীনস্তের হকসহ আরও যত রকমের হুকূক আছে তা আদায়ে যত্নবান থাকার হুকুম দিয়েছে। অর্থোপার্জন, অর্থব্যয়, আমানত, ধারকর্জ, বন্ধক প্রভৃতি লেনদেন সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। যার ভিত্তিতে মুজতাহিদ-গবেষকদের জন্য এসব বিষয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি মাসাইলের সমাধান খোঁজা সহজ হয়ে গেছে। দেশ শাসন, নেতৃত্বদান, বিচার-মীমাংসা, যুদ্ধ-সন্ধি প্রভৃতি বিষয়ক বিধানাবলীতেও কুরআন কোনও অস্পষ্টতা রাখেনি। হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিধানাবলী এমন বিশদভাবে বর্ণনা করেছে, যারপর এ ব্যাপারে কুরআন-পাঠকের কোনওরূপ দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

কুরআন কেবল অবশ্যপালনীয় বিধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তার ঊর্ধ্বে এমন নৈতিক হিদায়াত দান করেছে, যা মানুষকে উন্নত আখলাকী আচরণে নিবেদিত থাকার উৎসাহ যোগায়। কুরআনের সে নৈতিক শিক্ষামালা অতি বিস্তৃত, গভীর ও অত্যুচ্চ। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে সামনে স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা করা হবে।

সারকথা কুরআন মাজীদ মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রের শিক্ষা-সম্বলিত এক পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত-গ্রন্থ। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

'আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দানের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।' –সূরা নাহ্ল (১৬) : ৮৯

পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত এক আয়াতে

কুরআন মাজীদ যে দ্বীন-দুনিয়ার সফলতা লাভের পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশ করে, কুরআনের মনোযোগী পাঠককে সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। মুক্তমনে যে-কেউ কুরআন পড়বে, সে এর পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় তার মনের কথা পেয়ে যাবে। পাবে তার প্রয়োজনীয় বার্তা, উপস্থিত সমস্যার সমাধান ও পথের দিশা। সমগ্র কুরআন তো পূর্ণাঙ্গ বটেই, এমনকি এর বহু সূরা; বরং বহু আয়াতও এমন আছে, যা তার সীমিত শব্দমালা ও সংক্ষিপ্ত বাক্যবন্ধের ভেতর মানুষের বিস্তৃত জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান ধারণ করে। এ কারণেই তো সূরা ইয়াসীনকে কুরআন মাজীদের আত্মা ও সূরা ফাতিহাকে কুরআনের সার-সংক্ষেপ বলা হয়ে থাকে। যদি কোনও এক আয়াতের ভেতর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শের পথরেখা দেখতে চান, তবে পড়ুন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দকাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে উপদেশ গ্রহণ কর।' –সূরা নাহ্ল (১৬) : ৯০

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজের হুকুম দিয়েছেন এবং তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। যে তিনটি কাজের আদেশ করেছেন তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে 'আদল'। 'আদল মানে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতা। তার মানে 'আকায়েদ, 'আমল, আখলাক, লেনদেন, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি সবকিছুতে ইনসাফ ও ভারসাম্য রক্ষা করা। সর্বপ্রকার প্রান্তিকতা পরিহার করে চলা। নিজের প্রতিও ইনসাফের আচরণ করা এবং অন্যের সাথেও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া। যত বড় শত্রুই হোক না কেন, তার প্রতিও আচরণে ইনসাফের সীমারেখা লঙ্ঘন না করা। প্রিয়জনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতকে প্রশ্রয় না দেওয়া, নিজের কথা ও কাজে সংগতি রক্ষা করা এবং পসন্দ-অপসন্দের ব্যাপারে আপন-পরের মধ্যে প্রভেদ না করা।

দ্বিতীয় হুকুম করা হয়েছে 'ইহসান'-এর। অর্থাৎ কেবল ন্যায়ের সীমার মধ্যে না থেকে আরও ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া এবং নিজ সত্তা ও জগতের সকলের প্রতি মহানুভব হয়ে যাওয়া। শরী'আতের বিধানাবলী অনুসরণে কেবল অবশ্য-পালনীয় স্তরে ক্ষান্ত না থেকে স্বতঃস্ফূর্ত পুণ্য ও বাড়তি সৎকর্মে যত্নবান হওয়া। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে ফরজ-ওয়াজিবের অতিরিক্ত নফল ও মুস্তাহাবকে লক্ষবস্তু বানানো এবং প্রতিটি কাজকে সুচারু ও সর্বাঙ্গীন সুন্দররূপে সম্পন্ন করা। হযরত জিবরীল আ.-এর প্রশ্নের উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেছিলেন, সেটাই ইহসানের সারকথা ও

তাৎপর্যমণ্ডিত সংজ্ঞা। তিনি ইরশাদ করেন–

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'ইহসান হল– তুমি আল্লাহর 'ইবাদত-আনুগত্য করবে এমনভাবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। তুমি যদি তাকে দেখতে নাও পাও, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯

বলা বাহুল্য, এই অনুভব-অনুভূতির সাথে জীবন পরিচালনা করলে প্রতিটি কাজ কেবল বৈধ ও সংগতই নয়; বরং সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে উঠতে বাধ্য।

তৃতীয় হুকুম হল, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দানের হাত প্রসারিত করা সম্পর্কে। ইশারা করা হয়েছে যে, অন্যসব মানুষ অপেক্ষা বাহ্যিক সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজন যেহেতু বেশি কাছের তাই অন্যদের তুলনায় তাদের কিছু বাড়তি হকও রয়েছে। সুতরাং সকলের সাথে ইনসাফ ও ইহসানমূলক আচরণ রক্ষার পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অতিরিক্ত আন্তরিকতা প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়।

গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, করণীয় বা ইতিবাচক সবকিছুই এই তিন আদেশের মধ্যে এসে গেছে। বাকি থাকল বর্জনীয় বা নেতিবাচক বিষয়সমূহ। করণীয় কাজে যত্নবান থাকার পাশাপাশি বর্জনীয় কাজ পরিহারে সচেতন থাকাও জরুরি। তাছাড়া যেমন ব্যক্তি-মানুষের মানবিক উৎকর্ষ সাধিত হয় না, তেমনি সামগ্রিক মানবসভ্যতাও সুষমামণ্ডিত হতে পারে না। তাই বলা হয়েছে–

তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন অশ্লীল কাজ করতে। অর্থাৎ পাশবিক-প্রবণতামূলক যত রকম কাজ আছে, যেসব কাজকে প্রতিটি সৎ স্বভাবের মানুষ ঘৃণা করে তা পরিহার করে চল, যেমন ব্যভিচার করা, গালাগালি করা, অশ্লীল কথা বলা, মদপান করা, জুয়া খেলা, পরচর্চা করা, ফাঁকি দেওয়া প্রভৃতি। এক কথায় কুরুচিপূর্ণ সকল কাজ বর্জন কর।

দ্বিতীয়ত মুনকার ও অন্যায় কাজ পরিহার কর। অর্থাৎ এমন সব কাজ, যা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। তবে এ শ্রেণীর কাজ সর্বদা সকলের কাছে স্পষ্ট থাকে না। তাই শরী'আত তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং শরী'আত যা-কিছু নিষেধ করেছে, তা সবই অন্যায় কাজ, সকলের বুঝে আসুক বা নাই আসুক। তা পরিহার করা অপরিহার্য।

তৃতীয়ত জুলুম-অত্যাচার, যার ফলে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হয় এবং মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু অনিরাপদ হয়ে যায়, পরিহার কর। সর্বপ্রকার মন্দ ও গর্হিত বিষয়সমূহ এ তিন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এসে গেছে।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক এ ছয়টি বিধানের পরিমণ্ডল অতি ব্যাপক। মানব-জীবনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল দিক এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে ইসলামের সারমর্ম বলা চলে। এ কারণেই হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. এ আয়াতকে কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ আয়াত হিসেবে উল্লেখ করেন। এ আয়াত শুনে কুরায়শ নেতা ওয়ালীদ ইবন মুগীরা মন্তব্য করেছিল–

وَاللهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُورِقٌ وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ

'আল্লাহর কসম! এর রয়েছে বিশেষ মাধুর্য, আছে (অনির্বচনীয় এক) স্নিগ্ধতা, এর মূল পত্র-পল্লব উদ্গাতা এবং এর শাখা-প্রশাখা ফলদায়ী। এটা কিছুতেই কোনও মানুষের কথা হতে পারে না।' –তাফসীরে কুরতুবী ১০/১০৯

পরম সত্য বাণী

কুরআন মাজীদ তার পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের এই বৈশিষ্ট্যের কথাও বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছে যে, সে আল্লাহর সত্য বাণী। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ

'হে মানুষ! এই রাসূল তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য নিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা (তার প্রতি) ঈমান আন। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ।' –সূরা নিসা (৪) : ১৭০

কুরআন 'সত্য বাণী'– এর একটা দিক তো হল এই যে, এটি সত্যিই আল্লাহর কালাম, মানুষের রচনা নয়। দ্বিতীয় দিক হল এতে যা-কিছু বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটিই সত্য ও বাস্তবসম্মত।

বিষয়টা ভালোভাবে বোঝার জন্য কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রতি নজর দেওয়া যাক। কুরআন মাজীদের মূল আলোচ্য বিষয় চারটি–

ক. 'আকাইদ
খ. আহকাম
গ. আখলাক ও
ঘ. মাওয়া'ইজ।

এর প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে। 'আকাইদের মধ্যে কয়েকটি হল মৌলিক 'আকীদা এবং কিছু আছে শাখাগত 'আকীদা। মৌলিক 'আকীদা সাতটি, যথা–

১. তাওহীদ
২. রিসালাত
৩. কিয়ামত
৪. আসমানী কিতাবসমূহ
৫. মালাইকা
৬. তাকদীর ও
৭. আখিরাত (জান্নাত-জাহান্নাম)।

শাখাগত 'আকীদা যেমন কবরের আযাব, আমলনামা, মীযান, পুলসিরাত, হাওজে কাওছার, শাফা'আত প্রভৃতি।

মৌলিক 'আকীদাসমূহ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না এর প্রত্যেকটি বিষয়ই পরম সত্য। মানবস্বভাব চিরকালই এর সত্যতা স্বীকার করে আসছে। শয়তানের কুমন্ত্রণা ও নষ্ট-ভ্রষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে যাদের বোধ-বুদ্ধি বিকৃত হয়ে যায়, কেবল তারাই এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাদের অনেকে অন্যদেরও বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। সেই বিপথগামীদের সামনে সত্য পরিস্ফুট করে তোলার লক্ষে কুরআন মাজীদ এসব 'আকীদা সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করেছে। ফলে স্বভাবসিদ্ধ সেই সকল সত্য বিষয় দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন একমাত্র বিদ্বেষপ্রবণ হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এর কোনওটি অস্বীকার করার কোনও অজুহাত নেই। এরূপ অস্বীকারকারীর অবস্থা হল—

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

'তারা এসব অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তর এগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে। তারা অস্বীকার করে কেবল সীমালংঘন ও অহমিকাবশত।' —সূরা নামল (২৭) : ১৪

যারা এরূপ প্রমাণসিদ্ধ সত্য অস্বীকার করে তারা চরম পথভ্রষ্ট। কুরআন বলছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

'হে মু'মিনগণ! ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, যে কিতাব তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তার আগে নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করে, সে বহু দূরের ভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।' —সূরা নিসা (৪) : ১৩৬

কুরআন মাজীদ যেসব শাখাগত 'আকীদা বর্ণনা করেছে তাও সত্য। তার কোনওটি অস্বীকার করার সপক্ষে কোনও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই। তার প্রত্যেকটি গায়বী বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা গায়ব ও চাক্ষুষ যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞাতা। তিনি যখন তার সত্য কালাম কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করছেন, তখন তাকে সত্য বলে স্বীকার করতেই হবে। কেউ অস্বীকার করলে কোনও জ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ পেশ করুক। কিন্তু গায়বী বিষয় হওয়ার কারণে কস্মিনকালেও তা সম্ভব নয়। পারবে কেবল অনুমাননির্ভর কথা বলতে। কিন্তু—

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

'সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনও কাজে আসে না।' —সূরা ইয়ূনুস (১০) : ৩৬

'আকাইদের পর কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'আহকাম— বিধিবিধান। কুরআন মাজীদ মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান দান করেছে। সেসব বিধানের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। কিছু বিধান 'ইবাদত সংক্রান্ত, কিছু পরিবার ও সমাজনীতি সংক্রান্ত, কিছু অর্থনীতি সংক্রান্ত, কিছু বিচারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সম্পর্কিত। সবগুলোকে আল্লাহর হক ও বান্দার হক— এই দু'ভাগেও ভাগ করা যায়। এসব বিধানের সমষ্টি মানুষের জন্য এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। কুরআন মাজীদে প্রদত্ত হয়েছে— কেবল এই দৃষ্টিতে এর প্রত্যেকটি বিধান যথাযথ ও বাস্তবসম্মত তো বটেই, তাছাড়াও বিজ্ঞজনেরা এক-একটি করে এসব বিধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন এবং পরিশেষে মুগ্ধ-মোহিত হয়ে ঘোষণা করেছেন— কোনও মানুষের পক্ষে এমন যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত বিধান প্রণয়ন কখনও সম্ভব ছিল না।

'ইবাদতের বিষয়টাই দেখুন না!

'ইবাদত অর্থ সুনির্দিষ্ট পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি চরম ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন, যেমন নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া ও হজ্জ করা। এগুলো প্রত্যক্ষ 'ইবাদত এবং এগুলো ফরয। এমনিভাবে যেসব কাজ সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই করা হয়, মৌলিকভাবে কোনও পার্থিব সংশ্লিষ্টতা যার মধ্যে নেই, যতটুকু থাকে তা গৌণ, সেগুলোও প্রত্যক্ষ 'ইবাদত, তবে ফরয নয়; বরং নফল পর্যায়ের, যেমন যিক্র, তিলাওয়াত, দু'আ, সাদাকা ইত্যাদি।

এছাড়া যেসকল বৈধ কাজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়, পরোক্ষভাবে তাও 'ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়, যেমন অর্থোপার্জন করা, পানাহার করা, বিবাহ করা, রোগীর সেবা-যত্ন করা, বিপন্নের সাহায্য করা, কলহ-বিবাদ মীমাংসা করা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে 'ইবাদত বলতে প্রত্যক্ষ 'ইবাদতকেই বোঝায়।[১] কুরআন মাজীদ এ ব্যাপারে যেসব বিধান দিয়েছে, তা খুবই পরিমিত, সহজসাধ্য। সুবিন্যস্ত ও সর্বোপযোগী। সবচে'

১. কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তে ইসলামীর পরিভাষায় 'ইবাদত' দ্বারা এক প্রকারই উদ্দেশ্য। আর যেগুলোকে পরোক্ষ ইবাদত বলা হয়েছে এর জন্য অধিক মুনাসেব নাম 'তআত' (طاعة)। আর 'আমলে ছালেহ' শব্দ সবচে' ব্যাপক, যা সকল প্রকারকে শামিল করে। (আবদুল মালেক)

গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত নামায দৈনিক মাত্র পাঁচবার ফরয। তাও স্থির করা হয়েছে সময়ের যুক্তিসংগত ব্যবধানে যথেষ্ট অবকাশের সাথে এবং অল্প সময়ের জন্য। তা যে-কোনও স্থানেই আদায় করা যায় এবং তার জন্য বিশেষ ধর্মীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতার দরকার হয় না। এতে যে জামাতের অবস্থা রাখা হয়েছে তা মানবিক সাম্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। 'ইবাদতের এমন উপযুক্ত ও বাস্তবসম্মত পন্থার নজির অন্য কোনও ধর্মে পাওয়া যায় না। যে-কেউ এর সময়, এর স্থান, এর পরিমাণ ও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে কুরআন-নির্দেশিত 'ইবাদত সর্বতোবিচারে যথার্থ (হক) 'ইবাদত।

পরোক্ষ 'ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা এবং তার প্রত্যেকটিই বাস্তবসম্মত। পরোক্ষ 'ইবাদত বলতে ব্যক্তিগত কাজকর্ম, পরিবারনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থাকে বোঝাতে চাচ্ছি। তার মধ্যে কিছু আছে অর্জনীয়, কিছু বর্জনীয়– আওয়ামির ও নাওয়াহী। যেগুলো অর্জনীয়, শুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বিচার করলে তার প্রত্যেকটির উপযুক্ততা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি সম্পর্কে আকল-বুদ্ধি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা অবশ্যই করা উচিত বা করার উপযুক্ত, যেমন উপার্জন করা; বিবাহ করা; নিকটাত্মীয় (যাবিল-ফুরূয ও আসাবা)–এর মধ্যে মীরাছ বণ্টন করা; শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ইনসাফ রক্ষা করা; প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা; যবাহ-কালে আল্লাহর নাম নেওয়া; কিসাস, দিয়াত ও হুদূদের ব্যবস্থা; পর্দা রক্ষা করা; সতর ঢাকা; তালাকের সুযোগ; স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশ আরোপ; অন্যের গৃহে প্রবেশকালে অনুমতিগ্রহণ; আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা; সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা; সালাম দেওয়া-নেওয়া; বাকি লেনদেনে সাক্ষী রাখা; কার্যভেদে দু'জন বা চারজন সাক্ষীর অপরিহার্যতা; নেতা, পিতামাতা ও স্বামীর আনুগত্যের অপরিহার্যতা; মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন; কলহ-বিবাদের মীমাংসা; রোগীর খোঁজখবর নেওয়া; নেককাজে অর্থব্যয় করা প্রভৃতি।

কুরআনের নাওয়াহী অর্থাৎ যেসকল কাজ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার প্রত্যেকটিও অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। বুদ্ধিমান মাত্রই স্বীকার করবে এসব কাজ পরিহার করে চলা উচিত, যেমন পরধন হরণ; ব্যভিচার; সুদ ও ঘুষ; মদপান; জুয়া; মৃতজন্তু খাওয়া; আত্মহত্যা; ভিক্ষাবৃত্তি; অপবাদ আরোপ; পরনিন্দা; অন্যের ছিদ্রান্বেষণ; অশ্লীলতা; জাদুটোনা; কলহ-বিবাদ; সীমাতিরিক্ত রসিকতা; অন্যকে হেয় করা; অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করা; মিথ্যা ওয়াদা; অভিশাপ দেওয়া; কানভাঙানি দেওয়া; তোষামোদ করা; অহেতুক প্রশ্ন করা; গুপ্ত বিবাহ; মন্দবিষয় প্রচার; গোনা কথায় কান দেওয়া; আত্মীয়তা ছিন্ন করা; দালালী করা; ত্রাস সৃষ্টি; অজানা বিষয়ে তর্ক; অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহার; অর্থ-সম্পদের অপচয় ও অপব্যয়; মজুদদারি; পাত্র-পাত্রীর অমতে বিবাহ; একত্রে দুই বোনকে বিবাহ; নারী-পুরুষের নিভৃত অবস্থান; নারী-পুরুষের পারস্পরিক অনুকরণ; জাত্যাভিমান ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদ যেসকল চরিত্রের শিক্ষাদান করে, যুক্তি-বুদ্ধির বিচারে তাও নিঃসন্দেহে হক ও যথার্থ, যেমন সত্যতা; বিশ্বস্ততা; বদান্যতা; সহমর্মিতা; স্নেহ-মমতা; সৎসাহস; লাজুকতা; বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি। মানুষের মানবিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এসব গুণের পরিচর্যা জরুরি। বরং বলা যায় এগুলো ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব বজায় থাকে না। মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর কাতারে চলে যায়। এমনিভাবে কুরআন এর বিপরীত গুণাবলী বর্জনেরও জোর তাকীদ করেছে এবং সে তাকীদ যথার্থ ও হক। কেননা কপটতা, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, ভীরুতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার-অহমিকা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি এমনই গুণ, মনুষ্যত্বের সাথে যার সহাবস্থান চলে না। এর প্রত্যেকটিই পাশবিক গুণ। মনুষ্যত্বের মহিমা রক্ষা করার জন্য এর প্রত্যেকটিরই নির্মূল বা দমন অপরিহার্য।

অনুরূপ হক ও যথার্থ কুরআনের মাওয়া'ইজও। কুরআন মানুষকে উপদেশ দিয়েছে তার প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন নি'আমতের উল্লেখ দ্বারা, অতীতের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা এবং মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থাসমূহের উল্লেখ দ্বারা। এর প্রত্যেকটিই এমন বাস্তব ও সত্য বিষয়, যে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কুরআন মাজীদ এগুলো উল্লেখপূর্বক ঘোষণা করেছে যে, এসব সত্য কোনও কাল্পনিক ব্যাপার নয় যে, তোমরা সন্দেহ করবে, যেমন হযরত মূসা আ. ও ফির'আউনের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

'আমি যেসকল লোক ঈমান আনে তাদের কল্যাণার্থে মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি।' –সূরা কাসাস (২৮) : ৩

আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

'আমি তোমার কাছে তাদের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি।' –সূরা কাহ্‌ফ (১৮) : ১৩

কিয়ামতের 'আমলের ওজন সম্পর্কে ইরশাদ–

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

'এবং সেদিন (আমলসমূহের) ওজন (করার বিষয়টি) একটি অকাট্য সত্য।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ৮

হাবীল ও কাবীলের ঘটনা সম্পর্কে ইরশাদ–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

'এবং (হে নবী!) তাদের সামনে আদমের দু' পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শোনাও।' –সূরা মায়িদা (৫) : ২৭

জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে ইরশাদ–

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, এটা (অর্থাৎ আখিরাতের আযাব) কি বাস্তবিক সত্য? বলে দাও, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা বিলকুল সত্য এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না। –সূরা ইয়ূনুস (১০) : ৫৩

মোটকথা কুরআন মাজীদ এক সত্য কিতাব। এতে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ই সত্য। যে-কোনও বিষয়ের পরম সত্য-সঠিক কথাটি কুরআনই বলে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

'যখনই তারা তোমার কাছে কোনও সমস্যা নিয়ে হাজির হয়, আমি তোমাকে দান করি (তার) যথাযথ সমাধান ও সুন্দর ব্যবস্থা।' –সূরা ফুরকান (২৫) : ৩৩

অন্যত্র ইরশাদ– وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

'আমি কুরআনকে সত্যসহ নাযিল করেছি এবং এটা সত্যসহই নাযিল হয়েছে।' –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ১০৫

সুতরাং যারা আধুনিক বিজ্ঞানকে সবকিছুর সত্যাসত্য নিরূপণের মাপকাঠি মনে করে, এমনকি সেই মাপকাঠিতে কুরআন মাজীদের তত্ত্ব-তথ্যকেও যাচাই-বাছাই করার ধৃষ্টতা দেখায় তাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকেই নিরীক্ষণ করে দেখা উচিত যে, ঈমানের মানদণ্ডে তা ঠিক কতটুকু উতরোয়। যারা কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার কালাম বলে বিশ্বাস করে, তাদের তো এমনিতেই কুরআনকে সত্যের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করার কথা, সেখানে কুরআন যখন দাবি করছে সবকিছুর চূড়ান্ত সত্য সেই বলে থাকে, তখন সত্য নিরূপণের জন্য অন্য কিছুর দ্বারস্থ হওয়াটা তাদের ঈমানের সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ? বৈজ্ঞানিক গবেষণার যেসকল কথা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত নয়, কেবলই তত্ত্বকথা হিসেবে প্রচারিত, তা সত্য হওয়ার গ্যারান্টি কে দিতে পারে? আর তা যদি কুরআনের দেওয়া তথ্যের পরিপন্থী হয়, তবে তো তার উদ্ভট কল্পনা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু লোক পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার ডামাডোলে এমনভাবে তাল হারিয়ে ফেলে যে, নিজ বিশ্বাসের স্থানটুকুও রীতিমত ভুলে বসে। ফলে পশ্চিমা দর্শনের বিপরীতে কুরআন কি বলছে সেদিকে তাদের ফিরে তাকানোরই অবকাশ হয় না। আর তাদের মধ্যে যারা নিজেদের বেশ কঠিন বিশ্বাসী মনে করে, তারা কুরআনের একটা বিজ্ঞানমনস্ক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দু'কুল রক্ষা করেছে বলে কেমন আত্মপ্রসাদ বোধ করে। তাদের মুখে এই আত্মপ্রবঞ্চনার বোল বেশ শোনা যায় যে, দেখেছ ইদানীং বিজ্ঞান যা বলছে, আমাদের কুরআন চৌদ্দশ' বছর আগেই তা বলে রেখেছে। না, না, কুরআন কখনওই বিজ্ঞান-বিরোধী নয়; বরং বিজ্ঞান যা বলছে, কুরআন তাই বলে। অনেকে তো আরও সরেস বলে, কুরআন একখানি বিজ্ঞানগ্রন্থই।

কুরআন ব্যস কুরআনই। এটা আল্লাহর কালাম। মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। হিদায়াতের জন্য যা-কিছু দরকার তা পরিপূর্ণভাবে এতে বলে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান এর আলোচ্য বিষয় নয়। এর কোনও তথ্য বিজ্ঞানের সাথে মিললে তাতে বৈজ্ঞানিক সেই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ হবে, কুরআন তার সত্যতা প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়। আর কুরআনের যে তথ্য বিজ্ঞানের সংগে সাংঘর্ষিক দেখা যাবে, সে ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই ভ্রান্ত বিবেচিত হবে। সত্য সেটাই যা কুরআন বলছে। কুরআনকে মনগড়া ব্যাখ্যার শেকলে টেনে-হেঁচড়ে বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে যাওয়া একরকম হীনম্মন্যতা তো বটেই, প্রকৃতপ্রস্তাবে তা কুরআনের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস না থাকারও পরিচায়ক। তাছাড়া এটা একটা উল্টো কারবারও বটে। কুরআন এসেছে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে সত্যের পথনির্দেশ করার লক্ষ্যে। কাজেই মানুষের চিন্তা, মনন ও কর্মজগতে কুরআনই সন্দেহাতীত সত্যের যিম্মাদার। এখন সেই কুরআনকেই যদি মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির অনুগামী বানানোর চেষ্টা করা হয়, তবে তারচে' স্পষ্ট উল্টোযাত্রা আর কী হতে পারে!

আলোকগ্রন্থ

কুরআনের একটি বড় পরিচয় হল, এটি আল্লাহর নূর, মানুষের পথ চলার আলো, জীবন গঠনের জ্যোতি ও চেতনার বাতিঘর। কুরআন মাজীদ তার আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বারবারই এ কথা ঘোষণা করেছে যে, সে এক প্রোজ্জ্বল আলোকধারা। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের

কাছে এমন এক জ্যোতি ও এমন এক কিতাব এসেছে, যা (সত্যকে) সুস্পষ্ট করে। যার মাধ্যমে আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং নিজ ইচ্ছায় তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।' –সূরা মায়িদাঃ (৫) : ১৫-১৬

অন্যত্র ইরশাদ–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

'হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো পাঠিয়েছি, যা (পথকে) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে।' –সূরা নিসা (৪) : ১৭৪

অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বেশিরভাগ মানুষই ছিল পুতুল-পূজারী। তারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক, চিন্তা-চেতনা ও মানবীয় অস্তিত্বকে পাথর-মাটির প্রতিমায় বিসর্জন দেওয়ার অন্ধকূপে নিপতিত ছিল। যারা আসমানী কিতাবের ধারক-বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দিত, তারাও কিতাবের শিক্ষা হারিয়ে মূলত মনগড়া বিশ্বাসের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কেউ স্রষ্টার কৃপা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার দাবিতে বাদবাকি মানব-সম্প্রদায়কে অভিশপ্ত ঠাওরেছিল। দাবি করছিল বেহেশতে কেবল তারাই যাবে। অন্য কেউ সেখানে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। কেউ মানুষকেই ঈশ্বর বানিয়ে নিয়েছিল এবং তার পূজারী হিসেবে নিজেদেরকে নরকমুক্ত জাতি হিসেবে সনদ দিয়ে রেখেছিল। এভাবে সারা জগৎ সত্য ও জ্ঞানরহিত জাত্যাভিমানে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অন্ধকারের জীব হয়েও প্রত্যেকে নিজেকে ভাবছিল আলোর জগতে বিচরণকারী। অলীক বিশ্বাসের এহেন ঘন-চাপ অন্ধকারের ভেতর সহসাই জ্বলে ওঠে সত্যের আলো। হিরা-পর্বতশীর্ষে সেই যে প্রথম 'ইকরা'-এর ঝিলিক খেলে গেল, দীর্ঘ তেইশ বছর সেই আলোর অবিরাম ধারাবর্ষণ হতেই থাকল। আর তার জগদপ্লাবী জ্যোতিবিচ্ছুরণে একের পর এক ব্যক্তি-পরিবার ও কুল-গোত্রের সীমানা ছাপিয়ে দিশ-দিগন্তের জনমানুষ উদ্ভাসিত হয়ে চলল। সেই উদ্ভাসনের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি শুনি হযরত জা'ফর তয়্যার রা.–এর সত্যদীপ্ত উচ্চারণে, যা কিনা সেই আলোকে সিঞ্চিত প্রত্যেকের প্রাণের বাণী–

"রাজন! আমরা মূর্তিপূজা করতাম। মৃতজন্তু খেতাম। সবরকম অন্যায়-অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলাম। আত্মীয়তা ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর মর্যাদা রক্ষা করতাম না। আমাদের শক্তিমান দুর্বলকে গ্রাস করত। এহেন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে একজন নবী পাঠালেন। তাঁর বংশ ও খান্দান, আমানতদারি ও সততা, আখলাক-চরিত্র ও আল্লাহভীতি সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের দিকে ডাক দিলেন। এক আল্লাহর 'ইবাদত করার হুকুম দিলেন। আল্লাহ ছাড়া দেব-দেবী ও মাটি-পাথরের প্রতিমাদের পূজা করতে নিষেধ করলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন আমরা যেন সততা, বিশ্বস্ততা, আত্মীয়তা রক্ষা, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সদগুণাবলীতে ভূষিত হই। অন্যায়-অশ্লীলতা, নরহত্যা, মিথ্যাকথন, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, সতী-সাধ্বী নারীর গায়ে কলঙ্ক লেপন ইত্যাদি দুষ্কর্ম হতে নিবৃত্ত থাকি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত কিভাবে করতে হবে তা শিক্ষা দিলেন। নামায, রোজা ও যাকাতের তা'লীম দিলেন। আমরা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে নিয়েছি। আমরা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করেছি। মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছি। হারামকে হারাম ও হালালকে হালালরূপে গ্রহণ করে নিয়েছি"। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৭৪০

এসব কুরআনী শিক্ষারই সারমর্ম। সারা কুরআনই আলোর এক অনিঃশেষ ফোয়ারা। কুরআনের ভাষা আলোময়। তার মর্ম আলোয় ভরা। কুরআন পাঠে হৃদয় আলোকিত হয়, কুরআনের অর্থ-মর্মে মনন-মেধা উদ্ভাসিত হয়, কুরআনের অনুসরণে কাজকর্ম শুচিশুদ্ধ হয় এবং কুরআনের অবলম্বন ব্যক্তিসত্তাকে জ্যোতির্ময় করে। সেই আলোয় আবূ বকর, 'উমর উদ্ভাসিত হয়েছে, বিলাল, সুহায়ব সিঞ্চিত হয়েছে, মক্কার অলি-গলি জেগে উঠেছে, মদীনার পথ-ঘাট প্রাণ পেয়েছে। মুহাজিরদের সর্বত্যাগী উদ্দীপনা সেই আলোর ঝিলিকেই সঞ্চারিত হয়েছিল, আনসারদের প্রাণোৎসর্গী প্রতিযোগিতা সেই আলোর দ্যুতিতেই তেজোদ্দীপ্ত হয়েছিল। সে আলো নয় পূব বা পশ্চিমের, নয় কোনও দিক-বিশেষের। নয় তা আরব বা আজমের, নয় কোনও জাতি-বিশেষের এবং সে আলো নয় সপ্তম বা অষ্টম শতকের, নয় কোনও যুগ-বিশেষের। তা স্থান-কালের স্পর্শরহিত সৃষ্টিকর্তার নূর, যা কোনও সীমানায় বাঁধা পড়ে না; স্থান-কাল ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বত্র সমান আলো বিতরণ করে এবং প্রত্যেকে তা গ্রহণ করে আপন-আপন সক্ষমতা অনুযায়ী। আর যে-কেউ অন্তর্চক্ষু বন্ধ করে রাখে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে অন্ধকারেই পড়ে থাকে, যেমন সূর্যালোকের সামনেও অন্ধজন থাকে আলোকবঞ্চিত। হ্যাঁ সূর্যালোকে যেমন অন্ধজনকে ঠিক অন্ধ বলে চেনা যায়, তেমনি কুরআনের জগতোদ্ভাসী আলোয় বেদীন

তামসিকদেরও সুরতহাল বুঝে নেওয়া যায়। তা স্বেচ্ছাকবুল দিনকানা যাই ভাবুক না কেন, কুরআন এক চিরন্তন আলোই। তার অনির্বাণ শিখায় যুগে-যুগে জ্বলে উঠেছে কত 'আতা (রাহ.), ইবরাহীম (রাহ.), আবূ হানীফা (রাহ.), মালিক (রাহ.), বুখারী (রাহ.), তহাবী (রাহ.), জুনায়দ (রাহ.), গাঙ্গুহী (রাহ.), কাসিম (রাহ.), তুতায়বা (রাহ.), কত পুরুষ, কত নারী, সেই আরব, মিসর, আফ্রিকা, স্পেনে, এদিকে পাক-ভারত-বাংলা -ইন্দো-চীন-জাপানে। কত কৃষ্ণাঙ্গের অন্তরে তাওহীদের বাতি জ্বালিয়েছে এই কুরআন, কত শ্বেতাঙ্গের মনুষ্যত্ব প্রাণ পেয়েছে এর আলোয়! আজও সামনে এর আলো বিকীর্ণ হচ্ছে সারা জাহানে। হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। সকালে-সন্ধ্যায়, দিনে-রাতে হরদম অনুক্ষণ এর তিলাওয়াত, এর মর্ম, এর চর্চা, এর অনুসরণ মানুষের আত্মায়, মানুষের চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে সর্বকাজে বুলিয়ে যাচ্ছে ঈমান ও তাকওয়ার, সততা ও স্বচ্ছতার, শুচিতা ও সাধুতার আলোর পরশ, বুলাতে থাকবে অন্তহীন, যতক্ষণ না কিয়ামত হবে আর–

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

'হাশর-ভূমি নিজ প্রতিপালকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে এবং নবীগণ ও শহীদগণকে উপস্থিত করা হবে আর মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে, কারও প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না।' –সূরা যুমার (৩৯) : ৬৯

যখন এ আলোর ঝলকানি পড়ে অন্তকরণে, তখন তা যেন ঠিক অগ্নিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। এর সুতীব্র বিকিরণে আত্মিক রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়, পাশববৃত্তির বিনাশ সাধিত হয় এবং সমস্ত মরিচা-মলিনতা দূর হয়ে যায়। অনন্তর মানবাত্মা হয়ে ওঠে শুভ্র-সমুজ্জ্বল। সেখানে থাকে না কোনও হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার-অহমিকা, লোভ-লালসা প্রভৃতি রিপুর কলঙ্ক। গায়রুল্লাহর আসক্তি ও পাপানুরাগ থেকে মুক্ত হয়ে তা আল্লাহ্ প্রেমের আধারে পরিণত হয়ে যায়। সেই প্রেম প্রণোদনা যোগায় আল্লাহর রঙ গ্রহণের ও তাঁর পসন্দনীয় গুণাবলী অর্জনের। এক-এক করে তার ভেতর দিয়ে বিকশিত হতে থাকে যতসব উত্তম গুণের। তার সে সুকুমার গুণাবলী চারদিকে সুষমা ছড়ায়, মানুষকে আমোদিত করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিমালার পক্ষে সে শান্তিদায়ক হয়ে ওঠে।

যখন এ আলোর পরশ লাগে কারও মেধা-মস্তিষ্কে, তা তার মস্তিষ্ককে শাণিত করে, সমস্ত অসৎ চিন্তা ও ভ্রান্ত চেতনা থেকে তাকে পাক-সাফ করে ফেলে, সেখানে সাধু চিন্তা ও শুদ্ধ চেতনার বীজ বুনে দেয়, তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয় এবং তার সামনে সত্যের দুয়ার উন্মোচিত করে দেয়। অনন্তর সে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি খুলে যায়। সে সহজেই সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করতে পারে এবং আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে পারে। ফলে কোনও অসৎ চিন্তা তাকে ধোঁকা দিতে পারে না এবং কোনও ভ্রান্ত মতাদর্শ তাকে সত্যচ্যুত করতে সক্ষম হয় না। তার মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে সত্যের দর্পণ। সেই দর্পণে সে প্রকৃত সত্যকে সঠিকভাবে চিনে নিতে পারে। পরিবেশ-পরিস্থিতি যত ঘোলাটেই হোক না কেন তাতে সে খেই হারায় না। ভেজালের যত ছড়াছড়িই দেখা দিক না কেন, তার ভেতর থেকে সে সারসত্যটুকু ঠিক বেছে নিতে পারে। কুরআনী আলোয় উদ্ভাসিত মস্তিষ্ক ও হিদায়াতের জ্যোতিস্নাত চিন্তা-চেতনা সর্বাবস্থায় তাকে সঠিক পথেই পরিচালিত করে। এরূপ ব্যক্তি যেমন নিজের বেলায়ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, তেমনি সে অন্যদেরও দিতে পারে বাস্তবসম্মত পরামর্শ। ফলে তার চিন্তা-চেতনা দ্বারা গোটা সমাজই উপকৃত হয়। বস্তুত দেশ ও জাতিগঠনে ফলপ্রসূ ভূমিকা কেবল শুদ্ধচিন্তার লোকজনই রাখতে পারে। আর চিন্তার পরিশুদ্ধি কুরআনের জ্যোতিপাত দ্বারাই সম্ভব।

কুরআনের জ্যোতিপাতে কেবল মনন ও চিন্তারই পরিশোধন হয় না, চোখ-কান-মুখ প্রভৃতি অংগ-প্রত্যংগেও শুচিতা আসে। যে চোখ কুরআনের আলোকস্পর্শে ধন্য হয়, তা অনুচিত দেখায় প্রীতিবোধ করে না। কেবল সংগত দর্শনই তার পক্ষে সুখকর হয়। সে চোখ হয় সত্যের সন্ধানী, ঔচিত্যের প্রত্যাশী ও পরিণামদর্শী। অন্যের সুখদর্শনে সে চোখে আনন্দ খেলে যায় আর কারও দুঃখ-কষ্ট দেখলে হয় অশ্রুবিগলিত। সে চোখ কখনও স্বার্থান্ধ হয় না। তা সকলের কল্যাণ খুঁজে ফেরে। সে চোখ ইহলোকের সীমানায় আটকা পড়ে না। সেই সীমানা ভেদ করে তা পরকালের পরিভ্রমণে চলে যায়। সে চোখ জড়বস্তুর স্থূলতায় বাঁধা পড়ে না; বরং জড়বস্তু তার সামনে স্রষ্টার দর্পণ হয়ে যায় এবং তার ভেতর সৃষ্টিকর্তার কুদরতের কারিশমা দেখতে পায়, আর তখন জবান গেয়ে ওঠে–

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি (এমন ফজুল কাজ থেকে) পবিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।' –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৯১

যে রসনা এ আলোয় স্পৃষ্ট হয়, তা হয়ে ওঠে বড় শালীন-মধুর, তা অসত্য ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ

করে না, রূঢ় ও অহেতুক কথা বলে না। তা হয় পরিমিত ও সংযত। হয় উত্তম কথা বলে, নয়ত নীরবতা অবলম্বন করে। সে জবান আল্লাহর বন্ধুদের জন্য আনন্দদায়ী, শত্রুদের পক্ষে শাণিত তরবারি। একদিকে তা আল্লাহর যিক্‌রে সজীবতা লাভ করে, অন্যদিকে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে শান্তির বার্তা প্রচার করে আর মানুষকে ডেকে বলে– 'বল, আল্লাহ ছাড়া কোনও মা'বুদ নেই, সফল হয়ে যাবে'। কুরআনের আলোয় আলোকিত রসনা হয় সত্য ও ন্যায়ের রসনা এবং তা হয় যিক্‌র ও দাওয়াতের রসনা।

এমনিভাবে কুরআনের আলো যখন হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি অংগকে স্পর্শ করে, তখন এর প্রত্যেকটিই সুষ্ঠু-সঠিক কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অন্যায়-অসংগত কাজ তার নাগাল পায় না।

মোটকথা কুরআনের আলো ব্যক্তির বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্ম সবকিছুতেই শুচিতা আনে। সে আলোর পরশে ব্যক্তিমানুষ সর্বতোভাবে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, মানুষের মানবিকতা উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে ওঠে, মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় লোকে তার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তাকে সাহায্য করবে এবং তার সংগে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৭

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন থেকে আলো গ্রহণ করে না, তার জীবন হয় অন্ধকারের জীবন, তার বিশ্বাস হয় ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তার চিন্তা হয় বিকৃত ও অব্যবস্থিত এবং তার কর্ম হয় কলুষিত ও নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত। পরিণামে এ জাতীয় লোক অশান্তি-অস্থিরতার ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত থাকে। কুরআন মাজীদ এদের সম্পর্কে বলছে–

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

'অথবা (তাদের কার্যাবলী) যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার উপর আরেক তরঙ্গ এবং তার উপর মেঘরাশি। স্তরের উপর স্তরে বিন্যস্ত আঁধারপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে, তাও দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসীবে কোনও আলো নেই।' –সূরা নূর (২৪) : ৪০

তাদের অন্তর্চক্ষু হয়ে যায় অন্ধ আর সেটাই প্রকৃত অন্ধত্ব। ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

'প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয়ে যায় হৃদয়, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।' –সূরা হাজ্জ (২২) : ৪৬

এটা কখনওই সম্ভব নয় যে, কেউ কুরআন ছাড়া অন্য কোনও সূত্র থেকে তার জীবনে আলো সিঞ্চন করবে। যে-কোনও কালে যারাই অন্য কোনও উৎস থেকে আলো সংগ্রহের চেষ্টা করেছে, তারা কেবল ব্যর্থই হয়নি, জীবনকে আরও বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে। বর্তমানেও সকল চেষ্টার পরিণাম তাই দাঁড়াচ্ছে এবং এমন কোনও ভবিষ্যত কখনওই উপস্থিত হবে না, যখন অন্য কোনও উৎস মানব-জীবনে আলো সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা চিরন্তন–

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

'বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসীবে কোনও আলো নেই।' –সূরা নূর (২৪) : ৪০

তারা আলোবঞ্চিত থাকবে আখিরাতেও, যখন আলোর প্রয়োজন হবে পার্থিব জীবন অপেক্ষাও বেশি। ইহজগতে যারা কুরআনের আলোয় পথ চলেছে, সেখানেও তারা পথ চলার আলো পেয়ে যাবে এবং সেই আলোয় নিজেদের পরম গন্তব্যস্থল জান্নাতে পৌঁছে যাবে, আর যারা এ আলো উপেক্ষা করেছে, তারা গভীর অন্ধকারে নিপতিত থাকবে। কুরআন মাজীদ সে সময়কার চিত্র আঁকছে–

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

'সেদিন তুমি মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবে, তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানদিকে ধাবিত হচ্ছে (এবং তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের জন্য আজ এমনসব উদ্যানের সুসংবাদ, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ মু'মিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছুটা আলো গ্রহণ করতে পারি। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও, তারপর নূর তালাশ কর। তারপর তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। তার মধ্যে থাকবে একটি দরজা, যার

অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি। তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মু'মিনগণ বলবে, হাঁ, ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। তোমরা অপেক্ষা করছিলে, সন্দেহে নিপতিত ছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম আসল। আর সেই মহা প্রতারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করে যাচ্ছিল।' –সূরা হাদীদ (৫৭) : ১২-১৪

আত্মায় প্রাণসঞ্চারকারী গ্রন্থ

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন– وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

'এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার প্রতি ওহীরূপে নাযিল করেছি এক রূহ (তথা নির্দেশ)।' –সূরা শূরা (৪২) : ৫২

অর্থাৎ কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা মানুষের মৃত আত্মায় রূহ ফুঁকে দেয় এবং এর তাছীরে মানুষ এক অবিনশ্বর জীবনের অধিকারী হয়ে যায়। পূর্বে উদ্ধৃত হযরত জা'ফর তয়্যার (রাযি.)-এর বক্তৃতায় আমরা দেখেছি ইসলাম-পূর্বকালে মানুষ কেমন মৃত আত্মাবাহী জন্তুর মত ছিল আর কুরআনের স্পর্শ কিভাবে তাদের মধ্যে জীয়নকাঠির কাজ করেছিল। যেন কুরআনের ছোঁয়া লাগল আর অমনি একেকটি মৃতপ্রাণ মনুষ্যত্বের শক্তি নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে গেল। কেমন ছিল সভ্যতা বিবর্জিত অজ্ঞ-নিরক্ষর মরুচারী সেই জাতিটির জীবন! জাহিলিয়াতের সেই জীবন কি সত্যিকারের জীবন নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল? তারপর কুরআনের সঞ্জীবনীশক্তিতে সহসাই তারা জেগে উঠল। সভ্যতা-ভব্যতা ও মানবিক গুণাবলীতে তারা এক অমর জাতিতে পরিণত হয়ে গেল। তারপর সেই জীয়নকাঠি নিয়ে অন্যান্য জাতিসমূহে ছড়িয়ে পড়ল। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপীয় জাতিসমূহের আত্মায় তার ছোঁয়া লাগল। জেগে উঠল তুর্ক ও বারবার; প্রাণ পেল হিন্দ ও আনদালুস। বিশ্ববিস্তৃত গোরস্তানে ফের শুরু হল জীবনের কোলাহল। নিরক্ষরেরা সাক্ষর হতে লাগল, প্রতিমাপূজার মন্দিরে তাওহীদের আযান ধ্বনিত হতে থাকল, সরাইখানাসমূহ দাওয়াতী মুজাহিদদের গমনাগমনে সরগরম হয়ে উঠল, দস্যুকবলিত পথঘাট আশ্বস্ত-নিশ্চিন্ত পথিকদের পদাশ্রিত হল, জুলুমের রাজত্বসমূহ সাম্য ও ইনসাফের ছত্রছায়া পেল, শক্তিমান ও দুর্বলদের ভেদাভেদ ঘুচে গেল, পেশীশক্তির স্থানে সুকুমারবৃত্তির অধিষ্ঠান হল এবং পাশবিকতার উপর মানবিকতার বিজয় অর্জিত হল। জগদ্ব্যাপী এই মহাজাগরণ যার সুবাদে ঘটে গেল জগৎস্রষ্টা তার নাম দিয়েছেন রূহ বা আত্মা। বিশ্বের মানবগোষ্ঠী তার আসল প্রাণবস্তু তথা মানবিক গুণাবলী হারিয়ে ফেললে আল-হায়্যুল-কায়্যুম তাঁর পাক কালামকে জীয়নকাঠিরূপে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, যাতে তার বিদ্যুৎস্পর্শে মৃত মানবতা আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এরপর আদেশ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের দাওয়াত কবুল কর, যখন তিনি (রাসূল) তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। আর তোমাদের সকলকে তারই কাছে (নিয়ে) জমা করা হবে।' –সূরা আনফাল (৮) : ২৪

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যে বিধানাবলীর দিকে ডাকেন, যে ওহীর নির্দেশনা তোমাদেরকে দান করেন, তার অনুসরণের ভেতরই তোমাদের প্রকৃত জীবন নিহিত। তোমরা তো মানুষ। তোমরা অন্যসব জীবের মত নও যে, পানাহার ও প্রাকৃতিক কার্যনির্বাহই যাদের জীবনের শেষকথা। মানুষ হিসেবে তোমাদের মধ্যে আছে অপরিমিত সম্ভাবনা, মানবীয় গুণাবলীর বিকাশই যার সারকথা। মানুষ হিসেবে তোমাদের যে ইজ্জত ও সম্মান, তা তোমাদের মানবিক গুণাবলীর বিকাশের মধ্যেই নিহিত। যার ভেতর তার যতটুকু বিকাশ ঘটবে, মানুষ হিসেবে সে ততটুকু সম্মানপ্রাপ্ত হবে। আর যার মাঝে তার বিকাশ সাধিত হবে না, সে মানবিক সম্মান থেকে বঞ্চিত থাকবে। তার জীবন হবে পশুরে জীবন; বরং তার অধম। তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি জিন্ন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না; তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৭৯

অর্থাৎ অন্তকরণ, চোখ, কান সবই আছে, কিন্তু এর যথোচিত ব্যবহার করে না। জীবজন্তুর মত

প্রাকৃতিক কার্যাবলীর মধ্যেই তার ব্যবহার সীমিত রাখে। আল্লাহ-প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি ও সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়সেবায় নিয়োজিত রাখে। উচিত তো ছিল সে চোখ দিয়ে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখবে, অন্তকরণ দিয়ে তাতে চিন্তা করবে, কান দিয়ে সে আল্লাহর নির্দেশনা শুনবে এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রকাশ্য-গুপ্ত যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করবে, ফলে তার মানবজন্ম সার্থক হবে এবং অন্যান্য জীবের উপর তার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে পাশবিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির জীবনকেই গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে সে পশুর কাতারে নেমে গেছে; বরং নিজ অমিত সম্ভাবনাকে ধ্বংস করার কারণে পশু অপেক্ষাও অধম হয়ে গেছে। ফলে পশুর পক্ষে যতটা পাশবিকতা সম্ভব হয় না, তাই সে বাস্তবে করে দেখাচ্ছে এবং জলে-স্থলে ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে আনছে। এহেন অধম ও হীন সৃষ্টির ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কিই বা হতে পারে!

বস্তুত এটাই মানুষের মানবিক মৃত্যু। যে জীবনে মানব-সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ঘটে না, আল্লাহর 'ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা যে জীবন উৎকর্ষমণ্ডিত হয় না, যে জীবন তাকওয়ার ভূষণে ভূষিত হয় না, দয়া-দাক্ষিণ্য, সততা-স্বচ্ছতা, ন্যায়-ইনসাফ ও সেবা-সুকৃতি দ্বারা যে জীবন কীর্তিময় হয়ে ওঠে না, ভূ-পৃষ্ঠে তার দৌড়-ঝাঁপে যতই সরগরম থাকুক না কেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে মৃতই বটে। এরূপ একজন সম্পদশালী, ক্ষমতাদর্পী ও বিদ্বান-কৌশলী ব্যক্তি সেই নির্ধন, নিরক্ষর, সাধারণ-সাদামাঠা লোকটির সমতুল্য হতে পারে না, যে তার সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ এবং তা পূরণার্থে কায়মনে কুরআনী নির্দেশনা মেনে চলে। কেননা এরূপ ব্যক্তির জীবন কখনও ইন্দ্রিয়-পরবশতায় নিমজ্জিত হয় না; বরং পবিত্র চিন্তা ও পুণ্যকর্মে তা উৎকর্ষের ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডয়ন করে এবং সে তার দেহমনে লালন করে আল্লাহপ্রেমে অভিষিক্ত ও সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত এক মৃত্যুঞ্জয় জীবন। কাজেই এ উভয় জীবন সমতুল্য হয় কি করে। কুরআন বলছে–

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'একটু বল তো, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, এরপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনও বের হতে পারবে না? এভাবেই কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।' –সূরা আন'আম (৬) : ১২২

অর্থাৎ অজ্ঞতা ও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার দরুন যার আত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল, এরপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের জ্ঞান ও আলোর বিকিরণ ঘটিয়ে সেই মৃত আত্মায় প্রাণ সঞ্চার করেন, ফলে নিজেও সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে চলে আর মানুষকেও সেই আলোকোদ্ভাসিত পথের সন্ধান দিয়ে বেড়ায়, সে তো গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তির মত হতে পারে না, কুরআনের সঞ্জীবনীশক্তি গ্রহণ না করার দরুন যার প্রকৃত মানবিক জীবনলাভ করত সেই অন্ধকার থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কেননা প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হল–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে ব্যক্তিই মু'মিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবনযাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।' –সূরা নাহ্‌ল (১৬) : ৯৭

অর্থাৎ ঈমান ও বিশ্বাসে সঞ্জীবিত আত্মা নিয়ে যে নারী বা পুরুষ সৎকর্মে নিবেদিত থাকে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করে তাকে দান করি পবিত্র ও উপাদেয় জীবন, যে জীবনকে বিশ্বাস ও চেতনাগত কলুষ স্পর্শ করে না। ঐশ্বর্য, স্বস্তি ও প্রশান্তিভরা মন নিয়ে সে ব্যক্তি শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট কর্মচাঞ্চল্যে উজ্জীবিত থাকে। অন্তরে বোধ করে যিক্‌র ও তিলাওয়াতের আস্বাদ, আল্লাহ-প্রেমের আনন্দ, 'ইবাদত-বন্দেগীর মিষ্টতা, সৃষ্টিসেবার পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিন্ত সাফল্যের রোমাঞ্চ। কোনওরকম অভাববোধ তাকে কাতর করতে পারে না, কোনওরকমের প্রলোভনে সে টলে যায় না এবং কোনও অবস্থাতেই সে আদর্শচ্যুত হয় না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন থেকে প্রাণশক্তি গ্রহণ করে না, সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে থাকে হীনভাবাপন্ন; বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মে সে থাকে দীনতাগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

'আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।' –সূরা ত্বোয়াহা (২০) : ১২৪

তাছাড়া স্থূল দৃষ্টিতে যাকে জীবন মনে করা হয়, সেই জীবনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাও মূলত কুরআনের

অনুসরণ দ্বারাই নিশ্চিত হয়। কুরআন নরহত্যাকে কঠিন পাপ সাব্যস্ত করেছে। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি গোত্র ছাড়া কুরআন কারও প্রাণনাশের অনুমতি দেয় না। এমনকি আত্মহত্যাও অনুমোদিত নয়। কুরআন ঘোষণা দিয়েছে–

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

'কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা অন্য কাউকে হত্যা করার কারণে কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারের কারণে না হয়, তবে সে যেন সমস্ত মানুষ হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কারও প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।' –সূরা মায়িদা (৫) : ৩২

অন্যায় হত্যার ক্ষেত্রে কুরআন কিসাসের বিধান দিয়েছে এবং তার তাৎপর্য বর্ণনা করেছে–

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

'এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে।' –সূরা বাকারা (২) : ১৭৯

বস্তুত কুরআন মাজীদের সামগ্রিক বিধানাবলীই এরকম যে, তার বাস্তবায়ন দ্বারা; বরং কেবল তারই বাস্তবায়ন দ্বারা মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত নিরাপদ থাকতে পারে আর সে দৃষ্টিতে কুরআন রূহ-ই বটে। অর্থাৎ আত্মার সংরক্ষক হিসেবে যেন স্বয়ং আত্মা।

সবচে' বড় কথা কুরআন মানুষের প্রকৃত জীবন তথা আখিরাতের জান্নাতী জীবনের নিশ্চয়তা-বিধায়ক। স্থায়িত্ব, শুদ্ধতা, শংকাহীনতা ইত্যাদি দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন তো জীবন নামের উপযুক্তই নয়। আখিরাতের জীবনই সত্যিকারের জীবন। কেননা সে জীবন অক্ষয়, শোক-তাপহীন, নিঃশঙ্ক ও নিখুঁত-নিখাদ। তাই কুরআন ঘোষণা করছে–

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

'এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।' –সূরা 'আনকাবূত (২৯) : ৬৪

মানবাত্মা যখন কুরআনের স্পর্শে শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যায় তখন আখিরাতের পবিত্র ঠিকানায় তার বরাদ্দ লেখা হয়ে যায়। কুরআনের বদৌলতেই যেহেতু মানবাত্মা সেই অনন্ত ও নিশ্চিত জীবনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে, তাই খোদ কুরআনকেই রূহ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হিদায়াতের প্রমাণপঞ্জী

কুরআন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে যেসব বিশেষণ উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণ হল 'বায়্যিনা'– সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন। কুরআনের বহু আয়াতে তার এ বিশেষত্ব উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

'রমযান মাস– যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়।' –সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত দিলে যখন কাফের ও মুশরিকগণ তা প্রত্যাখ্যান করছিল এবং সে সম্পর্কে নানা অবান্তর প্রশ্ন তুলে তাঁর মিশনকে বাধাগ্রস্ত করার প্রয়াস পাচ্ছিল, তখন তাদের বিপরীতে সত্যের যে প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল তা এই কুরআনই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.

'বল, আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছ, তা আমার কাছে নেই। হুকুম আল্লাহ ছাড়া আর কারও চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।' –সূরা আন'আম (৬) : ৫৭

তা কুরআন কিসের প্রমাণ? সূরা বাকারার উপরিউক্ত আয়াতে এককথায় বলে দেওয়া হয়েছে– হিদায়াতের প্রমাণ। আমরা পূর্বে জেনে এসেছি কুরআন মানব-জীবনের প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ের হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা, যার ভেতর 'আকীদা-বিশ্বাস থেকে কর্মজীবনের যাবতীয় বিষয়ই দাখিল। তবে মৌলিকভাবে বিষয়টাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) 'আকাইদ ও (খ) শারাই' (কর্মগত বিধানাবলী)। উভয়টি আবার ইতিবাচক ও নেতিবাচক– এ দুইভাগে বিভক্ত। এসবের সমষ্টিই হচ্ছে দ্বীন। তো কুরআন প্রথমত দ্বীনের প্রমাণ। অর্থাৎ কী-কী বিশ্বাস পোষণ করতে হবে এবং কোন্-কোন্ বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে হবে, এমনিভাবে কোন্-কোন্ কাজ অর্জনীয় এবং কোন্-কোন্ কাজ বর্জনীয় তার প্রামাণিক ভিত্তি হল কুরআন। আমরা যে বলি, ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য আল্লাহ, আখিরাত, রিসালাত, মালাইকা, কিতাব, তাকদীর ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে হবে, যদি প্রশ্ন করা হয় এর প্রমাণ কী, উত্তরে বলা হবে, এর প্রমাণ কুরআন। কেননা কুরআনে এসব বিষয়ে

বিশ্বাস করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ– এ চারটি মৌলিক বিধান পালন করা ফরয এ কারণে যে, কুরআন এগুলোর আদেশ করেছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম, আমানতের খিয়ানত করা হারাম, মদপান করা, জুয়া খেলা, শূকরের গোশ্ত খাওয়া, প্রবাহিত রক্ত পান করা ইত্যাদি হারাম। কেননা কুরআনে এগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এমনিভাবে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, ফরয-ওয়াজিবের যে সুদীর্ঘ ফিরিস্তি ইসলামী শরী'আত পেশ করে থাকে, তার প্রধানতম হুজ্জত বা প্রমাণ হচ্ছে কুরআন মাজীদ। তারপর যথাক্রমে সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াস। এ চারটি উৎস থেকেই ইসলামী শরী'আতের বিধানাবলী নির্ণিত হয়। 'উসূলুল-ফিকহ'-এর গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। তো কুরআন মাজীদ বায়্যিনা বা সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হুজ্জত এক তো এই অর্থে যে, এ গ্রন্থ ইসলামী 'আকাইদ ও শরী'আতের প্রামাণিক উৎস। এস্থলে আমাদের প্রতিপাদ্য সেটা নয়। কুরআন মাজীদের এ ছাড়া আরও একটি প্রামাণিক চেহারা রয়েছে। সেই চেহারাকে খোলাসা করাই এ শিরোনামের উদ্দেশ্য। মৌলিকভাবে তার সম্পর্ক ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসের সাথে।

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ

কুরআন মাজীদ মানুষকে যেসব 'আকীদার প্রতি দাওয়াত দেয়, তা যে সত্য কুরআন নিজেই তার সপক্ষে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ পেশ করেছে। সেসব প্রমাণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, অকাট্য, সন্তোষজনক ও হৃদয়গ্রাহী। সর্বপ্রথম ধরা যাক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের বিষয়টি। নাস্তিক্যবাদীরা কোনও স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু কুরআন দেখিয়ে দিয়েছে, কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক, আল্লাহ তা'আলা যে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এটাই সত্য এবং এতে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টের অস্তিত্বলাভ অসম্ভব। তাই সৃষ্টমাত্রেরই স্বভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি স্বীকৃতির চেতনা নিহিত আছে। তাই শত বাধা সত্ত্বেও উপযুক্ত স্থান-কালে সেই নীরব স্বীকৃতি শব্দমালায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কুরআন প্রশ্ন তুলছে–

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بَلْ لَا يُوقِنُونَ

'তারা কি কারও ছাড়া আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা? না কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তারা সৃষ্টি করেছে? না; বরং (মূল কথা হচ্ছে) তারা বিশ্বাসই রাখে না।' –সূরা তূর (৫২) : ৩৫-৩৬

অর্থাৎ কোনও স্রষ্টা ছাড়া তারা এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি তারা নিজেরা নিজেদের সৃষ্টি করেছে, যদ্দরুন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে? বলা বাহুল্য এর কোনওটাই সম্ভব নয়। কেননা সৃষ্টির অস্তিত্বপ্রাপ্তির জন্য স্রষ্টার হাত অপরিহার্য। কাজেই স্রষ্টাকে অস্বীকার করার মানে দাঁড়ায় নিজ অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। কিন্তু নিজ অস্তিত্বকে তো অস্বীকার করা সম্ভব নয়, যেহেতু সেটা একটা বাস্তবতা। আর তা যখন সম্ভব নয়, তখন স্বীকার করতে হবে সৃষ্টিকর্তাও একজন আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সৃষ্টিকর্তা কি মাখলুক নিজেই, না অন্য কেউ? উত্তর হচ্ছে, নিজে হওয়া সম্ভব নয়। কেননা সৃষ্টি হওয়ার আগে তার তো কোনও অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্বহীনের পক্ষে এটা করা কিভাবে সম্ভব? যখন এ দু'ই সম্ভাবনাই নাকচ হয়ে গেল, তখন প্রমাণ হয়ে গেল সৃষ্টিনিচয়ের এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি নিজে মাখলূক নন, যার প্রতি ঈমান আনা সমস্ত মাখলূকের অবশ্যকর্তব্য।

কুরআন এ প্রশ্নের ভেতর আকাশমণ্ডলীকেও যুক্ত করে নিয়েছে। অর্থাৎ হে মানুষ! তোমার পক্ষে যখন নিজেকেই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তখন বিশাল মাখলূক আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিকার্য তোমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? বস্তুত তোমার মত ক্ষুদ্র সৃষ্টি থেকে আসমানের মত মহাসৃষ্টি পর্যন্ত যাবতীয় মাখলূকই একই স্রষ্টার সৃষ্টিসূত্রে গাঁথা। তুমি চিন্তা করলে সেই স্রষ্টার সন্ধান পেয়ে যাবে। কুরআন বলছে–

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে বহু নিদর্শন। এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পার না?' –সূরা যারিয়াত (৫১) : ২০-২১

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَ
السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে, রাত-দিনের একটানা আবর্তনে, সেইসব নৌযানে যা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে বয়ে চলে, সেই পানিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং সেই মেঘমালাতে যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আজ্ঞাবহ

হয়ে সেবায় নিয়োজিত আছে, বহু নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।' –সূরা বাকারা (২) : ১৬৪

আরও ইরশাদ–

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

'ধ্বংস হোক এরূপ মানুষ, সে কত অকৃতজ্ঞ। (একটু চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে এক বিশেষ পরিমিতিও দান করেছেন। এরপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। এরপর তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে কবরস্থ করেছেন। তারপর যখন ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরায় উত্থিত করবেন। কখনও নয়, আল্লাহ তাকে যে বিষয়ে আদেশ করেছিলেন, এখনও পর্যন্ত সে তা পালন করেনি। এরপর মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমি উপর থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। তারপর ভূমিকে বিস্ময়করভাবে বিদীর্ণ করেছি। তারপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, নিবিড়-ঘন বাগান এবং ফলমূল ও ঘাস-পাতা। তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য।' –সূরা 'আবাসা (৮০) : ১৭-৩২

কুরআন জানাচ্ছে, কঠিন বিপদ যখন মানুষকে ঘিরে ধরে, যা থেকে নিষ্কৃতির বাহ্যিক কোনও উপায় তার নজরে আসে না, তখন তার স্বভাবে নিহিত বিশ্বাস সকল কুফর ও নাস্তিক্যবাদের ঘেরাটোপ ছিন্ন করে বাইরে ঠিকরে আসে আর স্রষ্টার আশ্রয়ে আত্মনিবেদনের শেষ সুযোগকে লুফে নেয়। কুরআন বলছে–

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

'তিনি তো আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে স্থলেও ভ্রমণ করান এবং সাগরেও। এভাবে তোমরা যখন নৌকায় সওয়ার হও আর নৌকাগুলো মানুষকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে পানির উপর বয়ে চলে এবং তারা তাতে আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়ে, তখন হঠাৎ তার উপর আপতিত হয় তীব্র বায়ু এবং সবদিক থেকে তাদের দিকে ছুটে আসে তরঙ্গ এবং তারা মনে করে সবদিক থেকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা খাঁটি মনে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁকেই ডাকে (এবং বলে, হে আল্লাহ!) তুমি যদি এর (অর্থাৎ এই বিপদ) থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' –সূরা ইয়ূনুস (১০) : ২২

কুরআন মাজীদ এরকম আরও বহু আয়াতে বিভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছে। যে-কেউ সুস্থ ও মুক্তমনে তা পাঠ করবে এবং তার মর্মবাণী অনুধাবনের চেষ্টা করবে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তার সব সংশয়-সন্দেহ ঘুচে যাবে এবং অত্যন্ত শক্ত-পোক্ত ভিত্তির উপর সে এ বিশ্বাসটিকে দাঁড় করাতে সক্ষম হবে।

তাওহীদের প্রমাণ

কুরআন মাজীদ সর্বাপেক্ষা বেশি প্রমাণ যে বিষয়ে সরবরাহ করেছে, তা হচ্ছে তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদ। কেননা এটাই সর্বকালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'আকীদা। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রশ্নে কোনও কালেই বেশি সংখ্যক মানুষের মতিভ্রম ঘটেনি। নাস্তিকের সংখ্যা বর্তমানের মত অতীতেও কখনও কোনও সমাজে জমাট বাঁধতে পারেনি। ইদানীং অতি নগণ্য সংখ্যক অবিশ্বাসী এখানে-ওখানে সমস্বরে শোরগোল তোলার চেষ্টা করছে বলে বিভ্রম হয়, আমলে নেওয়ার মত একটা সংখ্যায় বুঝি তারা পৌঁছে গেছে। প্রকৃতপক্ষে আজও তারা সমাজের নেহায়েত একটা ভগ্নাংশ মাত্র। হাঁ, একথা সত্য যে, বিশ্বাসীদের প্রচার-প্রচারণায় বলবত্তার অভাবে তারা ফাঁকা বুলি বোলার কিছুটা জোর পাচ্ছে এবং দায়িত্বশীলদের অবহেলার ফাঁক গলিয়ে তারা সুবিধামত কিছু জায়গাও দখল করে ফেলেছে। না হয় মূল বুনিয়াদ যেহেতু দুর্বল তাই সংখ্যায় শক্তিমান হওয়ার সম্ভাবনা তাদের আগেও যেমন ছিল না, আজও তা আদৌ নেই। হাঁ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের অভাবে এবং স্বভাবতই ত্বরাপ্রবণ ও স্থূলদর্শী হওয়ার কারণে মানুষ শিরক ও বহু-ঈশ্বরবাদের ফাঁদে পা দিয়ে বসে। এভাবে যুগে-যুগে অগণ্য মানুষ কখনও সূর্যকে দেবতা মেনে নিয়েছে, কখনও নদ-নদীর পূজায় লিপ্ত হয়েছে, কখনও গরু-বাছুরের উপাসনা করেছে, কখনও নবী-বুযুর্গদেরকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে এবং তাদের প্রতিমা বানিয়ে পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন অংশীবাদী সম্প্রদায়ের। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী প্রচারের এই জমানায়ও বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষ বিভিন্ন রকমের শিরকের গোলক ধাঁধায় আটকা পড়ে আছে। বস্তুত সবযুগেই মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিনতম ও মৌলিক

বিপথগামিতা ছিল তাওহীদ থেকে বিচ্যুতি ও শিরকের অন্ধগলিতে প্রবেশ। এ কারণেই কুরআন মাজীদ সর্বাপেক্ষা জোরদারভাবে তাওহীদেরই দাওয়াত দিয়েছে এবং বহুবিচিত্র ধারায় এর প্রমাণ সরবরাহ করেছে। কুরআন বলছে–

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۖ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

'যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বূদ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি যা-কিছু করেন, সেজন্য কারও কাছে তাঁর জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু সকলকেই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তবে কি তারা তাঁকে ছেড়ে অন্যসব মা'বূদ গ্রহণ করেছে? (হে নবী!) তাদেরকে বল, নিজেদের দলীল পেশ করতে। এই তো (বর্তমান) রয়েছে (কুরআন, যা) আমার সংগে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশবাণী এবং রয়েছে (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ, যা) আমার পূর্বে যারা ছিল তাদের জন্য উপদেশবাণী। কিন্তু বাস্তবতা হল, তাদের অধিকাংশেই সত্যে বিশ্বাস করে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। আমি তোমার পূর্বে এমন কোনও রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনও মা'বূদ নেই। সুতরাং আমারই 'ইবাদত কর। তারা বলে, রহমান (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন (আর তাঁর সন্তান হল ফিরিশতাগণ)। সুবহানাল্লাহ! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁকে ডিঙিয়ে কোনও কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশমতই কাজ করে। তিনি তাদের সম্মুখ ও পিছনের সবকিছু জানেন। তারা কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, কেবল তাদের ছাড়া, যাদের জন্য আল্লাহর পছন্দ হয়। তারা তাঁর ভয়ে থাকে ভীত। তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কথা বলেও (যদিও সেটা অসম্ভব) যে, 'আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন মা'বূদ', তবে আমি তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেব। এরূপ জালেমদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দিই।' –সূরা আম্বিয়া (২১) : ২২-২৯

এসব আয়াতে বিভিন্ন প্রকার শিরক রদ করে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে সপ্রমাণ করা হয়েছে, যা একটু পর্যবেক্ষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তাফসীর গ্রন্থসমূহে এর প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝

'হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে নি'আমত বর্ষণ করেছেন তা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোনও খালেক আছে কি, যে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা বিপথগামী হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছ?' –সূরা ফাতির (৩৫) : ৩

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে তাঁর নি'আমতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

'তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। (এর) প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। ইনিই আল্লাহ– তোমাদের প্রতিপালক। সকল রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেসব অলীক প্রভুকে) তোমরা ডাক, তারা খেজুর বীচির আবরণের সমানও কিছুর অধিকার রাখে না। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবেই না আর শুনলেও তোমাদেরকে কোনও সাড়া দিতে পারবে না। কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত সত্তার মত সঠিক সংবাদ তোমাকে আর কেউ দিতে পারবে না।' –সূরা ফাতির (৩৫) : ১৩-১৪

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

'নিশ্চয়ই আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু নির্গত করেন এবং তিনিই প্রাণবান বস্তু হতে নিষ্প্রাণ বস্তুর নির্গতকারী। হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? (তিনিই) ভোরের উদ্‌ঘাটক। তিনিই রাতকে বানিয়েছেন বিশ্রামের সময় এবং সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন এক হিসাবের অনুবর্তী। এ সমস্ত মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সত্তার পরিকল্পনা। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ জানতে পার। আমি নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছি সেই সকল লোকের জন্য, যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়। তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। এরপর (প্রত্যেকের রয়েছে) এক অবস্থানস্থল ও এক আমানতস্থল। আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছি সেই সকল লোকের জন্য, যারা বুঝ-সমঝ রাখে। আর আল্লাহ তিনিই, যিনি (তোমাদের জন্য) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গত করেছি, তারপর তা থেকে সবুজ গাছপালা জন্মিয়েছি, যা থেকে আমি থরে থরে বিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের চুমরি থেকে (ফল-ভারে) ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং আমি আঙ্গুর বাগান উদ্‌গত করেছি এবং যায়তুন ও আনারও। তার একটি অন্যটির সদৃশ ও বিসদৃশও। যখন সে বৃক্ষ ফল দেয়, তখন তার ফলের প্রতি এবং তার পাকার অবস্থার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ কর। এসবের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে। লোকে জিন্নদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা গড়ে নিয়েছে, অথচ তারা (আল্লাহর সম্পর্কে) যা-কিছু বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। (তিনি) আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তার কোনও সন্তান হবে কি করে, যখন তার কোনও স্ত্রী নেই? তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। তিনি যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্তাধীন। তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত। (হে নবী! তাদেরকে বল,) তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জ্ঞান-বর্তিকা এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি চোখ খুলে দেখবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে থাকবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বশীল নই।' –সূরা আন'আম (৬) : ৯৫-১০৪

তাওহীদকে সুপ্রমাণ করার জন্য কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে প্রশ্ন তুলেছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ করে থাকেন, তোমাদের দেব-দেবীর কেউ কি তার কোনওটি করতে সক্ষম? বলা বাহুল্য তা করতে সক্ষম নয়। আর যদি সক্ষম নাই হয়, তবে এরকম দুর্বল ও অক্ষম বস্তুকে তোমরা মা'বূদ বানাচ্ছ কোন্ যুক্তিতে? কুরআন বলছে–

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

'(হে নবী!) বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। বল তো, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি যাদেরকে তারা (আল্লাহর প্রভুত্বে) অংশীদার বানিয়েছে তারা? তবে কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন? তারপর আমি সে পানি দ্বারা উদ্‌গত করেছি মনোরম উদ্যানরাজি। তার বৃক্ষরাজি উদ্‌গত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সংগে অন্য কোনও প্রভু আছে? না; বরং তারা (সত্যপথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখে। তবে কে তিনি, যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন অবস্থানের জায়গা, তার মাঝে-মাঝে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, তার (স্থিতির) জন্য (পর্বতমালার) কীলক গেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি দুই সাগরের মাঝখানে স্থাপন করেছেন এক অন্তরায়? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সংগে অন্য কোনও প্রভু আছে? না; বরং তাদের অধিকাংশেই (প্রকৃত সত্য) জানে না। তবে কে

তিনি, যিনি কোনও আর্ত যখন তাকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলিফা বানান? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সংগে অন্য প্রভু আছে? তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। তবে কে তিনি, যিনি স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান এবং যিনি নিজ রহমতের (বৃষ্টির) আগে (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে বাতাস পাঠান? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সংগে অন্য প্রভু আছে? (না, বরং) তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে। তবে কে তিনি, যিনি সমস্ত মাখলূককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করেন? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সংগে অন্য কোনও প্রভু আছে? বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর- যদি সত্যবাদী হও।' -সূরা নাম্ল (২৭) : ৫৯-৬৪

অন্যত্র বলা হয়েছে-

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, আচ্ছা তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোনও মা'বূদ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবে কি তোমরা শুনতে পাও না? বল, তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোনও মা'বূদ আছে কি, যে তোমাদেরকে এমন রাত এনে দেবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার? তবে কি তোমরা কিছুই বোঝ না?' -সূরা কাসাস (২৮) : ৭১-৭২

মোটকথা তাওহীদের সপক্ষে বিচিত্র ভঙ্গির উপস্থাপনাসমৃদ্ধ দলীল-প্রমাণে কুরআন পরিপূর্ণ। কুরআনের পাঠক এর সূরায়-সূরায়, পাতায়-পাতায় এ রকম অজস্র যুক্তি-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করবে। এরপর সে যদি তাওহীদবাদী হয়ে থাকে, তবে এর মাধ্যমে তার বিশ্বাস হবে আরও ঘনীভূত, আরও ধারালো ও বলিষ্ঠ এবং আরও স্বচ্ছ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। আর যদি অংশীবাদী হয়, তবে বারেকের জন্য হলেও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হবে এবং ইতোমধ্যে বুদ্ধি-বিবেক সম্পূর্ণ অন্ধ ও বিকৃত না হয়ে থাকলে নিজের ভুলও বুঝতে পারবে, অনন্তর তাওহীদের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ জীবনকে আমূল বদলে ফেলবে।

রিসালাতের দলীল

ইসলামে রিসালাতের বিশ্বাস একটি অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কার্যাবলী সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য সেই শুরু থেকেই রিসালাতের ধারা চালু করেছেন। তিনি নবী-রাসূলগণের প্রতি ওহী নাযিল করে মানুষকে সেই সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন, যাতে মানুষ তার অনুসরণ করত আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং দোজাহানের মুক্তি ও সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। তিনি এ ধারায় হযরত আদম আ. থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের অনেকের কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অনেকের কথা রয়ে গেছে অব্যক্ত। কুরআন মাজীদ সেই সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেয় এবং এ ধারার সত্যতা ও যুক্তিসিদ্ধতা সম্পর্কেও প্রমাণ পেশ করে। কুরআন বলছে-

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

'(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি ওহী নাযিল করেছি, যেভাবে নাযিল করেছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং আমি ওহী নাযিল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, (তাদের) বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইয়ূনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি। আর দাউদকে দান করেছিলাম যাবূর। আর বহু রাসূল তো এমন, পূর্বে যাদের ঘটনাবলী আমি তোমাকে শুনিয়েছি এবং বহু রাসূল রয়েছে, যাদের ঘটনাবলী আমি তোমাদেরকে শুনাইনি। আর মূসার সংগে তো আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। এ সকল রাসূল এমন, যাদেরকে (ছওয়াবের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলগণের (আগমনের) পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোনও অজুহাত বাকি না থাকে। আর আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।' -সূরা নিসা (৪) : ১৬৩-১৬৫

অন্যত্র ইরশাদ- وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

'এমন কোনও জাতি নেই, যাদের কাছে কোনও সতর্ককারী আসেনি।' -সূরা ফাতির (৩৫) : ২৪

আরও ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

'আমি কখনও কাউকে শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না (তার কাছে) কোনও রাসূল পাঠাই।' –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ১৫

সেই ধারারই সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

'আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন রাসূল বৈ তো নন! তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে।' –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪৪

আরও ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

'(হে মু'মিনগণ!) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোনও পুরুষের পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।' –সূরা আহযাব (৩৩) : ৪০

কুরআন তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের ডাক দিয়ে বলছে–

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

'এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে– আর সেটাই তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য– তা আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।' –সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ২

আরও ইরশাদ–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

'(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যার আয়ত্তে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আন, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৮

তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে কুরআন নিজেই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। যিনি জীবনভর একজন নিরক্ষর মানুষ, বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে যার জ্ঞানলাভের কোনও সুযোগ ছিল না, সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চার সাথে পরিচয়লাভের কোনও উপায়-উপকরণ যার হাতে ছিল না, মানুষের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা সংক্রান্ত কোনও পাঠচক্রে যার কখনও হাজির হওয়ার অবকাশ হয়নি, দুনিয়ার প্রচলিত কোনও ধর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য কোনও ধর্মের ব্যাখ্যাতা বা কোনও যাজক-সাধকের সাহচর্যও যিনি কখনও লাভ করেননি, এমনকি নিজ মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা সংক্রান্ত কোনও রকমের সম্পৃক্ততাও যার কোনও দিন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তিনি সহসাই এ যাবতীয় বিষয়-সম্বলিত এমন এক বাণী সকলের সামনে পাঠ করে শোনান, সকল দিক থেকেই যা মানুষের জ্ঞান-ক্ষমতার অতীত। তা কিভাবে এটা সম্ভব হল? এটাই প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলাই ওহী মারফত এ অলৌকিক গ্রন্থ তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন। কুরআন বলছে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

'তুমি তো এর আগে কোনও কিতাব পড়নি এবং নিজ হাতে কোনও কিতাব লেখওনি। সে রকম কিছু হলে ভ্রান্তপথ অবলম্বনকারীরা সন্দেহ করতে পারত।' –সূরা 'আনকাবূত (২৯) : ৪৮

অন্যত্র ইরশাদ–

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'(হে রাসূল!) আমি যখন মূসার উপর বিধানাবলী অর্পণ করেছিলাম, তখন তুমি (তূর পাহারের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না এবং যারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল, তুমি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলে না। বস্তুত আমি তাদের পর বহু মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, যাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তুমি মাদয়ানবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে না যে, তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে; বরং আমিই (তোমাকে) রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আমি যখন (মূসাকে) ডাক দিয়েছিলাম তখন তুমি তূর পাহারের পাদদেশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত (যে, তোমাকে ওহীর মাধ্যমে এসব বিষয় অবহিত করা হচ্ছে) যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার আগে কোনও সতর্ককারী আসেনি। হয়ত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।' –সূরা কাসাস (২৮) : ৪৪-৪৬

আরও ইরশাদ–

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ
مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

'(হে নবী!) এগুলো গায়েবের কিছু বৃত্তান্ত, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি। এসব বৃত্তান্ত তুমিও ইতঃপূর্বে জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে।' –সূরা হূদ (১১) : ৪৯

কুরআন ছাড়াও তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে আরও বহু দলীল আছে। কুরআন সে রকম বহু দলীলও উল্লেখ করেছে, যেমন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তার উল্লেখ থাকা এবং সে অনুযায়ী সেগুলোর অনুসারীদের কর্তৃক তাকে চিনতে পারা। কুরআন বলছে–

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

'যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে– যা তাদের নিকট আছে– লিপিবদ্ধ পাবে।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৭

অন্যত্র ইরশাদ–

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (এতটা ভালোভাবে) চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানকে।' –সূরা বাকারা, (২) : ১৪৬; সূরা আন'আম (৬) : ২০

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে চল্লিশ বছর নিজ এলাকার লোকজনের মধ্যে যে অসাধারণ সততা, সাধুতা, বিশ্বস্ততা, সেবা-পরায়ণতা ও পরহিতৈষণাপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন, তাও তার নবুওয়াতের প্রকৃষ্ট দলীল। কুরআন এদিকে ইংগিত করে বলছে–

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'বলে দাও, আল্লাহ চাইলে আমি এ কুরআন তোমাদের সামনে পড়তাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করতেন না। আমি তো এর আগেও একটা বয়স তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি। তারপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?' –সূরা ইয়ূনুস (১০) : ১৬

"অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, আমি কেবল তাই তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন, আমার মাধ্যমে তোমাদের সতর্ক করেন। তাঁর ইচ্ছা অন্যকিছু হলে আমার কি সাধ্য নিজের পক্ষ থেকে কথা বানিয়ে তাঁর নামে চালিয়ে দেব? আমার জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বছর তো তোমাদের চোখের সামনেই কেটেছে। এ দীর্ঘ সময়ের ভেতর আমার সম্পর্কে তোমাদের ভালোভাবেই জানা হয়ে গেছে। আমার সত্যবাদিতা, চারিত্রিক শুদ্ধতা, আমার আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা এবং আমার চারিত্রিক মাধুর্য তোমাদের মধ্যে প্রবাদতুল্য পরিচিতি লাভ করেছে। তোমরা জান আমি একজন উম্মী, কখনও কারও সামনে ছাত্র হয়ে বসিনি। বিগত চল্লিশ বছরের জীবনে একটা কবিতা পর্যন্ত লেখা হয়নি। কোনও কবিতা পাঠের আসরে আমাকে দেখা যায়নি। না কখনও কোনও বই-কিতাব খুলেছি, না কলম হাতে নিয়েছি আর না কোনও বিদ্যাচর্চার মজলিসে উপস্থিত থেকেছি। আচ্ছা বল তো এহেন এক উম্মী-নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে এটা কি কখনও সম্ভব যে, আচানক নিজের পক্ষ থেকে এমন এক জ্ঞানগর্ভ বাণী রচনা করে ফেলবে, যার ভাষালংকার, যার শক্তি-সৌকর্য, যার দার্ঢ্য ও গতিচ্ছন্দ, যার শিল্পগুণ ও দুর্দান্ত তাছীর, মোটকথা যার প্রতিটি দিক তাবৎ জিন্ন ও ইনসানের ক্ষমতার অতীত, কারও পক্ষে এমন গুণসমৃদ্ধ কালাম রচনা সম্ভব নয় এবং যার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-তত্ত্বের সামনে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-তত্ত্ব নিষ্প্রভ হয়ে যায়, যা মানবজাতির সামনে এমন পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন বিধিমালা তুলে ধরে, যার বিপরীতে বিগত দিনের সকল বিধিবিধান বাল্যশিক্ষাবৎ মনে হয় এবং যা দুনিয়ার বড়-বড় দেশ ও জাতিসমূহের মৃত আত্মায় প্রাণসঞ্চার করে, নবজীবনের সন্ধান দিয়ে দেয় এবং অমর-অক্ষয় জীবনলাভের অবলম্বন জোগায়? তোমাদের ভেবে দেখা উচিত, যেই শুদ্ধ-পবিত্র চরিত্রের লোকটি চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও কোনও মানুষের নামে মিথ্যা বলেনি, সে কি কখনও মহাবিশ্বের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নামে মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? তোমরা স্বীকার করতে বাধ্য হবে তা কখনও সম্ভব নয়। আর তা যখন সম্ভব নয়, তখন এটাও তোমরা মানতে বাধ্য হবে যে, আমি যে কালাম তোমাদেরকে পড়ে শোনাই, তা কিছুতেই আমার রচনা নয় এবং রচনা করার ক্ষমতা ও এখতিয়ারও আমার নেই।" –তাফসীরে 'উছমানী

কুরআন এ রকম আরও বহু প্রমাণ পেশ করেছে, যা দিবালোকের মত স্পষ্ট করে দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা এই আখেরী কিতাব তার প্রতি নাযিল করেছেন।

আখিরাত ও পুনরুত্থানের প্রমাণ

কুরআন মানুষকে যেসকল বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেয়, আখিরাত ও পুনরুত্থানের বিশ্বাস তার

অন্যতম। বর্তমানকালের নাস্তিকদের মত সেকালেও কিছু লোক ছিল, যারা মনে করত দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। আখিরাত বলতে কিছু নেই। কুরআন তাদের কথা উদ্ধৃত করেছে–

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

'জীবন তো এই ইহজীবনই, আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মরি ও বাঁচি। আমাদেরকে ফের জীবিত করা যাবে না। (আর এই যে ব্যক্তি) এ তো এমনই লোক, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আমরা এর প্রতি ঈমান আনার নই।' –সূরা মু'মিনূন ২৩) : ৩৭-৩৮

আরও বলত–

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

'তারা বলে, জীবন বলতে যা-কিছু তা বাস আমাদের এই পার্থিব জীবনই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি, আর আমাদেরকে কেবল কালই ধ্বংস করে।' –সূরা জাছিয়া (৪৫) : ২৪

তারা বলত মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। এই মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষকে পুনর্জীবন দান করা সম্ভব নয়। কুরআন তাদের কথা উদ্ধৃত করছে–

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

'সে কি তোমাদেরকে এই ভয় দেখায় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরায় (মাটি থেকে) বের করা হবে? তোমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখানো হচ্ছে, সেটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার।' –সূরা মু'মিনূন (২৩) : ৩৫-৩৬

তারা আরও বলত–

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

'আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে?' –সূরা ওয়াকি'আ (৫৬) : ৪৭

কুরআন তাদের উত্তরে বলছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

অর্থাৎ মারা যাওয়ার পর পচে-গলে মাটি হয়ে যাওয়ার পরও কিভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন, এ ব্যাপারে খটকা থাকলে তোমরা নিজ জন্ম-প্রক্রিয়ার ভেতর চিন্তা করে দেখ, জবাব পেয়ে যাবে। তোমরা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছ, মহাশক্তিমান আল্লাহ একমুঠো নিষ্প্রাণ মাটি বা এক বিন্দু পানি দ্বারা জ্যান্ত-জাগ্রত মানুষ সৃষ্টি করছেন, ঊষর মৃত ভূমিকে কিভাবে সবুজ-শ্যামল গাছ-বৃক্ষ দ্বারা প্রাণবন্ত করে তুলছেন, সৃষ্টির কোলাহলে প্রথমবার যিনি ধূলোক-ভূলোককে এভাবে মুখরিত করে তুলতে পেরেছেন, সেই একই সৃষ্টিকে পুনর্বার জাগিয়ে তোলাটা তার পক্ষে অসম্ভব হবে কেন? আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

'তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? না। বস্তুত তারা পুনঃসৃষ্টি সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে।' –সূরা কাফ (৫০) : ১৫

অর্থাৎ তাঁর শক্তির কোনও সীমা নেই, কোনও রকম অক্ষমতা তাঁকে স্পর্শ করে না। কাজেই প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও তিনি অনায়াসেই তা করতে পারবেন। মৃত প্রান্তরকে দেখে তোমরা ভাবতে পারনি, সেখানে কখনও তৃণলতা জন্মাবে, কিন্তু আল্লাহ ঠিকই রহমতের বারি বর্ষণে তা সুজলা-সুফলা করে তোলেন, তেমনি মৃত মানবদেহকেও তিনি তাঁর কুদরতের ছোঁয়া দ্বারা ঠিক জীবিত করে তুলবেন, তা তোমরা যতই অভাবনীয় মনে কর না কেন। আল্লাহ বলছেন–

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চালন করে। তারপর তিনি যেভাবে চান তা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে কয়েক স্তর বিশিষ্ট (ঘনঘটা) বানিয়ে দেন। ফলে তোমরা দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়। যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা হয় সে বৃষ্টি পৌঁছিয়ে দেন, তখন সহসাই তারা হয়ে ওঠে আনন্দোৎফুল্ল। অথচ তার আগে যতক্ষণ তাদের উপর বৃষ্টিপাত করা হয়নি, ততক্ষণ তারা ছিল হতাশাগ্রস্ত। আল্লাহর রহমতের ফল লক্ষ কর, তিনি কিভাবে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। বস্তুত তিনি মৃতদের জীবনদাতা এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' –সূরা রূম (৩০) : ৪৮-৫০

তা মানুষের পুনর্জীবন কেন জরুরি? আল্লাহ তা'আলা এর সপক্ষে যুক্তি দান করেন যে, নেক ও বদ এবং পাপী ও পুণ্যবান কী সমান হতে পারে?

তোমরা নিশ্চয়ই বলবে তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তোমরা তো দেখছ, দুনিয়ায় তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনও প্রভেদ নেই; বরং ক্ষেত্রবিশেষে পাপীকেই ভালো অবস্থাসম্পন্ন লক্ষ করা যায়। তাহলে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন এত উন্নত প্রজাতির মাখলূক তিনি কেন সৃষ্টি করলেন এবং ভালো ও মন্দকাজের ইচ্ছাশক্তিই বা তাদের মধ্যে কেন রাখলেন, যদি কোথাও তার কোনও ফলাফলই প্রকাশ না পায়? মহাস্রষ্টা কি এরূপ নিরর্থক কাজ করতে পারেন? আল্লাহ তা'আলা বলছেন—

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

'তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? অতি মহিমময় আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।' –সূরা মু'মিনূন (২৩) : ১১৫-১১৬

অর্থাৎ ভালো লোককে তার ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ লোককে তার মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়ার মত কোনও জায়গা না থাকলে সৃষ্টির এই মহা আয়োজন নিরর্থক হয়ে যায় আর আল্লাহ নিরর্থক কাজের অশোভনতা হতে বহু উর্ধ্বে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

'আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের ধারণা মাত্র। সুতরাং কাফেরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস জাহান্নামরূপে। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদেরকে সেইসব লোকের সমান গণ্য করব, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমান গণ্য করব?' –সূরা ছদ (৩৮) : ২৭-২৮

অর্থাৎ অন্যান্য জীবজন্তুর মত পানাহার ও প্রাকৃতিক কার্যাবলীর ভেতর জীবন সাঙ্গ হয়ে যাওয়া তারপর নতুন কোনও জীবনের সম্মুখীন না হওয়ার ধারণা কেবল অজ্ঞ-অবিশ্বাসীরাই করতে পারে। তারাই মনে করে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এবং পাপিষ্ঠ ও মুত্তাকী যাই হোক না কেন দুনিয়ার জীবনই সকলের একমাত্র জীবন। পরিণামে তাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ হবে না। কিন্তু আমি ন্যায়বিচারক।

দুনিয়ার জীবনে আমি সকলকে পরীক্ষা করছি, কে ভালো কাজ করে আর কে মন্দ কাজ। শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি সকলকে তার প্রাপ্য ফল দান করব। সেই ফলদানের জন্যই পুনরুত্থান জরুরি। দুনিয়ায় সেটা সম্ভব নয়। কারণ দুনিয়া কর্মক্ষেত্র, ফসল ভোগের জায়গা নয় এবং এটা পরীক্ষাকেন্দ্র, ফলাফল প্রকাশের স্থান নয়। পুনরুত্থানের মাধ্যমে যে জগতে তোমাদের আনা হবে তার নাম আখিরাত। সেখানে পরীক্ষা ও কর্মের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। যার ফল ভালো হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে আর যার ফল হবে মন্দ তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। পুরস্কারের জন্য অনন্ত সুখের স্থান জান্নাত রাখা হয়েছে আর শাস্তির জন্য অশেষ শাস্তির স্থান জাহান্নামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কুরআন জানাচ্ছে—

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

'মানুষের উপর কখনও এমন সময় এসেছে কি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনও বস্তু ছিল না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে বানিয়েছি শ্রবণকারী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে অকৃতজ্ঞ। আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করেছি শিকল, গলার বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন। নিশ্চয়ই পুণ্যবানেরা এমন পানপাত্র হতে (পানীয়) পান করবে, যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে। সে পানীয় হবে এমন প্রস্রবনের, যা থেকে আল্লাহর (নেক) বান্দাগণ পান করবে। তারা তা (যেথা ইচ্ছা) সহজে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।' –সূরা দাহ্‌র (৭৬) : ১-৬

জান্নাত ও জাহান্নামে কি রকমের সুখ ও শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার বিশদ বিবরণও কুরআন বিভিন্ন সূরায় পেশ করেছে।

কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

কুরআন তার নিজের সম্পর্কেও বায়্যিনা বা সুস্পষ্ট প্রমাণ। কুরআন তার প্রতি বিশ্বাসের দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি সে যে আল্লাহর কালাম, কোনও মানুষের রচনা নয়, সে সম্পর্কে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী প্রমাণও প্রদর্শন করেছে। পূর্বে কুরআন 'হক ও সত্যগ্রন্থ'– এই শিরোনামের অধীনে এরকম কিছু প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তাছাড়াও কুরআন তার সত্যতার পক্ষে বিভিন্ন দলীল দিয়েছে, যেমন

ইরশাদ হয়েছে– أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

'তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে তার (সংশ্লিষ্ট) তালা।' –সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ২৪

অর্থাৎ যারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করছে না, যদি কুফরীর ঘোর অন্ধকারে তাদের অন্তর পুরোপুরি আচ্ছন্ন না হয়ে গিয়ে থাকে, যদি তাদের বুঝ-সমঝের উপর তালা পড়ে না গিয়ে থাকে এবং জিদ ও হঠকারিতার পরিণামে তাদের সত্য-উপলব্ধির ক্ষমতা নিঃশেষ না হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কুরআনের ভেতর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি ফেললেই তারা তার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে যাবে। কারণ ভাষা, মর্ম, পূর্ণতা, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা প্রভৃতি বিচারে যে অসাধারণত্ব কুরআন ধারণ করে, তার কোনও তুলনা পেশ করা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটাই প্রমাণ করে কুরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং আল্লাহর কালাম। কুরআন আরও বলছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে হত তবে এর মধ্যে বহু অসংগতি পেত।' –সূরা নিসা (৪) : ৮২

অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে চিন্তা করলেই পরিষ্কার বোঝা যায় এটা আল্লাহর বাণী। কেননা মানবরচিত হলে এত বড় গ্রন্থের মধ্যে প্রচুর অসংগতি ও স্ববিরোধিতা পাওয়া যেত। কারণ মানুষ বড় দুর্বল। পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভেদ তার চিন্তা-ভাবনায় পার্থক্য সৃষ্টি করে। ক্রোধ ও সন্তোষ, শংকা ও নিরাপত্তা প্রভৃতি বিপরীতমুখী অবস্থায় সে তার মানবিক ঋজুতা সমান ধরে রাখতে পারে না, যার প্রভাব তার রচনা ও বক্তৃতায় স্বাভাবিকভাবেই পড়ে যায়। ফলে তার আগাগোড়া বয়ানের ভারসাম্য বজায় থাকে না। একেক স্থলে তার বক্তব্যে একেকরকম মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়, বিশেষত সে বক্তব্য যদি হয় খণ্ড-খণ্ড আকারে বহু বছরে প্রদত্ত। বড়-বড় লেখকের রচনামালা মেলালে দেখা যায় বছরে বছরে তার রং পাল্টায়। তথ্য ও তত্ত্বের পরিবেশনা ও ভাষার ছাদে জীবনভর সংগতি রক্ষা করে চলা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবার কুরআনের মধ্যে চোখ বুলিয়ে দেখুন। দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থের ভাষা ও মর্মে কোথাও কোনও গড়মিল পাবেন না। সূরা ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত হিরা পর্বতে অবতীর্ণ 'ইকরা' থেকে ওফাতের পূর্বে অবতীর্ণ 'আল-ইয়াওমা আকমালতু' পর্যন্ত সমগ্র কুরআন সমান গতিচ্ছন্দে বয়ে চলে। সুসমঞ্জস তার বিধিমালা এবং ছেদহীন তার তাছীর-ক্ষমতা। কুরআন বলছে–

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.

'আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী– এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসামঞ্জস্য, (যার বক্তব্যসমূহ) পুনরাবৃত্তিকৃত, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এর দ্বারা তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটা আল্লাহর হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি যাকে চান সঠিক পথে নিয়ে আসেন আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে সঠিক পথে আনার কেউ নেই।' –সূরা যুমার (৩৯) : ২৩

এই সুসংগতি ও সামঞ্জস্যই প্রমাণ করে কুরআন কোনও মানুষের রচনা নয়; বরং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কালাম।

কুরআন মাজীদে এ ছাড়াও আছে নবী-রাসূলগণের মানুষ হওয়া এবং ফিরিশতা বা অতিমানবীয় কোনও সৃষ্টি না হওয়ার প্রমাণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও যে একজন মানুষই ছিলেন তার দলীল, নবীগণের মা'সূম ও নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ, ফিরিশতা ও জিন্ন জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ, মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর জ্ঞানের অসীমত্বের প্রমাণ, আছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ বিকৃত হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্যসহ আরও অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দলীল। এ কারণেই এ গ্রন্থকে দলীল ও প্রমাণ নামে অভিহিত করে এর প্রতি পূর্ণ আস্থা সহকারে ঈমান আনার ডাক দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا.

'হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো পাঠিয়ে দিয়েছি, (যা পথকে) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে।' –সূরা নিসা (৪) : ১৭৪

হাকীম : জ্ঞানগর্ভ কিতাব

কুরআন মাজীদ তার পরিচয় দিতে গিয়ে কখনও কখনও হাকীম অভিধাও ব্যবহার করেছে, অর্থাৎ হিকমতপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কিতাব। যেমন ইরশাদ হয়েছে– تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

'এসব হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।' –সূরা ইয়ূনুস (১০) : ১

সূরা ইয়াসীনের শুরুতে আছে–

يس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

'ইয়া-সীন। হিকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ!

নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের একজন।' —সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ১-৩

অন্যত্র আছে— ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

'(হে নবী!) এসব এমন আয়াত ও সারগর্ভ উপদেশ, যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।' —সূরা নিসা (৪) : ৫৮

বস্তুত কুরআন এক অথৈ জ্ঞানভাণ্ডার। এতে রয়েছে বহু বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্বের সমাহার। কেউ যখন গভীর মনোযোগ ও অভিনিবেশের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে তার সামনে জ্ঞানের নতুন-নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে আর একে-একে সে ঢুকে পড়ে কৌতূহল নিবৃত্তির অজানা সব ভুবনে। তার ভেতর কখনও সে পায় আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর বিভিন্ন গুণ-সিফাতের সন্ধান, কখনও পায় বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত। কখনও সে আল্লাহর বিভিন্ন রহমত ও আশিসের বিবরণ দেখে মনে ভরসা পায় আবার কখনও আযাব-গযবের বিবৃতিতে প্রকম্পিত হয়। একবার সে তার করণীয় কাজের নির্দেশনা পায়, পরক্ষণেই উপদেশ ও নসীহতের ভুবনে হারিয়ে যায়। কি না আছে এই কুরআনে! অদৃশ্য জগতের অভাবনীয় সব অবগতি, যেখানে মানুষের অনুসন্ধানী সব তৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কুরআন না জানালে কিভাবে মানুষ হাশর, মীযান, কাওছার, জান্নাতের অকল্পনীয় ব্যবস্থাপনা ও জাহান্নামের বিভীষিকাময় শাস্তির খবর পেত? ফিরিশতাদের বহুমুখী কার্যক্রম, মানব-সৃষ্টির সূচনা, আদম আ. ও ইবলীসের ঘটনা, পৃথিবীতে মানুষের আগমন-প্রক্রিয়া, নবী-রাসূলগণের আগমন, তাদের দাওয়াতী মেহনত, তাতে সজাতির প্রতিক্রিয়া, অবাধ্যদের পরিণাম, বিভিন্ন আসমানী কিতাবের অবতরণ, তার শিক্ষা, মানুষ-কর্তৃক তার বিকৃতিসাধন ও অপব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিশুদ্ধ তথ্য আমরা কুরআনের সুবাদেই জানতে পারছি। কুরআন আরও জানায় ভবিষ্যতের অজানা যত কথা, ইয়াজুজ-মাজুজের নৈরাজ্য, দাব্বাতুল-আরদের আত্মপ্রকাশ, হযরত 'ঈসা আ.-এর পুনরাগমন এবং এমন এক চরম নির্দেশনার কথা, যার পর আর কারও তাওবা কবূল হবে না। সবচে' বড় কথা কুরআন আমাদের সামনে পেশ করে বিশুদ্ধ জীবন-প্রণালি। কি সে জীবন-প্রণালি?

আল্লাহর 'আবদ ও বান্দা হিসেবে ইহজীবন কিভাবে যাপন করতে হবে তার মৌল নীতিমালা এবং অনেকটা শাখাগত বিষয়ও কুরআন আমাদের শিক্ষাদান করে। কুরআনের সেই শিক্ষা অতি পূর্ণাঙ্গ, যথোপযোগী ও অপরিবর্তনীয়। কুরআন নাযিল হয়েছে 'আলিমুল-গায়ব ওয়াশ-শাহাদা— সর্বজ্ঞানী খালেক ও মালিকের পক্ষ হতে। কোন্ বিধান কী মাত্রায় প্রযোজ্য, কোন্ কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং কোন্ কাজ অমঙ্গলজনক তা তারচে' ভালো আর কে জানবে? সুতরাং সেই অনুপাতে প্রয়োজনীয় সব বিধান ও হিদায়াত নাযিল শেষে ঘোষণা করে দিয়েছেন—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি'আমত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।' —সূরা মায়িদা (৫) : ৩

এ আয়াতের আগে-পরে আছে শরী'আতের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি। তার মধ্যে হালাল-হারাম খাদ্যের সুস্পষ্ট নির্দেশনা, সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচারের আদেশ, বিবাহে বৈধাবৈধের হিদায়াত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের নিয়মাবলী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারা কুরআনেই এ জাতীয় আরও বহু বিধান এবং এর বাইরে পরিবারব্যবস্থা, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, সমরনীতি, অপরাধ ও দণ্ডবিধি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিরক্ষা এবং সরকার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কুরআন আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে যে জবরদস্ত শিক্ষাদান করেছে, তাও তার এক মহামু'জিযা। ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র শিরোনামে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আপাতদৃষ্টিতে কুরআন এক বৃহদায়তন গ্রন্থ, কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও পূর্ণাঙ্গতার দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় এ যেন কুঁজোর ভেতর সাগর ঠাসা। অল্প বয়ানে বিস্তর মর্মের পরিবেশনা কুরআনেরই বিশেষত্ব। 'আকাইদ-আহকাম ও মাওয়া'ইজের মহা আয়োজনের অন্তরালে আরও যে অথৈ জ্ঞানভাণ্ডার এর ভেতর লুক্কায়িত আছে, সেই ফল্গুপ্রবাহের বিশ্ময় কোনওদিন ফুরাবার নয়। এর প্রথম ব্যাখ্যাতা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে কর্ম ও উক্তির বিপুল সম্ভারের মাধ্যমে সেই প্রবাহের যে গতিমুখ খুলে দিয়েছেন, তারপর যুগে-যুগে শতশত ফকীহ, মুফাসসির ও অন্তরালোকসম্পন্ন সূফী-সাধকগণ তার থেকে জলোত্তোলন করে চলেছেন, আজও সমানে সেই আহরণ-প্রক্রিয়া চলছে এবং একইভাবে অনাগত ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকবে বিরামহীন, কিন্তু কোনওকালে কারও বলার অবকাশ হবে না যে, এর ভেতর কৌতূহল-নিবৃত্তির আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

আল্লাহর অন্তহীন 'ইলম থেকে যেই কালাম উৎসারিত, তার অন্তর্নিহিত বাণী-বার্তা ফুরাবেই বা কি করে? তিনি যে বাণীর সাথে নিজ জ্ঞান-নির্ঝরের

যোগসূত্র বর্ণনা করতে গিয়ে জানান–

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

'বস্তুত আমি তাদের কাছে এমন এক কিতাব উপস্থিত করেছি, যার ভেতর আমি (আমার) জ্ঞানের ভিত্তিতে (প্রতিটি বিষয়ের) বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। যারা ঈমান আনে, তাদের পক্ষে এটা হিদায়াত ও রহমত।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ৫২

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

'আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্য হয় হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।' –সূরা নাহল (১৬) : ৮৯

আরও বলেন–

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

'এটা এমন কোনও বাণী নয়, যা মিছামিছি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ।' –সূরা ইয়ূসুফ (১২) : ১১১

এবং আরও বলেন–

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'বলে দাও, এটা (এই বাণী) তো নাযিল করেছেন সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত রহস্য জানেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' –সূরা ফুরকান (২৫) : ৬

সেই কিতাব তো অফুরন্ততার এক চিরবিস্ময়ই হয়ে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ কালাম নাযিলের পর হুকুম দেন– وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

'তোমার প্রতিপালকের এই মহা নি'আমত (কুরআন ও হিদায়াত)-এর বিবরণ দিতে থাক।' –সূরা দুহা (৯৩) : ১১

এবং নবুওয়াতী পদের দায়িত্ব জানিয়ে দেন–

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

'যাতে তুমি মানুষের সামনে সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।' –সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

অনন্তর তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে দিতে থাকলেন এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। গড়ে উঠল বিশাল হাদীছভাণ্ডার, সংকলিত হল বিপুলায়তন হাদীছগ্রন্থসমূহ। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন ও তাদের উত্তরসূরীগণ এর অতলান্ত আধার থেকে মণি-মুক্তা সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকলেন, তৈরি হল শত-শত তাফসীরগ্রন্থ, হাজারও ফিকহীগ্রন্থ, গড়ে উঠল কালামশাস্ত্র, অস্তিত্বলাভ করল নতুন-নতুন শাস্ত্র, দৃষ্টিতে প্রসারতা আসল, চিন্তার দিগন্ত খুলল, সামর্থ্য বাড়তে থাকল, উপকরণে মাত্রাযোগ হয়ে চলল, কিন্তু সাগর যথারীতি কূল-কিনারাহীন সাগরই রয়ে গেল। কেনই বা থাকবে না–

فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

'আল্লাহ তো গুপ্ত ও গুপ্ততম সবই জানেন। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। সমস্ত উত্তম নাম (যা-কিনা সমস্ত উত্তম গুণের পরিচায়ক) তাঁরই।' –সূরা ত্বা-হা (২০) : ৭-৮

সুতরাং ব্যক্তের অন্তরালে সেই ব্যক্তের অনুকূল যে আরও কত অব্যক্ত রহস্য ও গুপ্ত তত্ত্ব নিহিত থাকবে, তার তো কোনও সীমা-পরিসীমা থাকার কথা নয়।

হাঁ এই সারগর্ভ কিতাব তার গর্ভে ধারণ করে অনিঃশেষ রহস্য। আপন-আপন সামর্থ্য অনুযায়ী তার সন্ধানীরা তত্ত্বোদ্ঘাটন করতে থাকবে, নিজ-নিজ পাত্র অনুযায়ী প্রত্যেকে সুধা ভরতে থাকবে, নিরাশ সে করবে না কাউকে। এটাও কুরআনের এক বিস্ময় যে, তার জ্ঞানভাণ্ডার সকলেরই জন্য অবারিত। অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির লোকও যেমন নিজ বুঝ-সমঝ অনুযায়ী জ্ঞানের খোরাক এর ভেতর পেয়ে যায়, তেমনি গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তিও যখন তার সন্ধানী দৃষ্টি দ্বারা এর তত্ত্ব-রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে, এ জ্ঞানাধার তারও চাহিদামত ঠিক-ঠিক জোগান দিয়ে দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরমোৎকর্ষের যুগেও কুরআনের এই অলৌকিকতা যথারীতি বহাল আছে। আল্লাহ তা'আলার ভাষায় এর দৃষ্টান্ত হল–

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

'তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন-আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্লাবিত হয়েছে।' –সূরা রা'দ (১৩) : ১৭

বরং বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এর জ্ঞান-রহস্য আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। আধুনিক গবেষণার ফলে মানুষ এর গুপ্ত সৌন্দর্যের অনেক কিছুই নতুনভাবে জানতে পারছে এবং তার ফলে বিশ্বের জ্ঞান-গবেষণার অঙ্গনে কুরআনের আবেদন আরও ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

একথা ঠিক যে কুরআন কোনও বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়। বরং কুরআনী জ্ঞান-বিদ্যার সামনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বিদ্যা কোনও বিষয়ই নয়। বিজ্ঞানের কাজ-কারবার তো কেবল মানুষের দেহজ চাহিদা নিয়ে আর তার দৌড়-ঝাঁপের অঙ্গন কেবলই প্রত্যক্ষ জগৎ, বস্তু ও জড়জগৎ, যে জগৎ বিজ্ঞান ছাড়াও বেশ চলতে পারে। একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের ফলে চলাটা সুবিধাজনক হয়েছে এবং সে সুবিধা বহুমাত্রিকও বটে (অসুবিধার দিকটা না হয় এড়িয়েই যাওয়া হল) কিন্তু কুরআন যেই জ্ঞান সরবরাহ করে

মৌলিকভাবে তার সম্পর্ক মানুষের আত্মা ও অদৃশ্যজগতের সাথে। সে জগতে কুরআনী জ্ঞান ছাড়া মানুষ সম্পূর্ণ অচল এবং সেই জগতের সচলতা ছাড়া মানুষের কোনও মানবিক মূল্য থাকে না। সে তখন অন্যান্য জীব-জন্তুর কাতারে চলে আসে।

তারপর কুরআন প্রসঙ্গক্রমে মাঝে-মধ্যে এমন-এমন তত্ত্ব দিয়ে রেখেছে এবং ইশারায়-ইঙ্গিতে বা গৌণভাবে এমন-এমন কথা বলেছে, আধুনিক আবিষ্কারসমূহ দ্বারা যার মর্ম অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'এবং ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরোহণ করতে পার এবং তা তোমাদের শোভা হয়। তিনি সৃষ্টি করেন এমন বহু জিনিস, যা তোমরা জান না।' –সূরা নাহল (১৬) : ৮

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এমন বহু বাহন আছে, যে সম্পর্কে এখন তোমাদের কোনও জ্ঞান নেই। এভাবে এ আয়াত আমাদের জানাচ্ছে, যদিও বাহন হিসেবে এখন তোমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাই ব্যবহার করছ, কিন্তু ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা নতুন-নতুন বাহন সৃষ্টি করবেন। সুতরাং কুরআন নাযিলের পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যেসব বাহন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন মোটরগাড়ি, বাস, রেল, উড়োজাহাজ, স্টিমার ইত্যাদি কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত আরও যা-কিছু আবিষ্কৃত হবে তা সবই এ আয়াতের মধ্যে এসে গেছে। আরবী ব্যাকরণের আলোকে এ আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যায়– "তিনি এমনসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যে সম্পর্কে তোমরা এখনও জান না।" এ তরজমা দ্বারা বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়। –তাওযীহুল কুরআন

এমনিভাবে কুরআন বলছে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

'আমি আমার নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাব বিশ্বজগতেও এবং খোদ তাদের অস্তিত্বের ভেতরও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য। তোমার প্রতিপালকের একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সকল বিষয়ের সাক্ষী?' –সূরা ফুসসিলাত (৪১) : ৫৩

আধুনিক মহাকাশ গবেষণা এবং সৌরজগৎ, গ্যালাক্সি, দৈত্যাকার গ্রহ-নক্ষত্রের আবিষ্কার, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রের গতির পরিমাপ, আলোকবর্ষীয় হিসাব-নিকাশ নিরূপণ প্রভৃতি দ্বারা এ আয়াতের মর্ম বেশি স্পষ্ট হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ

'এবং এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের প্রতিপালক।' –সূরা নাজ্‌ম (৫৩) : ৪৯

জ্যোতির্বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য তের লক্ষ গুণ বড় আর 'শি'রা' বা লুব্ধক নামক নক্ষত্রটি তারও বড়। এর দ্বারা আয়াতটির মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

উদাহরণ আরও দেওয়া যায়, কিন্তু ধারণালাভের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তবে এর মানে এ নয় যে, কুরআনী হিদায়াত লাভের জন্য আমাদেরকে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হবে; বরং নিজ আবিষ্কারের কল্যাণ রক্ষা এবং তার উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানই কুরআনী হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। আর বিজ্ঞানের যে অংশ কেবলই তাত্ত্বিক, যা চাক্ষুষ প্রমাণ-নির্ভর নয়, তার শুদ্ধাশুদ্ধি তো কেবল কুরআন দ্বারাই নির্ণিত হতে পারে। চরম সত্য কেবল কুরআনই এবং কুরআনই যাবতীয় সত্যের মাপকাঠি। কথা কেবল এতটুকু যে, কুরআন অসীম তত্ত্ব-রহস্যের ধারক। তার কোনও কোনও তত্ত্ব বা ইঙ্গিত আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষিত অংশটুকু দ্বারা আমরা সহজে বুঝতে পারি। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কুরআনের সত্য বোঝার সহায়ক মাত্র, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি নয়। বিজ্ঞান যত উৎকর্ষই সাধন করুক না কেন, সর্বাবস্থায় তা মানুষেরই জ্ঞান। আর মানবজ্ঞান কখনওই কুরআনকে টপকাতে পারে না। হাঁ মানুষের জ্ঞান যত বাড়বে, তার সহায়তায় কুরআনের রহস্য ততই উদ্‌ঘাটিত হবে।

স্মর্তব্য যে, সাধনা-গবেষণা দ্বারা যে নিত্য-নতুন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তার সম্পর্ক কখনওই কুরআনী 'আকাইদ ও আহকামের সাথে নয়; বরং বিধানাবলীর হিকমত ও রহস্য, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতির সংগে। 'আকাইদ ও বিধানাবলীতে নতুন কিছু উদ্‌ঘাটনের অবকাশ নেই। ইসলামের শুরু যমানায় তা যেমন ছিল, আজও আমাদেরকে সেখানেই থাকতে হবে। তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। কেননা কুরআনের মূল বিষয় সেটাই। আহকাম ও 'আকাইদের পথনির্দেশ করার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে, আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায়ই তা পরিষ্কার ও পূর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

'গোমরাহী থেকে হিদায়াত পরিস্ফুট হয়ে গেছে।' –সূরা বাকারা (২) : ২৫৬

হিদায়াতের ভেতর কুরআন কোনওরূপ অস্পষ্টতা রাখেনি। দ্বীন ও শরী'আতকে সে শুভ্র-সমুজ্জ্বলরূপে উপস্থাপন করেছে, যার দিনরাত সমান আলোকিত–

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ

'ফলে যার ধ্বংস হওয়ার, সে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হয় আর যার জীবিত থাকার, সেও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই জীবিত থাকে।' –সূরা আনফাল (৮) : ৪২ ●

কোরআনের সংস্পর্শ ছাড়া মানবজনম অর্থহীন

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

নশ্বর এ পৃথিবীতে আল্লাহর অবিনশ্বর কালাম আলকোরআন। আল্লাহ যেমন অনাদি তাঁর কালাম বা বাণীও তেমনই অনাদি। মহাগ্রন্থ আলকোরআন অমর অজর অব্যয় অক্ষয় এক মহাবিস্ময়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"আমি এই আমানত (পবিত্র বাণী বহনের গুরুভার) দিতে চেয়েছিলাম আকাশমণ্ডলী, ভূমণ্ডল ও পর্বতমালাকে। কিন্তু তারা এ আমানত বহনে স্বীকৃত হলো না। অতপর এটি বহনে নিয়োজিত হয় মানুষ। নিঃসন্দেহে তারা এক ধরনের অমিতাচারী ও অজ্ঞ।"–সূরা আহযাব : ৭২

পবিত্র কোরআন নিজেই তার পরিচয়। এর বাণী, মর্ম, আহ্বান ও আবেদন তুলনারহিত। পৃথিবীর মানুষের সাধ্য কী কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করে! একে বোঝাই যেখানে ভার ব্যাখ্যা সেখানে কত কঠিন! পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন–

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"যদি আমি এ কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তোমরা দেখতে পেতে যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত কম্পিত হয়ে পর্বতটি বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এসব উপমা আমি দিয়ে থাকি যেন মানুষ ভাবনাচিন্তা করে।"–সূরা হাশর : ২১

আল্লাহ যেমন বড়, তাঁকে চেনা, বোঝা ও পাওয়া যেমন কঠিন তাঁর কালামও এমনই হত, যদি না তিনি দয়া করে মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। সূরা আররহমানে বলা হয়েছে–

الرَّحْمَٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

"পরম করুণাময় মহান আল্লাহ, শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ।"–সূরা আররহমান : ১৪

অতীতের যত আসমানী গ্রন্থ সবই দুরাচারী মানুষ কর্তৃক বিকৃত হয়ে গেছে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক এসবে প্রবিষ্ট হয়েছে অনেক অপলাপ। কালের বিবর্তনে ভাষার প্রবাহে এসব হয়ে গেছে মানুষের দুর্বোধ্য। এ তিনটি সঙ্কট থেকেই পবিত্র কোরআন চির বিমুক্ত।

মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।"–সূরা হিজর : ৯

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

"কোন মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না, সামনে দিয়েও না, পেছন দিয়েও না। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" সূরা হা মীম সাজদাহ : ৪২

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, উপদেশ গ্রহণ করার মত কেউ কি আছে?"–সূরা কামার : ১৭

এ যে মানুষের রচনা নয়, নয় সৃষ্টি। কথা, কবিতা, কল্পিত সাহিত্য কিংবা জ্ঞানের অর্জনও নয়। এ হচ্ছে মহান আল্লাহর অনুপম অতুলনীয় বাণী। কেউ যেন কোন দিন কোরআন নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার না হয়, এর সাথে জ্ঞান, গবেষণা, প্রতিভা বা সৃজনশীলতার উপর ভর করে পাল্লা না দেয় সে জন্য মহান আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন–

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"এ কিতাব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হলে লোকেরা এর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি পেত।"–সূরা নিসা : ৮২

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে এর অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে আস আর তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে অন্য সকল সাহায্যকারীকে ডাক। যদি তোমরা না পার, বস্তুত তোমরা পারবেও না। তাহলে তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।"–সূরা বাকারা : ২৩, ২৪

মানুষ যখন আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে করে গাফেল হয়ে যায়, আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, অকৃতজ্ঞ হয়, অবিশ্বাস শুরু করে, শিরক ও

কুসংস্কারে আক্রান্ত হয়, পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয় তখন সতর্ককারী নবী-রাসূল আসেন। অতীতে এমনই নিয়ম ছিল। যে যুগে মানুষ তাদের যে কৃতিত্বটি সম্বল করে দম্ভ অহঙ্কারের শিকার হত, দেখা গেছে সে যুগের নবী এরচেয়ে শক্তিশালী নতুন কিছু কৃতিত্ব নিয়ে তাদের মাঝে এসে হাজির হয়েছেন। তারা যতই দক্ষ ও পারঙ্গম হোক নবীর আনা চমকটির সামনে তারা হয়ে যেত অসহায়। তাদেরকে অক্ষম করে দেয়া এ বিষয়গুলোকেই বলা হত মুজিযা। অতীতে যাদুবিদ্যার উৎকর্ষের সময় মুজিযা নিয়ে আগমন করেন হযরত মুসা আ., যার লাঠি সাপ হয়ে গিলে ফেলে সে যুগের সকল যাদু। হযরত ঈসা আ. এলেন জীবনদায়ী সুস্থতা নিয়ে, তার যুগে চিকিৎসা শাস্ত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ যামানায় দুনিয়ায় এলেন প্রথমত কাব্য ও কথাসাহিত্যে বিশ্বসেরা গর্বিত আরব জাতির কাছে। দুনিয়ার অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল সাহিত্যের দর্প চূর্ণ করে দিতে তাঁর মুজিযা স্বরূপ নাযিল হল পবিত্র কোরআন। জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস ও দর্শনের গৌরবও চিরতরে ম্লান করে দিল এই কোরআন। বলা হল–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এটি এমন কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।"–সূরা বাকারা : ২

আরবের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিরা বিশেষ করে কাবাগাত্রে ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তকের দাম্ভিক রচয়িতা ও বোদ্ধারা নির্বাক হয়ে কোরআনের অলৌকিকত্ব মেনে নিয়ে নিজেরাই পরাজয় স্বীকার করে নিল। উপরন্তু কাবাগাত্র থেকে তাদের কথাকাব্য নিজেরাই অপসৃত করে ঘোষণা দিয়েছিল যে–

ليس هذا كلام البشر

এটা কোন মানুষের বাণী নয়।

শুধু তাই নয়, মহানবীর সময় থেকে তার নবুওয়তের সময়সীমা তথা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির সমুদয় জ্ঞান সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে এই কোরআন বলে দিয়েছে, মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য নাযিলকৃত এক অদ্বিতীয় উপমারহিত এই কিতাবই বিশ্বমানবের চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ উৎসগ্রন্থ–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যারূপে; মুসলমানদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।"–সূরা নাহল : ৮৯

মানুষ মনে করে কোরআনে কোন খুঁত বা বৈপরীত্য বের করবে। যেমন, মক্কার অবিশ্বাসীরা একসময় বলল। কোরআনে বলা হয়েছে–

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

"কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"–সূরা শুআরা : ১৯৫

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"এ কোরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।"–সূরা ইউসুফ : ২

কিন্তু কোরআনে আমরা এমন কিছু শব্দ দেখতে পাই যেগুলো সমকালীন আরবরা বলে না বা বোঝে না। তা হলে بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ কীভাবে হল? তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাযি. পল্লীএলাকা থেকে একজন বয়োবৃদ্ধ আরব বেদুঈনকে খবর দিয়ে আনালেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রশ্নকর্তারা গোটা কোরআন শরীফ ঘেঁটে كبار ،عجاب ،هزوا এ তিনটি শব্দ বের করেছিল। বলেছিল, এ শব্দ তিনটি সমকালীন আরবে প্রচলিত নয়। তা হলে কোরআন কী করে বলল যে, সেটি পরিচিত আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। হযরত উমরের আহ্বানে যখন বৃদ্ধ লোকটি মরুভূমির তীব্র খরতাপে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তার মজলিসে প্রবেশ করলেন এবং বসতে উদ্যত হলেন তখন তিনি বৃদ্ধকে বললেন, এখানে নয় ঐপাশে গিয়ে বসুন। যখন বৃদ্ধ উমরের কথামত ওখানে গিয়ে বসতে চাইলেন তখন তিনি বললেন, না না ওখানেও নয় ওইদিকে গিয়ে বসুন। বৃদ্ধ নির্দেশিত স্থানে বসা শুরু করতেই উমর রাযি. পুনরায় বললেন, না না সেই দিকে নয় আমার কাছে এসে বসুন। এসব শুনে বৃদ্ধ কিছুটা বিরক্ত হয়ে উমরের উদ্দেশে বললেন–

يا أمير المؤمنين أتخذني هزوا وأنا شيخ كبار والله هذا لشيء عجاب.

এ কথাটি বলামাত্রই হযরত উমর বৃদ্ধকে বুকে টেনে নিলেন। উপস্থিত সাহাবীরা উমরের এ বুদ্ধিমত্তায় প্রীত হলেন। তারা বেদুঈনবৃদ্ধের এ বাক্য থেকে যুগপদ কোরআনের দাবি প্রমাণিত এবং প্রশ্নকর্তার দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রাপ্ত হওয়ায় খুব আনন্দিত হলেন।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে হীনম্মন্য কিছু মুসলমানও বিভ্রান্তির শিকার যারা নিজের মত করে কোরআনকে পেতে চান। যাকে ইসলাম 'তাফসীর

বিরবায়' নামে চিহ্নিত করেছে। কারণ, কোরআনের ভাষা যেমন আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ, এর অর্থ মর্ম ও আবেদনও তাঁরই নির্দেশনায় কোরআনের ধারক ও বাহক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ। সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.সহ বড় বড় সাহাবী কোরআনের প্রধান ব্যাখ্যাতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকেই এসব লাভ করেছেন। নতুন করে কোরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ও অবকাশ খুব সামান্যই রয়েছে। নতুন কিছু করতে চাইলে এর প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি মেনেই করতে হবে। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে পবিত্র কোরআনের বাস্তবরূপ, তিনি কোরআনের মুল শিক্ষক, ব্যাখ্যাতা ও বাস্তবায়নকারী। কোরআন ও রাসূল উভয়ে উভয়ের সম্পূরক, যা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। কিতাব এবং রিজাল নীতির দৃষ্টান্ত।

মানুষ নিজে যা অপরকেও তাই মনে করে, এটি মানুষের সহজাত স্বভাব। কোরআনের ক্ষেত্রেও অনেকে এই স্বভাবের শিকার। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নববী মূলনীতি ও দীনী ইলমের মাধ্যমে অর্জিত মননশীলতা না থাকার কারণে কোরআনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই মনে করে ভুল করতে পারে। রাজনীতিক বা সশস্ত্রবিপ্লবের প্রবক্তা ব্যক্তি মনে করতে পারে কোরআন রাজনীতি ও সশস্ত্র বিপ্লবের বই। বিজ্ঞানী ভাবতে পারে কোরআন বিজ্ঞানগ্রন্থ, দার্শনিকের কাছে দর্শনের কিতাব। সাহিত্যিক মনে করতে পারে এটি সাহিত্যগ্রন্থ। ইতিহাসবিদের চোখে কোরআন ইতিহাসের মহান দিশা। ধার্মিকের নজরে এটি ধর্মগ্রন্থ। অধ্যাত্মবাদী পাঠকের মনে হবে এ যেন সাধনার বই। আইনজ্ঞের জন্য এটি মহান আইনগ্রন্থ। বিধায়কের বিবেচনায় এটি বিশ্বসংবিধান, প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানা দিক কোরআনে বিবৃত– আছে ভূগোল, জীব, জড় ও পদার্থবিজ্ঞান। আছে খোদাতত্ত্ব, পারলৌকিক জীবনের বিশদ বর্ণনা। আগ্রহীরা একে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যে কোন সাবজেক্টের কিতাব বলে দাবি করে বসতে পারে। কিন্তু আসলে কোরআন কী, কোন সাবজেক্টের কিতাব? এর জবাব আমাদের পেতে হবে কোরআন থেকেই। তালাশ করতে হবে কোরআনের ধারক ও মহান শিক্ষক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– كان خلقه القرآن মহাগ্রন্থ আলকোরআনের বাস্তবরূপই ফুটে উঠেছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র ও আদর্শে। কোরআনই ছিল তাঁর চরিত্র ও আদর্শ।

আসুন, কোরআন থেকে আল্লাহর বাণীতে শুনে নিই কোরআনের পরিচয়, কোরআনের সাবজেক্ট।

هُدًى لِّلنَّاسِ মানবজাতির হেদায়াতের কিতাব। আলকোরআন হচ্ছে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত। একে যে যার ইচ্ছা ও রুচি মাফিক বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থ বলে পরিচিত ও আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। এর পরিচয় আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, এ হচ্ছে মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার জবাব।

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ সংশয়, সন্দেহ ও দোদুল্যমানতার নিরসন। নিরাময় ও রহমত, কৃপা ও করুণা, সতর্কতা ও স্মরণিকা, পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা, শিফা, যিকর, হুদা। দলীল, প্রমাণ, নিদর্শন, উপদেশ ও প্রজ্ঞা। বাসায়ের, বুরহান, মাউযিযা, হুজ্জত, ইলম ও হিকমাহ।

যদিও কোরআনের বৈশিষ্ট্য মুমিনের বিশ্বাসের দ্বারাই সমুজ্জ্বল এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানদারের চেতনার আলোয় প্রজ্জ্বলিত তথাপি সকলের জ্ঞাতার্থে পবিত্র কোরআনের কিছু অসাধারণ অনন্যতা তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন, কোরআন গদ্য বা পদ্য কোন রীতিই সর্বাংশে অনুসরণ করেনি। অসংখ্য এমন বিষয় কোরআনে অবতারণা করা হয়েছে যে সম্পর্কে মানুষ দেড় হাজার বছর আগে তো জানার প্রশ্নই ওঠে না, গত দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ বছর আগেও তারা এসব বিষয়ে কিছুই জানত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাতৃগর্ভে সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত, পৃথিবী ও সৌরজগতের গতি, মানবদেহের ত্বকের অনুভূতি প্রবণতা, পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ও বহির্মুখিতা, লোহার অবতীর্ণ হওয়া ও গতিশীলতা, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, জীবনোপকরণ ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। অতীতের সকল ধর্মগ্রন্থ তা আসমানী বলে খ্যাত হোক আর মানবরচিতই হোক এর কোনটিই উন্নত আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে টেকে না। কিন্তু একমাত্র কোরআনই এর ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের নির্ভুল কোন উদ্ভাবন ও অনুসন্ধানই কোরআনের বর্ণিত বাস্তবতার বিপরীত হতে পারে না। কেননা বিজ্ঞানময় এই কোরআন যার বাণী, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহই বিজ্ঞানের স্রষ্টা। সৃষ্টিজগৎ তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি, অঙ্ক, নিখুঁত পরিমাপ ও অবধারিত পরিণতি নির্ধারণ করেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব বিজ্ঞান ও দর্শনের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হচ্ছে স্রষ্টার বাণী পাক কোরআন।

পবিত্র কোরআন সাত সমুদ্রের চেয়েও বড়। আকাশ ও পৃথিবীর চেয়েও বিশাল। এর একটি

হরফে দশটি করে নেকি, তা বুঝে হোক বা না বুঝে হোক। পবিত্র কোরআন কবরে মুমিনকে সঙ্গ দেবে, সাহস দেবে এবং পরকালে শাফাআত করবে। কোরআন হেফজকারী, চর্চাকারী, এর উপর আমলকারী রোজ হাশরে নিরাপদ থাকবে, সম্মানিত হবে, ঊর্ধ্বারোহণ করবে, অপরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

মুমিনের প্রার্থনা হওয়া উচিত যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রাতদিন অধিক হারে তোমার কালাম তেলাওয়াত করার তাওফীক দান কর। আমাদের কবরের অস্বস্তি কোরআনের পরশে বিদূরিত কর। কোরআন যেন সব বিপদে ঢাল হয়ে দাঁড়ায়, যেন এ কিতাব হয় আমাদের জন্য মুক্তির দলীল ও সুপারিশকারী।

যারা কোরআনের স্বরূপ সম্পর্কে জানেন তারা তেলাওয়াতের সময় মনে করেন যে, আল্লাহ যেন তাদের বলছেন, পড়তো আমার কিতাব, দেখি কেমন পার। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নিজের কণ্ঠের উত্তম ব্যবহারে কোরআনকে সুন্দররূপে পাঠ কর। অনেক ভক্ত কোরআনপ্রেমিক কোরআনকে তার নিজের প্রতি মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ বার্তা হিসেবেই পাঠ করে থাকেন। তাদের কানে যখন কোরআনের বাণী পৌঁছে তখন তারা অভিভূত হন। তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস বেড়ে যায়। কোন আয়াত তাদের শরীরকে রোমাঞ্চিত করে। তাদের অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়। হৃদয়ের আবেগ অশ্রু হয়ে ঝরে। তারা সেজদায় নত হন, বিনয়ে হন গভীর আনত। তাদের গোটা অস্তিত্বটুকু নিঃশেষে নিবেদিত হয় আল্লাহর নৈকট্য ও আনুগত্যে, প্রেম ও সান্নিধ্যে, পরিচয় ও প্রাপ্তিতে। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"মুমিন তারাই যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর কম্পিত হয়, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই ভরসা করে।"–সূরা আনফাল : ২

কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক হওয়া উচিত পরম আরাধ্য মাওলার কথা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি একজন উৎহৃদয় বান্দার আবেগঘন সম্পর্ক ও ভক্তিশ্রদ্ধার মত। তাছাড়া এ পৃথিবীতে আর আছেই বা কী? পৃথিবী মহাসৃষ্টির তুলনায় বিশাল প্রান্তরে একটি ছোট্ট মুদ্রার চেয়েও ক্ষুদ্র। মহান স্রষ্টার সাথে পৃথিবীবাসীর কোনই যোগসূত্র থাকবে না যদি তাঁর কালাম না থাকে। যদি নবুওয়্যত ও রিসালাতের মাধ্যম না থাকে। এজন্যই আল্লাহ কোরআনকে তাঁর রজ্জু বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"–সূরা আলে ইমরান : ১০৩

এক মনীষী বলেছেন, আলকোরআন আমার দৃষ্টিতে এমন একটি জানালা যার মাধ্যমে আমরা পরকাল দেখতে পাই।

আদি থেকে অস্তিত্ববান মহাবিজ্ঞানময় সুনিবদ্ধিত ও সুরক্ষিত ফলকে অঙ্কিত এই কিতাব এত কিছুর পরেও অদ্ভুত রকম মানবিক ও পার্থিব। এভাবে বলা শোভনীয় নয় জেনেও বোঝাবার জন্য বলতে হয়, সুপার ডিজিটাল হওয়ার পাশাপাশি একই সাথে নর্মাল ও ম্যানুয়াল। এই কিতাব যখন নাযিল হয় তখনকার নৈমিত্তিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলে, প্রশ্ন এলে জবাব দেয়, নতুন সমস্যার সমাধান দেয়; জীবন, জগৎ, ঘটনার ঘনঘটা সবই ছুঁয়ে যায়। একদিকে এতে যেমন অতীত ইতিহাস বিবৃত হয়, তেমনি অপর দিকে বিধৃত হয় ভবিষ্যদ্বাণী। আয়াত ও সূরা লিখিত কাগজ বা ফলক আকারে নয়, অবতীর্ণ হয় উচ্চারণ ও পাঠরূপে। অঙ্কিত হয় মানবীয় স্মৃতিপটে। এরপর মানবিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় বিশ্বস্ত উপায়ে। বিস্ময়কর এ কিতাব পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ যা মানুষ মুখস্থ করতে পারে, রাখতে পারে এবং আজীবন পুনরাবৃত্তি করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, আয়াত, যের, যবর, পেশ, এমনকি বিন্দু বা নুকতা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত; যেমন অবিকৃত এর মর্ম, বোধ, বিধান ও আবেদন। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।"–সূরা হিজর : ৯

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

"কোন মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না, সামনে দিয়েও না, পেছন দিয়েও না। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।"–সূরা হা মীম সাজদাহ : ৪২

মুসলিম মনীষীগণ পবিত্র কোরআনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সংজ্ঞা, আলোচ্যবিষয়, অধ্যয়নের মূলনীতি ইত্যাদি বিশদ আলোচনা করেছেন। একথাও স্পষ্ট যে, কোরআনে পাকের প্রায় পাঁচশর মতো আয়াতই মাত্র আইন ও বিধান বিষয়ক আর বাকি সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি আয়াত কোরআনী অনন্য পদ্ধতিতে বর্ণিত হেদায়াত বিষয়ক।

(বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়)

কুরআন অনুধাবন : কিছু করণীয়

মাওলানা আবদুল মতিন

কুরআন কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী। সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মানুষের পথ-নির্দেশক। সকল উলূম ও মাআরিফ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ও আধার। ক্ষুধাহরা সুধারাশি। তৃষিত হৃদয়ের অমৃত সুধা। খোদা প্রেমে পাগলদের প্রেমাগ্নি নিবারণের প্রিয় শারাবান তাহূরা।

আল্লাহ নিজেই তার এই মহান বাণীকে রূহ ও নূর অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন। রূহ দ্বারা যেমন জীবনের চাকা ঘোরে, চাঞ্চল্য ও কর্মক্ষমতা আসে, তেমনি কুরআন দ্বারা জীবনের চাকা সঠিক পথে ঘোরে। এর অবর্তমানে মানুষ নির্জীব লাশে পরিণত হয়। কুরআন আলো। এর সঙ্গে যে কোনো শোগল-নিমগ্নতা, তেলাওয়াত, তরজমা ও তাফসীর পাঠ মানুষের অন্তরাত্মাকে করে আলোকিত। কিয়ামত ও পুলসিরাতের ঘনান্ধকারে আলো পেতে হলে এখনই কুরআনের আলো দিয়ে হৃদয় ভরতে হবে।

কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত, অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম সবই আপন আপন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনুধাবনের পর তেলাওয়াতে যে স্বাদ ও তৃপ্তি মেলে তা বর্ণনা করে বোঝাবার মতো নয়। এর সঙ্গে যদি আল্লাহর সঙ্গে ইশক ও প্রেমের সম্পর্ক থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক আলেম কুরআন অনুধাবনের যথাযথ গুরুত্ব আঁচ করতে পারছেন না। জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদরাসায় যখন তাফসীর বিভাগ খোলা হয়, তখন ঐ বিভাগে পড়ানোর যিম্মা এই অধমের উপরেও দেওয়া হয়েছিল। তখন অনেক ছাত্রের আলেম অভিভাবকের এমন মন্তব্য শুনে ব্যথিত হতাম যে, তাফসীর পড়ে কী লাভ হবে?

এ অধমের মূল বিষয় ছিল হাদীস ও উলূমুল হাদীস চর্চা। কিন্তু চৌধুরীপাড়া মাদরাসায় শিক্ষকতাকালে একটানা সাত বছর তাফসীরে জালালাইন পড়ানোর যিম্মাদারী এ অধমের উপর অর্পিত ছিল। হক আদায় করে পড়ানোর যোগ্যতা তো না সেকালে ছিল, না একালে। তথাপি কুরআন কারীমের যৎকিঞ্চিত অনুধাবন আমাকে এমনভাবে আকর্ষিত করেছিল যে, আমি আমার মূল বিষয়ের জন্য সময় সংক্ষেপ করে সারাটা সময় তাফসীর গ্রন্থাদি নিয়েই পড়ে থাকতাম। তাফসীর শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কিছু গ্রন্থ অধমের সেই সময়কারই সংগ্রহ। কাশশাফ, বায়যাবী, রূহুল মাআনী, তাফসীরে কবীর, ইবনে কাছীর, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন কৃত মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী ও মাওলানা মুফতী শফী রহ.। এ ছাড়া হাফেজ ইবনুল কায়্যিমের বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য মনীষীর লেখা বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর ডাইরীতে নোট করতাম ও পড়তাম। অল্পদিন পর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর মুশকিলাতুল কুরআন ও মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর তাফসীরে মাজেদীও সংগ্রহ করি। সে সময় এখান ওখান থেকে মুক্তা কুড়ানোর যে কী অপার আনন্দ পেতাম তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

অবশ্য এ আনন্দ লাভের বীজ বপিত হয়েছিল সিলেট গওহরপুর মাদরাসায় পড়াকালে। সে সময় কুরআনের প্রথম পনের পারা তরজমা পড়াতেন খাঁপুরী হুজুর। তিনি হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গওহরপুরী রহ.-এরও উস্তাদ ছিলেন। স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারতেন না। রিকশায় চড়ে আসতেন এবং আমাদের কুরআন তরজমার ক্লাস করে চলে যেতেন। এই অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটি মনে হয় কুরআন অনুধাবনের স্বাদ পেয়েছিলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও তাঁর কথা ছিল ঠাসঠাস। কুরআনের তরজমা বলার পর সংক্ষিপ্ত সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণ পেশ করতেন। জানতে পারলাম তিনি তরজমায়ে শাইখুল হিন্দের টীকা থেকে ঐ বিশ্লেষণ পেশ করেন। চরম আগ্রহ হল তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ সংগ্রহের। কিন্তু টাকার অভাবে এটি কেনাও ছিল দায়। বাধ্য হয়ে নিজের অতি কষ্টের সংগ্রহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আলকুরআনুল কারীম বঙ্গানুবাদ– যা তখন তিন ভলিউমে মুদ্রিত ছিল– এক সহপাঠীর নিকট বিক্রয় করে সিলেট শহর থেকে তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ খরিদ করলাম। সত্য বলতে কি, সে সময় তরজমায়ে শাইখুল হিন্দের অনেক টীকা পড়ে এতটাই আবেগ-আপ্লুত হতাম যে, পড়া থামিয়ে মাঝে মধ্যেই টীকাকারের জন্য এই বলে দোয়া করতাম, আল্লাহুম্মাগফির লাহু আল্লাহুম্মার হামহু– হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তার উপর রহম কর।

নিজের এসব দাস্তান শুনিয়ে লাভ কী, আসল কথায় আসা যাক। হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব একদিন ফোনে জানালেন, আলকাউসারের কুরআন সংখ্যা বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে একটা লেখা তৈরির জন্য আদেশ করলেন। কিন্তু আমার যে দশা তা কাউকে বোঝাতে পারি না। লিখতে বসলে কলম থেমে যায়। ভাব ও ভাষা দু'টিরই তীব্র অভাব বোধ হয়। কিন্তু তথাপি লিখতে

হবে, গুরুজনের আদেশ।

ভাবলাম, নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় কুরআন অনুধাবনে সহায়ক কিছু বিষয় আরজ করি। আল্লাহ তাআলা একে উপকারী বানিয়ে দিন।

এক.

শব্দের তাহকীক : কুরআন অনুধাবনের প্রথম সোপান হল শব্দের তাহকীক। বিশেষ কঠিন শব্দ হলে শব্দটির মূল কী, এটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে না রূপক অর্থে– এসব জেনে নেওয়া। এর জন্য আমরা আরবী নির্ভরযোগ্য অভিধান, আস্থাযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলী ও কুরআনের শব্দ-বিশ্লেষণে লেখা কিতাবাদির সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। যেমন, রাগেব ইসফাহানী কৃত 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন' ও মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী কৃত 'লুগাতুল কুরআন' ইত্যাদি। শুধুমাত্র বাংলা অনুবাদগুলোর উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না।

একটি উদাহরণ দিই। সূরা ইয়াসীনে চাঁদ সম্পর্কে বলা হয়েছে حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ এ আয়াতাংশের বাংলা প্রায় সব অনুবাদেই اَلْعُرْجُوْن শব্দটির অর্থ করা হয়েছে খেজুর শাখা। অথচ এটা সঠিক নয়। আরবী অভিধান ও নির্ভরযোগ্য আরবী তাফসীর গ্রন্থসমূহে এর অর্থ করা হয়েছে খেজুর কাঁদির ডাটা। তাই সঠিক অনুবাদ হবে– অবশেষে তা (চাঁদ) খেজুর কাঁদির পুরাতন ডাটার মতো হয়ে যায়। তাফসীরে কাশশাফে লেখা হয়েছে–

العرجون: عود العذق، ما بين شماريخه الى منبته من النخلة والقديم المحول، وإذا قدم دق وانحنى واصفر، فشبه به من ثلاثة أوجه.

অর্থাৎ উরজূন হলো খেজুর ছড়ার ডাটা, খেজুর ছড়া ও তার গোড়ার মধ্যবর্তী অংশ। কাদীম বা পুরাতন বলে বাঁকা বোঝানো হয়েছে। যখন এই ডাটা পুরাতন হয় তখন সরু, বাঁকা ও ফেকাসে হয়। চাঁদকে এই তিনটি অবস্থার সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে। অথচ শাখা বললে খেজুর গাছের ডালপালা বোঝা যায়।

দুই.

বালাগাত ও অলংকার-শাস্ত্রের সঙ্গে মিল রেখে কুরআনের অর্থ বোঝা : কুরআনে কারীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষালংকার। এই ভাষালংকার বোঝার জন্য ইলমে বালাগাত নামক স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রই তৈরি হয়েছে। মাদরাসাসমূহে এই শাস্ত্রের একাধিক কিতাব– দুরূসুল বালাগাহ, মুখতাসারুল মাআনী ও জাওয়াহিরুল বালাগাহ প্রভৃতি পড়ানো হয়। এসবসত্ত্বেও অনেক তালেবে ইলম কুরআনে কারীমের বালাগাত চোখে দেখে না। ফলে কুরআন অনুবাদে এর প্রতি লক্ষ রাখাও হয় না। যেমন–

ক. সূরা বাকারার শুরুর দিকে আছে– اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ। অনেকে এর অর্থ করেন– অথবা আসমান থেকে বর্ষিত বৃষ্টির মতো...। অথচ صيب শব্দটি এখানে مبالغة বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর السماء এর আলিফ লাম এসেছে استغراق বা ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য। সঠিক অর্থ হবে, গোটা আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির মতো...। এভাবে অর্থ করা হলে এরপরই যে বলা হয়েছে, فيه ظلمات এতে রয়েছে ঘনান্ধকার ...। এর সঙ্গেও মিল হয়ে যায়। কারণ, যামাখশারী'র মতে আরবী ভাষায় سماء বলে আসমানের একাংশ বোঝায়। আর একাংশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে তাতে ঘনান্ধকার হওয়ার কথা নয়।

খ. সূরা তাওবায় বলা হয়েছে– وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ। অনেকে এর অর্থ করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি অনেক বড়। অথচ এখানে رضوان শব্দটির تنوين এসেছে تقليل বা স্বল্পতা বোঝানোর জন্য। তাই সঠিক তরজমা হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সামান্য সন্তুষ্টিই অনেক বড়।

গ. সূরা রূমের শুরুর দিকে বলা হয়েছে, يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অনেকে এর অর্থ করেন, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটাই শুধু জানে। অথচ এখানে ظاهرا শব্দটির تنوين এসেছে تقليل বা স্বল্পতা বোঝানোর জন্য। তাই সঠিক অর্থ হবে, তারা তো পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটির কিছু কিছু জানে মাত্র।

কুরআনের বালাগাতপূর্ণ কথার মজা পেতে হলে এবং সে আলোকে তার মর্ম বুঝতে হলে আমাদেরকে তাফসীরে কাশশাফ মনোযোগসহ অধ্যয়ন করতে হবে। ইমাম কাশ্মীরী বলেছেন–

ما فهم القرآن إلا الأعرجان، أحدهما من زمخشر والآخر من جرجان.

কুরআন বোঝার মতো করে বুঝেছেন দু'জন খোঁড়া লোক। একজন যমখশর নিবাসী, অপরজন জুরজানের অধিবাসী।

এই যমখশর নিবাসী হলেন– কাশশাফ গ্রন্থকার। আর জুরজানের অধিবাসী হলেন ইমাম আব্দুল কাহের জুরজানী। তার যদিও কোনো তাফসীর গ্রন্থ নেই, তবে বালাগাত শাস্ত্রে তার অমরগ্রন্থ 'দালাইলুল ই'জাযে'র স্থানে স্থানে তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সুন্দর মর্ম তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি বারবার অধ্যয়ন করা চাই। কোনো কোনো স্থানে তিনি যমখশরীর চেয়েও উত্তম মর্ম বর্ণনা করেছেন। যেমন, সূরা আলে ইমরানে ইমরান-পত্নীর একটি কথা বলা হয়েছে رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى "হে আমার রব! আমি তো কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছি।"

একথা বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? যে রবকে তিনি এ কথা বলেছেন তিনি তো সেটা ভালো করেই জানেন। তাইতো এর পরের আয়াতেই বলা হয়েছে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ আর আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন তিনি কী জন্ম দিয়েছেন। যমখশারী বলেন–

قالته تحسراً على ما رأت من خيبة رجائها وعكس تقديرها، فتحزنت إلى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكراً، ولذلك نذرته محرراً للسدانة

অর্থাৎ তিনি (ইমরান-পত্নী) যখন তার আশা ভঙ্গের অবস্থা দেখলেন তখন আফসোস করে ঐ উক্তি করলেন এবং আপন রবের নিকট দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করলেন। কেননা তিনি আশা ও কল্পনা করেছিলেন পুত্র সন্তান জন্ম দেবেন। এ জন্যই তো সেবার কাজে উৎসর্গ করার মান্নত করেছিলেন।

আল্লামা তাফতাযানীও 'মুখতাসারুল মাআনী' গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন। কিন্তু আব্দুল কাহের জুরজানী 'দালাইলুল ই'জায' গ্রন্থে বলেছেন, 'ইমরান-পত্নী এ কথাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি ভাবতেও পারেননি কন্যা সন্তান জন্ম নেবে, এটা সম্পূর্ণ তার কল্পনা ও প্রত্যাশার বিপরীত হয়েছে।' (পৃষ্ঠা: ২১৬)

বলা বাহুল্য, ইমরান-পত্নীর তাকওয়া ও খোদাভীরুতা যে পর্যায়ের ছিল তাতে তিনি কন্যা সন্তান পেয়ে আফসোস ও অনুতাপ করবেন এটা ভাবতে মন সায় দেয় না।

যাহোক, বলছিলাম কুরআন অনুধাবনের গভীরে পৌঁছতে হলে কাশশাফ ও জুরজানী'র গ্রন্থ মনোযোগসহ অধ্যয়ন করতে হবে। তবে কাশশাফ গ্রন্থকার ছিলেন মু'তাযেলী। ফাঁকে ফাঁকে তিনি তার আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। তাই পাঠককে খুব সতর্ক থাকতে হয়। এ কারণে কাশশাফের সাথে ইবনুল মুনাইয়্যির-এর টীকা, যা কাশশাফের সাথেই মুদ্রিত, পাঠ করা উচিত। আর এখন তো মাশা আল্লাহ আল্লামা তীবী-র কাশশাফের টীকাও 'ফুতূহুল গাইব' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। আরো প্রকাশিত হয়েছে ইমাম আবু আলী উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হামদ আলমাগরিবী আলমালেকী রাহ. (৭১১ হি.)-এর তিন খণ্ডের গ্রন্থ 'আততাময়ীয লিমা আওদাআহু যামাখশারী মিনাল ই'তিযালি ফী তাফাসীরিল কিতাবিল আযীয'। কাশশাফের নে'মাল বদল বা উত্তম বিকল্প হল তাফসীরে আবুস সউদ। এটির ভাষা অতি উচ্চাঙ্গের। লেখক ছিলেন হানাফী মাযহাব-অনুসারী উঁচু মাপের ফকীহ ও প্রধান বিচারপতি। আল্লামা আলূসী বাগদাদী তার তাফসীর রূহুল মাআনীতে যেখানেই বলেছেন, قال شيخ الإسلام অর্থাৎ 'শাইখুল ইসলাম বলেছেন' সেখানে এই আবুস সউদকেই বুঝিয়েছেন। আবুস সউদও বালাগাত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ফলে তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনায় এদিকটি লক্ষ রেখেছেন।

চার.

কুরআনে কারীমের যেসকল আয়াতে ইহুদী খৃস্টানদের বিশ্বাস উল্লেখ করা হয়েছে বা খণ্ডন করা হয়েছে, সেসবের সঠিক উপলব্ধির জন্য তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় সঠিক উপলব্ধি পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হবে না। এজন্য মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের 'ঈসাইয়্যাত কেয়া হায়' বা এর বাংলা অনুবাদ মাওলানা আবুল বাশার সাহেব কৃত 'খৃস্টধর্মের স্বরূপ' খুব ভালো করে অধ্যয়ন করতে হবে। এখানে উদাহরণস্বরূপ দু'একটি বিষয় তুলে ধরছি।

ক. কুরআনে কারীমে এক স্থানে বলা হয়েছে–

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

"আর খৃস্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।" –সূরা তাওবা (৯) : ৩০

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا "আর তারা বলে, আল্লাহ এক সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন।" –সূরা বাকারাহ (২) : ১১৬

অনেকে মনে করে আয়াত দু'টির মর্ম একই। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কুরআন শব্দের পার্থক্য দিয়ে খৃস্টানদের দুটি দলের দুই দাবীর প্রতি ইঙ্গিত করেছে। একটি দলের দাবী হল, হযরত ঈসা মসীহ খোদার পুত্র ছিলেন। অপর দলের দাবী হল, তিনি খোদার পুত্র ছিলেন না, খোদা তাঁকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি খোদার পালকপুত্র ছিলেন। পালক পুত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় Adopt, আর এর প্রবক্তা বা বিশ্বাসীদেরকে বলা হয় Adoptionist। ১৮৫ খৃস্টাব্দের দিকে এদের অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। অষ্টম শতাব্দীতে রোমের পোপ কর্তৃক এ ধরনের বিশ্বাসকে খোদাদ্রোহিতা বলে ঘোষণা করা হয়। (দ্র. তাফসীরে মাজেদী, প্রথম খণ্ড)

খ. কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

নিঃসন্দেহে তারা কাফের হয়ে গিয়েছে, যারা বলে মারইয়ামের পুত্র মসীহই আল্লাহ। –সূরা মায়েদা (৫) : ১৭, ৭২

অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

অবশ্যই তারা কাফের হয়ে গিয়েছে, যারা বলে আল্লাহ তিনের একজন। –সূরা মায়েদা (৫) : ৭৩

এ দুটি আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই। দু'টি আয়াতে খৃস্টানদের দুটি দলের বিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে। একদল বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহর সত্তা ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের দেহে অনুপ্রবেশ করেছে। সুতরাং একমাত্র তিনিই আল্লাহ। আরেকদল বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ তিন খোদায়ী সত্তা তথা পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুস বা পাক রূহ-এর এক সত্তা। তিনের এক। এই বিশ্বাসকেই ত্রিত্ববাদ বলে। বর্তমানের খৃস্টানরা এ বিশ্বাসেই বিশ্বাসী। এই তিন সত্তা সম্পর্কে খৃস্টান পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা কী সেটাই বিশদভাবে তুলে ধরেছেন মাওলানা তাকী উসমানী তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে।

প্রথম দিকে খৃস্টানদের আরেকটি দল ছিল যারা তিন খোদায়ী সত্তার এক সত্তা পাকরুহের পরিবর্তে হযরত মারইয়ামকে এক খোদায়ী সত্তারূপে বিশ্বাস করতো। এদের এ বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করেই কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহ বা উপাস্য বানিয়ে নাও? –সূরা মায়েদা (৫) : ১১৬

পাঁচ.

কুরআনে কারীমে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেসব আয়াতে বাইবেলে বা এর বাইরে ইহুদী খৃস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ঐসব আয়াতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে হলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য। যেমন:

ক. সূরা ক্বাফে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

আর আমি আকাশসমূহ, যমীন ও দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। কোনো ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। –সূরা ক্বাফ (৫০) : ৩৮

এ আয়াত পড়ে চিন্তাশীল পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারেন না যে, আল্লাহ তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কোনো কাজ করে ক্লান্ত হবেন সেটা তো কেউ ভাবতেই পারে না। তথাপি তিনি এমন কথা কেন বলেছেন?

কিন্তু বাইবেলের আদি পুস্তকে যা বলা হয়েছে সেটা জানা থাকলে এ বিস্ময় দূর হয়ে যাবে এবং বাইবেলে আসমান যমীনসহ সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বলে বলা হয়েছে–

"পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।" –বাংলা পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, ২:২

ইংরেজী কিং জেমস ভার্সনে বলা হয়েছে–

And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. *(Genesis 2:2)*

এখানে *rested* বা বিশ্রাম করিলেন কথাটি থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহও মানুষের মতো কাজ করে ক্লান্ত হন, আর তাই তাঁর বিশ্রামেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। আয়াতটিতে মূলত এমন বিশ্বাসকেই খণ্ডন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাইবেলের অনুবাদকরা এ বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছেন। তাই পরবর্তী অনেক অনুবাদেই কথাটি বদলে ফেলা হয়েছে।

খ. সূরা বাকারায় বলা হয়েছে–

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

আর সুলায়মান কুফরী করেনি, অবশ্য শয়তানরাই কুফরী করেছে। –সূরা বাকারা (২) : ১০২

এখানে পাঠকের সামনে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুলায়মান আলাইহিস সালাম একজন মহান নবী। একজন নবীর পক্ষে কুফরীর তো কল্পনাও করা যায় না। মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী নবীগণের গুনাহ করাও অসম্ভব। তাহলে আল্লাহ কেন বলছেন, সুলায়মান কুফরী করেনি?

বাইবেল পাঠ করলে এরও হেতু বুঝে আসে। ইহুদী খৃস্টানরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ ও ঐশীগ্রন্থরূপে যে বাইবেল পাঠ করে সেখানে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের উপর কুফরী করার অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। তিনি নাকি তার বিদেশী স্ত্রীদের প্ররোচনায় মূর্তি পূজাও করেছেন। –রাজাবলি, ১১ : ৪-১০

এছাড়া ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর দুষ্ট জিনেরা একথা রটিয়ে দেয় যে, তিনি যাদু দ্বারা দেশ পরিচালনা করেছেন। তাদের কথায় কান দিয়ে ইহুদীরাও বিশ্বাস করতে থাকে যে, সত্যিই তিনি যাদু দ্বারা দেশ শাসন করেছেন।

এসব ধারণা-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যই উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, সুলায়মান কুফরী করেনি। –তাফসীরে মাজেদী, খ. ১ পৃ. ১৯৯-২০১

কুরআনে করীমের ঘোষণার সুদীর্ঘ তের-চৌদ্দশ বছর পর ইহুদী খৃস্টানদের টনক নড়ে। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় স্পষ্ট করে তারা লিখেছে, সুলায়মান এক আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসনাকারী ছিলেন। (খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯৫২, চতুর্দশ মুদ্রণ)

একইভাবে ইনসাইক্লোপেডিয়া বিবিলিকা– যা মসীহী গবেষক ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বিশেষজ্ঞদের গবেষণার সারনির্যাস– সেখানে স্পষ্ট স্বীকার করা হয়েছে যে, বাইবেলের যেসব পদে হযরত সুলায়মানের কুফর ও শিরকের কথা বলা হয়েছে সেগুলো পরবর্তী কালের সংযোজন। –তাফসীরে মাজেদী, খ. ১ পৃ. ২০০

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে শিক্ষা ও সভ্যতার সকল সূতিকাগার থেকে দূরে আরবের মরু এলাকায় বসে আখেরী ও উম্মী নবী বাইবেলের

বর্ণনার বিপরীতে যা বলে গেছেন, বর্তমানের ইহুদী খৃস্টান গবেষকরা সেটাকেই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত সত্যরূপে স্বীকার করে নিচ্ছে।

ছয়.

কুরআনে কারীমে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং তা পূর্ণ হয়েছে সেগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য চাই ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন। বিশেষ করে সূরা রূমের শুরুতে রোমক খৃস্টানদের বিজয় লাভ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার গুরুত্ব বোঝার জন্য ইতিহাস অধ্যয়নের বিকল্প নেই। কোন পরিস্থিতিতে কুরআন এ বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর দুই পরাশক্তির একটি রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন কী পর্যায়ের ছিল, অপর পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি ও সামর্থ্য তখন কেমন ছিল- এসব না জানলে কুরআনের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটির গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এর জন্য পাঠককে তরজমায়ে শাইখুল হিন্দের টীকা ও মাওলানা আলী মিয়া নদভীর 'মুতালাআয়ে কুরআন কে উসূল ও মাবাদী'র উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত আলোচনা দেখার পরামর্শ দেব।

সাত.

কুরআনে কারীমের স্বাদ আস্বাদন করতে হলে একজন আলেমে ইলমকে কুড়ানো মানিক সংগ্রহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কারণ কুরআন গবেষণায় এ পর্যন্ত অসংখ্য ডুবুরি অনেক অনেক মনি-মুক্তা উদ্ধার করে এনেছেন। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেসব মুক্তা নিয়ে মালা গাঁথতে পারার মধ্যেই সার্থকতা। ঐসব ডুবুরিদের মধ্যে আবার কিছু রয়েছেন ব্যতিক্রমধর্মী। কুরআন অনুধাবনে যারা এমন গভীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন, যেখানে অনেকেই পৌঁছতে পারেননি। এমনই একজন ব্যতিক্রমী প্রবাদ পুরুষ শাহ আবদুল কাদের দেহলভী। শাহ ওলীউল্লাহর এই ভাগ্যবান সন্তান সর্বপ্রথম উর্দূ ভাষায় কুরআনে কারীমের ভাবানুবাদ করেন। টীকায় কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি এমন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, পাঠক মাত্রই বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারবেন না।

একদিন আসরের নামাযের পর আমি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরতুল উস্তায মাহমূদ গাঙ্গুহীর ছাত্তা মসজিদ-সংলগ্ন কামরায় যাই। আমার পৌঁছতে সামান্য দেরি হয়েছিল। গিয়ে দেখি মজলিসে সাহারানপুর মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেবও উপস্থিত। মুফতী সাহেব হুজুর তাঁকে একটি কিতাব থেকে একটি স্থান দেখিয়ে দিলেন। উক্ত স্থানে লেখা ছিল جتنا میل اتنا صابن অর্থাৎ ময়লা অনুসারে সাবান লাগাতে হবে। মাওলানা ইউনুস সাহেব বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমাদের আকাবির অল্প কথায় কী চমৎকার জিনিস তুলে ধরেছেন!

আল্লাহর মেহেরবানী, আমি তখন ধরে নিয়েছিলাম, এটি আবদুল কাদের দেহলভীর 'মুযেহুল কুরআন' হবে। সেখানে إن الحسنات يذهبن السيئات নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দকর্মসমূহকে দূরীভূত করে- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত কথা বলা হয়েছে। দেওবন্দ থেকে পড়ালেখা শেষ করে যখন দেশে ফিরে আসলাম তখন 'মুযেহুল কুরআন' দেখে বুঝলাম আমার ধারণা সঠিক ছিল। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় পুরা কথাটি মুযেহুল কুরআনের টীকায় এভাবে লেখা হয়েছে-

نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو تین طرح سے، جو نیکیاں کرے اس کی برائیاں معاف ہوں، اور جو نیکیاں اختیار کرے اس سے خو برائیوں کی چھوٹے، اور جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو وہاں ہدایت آئے اور گمراہی مٹے، لیکن تینوں جگہ وزن غالب چاہیے۔ جتنا میل اتنا صابن. (سورہ ہود آیت 114)

অর্থাৎ নেক কাজসমূহ মন্দকাজগুলোকে দূর করে তিনভাবে। যে ব্যক্তি নেক কাজ করে তার কৃত মন্দকাজ মাফ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নেক কাজ আঁকড়ে ধরে তার থেকে মন্দ স্বভাব ছুটে যায়। যে দেশে নেক কাজের রেওয়াজ হয় সেখানে হেদায়েত আসে। তবে এ তিনটি ক্ষেত্রেই নেকের পাল্লা ভারী থাকতে হবে। যত ময়লা তত সাবান। -সূরা হুদ (১১) : ১১৪

মুযেহুল কুরআনের চমৎকার আলোচনার আরেকটি জায়গা হল সূরা আলিফ লাম মিম আস সাজদার আয়াত-

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

আর তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাব, তখন কি নতুন করে সৃজিত হব? বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে। তুমি বলে দাও, তোমাদেরকে নিয়ে নেয় মওতের ফেরেশতা, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, এরপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। -সূরা আলিফ লাম মিম আসসাজদাহ (৩২) : ১০, ১১

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখানে প্রশ্ন ও উত্তরে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী সুন্দর মিল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

تم آپ کو شکل بدن اور دھڑ سمجھے ہو کہ خاک میں رل مل کر برابر ہو گئے، ایسا نہیں۔ تم حقیقت میں جان ہو، سے فرشتہ لے جاتا ہے بالکل فنا نہیں ہو جاتے۔

অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে ধর মনে কর, যা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তোমরা তো আত্মা, যা ফেরেশতা নিয়ে যায়। তোমরা বিলীন হয়ে যাও না। ●

মানবজাতির হেদায়েতনামা হচ্ছে আলকুরআন

ইসহাক ওবায়দী

প্রথমবার যখন মোবাইল ফোন খরিদ করতে গেলাম তখন মটোরোলা সেট খরিদ করলাম। আমার জামাতা মাওলানা বশীর মেসবাহ্ বললেন, এই সেটগুলো অনেক মজবুত, পড়লেও ভাঙে না, এটাই খরিদ করুন। আমি তাই করলাম। দোকানদার সাথে একটা ৭৭ পৃষ্ঠার ক্যাটালগ বই দিয়ে দিলেন। আমি দেখে অবাক, এত ছোট্ট একটা মোবাইল সেট, তার আবার ব্যবহার-পদ্ধতি এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এত পৃষ্ঠার একটা ক্যাটালগ, কী আশ্চর্য ব্যাপার! পরে ভেবে দেখলাম, একটা ফ্লাস্ক বা আরো তুচ্ছ কোনো মেশিনারিজের সাথেও একটা ক্যাটালগ দেওয়া থাকে। মেশিন যত বড় হয় ক্যাটালগও তত বড় ও সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

আরেকবার দেখলাম, আমার পীরভাই জনাব আবদুল্লাহ্ আলমামুন সাহেব সাভার ইপিজেড-এ জিন্স কাপড়ের একটা ফ্যাক্টরি করছিলেন, দেখার জন্য আমাকে তিনি সাথে করে নিয়ে গেলেন। দেখলাম বিদেশী ইঞ্জিনিয়াররা মেশিনগুলো বসাচ্ছে। মামুন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম, মেশিন-কোম্পানি মেশিনের সাথে ইঞ্জিনিয়ারও দিয়ে দিয়েছে তা বসানোর জন্য এবং মেশিনগুলোকে চালিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। যখন আমাদের লোকজন পুরোপুরিভাবে মেশিন চালানো ইত্যাদি শিখে ফেলবে তখন বিদেশী ইঞ্জিনিয়াররা চলে যাবে। বিষয়টা যতটা আশ্চর্যের তার চেয়েও বেশি চিন্তার। একটি যন্ত্রের জন্য যদি ক্যাটালগ প্রয়োজন হয় এবং যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার শেখাবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে মানুষ যে সৃষ্টির সেরা তার জন্য কি প্রয়োজন নেই শিক্ষক ও তার নির্দেশনার? মানুষ তো একটি জড় বস্তু নয়। তার রয়েছে দেহ ও আত্মা, বুদ্ধি ও বিবেক এবং রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাত। তার দেহের সুস্থতা ও পরিচর্যার জন্য যেমন রয়েছে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি ও সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা, তার হৃদয় ও আত্মার পরিশুদ্ধি, স্বভাব ও চরিত্রের উৎকর্ষ এবং দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের জন্যও প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা ও ব্যবস্থার। সেই শিক্ষা ও ব্যবস্থাই হচ্ছে মহাগ্রন্থ আলকুরআন। এতে আছে মানুষের সৃষ্টির সূচনা ও তার স্রষ্টার পরিচয় এবং জীবন-যাপনের যাবতীয় দিকনির্দেশনা। মানুষের আত্মার খোরাক, কলবের গিযা, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও পরিচালনার নিয়ম-নীতির বিবরণ ও বিশ্লেষণ এতে রয়েছে। শুধু তাই নয় এই আসমানী কিতাবের সাথে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন একজন শিক্ষক ও আদর্শ। এই মহাগ্রন্থের যথাযথ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং এর প্রায়োগিকরূপ জীবন ও কর্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য। তিনি তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়তি জীবনে এই মহাগ্রন্থকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এবং সেই মোতাবেক মানবজাতিকে পরিচালনার জন্য একটি সুশৃঙ্খল বড় জামাতও সৃষ্টি করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যাঁদের নাম হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম রা.।

মহাগ্রন্থ আলকুরআনের বৈশিষ্ট্য কেউ কখনো লিখে শেষ করতে পারবে না। শুধু তার জীবন-ব্যবস্থা হওয়ার দিকটিও যদি কেউ বিশ্লেষণ করতে চায় তাহলেও তা কয়েক ভলিউমে লিখে শেষ করা যাবে না। মানবের জীবন কীভাবে পরিচালিত হলে ঘরে ও বাইরে, ব্যক্তি ও পরিবারে, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও প্রশান্তি, সুখ ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে তার বৃত্তান্ত মহাগ্রন্থ আলকুরআনে বিস্তারিতভাবে দেয়া আছে। তারপরও হাতে-কলমে বাস্তবতার নিরিখে শিখিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়ে এবং কুরআনী শিক্ষা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা মানবজাতির জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে বিরাট একটি জামাত তৈরি করে গেছেন। যাঁরা পরবর্তী জেনারেশনকে এই ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে শিক্ষিত করে বিদায় নিয়েছেন। তাদের পর তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে যুগ-পরম্পরায় আমাদের কাছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পৌঁছে গেছে এবং সেই মহান শিক্ষকের শিক্ষা ও আদর্শও আজ অবধি সংরক্ষিত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তা বাকি থাকবে।

এখন যদি কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো প্রগতিশীল নেতা এই শিক্ষা ও আদর্শের বিপরীত কোনো মতবাদ বা দর্শন মানবজাতির পরিচালনার জন্য আবিষ্কার করে বা চালাতে চায় তা বাহ্যত যত সুন্দর চকচকে হোক না কেন, মানবের যিনি স্রষ্টা তার বিধান-পরিপন্থী হওয়ার কারণে কখনো তা মানবের জন্য কল্যাণকর হবে না।

(বাকি অংশ ৭১ পৃষ্ঠায়)

কুরআন তেলাওয়াতের ফাযায়েল, মাসায়েল ও আদাব

মাওলানা আহমদ মায়মূন

[শিরোনামের বিষয়টি একইসাথে সর্বজনবোধ্য এবং আমলী দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ। মাওলানা আহমদ মায়মূন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এতে বিশেষভাবে জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আলইতকান ফী উলূমিল কুরআন'-কে সামনে রেখেছেন। কিন্তু ঐ কিতাবে উদ্ধৃত মুনকার কোনো বর্ণনা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন ও তেলাওয়াত সম্পৃক্ত মাসায়েল বিস্তারিতভাবে ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে রয়েছে। এখানে শুধু অধিক জরুরি মাসআলাগুলোই আলোচিত হয়েছে। –আবদুল মালেক]

আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহ বান্দার প্রতি অগণিত। তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ বান্দার হেদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআনের অবতারণ। কুরআন পাক থেকে হেদায়াতের আলো গ্রহণ করার জন্য যেমন কুরআন পাকের অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা আবশ্যক, তেমনি কালামে পাকের খায়ের ও বরকত হাসিলের জন্য তা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করাও একটি জরুরি আমল।

আমরা জানি, যিনি যত বড়, তাঁর কথাও তত বড় দামি। এটাকেই আরবী প্রবাদে বলা হয় : 'কালামুল মুলূকি মুলূকুল কালাম।' কুরআন পাক যেহেতু মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী, তাই তাঁর কালামের মর্যাদাও তাঁর মতোই অপরিসীম, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং তাঁর পবিত্র কালাম তেলাওয়াতের ফাযায়েল, মাসায়েল ও আদাব সম্পর্কে আমাদের অবগতি লাভ করা জরুরি।

কুরআন পাক তেলাওয়াতের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কুরআন পাক তেলাওয়াতের তাওফীক লাভ করা একটি ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য। একটি সহীহ হাদীসের বর্ণনায় যে দু'জন ব্যক্তির আমলকে ঈর্ষণীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের একজন এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা করার তাওফীক দান করেছেন; যার ফলে সে দিনরাত কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। হাদীসটি হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৫

কুরআন পাক তেলাওয়াতে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী লাভ হয়। এক হাদীসে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কালামের একটি হরফ তেলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।"

হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০; মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম, হাদীস ২০৮০

কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য কুরআন কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

"তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন কেয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।"

হাদীসটি হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে :

الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَتَرَاءَى لِأَهْلِ السَّمَاءِ، كَمَا تَتَرَاءَى النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

"যে গৃহে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় সেটি আসমানের ফেরেশতারা এরূপ দেখতে পায়, যেমন দুনিয়ার মানুষ আকাশের তারকা দেখতে পায়।"

হাদীসটি হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। –শুআবুল ঈমান ২/৩৪১, হাদীস ১৯৮২ ; قال الذهبي في «السير» ٢٩/٨ : هذا حديث نظيف الإسناد، حسن المتن.

অপর এক হাদীসে এসেছে :

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، لَا تَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوهُ، وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে কুরআনের ধারক-বাহক! তোমরা কুরআনকে শিথানে ফেলে রেখো না। তোমরা কুরআনকে দিনরাত যথাযথভাবে তেলাওয়াত কর এবং কুরআনের প্রচার-প্রসার ঘটাও, কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।"

হাদীসটি হযরত উবায়দা মুলাইকী রা. থেকে মারফূ, মাওকুফ উভয়ভাবে বর্ণিত। –শুআবুল ঈমান, হাদীস ২০০৭ ও ২০০৯

কত দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত

সালাফের বুযুর্গানের দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত

সম্পর্কে কিছু বিস্ময়কর বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন কেউ দিনরাতে দুই খতম করে মোট চার খতমও করতেন। আবার কেউ তিন খতম, কেউ দুই খতম এবং কেউ এক খতম করতেন।

এসব বর্ণনা (যদি প্রমাণিত হয়) তাঁদের কারামাত বলেই গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য হযরত আয়েশা রা. এত দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করা অপছন্দ করেছেন। হযরত মুসলিম ইবনে মিখরাক বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বললাম, লোকেরা কেউ কেউ এক রাতে দুইবার অথবা তিনবার কুরআন খতম করেন। উত্তরে তিনি বললেন, قرأوا ولم يقرأوا, অর্থাৎ তারা পড়ার মতো পড়েনি। আমি বছরের দীর্ঘতম রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতাম, তখন তিনি সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা নিসা তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াতের মধ্যে কোনো সুসংবাদের আয়াতে পৌঁছুলে সে সুসংবাদ পাওয়ার জন্য আগ্রহ সহকারে দোয়া করতেন, আর কোনো ভয়ের আয়াতে পৌঁছুলে সে ভয়ের বিষয় থেকে আশ্রয়ের জন্য দোয়া করতেন। -কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক, হাদীস ১১৯৬

কেউ আবার দুই দিনে কুরআন খতম করতেন, আর কেউ প্রতি তিন দিনে খতম করতেন। তিন দিনে খতম করা উত্তম। কেননা এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث

"যে তিন (রাত-দিনের) চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করে সে কুরআন বুঝে পড়ে না।"

হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩৯৪; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯৪৯ (ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে-

لا تقرأوا القرآن في أقل من ثلاث.

"তোমরা তিন (রাত-দিনের) চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করো না।" -আততাফসীর মিন সুনানি সাঈদ ইবনে মানসূর, হাদীস ১৪৬

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত :

أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث

"তিনি তিন (রাত-দিনের) চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করা অপছন্দ করতেন।" -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৫৯৫৩

হযরত সা'দ ইবনুল মুনযির রা. বলেন, আমি বললাম :

يا رسول الله! أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم، إن استطعت.

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তিন (রাত-দিনে) দিনে কুরআন খতম করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়।"

সা'দ ইবনুল মুনযির রা. এই একটিমাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। -কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক, হাদীস ১২৭৪

কেউ কেউ চারদিনে, কেউ পাঁচ দিনে, কেউ ছয় দিনে আবার কেউ সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। সাত দিনে কুরআন খতম করা মাঝামাঝি পন্থা এবং এটাই সর্বোত্তম। অনেক সাহাবী ও তাবেঈর আমল ছিল এ রকম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : اقرأ القرآن في كل شهر

"তুমি প্রতি এক মাসে কুরআন খতম কর।"

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এরচেয়ে বেশি তেলাওয়াত করতে সক্ষম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, فاقرأه في كل عشرين "তাহলে প্রতি বিশ দিনে খতম কর"। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি তেলাওয়াত করতে সক্ষম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, فاقرأه في كل عشر "তাহলে প্রতি দশ দিনে খতম কর।" আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি তেলাওয়াত করতে সক্ষম। তখন তিনি বললেন, فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك "তাহলে প্রতি সাত দিনে খতম কর। এরচেয়ে বেশি নয়।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫৯

এমনিভাবে কেউ আট দিনে, কেউ দশ দিনে, কেউ এক মাসে এবং কেউ দুই মাসে খতম করতেন।

মাকহুল রাহ. বলেন, শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান সাহাবীগণ কেউ সাত দিনে, কেউ এক মাসে, কেউ দুই মাসে, আবার কেউ এর চেয়ে বেশি সময়ে কুরআন খতম করতেন। -আলইতকান, খ. ১, পৃ. ৩০৪

আবুল লাইস সামারকান্দী রাহ. বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারী বেশি তেলাওয়াত করতে না পারলে কমপক্ষে বছরে দুইবার খতম করবে। ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন, যে ব্যক্তি বছরে (কমপক্ষে) দুইবার কুরআন খতম করে সে কুরআনের হক আদায় করল। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের বছর জিবরাঈল আ.-কে দুইবার কুরআন শুনিয়েছিলেন। -বুস্তানুল আরেফীন, পৃ. ২০

অন্যেরা অবশ্য বলেছেন, কোনো ওজর ব্যতিরেকে চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশি সময় কুরআন খতমকে বিলম্বিত করা অপছন্দনীয়। ইমাম আহমদ রাহ. এমনটি বলেছেন। কারণ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কয়দিনে আমরা কুরআন খতম

করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, في أربعين يوما "চল্লিশ দিনে।" –আলইতকান, খ. ১, পৃ. ৩০৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩৯৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯৪৭

ইমাম নববী রাহ. বলেন, গ্রহণযোগ্য অভিমত এই যে, কুরআন খতমের বিষয়টি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে তেলাওয়াত করলে কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বুঝতে সক্ষম হন তিনি প্রতিদিন যতটুকু তেলাওয়াত করে তার পক্ষে কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয় ততটুকু তেলাওয়াত করবেন। এমনিভাবে যিনি ইলমের প্রচার-প্রসার ও তালীম-তাদরীসের কাজে ব্যাপৃত অথবা প্রশাসনিক বা বিচারকার্যে নিয়োজিত কিংবা কোনো দ্বীনী বা জনকল্যাণমূলক কাজে জড়িত তিনি তার দায়িত্ব সম্পাদনে ক্ষতি না করে যতটুকু তেলাওয়াত করা সম্ভব ততটুকু তেলাওয়াত করবেন। আর যদি কেউ এরূপ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত না হন তবে তিনি যত বেশি সম্ভব তেলাওয়াত করবেন। তবে তা এত বেশি না হওয়া উচিত, যা বিরক্তি অথবা তেলাওয়াতে ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। –আলআযকার, পৃ. ৯৮, আততিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, পৃ. ৮০

তেলাওয়াত শেখার পর ভুলে যাওয়া

তেলাওয়াত শেখার পর ভুলে যাওয়া বড় গুনাহ। কারণ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَجْذُومٌ

"যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত শেখার পর ভুলে যায় সে কেয়ামতের দিন হাতকাটা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৭৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২১৪৫৬

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম আবুল আলিয়া (৯০ হি.) বলেন :

كنا نرى من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام حتى ينساه، لا يقرأ منه شيئا

"আমরা এটাকে অনেক বড় গুনাহ মনে করতাম যে, কোনো ব্যক্তি কুরআন শেখার পর (চর্চা না করে কুরআনের ব্যাপারে উদাসীন ও) ঘুমিয়ে থাকে, সবশেষে তা ভুলে যায়। কুরআনের কিছুই আর তেলাওয়াত করতে পারে না।" –আততাবাকাতুল কুবরা, খ. ৭, পৃ. ৫৮; কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমাদ, পৃ. ৩০৩

এই হুঁশিয়ারি থেকে বাঁচার পন্থা এ নয় যে, কুরআন তেলাওয়াত শিখবে না। কারণ এতে তো আরও বড় গুনাহ হবে। বরং কুরআন তেলাওয়াতও শিখতে হবে, তেলাওয়াত করতেও হবে, যেন তেলাওয়াত ভুলে না যায়। যাকে আল্লাহ তাআলা হিফজ করার তাওফীক দান করেছেন সে আরও গুরুত্বের সাথে তেলাওয়াত করতে থাকবে, যেন হিফজ দুর্বল না হয়ে যায়।

আর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

"তোমরা কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রাখ, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদ-এর প্রাণ রয়েছে, কুরআন রশিতে বাঁধা উটের চেয়ে অধিক পলায়নপর।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯১

কুরআন তেলাওয়াতের জন্য অজু

মুখস্থ তেলাওয়াত করার জন্য অথবা কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে তেলাওয়াত করার জন্য অজু করা মুস্তাহাব। কারণ, কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম যিকির। আর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র অবস্থা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে অপছন্দ করতেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৭

তবে কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে অজুবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া মাকরূহ নয়। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজুবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়তেন। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৪৬

যদি কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায় কারও পেটের বায়ু বের হওয়ার উপক্রম হয় তবে তেলাওয়াত বন্ধ রাখবে।

গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় এবং ঋতুগ্রস্ত মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ। তবে তারা কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে কুরআন দেখতে পারবে। কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হলে অজু করা ওয়াজিব।

কুরআন তেলাওয়াতের স্থান

পবিত্র জায়গায় বসে কুরআন তেলাওয়াত করা সুন্নত। সর্বোত্তম হল মসজিদে বসে তেলাওয়াত করা। কেবলামুখী হয়ে বিনয় সহকারে ধীর ও স্থিরভাবে মাথা নিচু করে কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

কুরআন তেলাওয়াতের আগে মেসওয়াক করা

কুরআন পাকের সম্মানার্থে এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য কুরআন তেলাওয়াতের আগে অজুর সময় মেসওয়াক করা সুন্নত। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي

جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.

"কোনো বান্দা যখন মেসওয়াক করে নামাযে দাঁড়ায় একজন ফিরিশতা তার পেছনে দাঁড়ায়। যখন সে তার তেলাওয়াত শুনে তখন তার নিকটবর্তী হয়। এমনকি সে তার মুখ বরাবর নিজের মুখ করে, ফলে তার মুখ থেকে কুরআনের যা কিছুই বের হয় তা তার পেটে চলে যায়। সুতরাং তোমরা মেসওয়াক দ্বারা মুখকে পরিচ্ছন্ন কর।" -মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৬০৩; আততারগীব ওয়াততারহীব, খ. ১ পৃ. ১৬৭

কুরআন তেলাওয়াতের আগে আউযু বিল্লাহ পড়া

কুরআন তেলাওয়াতের আগে 'আউযু বিল্লাহ' পড়া সুন্নত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত (করতে ইচ্ছা) কর তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।" -সূরা নাহল (১৬) : ৯৮

আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশের কারণে কেউ কেউ কুরআন তেলাওয়াতের আগে আউযু বিল্লাহ পড়া ওয়াজিব বলেছেন।

ইমাম নববী রাহ. বলেন, কুরআন তেলাওয়াতের মাঝে কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দিয়ে তারপর আবার তেলাওয়াত করতে চাইলে পুনরায় আউযু বিল্লাহ পড়া উত্তম।

আউযু বিল্লাহ'র পূর্ণাঙ্গরূপ অনেকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে উত্তম হল أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়া। এছাড়াও বর্ণিত হয়েছে :

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

কেরাআতের ইমামদের মতে, সশব্দে তা'আওউয পড়া উত্তম। আবূ শামা অবশ্য বলেছেন, শ্রোতা উপস্থিত থাকলে সেখানে তা'আওউয সশব্দে পড়বে। কারণ, সশব্দে তা'আওউয উচ্চারণ করার দ্বারা বোঝা যায় যে, এখন কুরআন পাকের তেলাওয়াত হবে। এর দ্বারা তেলাওয়াতের প্রতীক প্রকাশিত হয়। যেমন হজ্বের জন্য তালবিয়া এবং ঈদের নামাযের জন্য তাকবীর প্রতীকের মর্যাদা রাখে।

সশব্দে তা'আওউয উচ্চারণ করার একটি উপকারিতা এই যে, তা'আওউযের শব্দ শুনেই শ্রোতা তেলাওয়াতের শুরু থেকেই শোনার প্রতি মনোযোগী হবে। এতে তেলাওয়াতের কোনো অংশ তার শ্রবণ থেকে বাদ পড়বে না। পক্ষান্তরে তা'আওউয নীরবে পড়া হলে শ্রোতার পক্ষে তেলাওয়াতের কিছু অংশ শ্রবণ থেকে বাদ যেতে পারে।

তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ পড়া

তেলাওয়াতের সময় সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) ব্যতীত প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। কেননা, প্রত্যেক সূরার শুরুতে অবস্থিত বিসমিল্লাহও একটি সম্পূর্ণ আয়াত। যা সূরাসমূহের মাঝে পার্থক্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীস থেকে এও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা তেলাওয়াত শুরু করতেন বিসমিল্লাহর মাধ্যমে। এভাবেই উম্মতের আমল চলে আসছে যে, প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাও হয় এবং পড়াও হয়। -আহকামুল কুরআন, আবু বকর জাসসাস, খ. ১, পৃ. ১৫-১৬; আননাশর ফিল কিরাআতিল আশর, ইবনুল জাযারী, খ. ১, পৃ. ২৫৯-২৭১

সূরা বারাআতের মধ্যবর্তী কোনো স্থান থেকে তেলাওয়াত শুরু করলেও বিসমিল্লাহ পড়বে।

তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করা

তারতীলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা সুন্নত। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

"আপনি ধীরস্থিরভাবে স্পষ্টরূপে (তারতীলের সাথে) কুরআন তেলাওয়াত করুন।" -সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ৪

হযরত উম্মে সালামা রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, তাঁর তেলাওয়াত ছিল : قراءة مفسرة حرفا حرفا "প্রতিটি হরফ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারিত।" -সুনানে আবু দাউদ, ১৪৬৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯২৩; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১১৫৮

হযরত আনাস রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর তেলাওয়াত ছিল (মদের স্থানগুলো) টেনে পড়া। এরপর তিনি بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে শোনান এবং তাতে اللّٰه, الرَّحْمٰن ও الرَّحِيْم এর মদগুলো টেনে উচ্চারণ করে দেখান। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৪৬

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে বলল, আমি নামাযের এক রাকাতে মুফাসসাল সূরা পাঠ করি। উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, সে তো কবিতা আওড়ানোর মতো পাঠ করা। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২২

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُهَا.

"কুরআন তেলাওয়াতকারী বা হাফেজকে (কেয়ামতের দিন) বলা হবে, তুমি তেলাওয়াত করতে থাক আর উপরে উঠতে থাক। তুমি ধীরে ধীরে

তেলাওয়াত কর, যেভাবে তুমি ধীরে ধীরে দুনিয়াতে তেলাওয়াত করতে। তোমার অবস্থান হবে সর্বশেষ আয়াতের স্থলে, যা তুমি তেলাওয়াত করতে।"

হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৪; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৬৬

উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, খুব বেশি দ্রুত তেলাওয়াত করা (যাতে উচ্চারণ বিঘ্নিত হয়) মাকরূহ।

উলামায়ে কেরাম এও বলেছেন যে, তারতীলের সাথে এক পারা তেলাওয়াত করা সমপরিমাণ সময়ে তারতীল ব্যতীত দুই পারা পড়ার চেয়ে উত্তম।

উলামায়ে কেরাম আরও বলেছেন, কয়েকটি কারণে তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব :

(১) তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করা হলে কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তুগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা যায়।

(২) আল্লাহ তা'আলার কালামের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শিত হয়।

(৩) অন্তরে অধিক ক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনের তরজমা বুঝে না তার জন্যও তারতীলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

আল্লামা যারকাশী রাহ. বলেন, পরিপূর্ণ তারতীল মানে কুরআনের শব্দগুলো ভরাট উচ্চারণে পাঠ করা এবং হরফগুলোকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। অন্যথায় এক হরফ আরেক হরফের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। কারও কারও মতে, এটা হল তারতীলের সর্বনিম্ন মাত্রা। পরিপূর্ণ তারতীল হল, কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ রেখে তেলাওয়াত করা। যেমন, শাসনবাণী বিষয়ক আয়াত তেলাওয়াতের সময় শাসনবাণী উচ্চারণকারীর মতো উচ্চারণ করা এবং সম্মান প্রদর্শন বিষয়ক আয়াতের তেলাওয়াতের সময় সম্মান প্রকাশ করার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা ইত্যাদি। –আলবুরহান ফী উলূমিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৬৩৫; আল-ইতকান, খ. ১, পৃ. ৩১০

কুরআনের অর্থ অনুধাবন করে তেলাওয়াত করা

কুরআনের অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করে বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করা সুন্নত। এটাই তেলাওয়াতের বড় উদ্দেশ্য এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এর ফলে দ্বীনের বিষয়ে মনের প্রশস্ততা সৃষ্টি হয় এবং অন্তরাত্মা আলোকিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ

"আমি আপনার নিকট একখানা বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা তার আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।" –সূরা ছদ (৩৮) : ২৯

আল্লাহ তা'আলা আর এক আয়াতে বলেন :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

"তবে কি তারা কুরআনে (র আয়াতসমূহে) চিন্তা-ভাবনা করে না?" –সূরা নিসা (৪) : ৮২

সুতরাং কুরআন তেলাওয়াতের সময় যখন যা উচ্চারণ করছে তখন তার অর্থের প্রতি পুরোপুরি মনোনিবেশ করবে। প্রতিটি আয়াতের অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করবে। আদেশ-নিষেধ বিষয়ক আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করবে, সেগুলো পালনের প্রতি আন্তরিক হবে। কোনো বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। দয়া ও অনুগ্রহ বিষয়ক কোনো আয়াতে পৌঁছলে আনন্দিত বোধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আবেদন করবে। আযাব ও শাস্তি বিষয়ক কোনো আয়াত এলে সেখানে ভীত হবে এবং আযাব ও শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বিষয়ক কোনো আয়াত এলে সেখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশ করবে; কোনো দোয়ার আয়াত এলে কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করবে।

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি এক রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাকারা শুরু করলেন, তারপর সূরা নিসা পড়লেন, এরপর সূরা আলে ইমরান পড়লেন। তিনি ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করছিলেন। তাসবীহ বিষয়ক কোনো আয়াত এলে সেখানে তাসবীহ পাঠ করলেন, কোনো প্রার্থনার বিষয় এলে প্রার্থনা করলেন এবং কোনো আশ্রয় প্রার্থনা বিষয়ক আয়াত এলে আশ্রয় চাইলেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭২

হযরত আওফ ইবনে মালেক রা. বলেন, আমি এক রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (তাহাজ্জুদের) নামাযে শরিক হলাম, তিনি দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা পড়লেন, কোনো রহমত বিষয়ক আয়াত এলে সেখানে থামলেন এবং আল্লাহর নিকট রহমত লাভের দোয়া করলেন। আর আযাবের কোনো আয়াত এলে সেখানে থামলেন এবং আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৭৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১০৪৯; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৩৯৮০

এক হাদীসে এসেছে:

من قرأ : وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فانتهى إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فانتهى إلى آخرها "أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى"، فليقل: "بلى"، ومن قرأ والمرسلات فبلغ "فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ" فليقل: "آمنا بالله"

"যে ব্যক্তি সূরা والتين والزيتون পড়ে শেষ করে সে বলবে : بَلٰى وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ "হাঁ, আমি এ ব্যাপারে একজন সাক্ষী।" আর যে ব্যক্তি সূরা لا أقسم بيوم القيامة পড়ে শেষে أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى পাঠ করে সে বলবে : بلى "হাঁ"। আর যে ব্যক্তি সূরা والمرسلات তেলাওয়াত করে শেষ আয়াত فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ পাঠ করে সে বলবে : آمنا بالله "আমরা ঈমান আনলাম।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৮৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৪৭; (হাদীসের সনদ যয়ীফ।)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাহ. বলেন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যখন أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى পড়তেন, তখন বলতেন, سبحانك اللهم بلى। আর যখন سبح اسم ربك الأعلى। পড়তেন, তখন বলতেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى। –মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ৪০৫১

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে সাহাবায়ে কেরামের সামনে এসে সূরা আররাহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। সাহাবায়ে কেরাম তেলাওয়াত শুনে চুপ থাকলেন, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلٰى قَوْلِهِ : فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ.

"আমি এ সূরাটি জিন সম্প্রদায়ের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি, তখন তারা তোমাদের চেয়ে সুন্দর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমি যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করতাম তখন তারা বলত : لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কোনো নেয়ামতকে অস্বীকার করি না। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনার প্রাপ্য।"

হাদীসটি হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩২৯১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৭৬৬, আরো দেখুন, মুসনাদে বাযযার, হাদীস ২২৬৯ (কাশফুল আসতার), তাফসীরে তাবারী, খ. ২২, পৃ. ১৯০

আবু মায়সারা বলেন, জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা বাকারা সমাপ্ত করার পর آمين বলতে বলেছেন। –ফাযায়েলুল কুরআন, আবু উবায়দ, পৃ. ২৩৩, বর্ণনাটি 'মুরসাল' এবং এর সনদ কিছুটা দুর্বল।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. যখন সূরা বাকারা খতম করতেন তখন آمين বলতেন। –ফাযায়েলুল কুরআন, আবু উবায়দ, পৃ. ২৩৩

ইমাম নববী বলেন, কুরআন তেলাওয়াতের একটি আদব এই যে, (আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলদের সম্পর্কে ইহুদী-নাসারা ও কাফের-মুশরিকদের বিরূপ মন্তব্য বিষয়ক) আয়াতগুলো তেলাওয়াতের সময় আওয়াজ নিচু করবে। যেমন وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ এবং وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ ইত্যাদি।

ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী এমনই করতেন। –আলইতকান, খ. ১, পৃ. ৩১৩

কোনো আয়াত বারংবার পড়া

কোনো আয়াত বারবার পড়তে কোনো আপত্তি নেই। হযরত আবু যর রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ আয়াতখানি একরাতে পড়তে থাকলেন ভোর হওয়া পর্যন্ত। –সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১০১০; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২১৩২৮

তেলাওয়াতের সময় কান্না

কুরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না করা এবং কান্না না আসলে কান্নার ভান করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

এবং তারা (কুরআন তেলাওয়াতের সময়) কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ১০৯

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছিলেন, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০০

ইমাম নববী বলেন, কুরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না আসার পন্থা হল, কুরআন পাকে বর্ণিত আযাব-গযব, শাসনবাণী ও ওয়াদা-অঙ্গীকার বিষয়ক আয়াতগুলো তেলাওয়াতের সময় সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সাথে সাথে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতা নিয়ে ভাববে। যদি

এতে কান্না না আসে তবে কেন কান্না আসে না তা নিয়ে কান্না করবে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে কান্না না আসাও একটি দুঃখজনক বিষয়। -আততিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, পৃ. ১০৭

সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করা

সুন্দর আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করা সুন্নত। এক হাদীসে বলা হয়েছে : زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

"তোমরা শ্রুতিমধুর আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত কর।" -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৮; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১০১৫; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৫৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৪৯

অপর এক হাদীসে এসেছে :

حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

"তোমরা সুন্দর আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা, সুন্দর আওয়াজ কেরাআতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।" -সুনানে দারেমী, হাদীস ৩৭৭৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১২৫

সুন্দর আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করা সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। সুতরাং যদি তেলাওয়াতকারী সুন্দর আওয়াজের অধিকারী নাও হয় তবু যথাসম্ভব আওয়াজ সুন্দর করার চেষ্টা করবে। তবে দৃষ্টিকটু পর্যায়ের টানাটানি করবে না।

সুর করে কুরআন তেলাওয়াত করা, যদি তাতে উচ্চারণ-বিকৃতি না ঘটে, তবে তাতে আপত্তির কিছু নেই। আর উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটলে নাজায়েয।

ইমাম নববী রাহ. বলেন, সুন্দর আওয়াজের অধিকারী কুরআন তেলাওয়াতকারীর নিকট তেলাওয়াত শুনতে চাওয়া এবং মনোযোগের সাথে তা শোনা মুস্তাহাব। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াতকারী সাহাবীদের থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনেছেন। -আততিবয়ান, পৃ. ১৩০

জরাট আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করবে, না নিম্নস্বরে

হাদীস শরীফে এসেছে:

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ

"আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুই এভাবে শোনেন না, যেভাবে সুন্দর আওয়াজের অধিকারী নবীর কুরআন তেলাওয়াত শোনেন, যখন তিনি সুন্দর আওয়াজে উচ্চ স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেন।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯২

অপর এক হাদীসে এসেছে :

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

"উচ্চ স্বরে কুরআন তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে সদকা দানকারীর মতো, আর নিম্ন স্বরে কুরআন তেলাওয়াতকারী গোপনে সদকা দানকারীর মতো।" -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৩৪

ইমাম নববী রাহ. বলেন, যেখানে রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো)-র আশঙ্কা থাকে অথবা উচ্চ স্বরে কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নামাযরত ব্যক্তির নামাযে বিঘ্ন ঘটার কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমে বিঘ্ন ঘটার কারণে তার কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে সেখানে নীরবে তেলাওয়াত করা উত্তম। আর যেখানে এসব আশঙ্কা নেই, সেখানে সরবে তেলাওয়াত করা উত্তম। কেননা, সরবে তেলাওয়াতের মধ্যে ফায়েদা বেশি। সরব তেলাওয়াতের ফায়েদা তেলাওয়াত শ্রবণকারীরাও লাভ করে এবং সরব তেলাওয়াত তেলাওয়াতকারীর অন্তরকে জাগ্রত করে, কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রতি মনকে ধাবিত করে, শ্রবণশক্তিকে সেদিকে অভিনিবিষ্ট করে, ঘুম দূরীভূত করে এবং উদ্যম বৃদ্ধি করে। -আলআযকার, পৃ. ১০২

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা একটি হাদীস শরীফ দ্বারা সমর্থিত। হাদীসটি এ রকম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এতেকাফ করলেন, তখন তিনি লোকদের উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত শুনে পর্দা সরিয়ে বললেন :

أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

"জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকেই তার রবের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় (ইবাদতে) রত। সুতরাং তোমাদের একে অপরকে যেন কষ্ট না দেয় এবং কুরআন তেলাওয়াতে যেন একে অপরের চেয়ে আওয়াজ উঁচু না করে।"

হাদীসটি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১১৮৯৬; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১১৬২

কেউ কেউ বলেন, কিছু তেলাওয়াত সরবে আর কিছু তেলাওয়াত নীরবে হওয়া মুস্তাহাব। কেননা, নীরবে তেলাওয়াতকারী কখনও অবসাদ বোধ করতে পারে, তখন সে সরবে তেলাওয়াত করে

অবসাদ দূর করবে, আবার সরবে তেলাওয়াতকারী কখনও ক্লান্তি বোধ করতে পারে, তখন সে নীরবে তেলাওয়াত করে আরাম লাভ করবে। –আল ইতকান, খ. ১ পৃ. ৩১৬

কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াত করা

মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করার চেয়ে কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াত করা উত্তম। –ফাতাওয়া আলমগীরী খ. ৫, পৃ. ৩১৭

ইমাম নববী রাহ. অবশ্য বলেছেন, কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াত করা এবং মুখস্থ তেলাওয়াত করা উভয় অবস্থায় কুরআনের শব্দ ও অর্থের প্রতি একাগ্রতা ও মনোযোগ যার সমান, তার জন্য কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াত করা উত্তম। আর যার দেখে তেলাওয়াত করার চেয়ে মুখস্থ তেলাওয়াত করলে একাগ্রতা ও মনোযোগ বেশি হয় তার জন্য মুখস্থ তেলাওয়াত করা উত্তম। –আলআযকার, পৃষ্ঠা ১০২

কুরআন তেলাওয়াতের সময় কথা বলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন তেলাওয়াত শেষ না করা পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলতেন না। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫২৬

কুরআন তেলাওয়াতের সময় হাসা, অনর্থক কাজ করা এবং মনোযোগ নষ্ট করে এমন কোনো কিছুর প্রতি তাকানো মাকরূহ।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় মনোযোগের সাথে তেলাওয়াত শোনা এবং কথাবার্তা না বলা সুন্নত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" –সূরা আ'রাফ (৭) : ২০৪

সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে অথবা সেজদার আয়াতের তেলাওয়াত শুনলে সেজদা করা ওয়াজিব।

কুরআন তেলাওয়াতের সময়

সর্বোত্তম তেলাওয়াত হল নামাযের মধ্যকার তেলাওয়াত। তারপর রাতের তেলাওয়াত, বিশেষ করে শেষ রাতের তেলাওয়াত। মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তেলাওয়াত করাও পছন্দনীয়। দিনের বেলায় তেলাওয়াতের সর্বোত্তম সময় হল সকাল বেলা। তবে দিনের বা রাতের কোনো সময় তেলাওয়াত মাকরূহ নয়। যে কোনো সময় তেলাওয়াত করা যায়। –আলআযকার, পৃষ্ঠা ৯৯ ●

কুরআনের সংস্পর্শ ছাড়া ...

(৪৪ পৃষ্ঠার পর)

মানুষের ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধান যা তাদের কোনদিন দিতে পারত না সেই প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান। আল্লাহ, আখেরাত, অতীত যুগের ইতিহাস, আল্লাহর দেয়া আশা, প্রতিশ্রুতি, তাঁর দেখানো ভীতি, সতর্ক বার্তা এবং সৃষ্টিজগৎ ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ বর্ণনা কোরআন শরীফের একক বৈশিষ্ট্য।

একজন বিশ্বাসী মানুষ তার হৃদয়ের সবটুকু নিবেদন নিংড়ে নিয়ে যখন আল্লাহর সমীপে নিজেকে উপস্থিত করতে চায় তখন তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন হয় আল্লাহর এ কালাম। আল্লাহকে স্মরণ করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এই কোরআনের পঠন, পাঠন, চিন্তা, গবেষণা, এর শিক্ষার প্রসার এবং এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে জীবন গঠন।

أفضل الذكر تلاوة القرآن

"কোরআন তেলাওয়াত মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যিকির।"

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কোরআন শেখে ও অপরকে শেখায়।"

আল্লাহর পরিচয়, প্রজ্ঞা ও প্রেম প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কেউ যখন কোরআন তেলাওয়াত ও তাদাব্বুরে ব্রতী হয় তখন বিস্ময়কর এ কোরআন তাকে প্রদান করে অফুরন্ত ঐশী আনন্দের অতুলনীয় আর অনন্ত ধারা। মনে হবে মহান আল্লাহ তাঁর নগণ্য এক সৃষ্টির সাথে কথা বলছেন। তাকে অভয় দিচ্ছেন, সতর্ক করছেন, আশার বাণী শোনাচ্ছেন। কখনো মনে হবে তিনি তাঁর এ প্রিয় ও বিশ্বাসী বান্দার কাছে পথহারা সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আক্ষেপগুলো প্রকাশ করছেন, যুক্তি তর্ক তুলে ধরছেন এবং তাদের প্রতি নিজ ক্ষোভের কথা বর্ণনা করছেন। তাঁর বিশ্বাসী বান্দাকে শোনাচ্ছেন ক্ষমা, করুণা আর অনন্ত সুখের বার্তা। মানব জনমের চরম সাফল্যের পয়গাম। শুনাচ্ছেন জান্নাতের অকল্পনীয় নাজ ও নেয়ামতের কথা। তাঁর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাতের কথা। যা অতৃপ্ত মানবাত্মার জন্য পরম তৃপ্তির বাণী, বারবার যা পাঠ করে একজন মুমিন তার ঈমানকে তাজা করে। মনে হয়, প্রতিটি আয়াত যেন তাকে নতুন করে পরম সৌভাগ্যে ভূষিত করছে। প্রতিটি বার্তা যেন তার ভক্তি ও বিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিটি বাণী বিলিয়ে যাচ্ছে নৈকট্য ও ভালোবাসার অভিনব সব অনুভূতি। এককথায় বিচ্ছিন্ন এ ধরণীতে মহান সৃষ্টিকর্তা প্রভুর বিরহ যাতনায় পিষ্ট, ব্যথিত মানবের অনন্য অবলম্বন এই কোরআন। মুখে বলে বা কলমে লিখে যা বোঝানো যাবে না, ঈমান ও মহব্বতপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ভাবের গভীরে ডুব দিয়ে অনুভব করতে হবে। ●

সাক্ষাৎকার

'কুরআনে কারীমের সঙ্গে আমার মহব্বতের শুরু হযরত কারী সাহেবের উসিলায়'

– হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান

[হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম। হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রাহ.-এর দুজন বিশিষ্ট খলীফা– হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. এবং হযরত হরদুঈ রাহ.-এর ইজাযতপ্রাপ্ত বুযুর্গ, খলীফা বর্তমান বাংলাদেশের প্রবীণ বরেণ্য মনীষী। বহু মানুষের ইসলাহ ও দ্বীনী যিন্দেগী লাভের উসিলা। অর্জন সান্নিধ্য আর আল্লাহর দানে পরিপুষ্ট আশি-স্পর্শী জীবন। বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক। তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম গত ১৯ মার্চ বাদ যোহর। তাঁর উত্তরার বাসায়। ছিল সাক্ষাৎকারের মজলিস। কুরআনে কারীমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূচনা, উপলক্ষ, মাধুর্য ও কিছু বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে তাঁর কথামালায়। কখনো কিছু প্রশ্ন কখনো দীর্ঘ স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনায় সাক্ষাৎকারের এ পত্র প্রস্তুত হয়েছে। অসুস্থতা ও ক্লান্তির মধ্যেও তাঁর হৃদয়জাত কিছু অভিব্যক্তির এই ঝলকটি তুলে ধরা হল তাই স্বাভাবিক বিবরণে। প্রশ্ন-উত্তরের সীমানা উঠিয়ে দিয়ে। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা সবাইকে উপকৃত করুন। আর এই মনীষীর বা-বরকত দীর্ঘ হায়াত দান করুন।

লক্ষ্যণীয়, এ সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মিলাদ মাহফিলের কথা এসেছে। এটা মূলত যা ঘটেছে তার বিবরণ। কাজটা ঠিক ছিল কি না সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কে না জানে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল একটি রসমমাত্র। আর আজকাল তো তার সাথে যোগ হয়েছে কত গলত আকীদা এবং কত আপত্তিকর কর্মকাণ্ড।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে উপস্থিত ছিলেন মুফতি মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, মাওলানা আরিফুর রহমান, মাওলানা ফজলুল বারী, জনাব মুহাম্মাদ ইয়াসীন এবং হাজী লুৎফুর রহমান]

এক. আমি যখন প্রথম শ্রেণিতে পড়ি তখনই চাঁদপুরের কারী ছাহেব হযরত মকবুল হোসাইন ছাহেবের কাছে কুরআন শরীফের সবক পড়ি। এটা ছিল কুরআন শরীফ পাঠের নিয়মতান্ত্রিক সূচনা। তখন ১৯৪৫ সন। এর আগে থেকেই অবশ্য মুখে মুখে শুনে শুনে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সকালে কারী সাহেব হযরত যে সবক পড়াতেন সেটা বাইরে থেকে শুনতাম। সে সবক কানে আসতো। আমার দাদার বাড়ির–নানার বাড়ির ছোটরা পড়তেন তাঁর কাছে। সে পড়া শুনে শুনেই কয়েকখানা আয়াত আমার ইয়াদ হয়ে যায়। সেসময়ের একজন ছাত্রী ছিলেন আমার খালা। তিনিও পড়তেন মক্তবে। আমি শুনতাম। ইয়াদ হয়ে যেত আমারও। এরপর স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমিও মক্তবের ছাত্র হলাম। এবং কায়দা-আমপারাসহ কুরআন শরীফের সবক গ্রহণ করলাম তাঁর কাছে। কুরআন শরীফের মাঝখানের কয়েকখানা আয়াত তিনি আমাদেরকে ইয়াদ করিয়ে দিলেন। খুব সুন্দরভাবে পড়া মশক করিয়ে দিতেন তিনি। ছাত্ররা কেউ কায়দা পড়তো। কেউ আমপারা পড়তো। কেউ কুরআন শরীফ পড়তো। কিন্তু কিছু আয়াত মুখস্থ করাতেন সবাইকে একসঙ্গে করে। সবাই মুখস্থ করতো সে আয়াতগুলো। ফজরের পর থেকে ১১টা -১২টা পর্যন্ত, কোনো কোনো সময় যোহরের আযান পর্যন্ত তিনি পড়াতেন। তিনি যে জায়গাগুলো থেকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন– সেগুলো ছিল–

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ...

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ...

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ...

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ...

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ...

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ...

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى...

আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই, এতগুলো জায়গা কীভাবে মুখস্থ করলাম তখন! মাত্র এক বছরে ফজরের পরের মক্তবে। দশটার সময় স্কুলের ক্লাস শুরু হতো। ফজরের পর মক্তবে পড়তাম। তারপর স্কুলে চলে যেতাম। কিছুদিন পর চাঁদপুরে চলে যাই আব্বার সঙ্গে। চাঁদপুরে থাকা অবস্থায় ক্লাস টু-থ্রিতে যখন পড়ি ছুটিতে বাড়িতে এলে তখনও মক্তবে বসতাম। ব্যস, এতটুকুই ছিল মক্তবের পড়া।

দুই. আমার যতটুকু মনে পড়ে ও অনুভব হয়, হযরত কারী সাহেবের পড়া ছিল খুবই শুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ করার মতো। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন বার্ষিক মিলাদ-মাহফিলের অনুষ্ঠানে কেরাত অর্থাৎ কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের

প্রতিযোগিতায় নাম দিতাম। আমার আব্বাজান আমাকে উৎসাহিত করতেন। যখনই কারী সাহেব হুযুরের শিখিয়ে দেওয়া আয়াতগুলো থেকে তেলাওয়াত করতাম তখনই পুরস্কার পেতাম। দেখা গেছে, কখনো কখনো অন্য কোনো জায়গা থেকে প্রতিযোগিতায় তেলাওয়াত করেছি, তখন আমি আর পুরস্কার পাইনি। অন্যদের সাথে মশক করে যখনই অন্য জায়গা থেকে পড়তাম, পুরস্কার পেতাম না। এই জায়গা থেকে কারী সাহেব হুযুরের কাছে পড়িনি। বুঝতাম না তখন কেন এমন হতো। আসলে তাজবীদ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আর হযরতের শিখিয়ে দেওয়া আয়াতগুলোর মশক করা হয়েছিল বিশুদ্ধভাবে। সেজন্যেই সেই আয়াতগুলোর তেলাওয়াত হয়তো আমার কণ্ঠে সুন্দরভাবে উচ্চারিত হতো। আমি পুরস্কারও পেয়ে যেতাম।

তিন. আমার দাদার বাড়ি-নানার বাড়ি ছিল একদম কাছাকাছি, মুন্সিগঞ্জে। একই মসজিদে উভয় বাড়ির লোকেরা নামায পড়তেন। কাছাকাছিই ছিল মসজিদ। গোরস্তান আর স্কুল, বাড়ির সামনে। মসজিদের মক্তবে আর স্কুলে তাই একসঙ্গেই পড়ার সুযোগ হয়ে যেতো। মক্তবের হুযুর কুরআন শরীফের সবকের পাশাপাশি কিছু উর্দু কিতাবও পড়াতেন। রাহে নাজাত, তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ। তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ ছিল সীরাতের কিতাব। কাউকে কাউকে তিনি শরহে বেকায়াও পড়িয়েছেন। ১৯৯৬ সনে আমার ছোট খালা হজ্ব করতে গেলেন। বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন। আমি সঙ্গে। হজ্বের সময় আরাফা-মিনা বিভিন্ন জায়গায় তাকে কাঁদতে দেখলাম না। কিন্তু মদীনায় উহুদ পাহাড়ের যিয়ারাহর সময় কাঁদতে শুরু করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খালা! কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, 'মক্তবের হুযুরের কথা, তাঁর পড়ানো সীরাতের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেছে। আমাদের কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শেখার পেছনে রয়েছে তাঁর অনেক বড় অবদান।

চার. আব্বাজানের ছিল বদলির চাকুরি। আমার প্রথমশ্রেণি শেষ হওয়ার পর আব্বা বদলি হয়ে গেলেন। চাঁদপুর আব্বার সঙ্গে আমরাও চলে গেলাম। সেখানে আলাদা করে কোনো হুযুরের কাছে কুরআন শরীফ পড়ার সুযোগ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৪৭ সনে একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকে আব্বাজান জিজ্ঞেস করলেন তেলাওয়াত করতে পারব কি না। সেখানে বাহাদুরপুরের মরহুম বাদশাহ মিয়া আসবেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। তেলাওয়াত করলাম সেই কারী সাহেব হযরতের শিখিয়ে দেওয়া আয়াত কয়েকখানা থেকে। একটা বই উপহার পেয়েছিলাম সেদিন। এরপর আবার আমরা বাড়িতে চলে আসি। আব্বাজান ঢাকায় বদলি হয়ে যান। আমরা বাড়িতে মুন্সিগঞ্জে থাকি। চতুর্থ শ্রেণি পড়ে শেষ করিনি। সাত-আট মাস বাড়িতে ছিলাম। ঢাকায় মনমতো বাসার ব্যবস্থা করতে দেরি হচ্ছিল আব্বার। এরপর যখন আমরা ঢাকায় এলাম, এসে উঠলাম নিমতলিতে। বড় মসজিদের পাশে। সেখানে মক্তব আছে। মসজিদে যাতায়াত করি। আর ভর্তি হয়ে গেলাম পুরানা ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার পেছনে ইসলামিয়া স্কুলে, পঞ্চম শ্রেণিতে। ইসলামিয়া স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খান ছাহেব রাহ.। সেখানে পড়াকালেও বার্ষিক মিলাদ-মাহফিলের সময় কেরাত পড়ার জন্য নাম দিয়ে দিতাম। আব্বাজান উৎসাহ দিতেন। বলতেন, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে নাম দেবে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আব্দুল বারী সাহেব। তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা আতাহার আলী রাহ.-এর মুরিদ। আতহার আলী ছাহেব রাহ. ১৯৫৩, ৫৪, ৫৫ সনের দিকে বহুদিন ওই স্কুলে যেতেন। লাইব্রেরীতে বসতেন। পান খেতেন, কী কী সব লিখতেন। আমরা দেখতাম। আমাদের ওই প্রধান শিক্ষক লেখাপড়ার পাশপাশি ছোটখাটো দ্বীনী বিষয়েও ছাত্রদের দিকে লক্ষ রাখতেন। তখন ছাত্রদের মাঝে হাফপ্যান্ট পরার চল ছিল। তিনি ছাত্রদের বলতেন, মুসলমানের বাচ্চা তোমরা। হাফপ্যান্ট পরবে না! ওই স্কুলে একজন আরবির শিক্ষক ছিলেন। মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক, চিকন স্বাস্থ্য। লম্বা মানুষ। হ্যাংলা-পাতলা। আমাদের সহপাঠীদের অনেকেই তাঁর পড়ায় মনোযোগ দিতে চাইত না। তাঁকে মানতো না। আলহামদুলিল্লাহ আমার দ্বারা তাঁর প্রতি কোনো বেয়াদবি হয় নাই। তিনিও আমাকে মায়া করতেন। আমার বিয়ের আগে কলাবাগানের বাসায় ওই হুযুরকে বেশ কয়েকবার দাওয়াত করে এনেছি। বিষয়ের অংশ হিসেবে স্কুলে তিনি আরবি কিছু কিছু পড়াতেন। ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত সিলেবাসে আরবি ছিল। উর্দূ-আরবি যে কোনো একটা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি আরবি নিয়েছিলাম। মনে পড়ে ফেয়েলের সঙ্গে সঙ্গে চারটি বাবের (নাসারা, দারাবা, সামিআ, ফাতাহা) কিছু সীগা পড়িয়ে দিতেন। স্কুলে আরবি পরীক্ষায় কঠিন কিছু আসতো না। পরীক্ষায় পরিচিত ও পঠিত

কয়েকখানা আয়াতের তরজমা লিখতে বলা হতো। আমরা সেটুকুই সহজে লিখতাম। এভাবে অল্প পরিমাণে কুরআন শরীফের কিছু কিছু অর্থ বুঝে পড়ার একটি চর্চা ছাত্র-যমানায় শুরু হয়। অতটুকুই। এরচেয়ে বেশি তখন হয়নি। আমরা পড়িওনি।

পাঁচ. এর মধ্যে একবার হলো কি! নিমতলি মসজিদে যেখানে তেলাওয়াত করতাম সেখানে কুরআন শরীফের একটি তরজমা পেয়ে গেলাম। এখন যেখানে মরহুম ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর কবর, তার কাছেই মসজিদ। পাশে ছিল মাঠ। আমরা খেলতাম বিকালে। ওই মসজিদেই তেলাওয়াত করতাম। সেখানেই পেয়ে গেলাম ওই তরজমা। ২৩ পারার একটি খণ্ড। খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করা হয়েছিল। তরজমাকারী ছিলেন আলী হাসান আবদুল হাকীম। তরজমা এবং সঙ্গে কিছু ব্যাখ্যা। তারা খুব বিনয়ের সঙ্গে ভূমিকায় বললেন যে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু লিখিনি। বরং বয়ানুল কুরআনসহ অন্যান্য তাফসীর দেখে এটি সাজিয়েছি। সেই তরজমা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তখন আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। ১৯৫৩-৫৪ সন। তেলাওয়াতের সময় এবং আরো কিছু সময়জুড়ে ওই তরজমা পড়তে শুরু করলাম। খুব স্বাদ লাগতে লাগলো। নিয়মিত তেলাওয়াত কমে গেল। তরজমা পাঠের পেছনে পড়ে গেলাম। এরকম সময়ই একদিন আব্বাজানের সঙ্গে একটি শক্ত 'বেয়াদবি' হয়ে গেল আমার। আমি তেলাওয়াত না করে শুধু তরজমা পড়ছি। আব্বাজান নিয়মিত তেলাওয়াত করতেন। আমিও পড়ছি কি না খোঁজখবর নিতেন। পাশের ঘর থেকে একদিন ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- 'কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করো না, কী ব্যাপার?' আমি সেদিন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলাম 'অর্থ না বুঝে শুধু কুরআন শরীফ পড়লে কী লাভ।' কত বড় বেয়াদবি করলাম! কথাটি কত ভয়াবহ তা তো পরে বুঝতে পেরেছি। হযরত হারদুঈ তো একটি কথা আমাদেরকে ওযীফার মত বানিয়ে দিয়েছেন। প্রতি অক্ষরে দশ নেকী, না বুঝে পড়লেও এ নেকী পাওয়া যাবে। যে বলে কুরআন না বুঝে পড়লে ফায়দা নেই সে মূর্খ বা বে-দ্বীন বা উভয়টা। আব্বাজান আমার কথা শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। সেই ছিল কুরআন শরীফের তরজমা পড়ার আমার প্রথম চেষ্টা। প্রথমে ২৩তম পারা পড়ি। পরে অন্য পারাগুলোরও তরজমা-তাফসীর সংগ্রহ করে পড়ি। পরবর্তী জীবনে অর্থ বুঝার জন্য পড়ি তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন বাংলা তো আছেই। সেটা দেখার সুযোগ হয়। উর্দু তেমন বুঝি না। মাআরিফুল কুরআনের অর্থটা অবশ্য নিতে পারতাম। ৮১ সালে আমার ছেলের মামা বিমানের চাকরিতে থাকাকালে সে করাচি থেকে এনে উর্দু মাআরিফুল কুরআন ৮ খণ্ড আমাকে দিল। সেটা পড়ি। ভাঙাচুরা বুঝি। ভালো লাগে। কুরআন শরীফের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে আমার জন্য মাআরিফুল কুরআনই আসল। আর শুরুর দিকে পড়েছি আলী হাসান আবদুল হাকীমের তরজমা। আলহামদুলিল্লাহ ছোট কাল থেকে তেলাওয়াতও করতাম। কলেজ জীবনে হোস্টেলে অন্য তলায় অবস্থানরত আমার কোনো কোনো সহপাঠী বলত, তুই যে সকালে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিস আমরা শুনতে পাই।

ছয়. আমার আব্বাজান খুব বেশি তেলাওয়াত করতেন। সকালে ফজরের পর অফিসে যাওয়ার আগে তেলাওয়াত করতেন। অফিস থেকে ফিরে এসে আসরের আগে তেলাওয়াত করতেন। আসরের পর তেলাওয়াত করতেন। রাতে ঘুমানোর আগে তেলাওয়াত করতেন। ফুরসত পেলেই তেলাওয়াত করতেন। আমার ধারণা, তাঁর তেলাওয়াত মোটামুটি শুদ্ধই ছিল। আব্বাজানের প্রভাব ছিল আমাদের উপর। তিনি সবসময় চাইতেন, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আমার যেন কোনো বিরতি না ঘটে। তিনি চাইতেন মসজিদের সঙ্গে এবং দ্বীনী পরিবেশে যেন সবসময় আমার চলাফেরা সহজ হয়। প্রথমবার ঢাকায় বাসা নিলেন নিমতলি মসজিদের কাছে। নামায-তেলাওয়াত, মক্তব, আযান- সব সহজ হয়ে গেল। ওই মসজিদে যিনি নামায পড়াতেন তিনি বড় কাটারা মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। ১৯৫০ সনে বড়কাটারা থেকে আলাদা হয়ে লালবাগ মাদরাসা যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন আমরা তাঁর কাছে পড়ি। তিনি বড় তাফসীরের কিতাব মাথায় করে লালবাগ নিয়ে যান। সে দৃশ্য আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। অপরদিকে ঢাকায় এসে আমাকে ভর্তি করলেন ইসলামিয়া স্কুলে। ওই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল '৪৭ সনে। মুসলিম ছেলেদের নিরাপদে পড়াশুনার সুবিধার্থে। সদরঘাটের কাছে তখন ছিল বনেদি এলাকা ও স্কুল। কিন্তু চকবাজার, লালবাগ, সোয়ারিঘাট- এসব অঞ্চলের ছেলেরা সেখানে যেতে পারতো না। শুনেছি, দাঙ্গার কারণে হিন্দুদের আক্রমণের ভয়ে এই সমস্যা হয়েছিল। তো সেই স্কুলের পরিবেশেও দ্বীনী বিষয়ে আনুকূল্য ছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত আলেম মুফতী দীন মুহাম্মাদ খান রাহ.। লালবাগ মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। তেলের ব্যবসা করতেন। দোকানে অনেক

সময় বসে থাকতেন। তিনি ঢাকায় তাফসীর মাহফিল করতেন। শুনেছি, তিনি যখন চকবাজার তাফসীর করতেন মাইকের সংযোগ থাকতো সদরঘাট পর্যন্ত। আর যোহরের নামায পড়তাম আমরা রহমতগঞ্জ গণিমিয়ার হাট মসজিদে। সেখানে হাফেজ্জী হুযুর রাহ., ছদর ছাহেব হুযুর রাহ. আর পিরজী হুযুর রাহ.-কে আমরা দেখতে পেতাম। আব্বাজান ওই সময় মাসিক 'নেয়ামত' পড়তেন। 'নেয়ামত'-এ কেবলমাত্র হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-এর বয়ান ছাপা হতো। ব্যক্তিগতভাবে কারো কোনো প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হতো না। দু-একটি মাসআলা হয়তো ছাপা হতো। ছাপা হতো খুবই কমদামি নিউজপ্রিন্টে। 'নেয়ামত'পড়ার কারণেই পরবর্তী সময়ে আমার মনের মধ্যে 'মাওয়ায়েযে আশরাফিয়া' পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আরেকদিকে আব্বাজান সবসময় কুরআন শরীফ পড়ার কোনো অনুষ্ঠান হলে, প্রতিযোগিতা হলে আমাকে নাম জমা দিতে বলতেন। উৎসাহিত করতেন। নাম দিতাম। তেলাওয়াত করতাম। পুরস্কারও পেতাম। এটা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ও হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ইসলামিয়া স্কুলেও হয়েছে। একবার ভৈরবে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান কেরাত প্রতিযোগিতার ঘোষণা হলো। আব্বা আমাকে নাম দিতে বললেন– ভৈরবে আমাদের এক আত্মীয় ব্যবসা করতেন। সেই ভাইয়ের দোকানে গিয়ে উঠি। সেখানে দুই-তিনদিন থাকি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। কারী সাহেব হযরতের শেখানো আয়াতগুলো থেকে কোনোটা না পড়ে অন্য জায়গা থেকে পড়লাম। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারলাম না। পড়তাম স্কুলে। আব্বাজান সবসময় কুরআন শরীফের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গাঢ় হোক– এটা চাইতেন। আমার ইন্টারমিডিয়েটের প্রথম বছর আব্বাজান ইন্তিকাল করেন। তখন ১৯৫৬ সন।

সাত. পরে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমান বুয়েট) পড়ার জন্য ভর্তি হলাম। সেখানকার পরিবেশেও একটা আনুকূল্য পেলাম। আমাদের প্রিন্সিপাল ড. এম এ রশিদ স্যার। ঢাকা কলেজে থাকতে একবার তাঁকে দেখি। দাঁড়িওয়ালা একজন মানুষ। তাঁর অস্তিত্বই ছিল দ্বীনের জন্য অনেক বড় আকর্ষণ ও দাওয়াত। তিনি সেভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন না। কিন্তু জুমার নামাযসহ কোনো কোনো ওয়াক্তিয়া নামাযে মসজিদে আসতেন। আর লম্বা দাঁড়ি রাখতেন। বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠানের সময় অল্প কয়েকজন ছাত্র উপস্থিত থাকতো। তিনিও সেই মজলিসে দায়িত্বের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। অত্যন্ত দায়িত্বসচেতন, নীতিবান ও ন্যায়পরায়ণ একজন শিক্ষক ও প্রশাসক ছিলেন। কয়েকজন ছাত্রের ওই মজলিসে উপস্থিত হয়েও তিনি একসময়ই দ্বিধাহীন থাকতেন। আমাকে বললেন, হামীদ! তুমি যা আলোচনা করবে ইংলিশে কর। আমি দাঁড়িয়ে আলোচনা করলাম।

আট. ১৯৬৮ সনের দিকে মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের (আজিমপুর ফয়জুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা) সঙ্গে আমার পরিচয় গড়ে উঠলো। আমার জীবনে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। পরিচয়ের সূচনাটিও ছিল একটি বিশেষ উপলক্ষ ধরে। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতাম তখন। বাসা ছিল কলাবাগান বশিরউদ্দিন রোডে। অফিস থেকে গাড়ি দিল আমাকে। গলিটা ছিল খুব চিকন। সেই গলিতে গাড়ি ঢুকানো মুশকিল। কী করা যায়! গাড়ি রাখা যায়– এমন কোনো বাসার ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়িসহ বাসার খোঁজ পেলাম আজিমপুরে। ৪৫০ টাকার মধ্যে গাড়ির গ্যারেজসহ বাসা। আমার অফিস তখন মতিঝিলে। আবদুল্লাহ সাহেবের কাছে যাতায়াত শুরু করি। ধীরে ধীরে পরিচয় ও সম্পর্ক গাঢ় হয়। একদিন তিনি আমাকে বললেন, মন চায় আপনাকে কিছু আরবি পড়াই। কিতাব কেনা হলো। তাইসীর, মিযান, রওযাতুল আদব, নাহবেমীর। অফিসের পর তাঁর কাছে পড়ি। অল্প কিছু দিন এভাবে চললো। সীগা, বাব, গরদান কিছু ইয়াদ হলো। স্কুলে চার বাব তো পড়াই ছিল। কিছু সহজ হয়েছে। কিন্তু নাহবেমীর পড়তে কষ্ট হতো। ফার্সী ভাষায় লেখা। এসব পড়ার কারণে চাপ তৈরি হতো। আমি একদিন বললাম, হুজুর! আমার তো ঝিমুনি আসে (অফিসে)। তিনি পড়া বন্ধ করে অফিসে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে বললেন। তিনি বললেন, সব বন্ধ। অফিস ঠিকমত করেন। আগে রুজি হালাল করেন। কিতাব পড়া বন্ধ হলো, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রইল। তিনি আমাকে কোনো কোনো দিন নিয়ে বের হতেন। মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া, হাজারিবাগসহ বিভিন্ন জায়গায়। তাঁর ছাত্ররা কে কোথায় কী খেদমত করছেন ঘুরে ঘুরে দেখতেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তখন তিনি পড়াতেন ফরিদাবাদ মাদরাসায়। তাঁকে ফরিদাবাদ নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যেতাম মতিঝিল। তখন গাড়ি আমিই চালাতাম। এভাবে বছর-দেড় বছরের মাথায় আমার চাকুরি হয়ে গেল বুয়েটে। ১৯৬৯ সনে। আজিমপুরের বাসা ছেড়ে আমি চলে এলাম বুয়েটের স্টাফকোয়ার্টারে। কিন্তু আবদুল্লাহ হুযুরের সঙ্গে

যোগাযোগ থাকলো। মাঝে কিছুদিন তাবলিগের সঙ্গে সময় দিলাম। কাকরাইলে যাতায়াত করতাম। ৭০ সনে। রায়বেণ্ডে চিল্লা দিতে গেলাম। আবদুল্লাহ হুযুরের কাছেও যাতায়াত করতাম। ওই সময় তিনি বলতেন, আমার কাছে আসেন, ভালো। কাকরাইলে যাতায়াত করেন, ভালো। আর- আল্লাহ রাখছেন আল্লাহর এক ওলী (হাফেজ্জী হুযুর রাহ.), তাঁর কাছেও যাবেন। তখনও আমি সেভাবে হাফেজ্জী হুযুরের কাছে যাতায়াত শুরু করিনি।

মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি। ৬৯ সালের দিকের একটি ঘটনা। তখন কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। বুয়েটে ঢুকব। আজিমপুর মসজিদের সামনে একদিন আমার স্কুলযুগের হেডমাস্টার সাহেবের সাথে দেখা। তিনি আমাকে আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো করে বললেন, 'হামীদুর রহমান আমার ছাত্র। সে কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখন বুয়েটে চাকরি করবে। তার জন্য দুআ কইরেন'। আমি তো আগে থেকেই আবদুল্লাহ সাহেবের সাথে পরিচিত। তার কাছে কিতাব পড়ি। তাঁর সাথে হাঁটতে যাই। কিন্তু তিনি তখন পরিচয়ের কোনো ভাব করলেন না। তাঁর ইশারায় আমিও কিছু বললাম না। যেন আমি নতুন পরিচিত- এমনভাবেই হেডমাস্টার সাহেবকে আবদুল্লাহ সাহেব উল্টো প্রশ্ন করলেন- কী জন্য দুআ করব- দুনিয়া না আখেরাতের জন্যে? হেডমাস্টার সাহেব বললেন, দুনিয়া-আখেরাত উভয়ের জন্য দুআ করবেন। আল্লাহ তো বলেছেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً...

মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের সাথে অনেক জায়গায় সফরেও গিয়েছি। তখন বাচ্চা-কাচ্চা ছিল না। রিযওয়ানের (বড় ছেলে) বয়স যখন ৫ বছর হলো, মক্তবের পড়া পড়ানোর জন্য আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'একটা হুযুর দেন।' ৭৪ সালের মে মাসের ঘটনা এটা। রিযওয়ানের জন্ম ৬৯ সালে। আবদুল্লাহ সাহেব বললেন- 'একটা হুযুর দেব না।' বললাম- 'কেন?' তিনি বললেন- 'একটা হুযুরের কাছে পড়লে বাচ্চাদের পড়া মজবুত হয় না।' বললাম, 'তাহলে কী করব?' তিনি বললেন- 'মক্তব করেন।' বললাম,'আমি কীভাবে মক্তব কায়েম করব? আমি কি মক্তব করা শিখেছি?' তিনি বললেন,' আসেন আমার সঙ্গে।' একথা বলে তিনি আমাকে নিয়ে কাছের এক মসজিদে গেলেন। ওই মসজিদের ইমাম এখনও আছেন। আগে ছিলেন জওয়ান, এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। মাওলানা আবদুল আউয়াল। লালবাগে হাফেয মফীযুর রহমান রাহ.-এর কাছে হিফয পড়েছেন। এরপর আলিয়াতে পড়েছেন। তাকে গিয়ে হুযুর মক্তবের কথা বললেন। তিনি না-বাচক কিছু বললেন না। তাঁর কাছেই রিযওয়ান পড়েছে, মুস্তাফিয পড়েছে, আরিফ পড়েছে। খুব বরকত হয়েছে। আমপারা মুখস্থ হয়ে গেছে মক্তবে পড়ার সময়ই। এক বছরের মধ্যেই। আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন- 'একজন হাফেয সাহেবের কাছে বাচ্চাগুলোকে রেখে দেন। খেলতে খেলতে হাফেয হয়ে যাবে। আর ইংরেজি-বাংলা তো আকাশে-বাতাসে আছে। বিনা কষ্টেই শিখে নিতে পারবে।' আবদুল্লাহ সাহেবের অমর কথা।

রিযওয়ানকে চাঁদপুরের হাফেয মুহসিন সাহেবের মাদরাসায় দেওয়ার জন্য কাকরাইলে মশওয়ারা করলাম। তখন আমি মাঝে মাঝে তাবলীগে সময় লাগাই। হাজী আবদুল মুকীত সাহেব সুপারিশের মতো করে একটি চিঠি লিখে দিলেন। পরদিন আজিমপুরে এসে রিযওয়ানকে চাঁদপুরে পাঠানোর নিয়তের বিষয়ে বললাম। আর সেই চিঠিটি আবদুল্লাহ সাহেবকে দেখালাম। তিনি মুখে কিছু বললেন না। কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন। বললেন- রিযওয়ানকে দূরে পাঠাবেন না। আমার এখানে (আজিমপুরে) হিফযখানা হবে। বিরাট গম্বুজ, সুন্দর মসজিদ, খোলা ময়দান। তাকালেই কবরস্থান দেখা যায়। আখেরাতের কথা মনে হয়। উত্তম পরিবেশ। এখানে একটি হিফযখানা হবে।' তখন কিন্তু কিছুই নেই। 'হবে' মানে এখন খালি। দু'মাস যায়, তিন মাস যায়। কিছুই হয় না। আমি তো অপেক্ষায় থাকি। জিজ্ঞেস করি, হুযুর! কবে হবে হিফযখানা? তিনি বলেন, সবুর করেন, হবে, হবে। ছয়-সাত মাস পর একদিন বললেন, পাঁচ হাজার ইট দিয়েছে রাজা মিয়া।' ফজলুর রহমান রাজা মিয়া আমার সহপাঠী-বন্ধু। লালবাগ-রাহমানিয়াসহ বিভিন্ন মাদরাসায় তার খেদমত আছে। সে দিল পাঁচ হাজার ইট। এরপর আসমানী কারবার হল। দেখতে দেখতে দু'মাসের মধ্যেই দু'টি ঘর উঠে পড়ল। এরপর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ইমাম নেওয়া হল। হাফেয মাওলানা ইসমাইল। তার ভাই বিখ্যাত কারী আবদুল মুমিন। সেই শুরু হল ফয়যুল উলূম। শুরু হল মক্তব-হেফযখানা হিসেবে। রিযওয়ান সেখানকার প্রথমদিককার ছাত্র। কুরআনে কারীমের সঙ্গে আমার মহব্বতের শুরু হযরত কারী মকবুল হোসাইন রাহ.-এর উসিলায়। আর মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব যে আমাকে কয়েক মাস কিছু কিতাব

পড়িয়েছেন– এর একটি আজীব তাসির হয়েছে আমার ওপর। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলাম। ৬৮ সালের মাঝামাঝি তার সঙ্গে সম্পর্কের শুরু। ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩ তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কিছু তাবলীগেও যাতায়াত করতাম। ৭৪ সালে হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ.-এর কাছে বাইয়াত হলাম। ৭৬ সালে নূরানী ট্রেনিং নিলাম ইতেকাফের সময় নূরিয়ার মসজিদে। এরপর থেকে আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক একটু কমে গিয়েছিল। তিনি অনেক মাদরাসায় পড়িয়েছেন। বড় কাটারা, ইসলামিয়া, ফরিদাবাদ। একবার হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. আমাকে বললেন, দেখা করার জন্য আবদুল্লাহ সাহেবকে খবর দিতে। আমি সে খবর বললাম তার কাছে গিয়ে। তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, হুযুর আমার নাম নিয়েছেন? আমাকে যেতে বলেছেন!' এরপর একদিন গেলেন। দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলেন দু'জন। ... হাফেজ্জী হুযুর খুব সুন্দর করে হাসিমুখে বলতেন, 'কই আবদুল্লাহ সাব? তাকে আসতে বইলেন। আসলে তাকে ছাড়মু না।' 'ছাড়মু না' কথাটা খুব সুন্দর করে বলতেন। 'মু' খুব টান দিয়ে মাজফ করে বলতেন হারদুঈয়ের মশকের মতো।

৭৪ সালের দিকে আমার বুয়েটের বাসায় একবার এলেন আবদুল্লাহ সাহেব। আমার বাসার জানালার পর্দা অন্যদের বাসার তুলনায় দামী ছিল না। তবে সুন্দর ছিল। আমার মা আমাকে আদর করে বলতেন 'দুইখ্যা'। বলতেন 'দুইখ্যার ঘরের পর্দা দুর্বল বেশি।' কিন্তু আবদুল্লাহ সাহেব এসেই বললেন, এত দামী পর্দা কিনেছেন কেন?

বুয়েটের বাসায় উঠার কয়েক মাস পরের ঘটনা। আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারি। ১০ ফেব্রুয়ারি ছিল আব্বাজানের ওফাতের তারিখ। বাসায় মাহফিল করলাম। তখন তো সচেতন ছিলাম না। সেখানে আবদুল্লাহ সাহেবকে দাওয়াত দিলাম। তিনি বয়ান করলেন। হঠাৎ বয়ানের মধ্যেই বলে বসলেন– 'একটা কথা বলি।' মাইকে বয়ান হচ্ছিল। তার কথা সবাই শুনছে। বাইরে প্রফেসর সাহেবরা বসে আছেন। বাসার ভেতরে মেয়েরা। তিনি বললেন– হামীদুর রহমান সাহেব! আপনার আব্বা ১০ ফেব্রুয়ারি মারা গেছেন। ওই তারিখে দুআ করলে কবরে পৌছাবে, অন্য তারিখে দুআ করলে কি কবরে পৌছাবে না?' সব মানুষের মধ্যে একথা বলে বসলেন। আল্লাহর বান্দা ছিলেন স্পষ্টভাষী। মজযুবের মতো। মিলাদের উসিলায় তাকে নিলাম। তিনি গিয়ে মিলাদের পা কেটে দিলেন।

সেদিন আরেকটি ঘটনা ঘটল। এক নওমুসলিম ছিল। সালেহ আহমদ। ভোলার ছেলে। আগের নাম ছিল বিমল চন্দ্রদাস। ৭২/৭৩ সালের দিকে মুসলমান হয়েছে আবদুল্লাহ হুযুরের কাছে। তাঁর সাথে সাথেই থাকত। মাহফিল শেষ হয়ে হুযুর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর সেই সালেহ আহমদ আসল। এসে আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বলল, আজকের মাহফিলে আপনার এক স্যার হুযুরকে দশ টাকা হাদিয়া দিয়েছেন। সেই দশ টাকা হুযুর পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর আপনি যদি কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে আমার সঙ্গে আপনাকে আজিমপুর যেতে বলেছেন। গেলাম আজিমপুর। আবদুল্লাহ সাহেব আমাকে বললেন, আপনার এক স্যার এরকম এরকম চেহারা।' আমি চিনে ফেললাম। আবদুল্লাহ সাহেব বললেন– 'সেই স্যার আলাপ প্রসঙ্গে একপর্যায়ে কালকের মাহফিলে আমাকে বলেছেন– 'আমরা না দিলে মৌলবীরা খাবে কোত্থেকে?' এ কথাও বলেছে আবার আলাপ শেষে আমাকে ১০ টাকা হাদিয়াও দিয়েছে। লোকজনের সামনে আমি তাকে শরম দেই নাই। আমি হাদিয়াটা নিয়েছি। এই নেন সেই ১০ টাকা। তাকে ফেরত দিয়েন। আর তাকে বলবেন, যারা আমাদের মহব্বত করে দেয় তাদেরটা আমরা খাই। আর যারা আমাদেরকে করুণা করে দেয় তাদেরটা খাই না।

দেখ, আবদুল্লাহ সাহেব কত বড় বুযুর্গ ছিলেন। কত সহজ সরল! দেখলে বিশ্বাস হবে না। তাঁর ব্যাপারে মশহুর ছিল, বড় কাটারা মাদরাসা থেকে ফেরার সময় বাজার করে আনতেন। তখন সঙ্গে ব্যাগ না থাকলে পাঞ্জাবির কোনায় তরি-তরকারি বেঁধে নিয়ে আসতেন। কত সাদা-সিধা! আমার জীবনে তাঁর অনেক অবদান। আমার জীবন তাঁর এহসানে ভরা। আমার পাঁচও ছেলে হাফেয হয়েছে তাঁর পরামর্শমতো পড়াশুনা করে।

নয়. আমি আজিমপুর থাকতে মরহুম মাওলানা আলতাফ হোসাইন সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় গড়ে উঠেছিল। এরপর ১৯৭৪ সনের দিকের ঘটনা। তিনি তখন বড়কাটারায়। আমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলাম। আমি কার কাছে বাইয়াত হবো? আমার আব্বা-দাদা ছিলেন জৌনপুরী সিলসিলার মুরিদ। আমি তাকে গিয়ে বললাম, আমিও (ঢাকায়) এ সিলসিলার একজন পীরের সন্ধান পেয়েছি। আমি কি তার কাছে বাইআত হবো? তিনি এসব পরামর্শে কোনো উত্তর দিলেন না। সোজা আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। একজন বাচ্চাকে কোথাও নেয়ার জন্য মানুষ যেভাবে তার হাত ধরে হাঁটতে থাকে। সোজা

নিয়ে গেলেন লালবাগ শাহী মসজিদের মিনারার কামরায়। সেখানে গিয়ে আমাকে হাফেজ্জী হুযুরের কাছে বাইআত করে দিলেন। হুযুরও কোনো আপত্তি করলেন না। সবক দিলেন। আর বললেন– "নযরের গোনাহ থেকে বাঁচবেন।" ... এরপর আমি আগের মতোই চলতে লাগলাম। দু'বছর পর একদিন আমাকে মরহুম মাওলানা আলতাফ সাহেব আবার ধরলেন। লালবাগ মাদরাসার মাঠে। আপনাকে যে হুযুরের কাছে মুরিদ করে দিলাম– আপনি কী করেন? আমি বললাম, শাহী মসজিদে এসে ফজরের নামায পড়ি। তিনি বললেন, শুধু লালবাগে এসে ফজরের নামায পড়ার জন্য আপনি মুরিদ হয়েছেন? চলেন সামনের রমযানে। হুযুরের সাথে কামরাঙ্গিরচর নূরিয়ায় ইতিকাফে বসেন। ওই বছরই (১৯৭৬ সনে) নূরিয়ায় হুযুরের সঙ্গে ২০ রমযানে গিয়ে ইতিকাফে বসলাম। ২০ তারিখেই ইতিকাফে থাকা অবস্থায় আমাদেরকে হুযুর বললেন, নূরানীর প্রতিষ্ঠাতা আমার খলীফা কারী বেলায়েত হোসাইন ছাহেবের কাছে কুরআন শরীফের মশক করবেন। আমরা মশক শুরু করলাম। ওই ইতিকাফে কুরআন শরীফের মশক হলো। এর কিছুদিন পর আবার নূরিয়ায় গেলাম। হুযুরের মজলিসে বসে আছি। এসময় একজন বললেন, 'প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব নিজের এলাকায়-আত্মীয় স্বজনের বাচ্চাদের মধ্যে কুরআন শরীফ সহীহ করার খেদমত করছেন।' একথা শুনে হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. আমার মুখ টেনে নিয়ে কপালে চুমু দিলেন।

দশ. কিছু কিছু মক্তবের খেদমত শুরু করলাম। একদিন হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ.-এর কাছে গিয়ে বললাম 'মাওয়ায়েযে আশরাফিয়া'তে পেলাম ঋণ থাকা অবস্থায় নফল সদকা করা জায়েয নেই। আমরা মক্তব করতে গিয়ে তো কোথাও কোথাও ঋণী হয়ে যাচ্ছি। এখন কী করব?' হুযুর সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন- 'আল্লাহ ভরসা, করতে থাকেন।' আমি এজন্যই বলি, হাফেজ্জী হুযুর রাহ.-এর কাছ থেকে ঋণ করে হলেও মক্তব চালিয়ে যাওয়ার ট্রেনিং পেয়েছি। এরপর তো হুযুর ১৯৮১ সনের নির্বাচনী ঘোষণা করলেন– ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার মক্তব করবেন। হুযুর আগে থেকেই মক্তব করছিলেন। আরো বাড়িয়ে দিলেন ১৯৮১ সন থেকে। আমরাও তখন সঙ্গে সঙ্গে থাকি।
দেশের নানান প্রান্তে হুযুর যান। মক্তব কায়েম করেন। সবাইকে উৎসাহিত করেন। হুযুরের সঙ্গে

হজ্বের সফরসহ বিভিন্ন সফর করার সুযোগ হয়েছে। একবার হজ্বের সফরে আমপারা হুজুরকে মুখস্থ শোনানোর সুযোগ পেলাম। ওই সময়ে হজ্বের আগে ছিলাম মিসফালায়। হজ্বের পর হাজী হেমায়েত আমাদেরকে নিয়ে আসলেন এখন যেখানে যমযম টাওয়ার, সেখানে একটি দোতলা ছিল। সেই জায়গায় হুযুর একদিন বললেন– কিছু কুরআন শরীফ শোনাইবেন নি?' তখন হুজুরকে 'আম্মা ইয়াতাসাআলুন' থেকে শোনানো শুরু করলাম। সূরায়ে বালাদ পর্যন্ত এসে সূরায়ে বালাদের শেষ দিকে তাশাব্বুহ হয়ে গেল। আটকে পড়লাম। হুজুরও বললেন কুরআন শরীফ দেখে নিন। তখন কাছে কুরআন শরীফ ছিল না। সেদিন আর শোনাতে পারিনি।

এগার. অর্থসহ বা তরজমাসহ কুরআন শরীফের মক্তবের যে খেদমতের কথা তুমি বলছ– সেটা ৯৫ সালে হজ্বের সময় শুরু। প্রফেসর লুৎফুল কবীর ছিল। সোহাগের হাজী আনোয়ারুল কাদীর ছিল। গাজী হারুনুর রশীদ ছিল। তাদেরকে নিয়ে শুরু। আমি যে আব্দুল্লাহ সাহেবের কাছে একটু-আধটু পড়েছিলাম সেটা তখন কাজে লেগেছে। ছাত্র চার-পাঁচজন মাত্র। অনেক ফায়েদা হয়েছে। প্রফেসর লুৎফুল কবীর সেই মক্তবের ছাত্র। তার তিন ছেলেকেই হেফযখানায় দিয়ে দিল। তার বড়ছেলে এখন তিরমিযী শরীফ পড়ায়। ওই মক্তবের প্রথম ছাত্র লুৎফুল কবীর। ৬টা বার আর সুলাসী মুজাররাদ ও মাযীদ ফীহ নিয়ে আলোচনা করেছি। এটুকু বুঝলে দেখা যায় কুরআন শরীফের কত আয়াত আমরা অনেকটা বুঝতে পারি আলহামদু লিল্লাহ। অথচ কোনো কোনো ভাই বলেন, এসবের কোনো প্রয়োজন নাই। কুরআন শরীফের মা'না বোঝার চেষ্টা করার কোনো দরকার নাই। শুধু ফাযায়েলের কিতাব পড়লেই হবে নাউযুবিল্লাহ। আসলে কুরআন শরীফ সহীহ করে পড়তে শেখা প্রথম জরুরি। এরপর কিছু কিছু মা'না ও তরজমা বুঝার চেষ্টা করলেও অনেক ফায়দা হয়।
[আর ঐ মজলিসে না বলে থাকলেও অন্য সময় হযরত বলেছেন যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কুরআন মাজীদের ভাষার সাথে একটি সাধারণ পরিচিতি অর্জনের জন্য। এর দ্বারা কেউ তাফসীর করার যোগ্য হয়ে যাবে বা গবেষণা করার যোগ্য হয়ে যাবে এটার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। কেউ এমন কিছু করে থাকলে এটা তার মূর্খতা। বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের ভূমিকা পড়া যেতে পারে।] ●

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শরীফ মুহাম্মদ

হিফযুল কোরআন

সন্তান স্বপ্ন এবং হীরার মুকুট

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

সন্তানকে আমরা আত্মার ধন বলি, চোখের মণি বলি, হৃদয়ের স্পন্দন বলি–বলি মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন! তবুও কি তৃপ্ত হয় সন্তানের প্রতি আমাদের মথিত আবেগ? আসলে আবেগ ও অনুভবের যে জায়গাটায় বসবাস প্রাণের প্রাণ সন্তানের সে জায়গাটা স্পর্শ করার মতো ভাষা আমাদের নেই। পুরনো দিনের বিজ্ঞজনেরা বলেছেন– 'যার সন্তান নেই তার চোখের শান্তি নেই; যার বংশ নেই তার বাহু শক্তিহীন; যার স্ত্রী নেই তার শরীরের সুখ নেই; যার বিত্ত নেই সমাজে তার মূল্য নেই আর যার এর কোনোটিই নেই তার কোনো ভাবনা নেই।' তাই সন্তান জীবনপূর্ণতার এক পরম প্রার্থনীয় অধ্যায়। এর শ্রেষ্ঠ উপমা আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আ.। জীবনসন্ধ্যায় দাঁড়িয়েও উপেক্ষা করতে পারেননি সন্তানশূন্যতার হাহাকার। মুনাজাত-কাতর হয়েছেন প্রভু দয়াময়ের দয়ার দুয়ারে। কুরআনের ভাষায়–

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।' –সূরা সাফফাত (৫৫) : ১০০

সন্তান : আমাদের ধর্মে

আমরা ভুলতে পারি না, মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের পরিচয়ের শেকড় চিনিয়ে দিয়েছেন এইভাবে– 'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই পূর্বে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম ...।' –সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

সুতরাং পিতা ইবরাহীমের বোধ চিন্তা চেতনাই আমাদের বিশ্বাসের শেকড়। তাছাড়া আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে সেই একই সুর। বলেছেন– 'যখন কোনো মানুষ মারা যায় তিনটি পথ ব্যতীত তার আমলের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। (আর সেই চলমান পথ তিনটি হলো) সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং তার জন্যে দোয়া করবে এমন নেক সন্তান।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৩১

লক্ষ করার বিষয় হলো, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মুনাজাতে যে শব্দে সন্তানের আকুতি ভাষা পেয়েছে ঠিক সেই শব্দেই সন্তান জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলে উচ্চারিত হয়েছে নবীজির কণ্ঠে। সালেহ–নেক এবং মুমিন বান্দার যোগ্য সন্তান। সন্তান ও সন্তানের প্রার্থনার বিষয়টি আরও বাঙময় হয়ে উঠেছে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মুনাজাতে। কোরআনের ভাষায়– (তরজমা) এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি–যখন তিনি তার প্রতিপালককে ডেকেছিলেন নিভৃতে, এই বলে– 'হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল। হে আমার প্রভু! তোমাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি। আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের নিয়ে আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুবের বংশের। হে আমার প্রভু! তাকে করো তোমার সন্তুষ্টিধন্য। –সূরা মারইয়াম (১৯) : ২-৬

পাক কোরআনের দীর্ঘ উদ্ধৃতি! হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে দয়াময় আল্লাহর দরবারে সন্তান প্রার্থনা করেছেন। কাতর মিনতি জানিয়েছেন সেই সন্তান যেন দুটি গুণের অধিকারী হয়। এক. আমার এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী হবে। আর আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আলেমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার ও দেরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না, তাঁরা রেখে যান ইলমের উত্তরাধিকার। –জমউল ফাওয়াইদ, হাদীস : ১৬৫; হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখ স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১]

দুই. সেই সন্তান যেন তোমার সন্তুষ্টিধন্য হয়। এক কথায়– নববী ইলমের অধিকারী এবং আল্লাহ তাআলার রিযা ও সন্তুষ্টি ধন্য সন্তান প্রার্থনা করেছেন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেই বলেছেন 'সালেহ' নেক ও যোগ্য সন্তান।

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৪১; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৬৮২

পৃথিবীর সকল সভ্য সচেতন মানুষই সন্তান চায়। আমাদের প্রতি আমাদের আল্লাহ এবং আমাদের নবীর ভাষাতীত অনুগ্রহ হল- আমাদের এই মানবিক চাওয়াটাও কীভাবে আমাদের অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে- সেই পথটা বলে দিয়েছেন। এটাই আমাদের গর্বের ধর্ম ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব। একজন অমুসলিমও সন্তান চায়, চায় একজন মুসলিমও। কিন্তু দু'জনের স্বপ্ন ও মনযিলের মাঝে দুস্তর ব্যবধান!

ভবিষ্যতের সন্তান এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ

সন্তানের কথা যখন আসে, শীত ও শীতবস্ত্রের মতো- সন্তানের ভবিষ্যতের কথাও আসে একই সঙ্গে। ইসলাম আমাদেরকে নিয়ে যেতে চায় আরেকটু গভীরে। ইসলাম আমাদেরকে শেখায়- এখানে দুটি সত্তা। পিতা ও সন্তান কিংবা মাতা ও সন্তান। ইসলাম বলে- যে আবেগ ও যুক্তিতে সন্তানের ভবিষ্যৎ শব্দময় ঠিক একই যুক্তি ও আবেগে প্রতিষ্ঠিত মা বাবার ভবিষ্যৎ। মানে- ভবিষ্যৎ যদি প্রয়োজনীয় লক্ষণীয় এবং সযত্নে লালিত হওয়ার মতো কোনো বিষয় হয় তাহলে সেটা সন্তানের জন্যে যেমন চাই, তেমনি চাই মা বাবার জন্যে। এও সত্য- মা-বাবা আগত আর সন্তান অনাগত। তাই মা-বাবার ভবিষ্যতটা সন্তানের ভবিষ্যতেরও আগে বিবেচ্য! হযরত ইবরাহীম ও হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মুনাজাত আর আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে এই দুই ভবিষ্যতের সার্থক চেতনা ফুটে উঠেছে দ্ব্যর্থহীনভাবে। বলেছেন- জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতার জন্যে সন্তান চাই! সন্তান চাই অপূর্ণ স্বপ্নের পূর্ণতার জন্যে। এই চাওয়া শুভ সুন্দর এবং কল্যাণময়। সন্তানের জন্যে উত্তোলিত হাত আবেগমথিত মুনাজাত পিতা ইবরাহীমের সুন্নত। তবে সেই চাওয়া যেন হয় 'ওয়ালাদে সালেহ' নেক সন্তানের প্রার্থনা।

ওয়ালাদে সালেহ বা নেক সন্তান কী- যদি কেউ এমন প্রশ্ন করেন তাহলে এর সবচেয়ে সরল উত্তর হবে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মতো সন্তান। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নেক সন্তান চেয়েছেন আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে দান করেছেন আর যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মুনাজাতের পিঠে দান করেছেন হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে। আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইসমাঈল ও ইয়াহইয়া আ. কী, তার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ভাষায়। বলেছেন- এমন সৎ ও নেক সন্তান যে তার বাবা মায়ের জন্যে দোয়া করবে। কথা কি- এই 'সালেহ' শব্দটি ইসলামের একটি নিজস্ব পরিভাষা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দোয়ার বাইরেও নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দটি। একটি উদাহরণ দিই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন- (তরজমা) 'আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী সিদ্দীক শহীদ ও সালেহ- যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী।' -সূরা নিসা (৪) : ৬৯

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভাগ্যবান চার শ্রেণির একটি শ্রেণি হলো সালেহ! এও স্মরণ করার মতো- এই চার শ্রেণির ভাগ্যবানদের পথই ভিক্ষা চাই আমরা নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে। বলি- 'তাদের পথ দেখাও যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।' -সূরা ফাতিহা (১) : ৭

সুতরাং যে আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি নিঃশর্ত অনুগত নয়; পরকাল চিন্তায় বিভোর নয় যার দিবানিশি; ইবাদত-বন্দেগীতে উদ্ভাসিত নয় যার যাপিত জীবন- সে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভাগ্যবান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এও কোনো তাত্ত্বিক কথা নয়- যার জীবনে ঈমানের দীপ্তি আভা ছড়ায় না; পরকাল কথা কয় না যার ললাটদর্পণে, ইবাদত-বন্দেগীতে যার মন নেই; হালাল হারাম আর ন্যায় অন্যায় একাকার যার জীবনে- সে কি তার মা বাবার জন্যে দোয়া করবে? নেক ও মা বাবার জন্যে মুনাজাতকাতর সন্তান- তার পূর্ণরূপ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম। তাঁদের জীবনের ছাপ আছে যাদের জীবনে তারাই নেক সৎ ও আদর্শ সন্তান। ইসলাম শিখিয়েছে সন্তান চাইলে আল্লাহর কাছে এমন সন্তানই চাও!

কথা রইল ভবিষ্যতের! ভবিষ্যৎ বলতে আমরা দুটোই বুঝি! দ্ব্যর্থহীন অকাট্য ভবিষ্যৎ- আখেরাত। নেক ও সৎ সন্তানের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি- সন্তান যদি তেমনি নেক সন্তান হয় তাহলে পরকাল যে সার্থক পিতা ও সন্তানের এবং মাতা ও সন্তানের সে নিয়ে হয়তো কেউ তর্ক করবেন না। তারপরও কথা কি- 'আমি মরে গেলে আমার সন্তানের কী হবে'- এটা নিয়ে আমরা যতটা ভাবি- 'আমার সন্তান মারা গেলে তার কী হবে'- সে কথা আমরা

ততটা ভাবি না! অথচ বেঁচে থাকাটা যতটা অনিশ্চিত ঠিক ততটাই সুনিশ্চিত মারা যাওয়াটা। সুনিশ্চিত আমার নিজের মারা যাওয়াটাও। ইসলাম এই সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের মীমাংসাটাই করেছে সবার আগে। তাও আমার এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ। আর যদি এই পার্থিব জীবনের সাময়িক ভবিষ্যৎ ও তার সফলতা ও সার্থকতার কথা বলি তাহলে বলব- হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যে পিতার কথায় শাণিত ছুরির নীচে গলা বিছিয়ে দিয়েছিলেন সে ইতিহাস আমরা জানি। এমন সন্তান যার কপালে জুটে তার পার্থিব জীবনও হয় বেহেশতের ছবি!

চাই স্বপ্ন ও সত্যের সমন্বয়

কিন্তু সুনিশ্চিত এই ভবিষ্যতের দাবি অনেক সময় শূন্যেও হারিয়ে যায় বাঁধনহীন স্বপ্নের ঝড়ো বাতাসে। সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর বুক টান করে দাঁড়ায় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আবদার রক্ষায় খুন করা হয় নিশ্চিত ভবিষ্যতের সমূহ দাবি! পেট ও পকেটের ক্ষুদ্র স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখার মাতাল উন্মাদনায় ধর্ম যুক্তি ও আদর্শের সব আবেদন দলিত হয় অবাধ্য উৎসাহে। মুসলমান হিসাবে একবার ভেবে দেখার সুযোগ হয় না- আমার এই সন্তান আমার সৃষ্টি নয়। আমি তার মালিক কিংবা প্রভু নই। এর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ! আল্লাহই তার প্রভু। তিনি আমাকে দান করেছেন এই ধন! এই ধন এই সম্পদ আমার হাতে আমানত তাঁর। আমরা ভুলে যেতে পারি না আমাদের নবীর এই সতর্কবাণী- 'তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। তোমাদের সকলেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' -সহীহ্ বুখারী, হাদীস : ৫২০০; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস : ১৮২৯

আত্মার আত্মা জীবনের ফুল ও স্বপ্নের প্রদীপ সন্তানের ক্ষেত্রে যেন আমানতের খেয়ানত এবং অধীনস্থের হক লঙ্ঘনের অভিযোগে আসামী না হই ময়দানে হাশরের কাঠগড়ায় সে জন্যে প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়ে বলেছেন- 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি চরিত্রে গড়ে তোল। তোমাদের নবীর ভালোবাসা, তাঁর পরিবারের ভালোবাসা এবং কোরআন তেলাওয়াত। কারণ আল্লাহর ছায়া ব্যতীত যে দিন আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন কোরআন ধারণকারীগণ আল্লাহর আরশের ছায়ায় ঠাঁই পাবে তাঁর নবী এবং বিশেষ বান্দাগণের সঙ্গে।' -তবারানীর সূত্রে-মুহাম্মাদ আলী সাবুনী, মিন কুনুযিস সুন্নাহ, হাদীস : ২৬[1]

আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের ধর্মে যেমন পরকালের শিক্ষা আছে স্বার্থহীন তেমনি পার্থিব এই যাপিত জীবনও উপেক্ষিত নয় এখানে। পবিত্র কোরআনে আমাদের প্রার্থনার ভাষা এইভাবে অঙ্কিত হয়েছে- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে রক্ষা করো দোযখের শাস্তি থেকে।' -সূরা বাকারা (২) : ২০১

আর এ শুধু আবেগে লালিত পুঁথিবাক্য নয়। কী ছিল পবিত্র মদীনা! ব্যবসা কিংবা উৎপাদনের ছোঁয়া ছিল না। অতি সাধারণ এক কৃষি অঞ্চল। এই কৃষি অঞ্চলকে কেন্দ্রে রেখে গড়ে উঠল যে ইসলামী রাষ্ট্র কিংবা জীবনব্যবস্থা- মাত্র একশ বছরের মাথায় গিয়ে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল চষে একজন যাকাতগ্রহীতা খুঁজে পাওয়া গেল না- এই তো আমাদের ইতিহাস!

স্পষ্ট করতে চাই, কবর সত্য, আখেরাত সত্য, বেহেশত সত্য! পেট ও পকেটের লোভী স্বপ্নকে ধরতে গিয়ে অকাট্য সত্যকে উপেক্ষা করতে পারি না। ডেকে আনতে পারি না আমরা সন্তানের সুনিশ্চিত অগ্নিময় দুর্বিষহ ভবিষ্যৎ। বরং সত্য ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দাবিকে কেন্দ্রে রেখে শুনতে হবে স্বপ্নের কথা!

উলামায়ে কেরামের এই ঋণ ভুলবার নয়

এই যে মসজিদের মকতব থেকে মাদরাসার প্রাণ শীতলকরা ছায়া অবধি প্রসারিত কোরআন শিক্ষার পাঠশালা; পাঠশালা সুনিশ্চিত ভবিষ্যতকে অর্থময় করে তোলার- মানবজীবনের জন্যেও এর চাইতে মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো প্রাঙ্গণ নেই। এখানেই সন্তান- নেক ও আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে উঠে- যার চোখভেজা দোয়া শীতল রাখে বাবার কবর, মায়ের সমাধি। মৃত্যুর ফেরেশতা পার্থিব জীবনের সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পারে কিন্তু মকতব ও মাদরাসায় বেড়ে ওঠা নেক সন্তানের বাঁধন ছিন্ন করতে পারে না। সন্তানের আত্মায় পাক কোরআনের বাণী অঙ্কনের মূল্য আমরা বুঝি না। যারা বুঝতেন তাদের একটা ঘটনা বলি। সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পুত্র যেদিন কোরআন পাঠের সবক শুরু করেন, সেদিন

১. হাদীসটি তবারানীতে পাইনি। অন্যসূত্রে 'আলজামিউস সগীরে' বর্ণিত হয়েছে। তবে সনদ বেশ দুর্বল। অবশ্য হাদীসটির মূল বক্তব্য অনেক সহীহ্ হাদীস ও শরীয়তের মূলনীতি দ্বারা সমর্থিত। (আবদুল মালেক)

তার শিক্ষককে হযরত ইমাম রহ. পাঁচ শ কিংবা এক হাজার দেরহাম উপহার পাঠান। আবার যেদিন সূরা ফাতিহা শেষ করেন সেদিনও পাঁচ শ দেরহাম হাদিয়া পাঠান এবং এই বলে সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন–

والله، لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيما للقرآن

খোদার কসম! যদি আজ আমার কাছে এরচে' বেশি অর্থ থাকত তাহলে কোরআনের সম্মানে তাই আপনার খেদমতে পেশ করতাম। –আল্লামা সালেহী রহ. ওকুদুল জুমান : ২৩৩

সত্যিই নবীজির প্রতি যার ঈমান ও আস্থা আছে তার জন্যে তো নবীজির এতটুকু কথাই যথেষ্ট– তিনি বলেছেন– 'যার ভেতরে কোরআনের কোনো অংশ নেই তার ভেতরটা যেন বিরান ঘর।' –জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৯১৩

অন্য হাদীসে বলেছেন– 'তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে কুরআন শেখে এবং শেখায়।' –সহীহ্ বুখারী, হাদীস : ৫০২৭

আর এই হাদীসটি তো আমরা মাঝেমধ্যেই শুনি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– হাফেযে কোরআনকে বলা হবে– পড়তে থাক, উঠতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে সুন্দর সুরে স্পষ্ট উচ্চারণে তেলাওয়াত করতে সেভাবে তেলাওয়াত করতে থাক। সর্বশেষ আয়াতটি যেখানে তেলাওয়াত করবে সেটাই হবে তোমার নিবাস।' –জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৮৩৮

কল্যাণ অর্জন ও সফলতার কী হীরকসংবাদ! আমরা ভুলে যেতে পারি না, বেঈমান ব্রিটিশরা যখন আমাদের এই উপমহাদেশ দখল করে নেয় তখন তারা শুধু বাংলা অঞ্চলেই আশি হাজার মাদরাসা মসজিদের ওয়াক্‌ফ বাতিল করে দিয়েছিল। তারা চেয়েছিল আমাদের সন্তানদের এই মহান অর্জন ও সফলতার এই শীর্ষবিন্দু থেকে বঞ্চিত করতে। আমাদের উলামায়ে কেরাম, সবিশেষ উলামায়ে দেওবন্দ যে বর্ণনাতীত ত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে জ্বালিয়ে রেখেছেন পবিত্র কোরআনের এই দীপক পাঠশালা, আলোকিত রেখেছেন আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্মের আত্মা ও বিশ্বাসের ভুবন– এই ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারব না। এরচেয়েও বড় কথা, এই ঋণের গভীরতাও হয়তো আমরা উপলব্ধি করতে পারব না– অন্তত ইমাম আবু হানীফা রহ. যতটুকু উপলব্ধি করেছিলেন সন্তানকে কোরআন শেখানোর মূল্য!

এই আলো ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে

কেন এই সম্পদকে অমূল্য বলছি তা আমাদের কিছুটা হলেও জানা। দুটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিই। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'তোমরা কোরআন পড়ো। কারণ কোরআন কেয়ামতের দিন তার অধিকারীদের জন্যে সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে।' –সহীহ্ মুসলিম, হাদীস : ১৯১০

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদীসে বলেছেন– 'যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পাঠ করবে সে একটি নেকি পাবে। আর প্রতিটি নেকি হবে দশগুণ। আমি আলিফ, লাম, মীমকে একটি হরফ বলছি না। বলছি– আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। –জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৯১০

অর্থাৎ যেদিন আমরা আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানদের কোনো উপকার করতে পারব না, পার্থিব জগতের সকল অর্জন ফেলে দিয়ে রক্ষা পাবে না কেউ এক সকালের আযাব থেকে সেদিন কোরআন তার অধিকারীদের জন্যে সুপারিশ করবে! তাছাড়া নেকি ও পুণ্য ছাড়া সবকিছু যখন অচল হয়ে পড়বে তখন রাজা বাদশা রূপে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াবে তারা, যারা এখানে হরফে হরফে নেকির বাণিজ্য করে আমলনামায় পুণ্যের পিরামিড তৈরি করে গেছে। এর জন্যে চাই– তেলাওয়াত এবং শুদ্ধ তেলাওয়াত। উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সামান্য ওঠাবসা আছে তারাও বুঝেন, নেকির এই বিশাল অর্জনের জন্যে কোরআন শিখতে হবে আলেমের কাছে। আর যারা 'অর্থ না বুঝে কোরআন পড়ে কী লাভ?' ধরনের অসঅসা বিতরণ করে বেড়ায় তিরমিযী শরীফের এই হাদীসখানা তাদের জন্যে একটি মূল্যবান চপেটাঘাত! আর হেদায়াত তো আল্লাহর হাতে!

কথা হলো, এই প্রয়োজন তো প্রতিটি মুসলমানের এবং মুসলমানের প্রতিটি সন্তানের। নেকি ছাড়া তো কেউ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে না। তাছাড়া নামাযের শুদ্ধতাও তো কোরআন শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু শুয়ে বসে হাঁটতে চলতে অবিরাম বর্ণে বর্ণে নেকি লাভের মহা সুযোগ কি হাফেয কিংবা কোরআনের কিয়দাংশের হাফেয হওয়া ছাড়া সম্ভব? অথচ হতাশা এবং ভয়ের কথা হলো, মুসলমানদের একটা সামান্য সংখ্যাই কোরআন শিখছে এবং শুদ্ধভাবে শিখছে। অনেকেই তো পার্থিব ক্ষুদ্র স্বপ্নের পাকে পড়ে কলিজার টুকরা সন্তানের সুন্দর ও

নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যে রক্ত ও ঘাম একাকার করে অর্জিত অর্থ বৃষ্টির মতো ঢেলে যাচ্ছে। অথচ তাদের পরকালের করুণ পরিণতির কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবে না। মুসলমান ভাই হিসাবে যারা বিষয়টি বুঝেন তারাও কি তাদের কথা ভাববেন না?

আমাদের দৃষ্টিতে তাদের কথা ভাববার এবং এই আলোর জলসায় তাদের তুলে আনার একটি সহজ পথ হলো আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সিলেবাসে উলামায়ে কেরামের পদ্ধতিতে কোরআন ও দীন শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার জন্য দীনি আমলে অভ্যস্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। কিন্ডার গার্টেন ধরনের বিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠানপক্ষ এবং অভিভাবকগণ চাইলে যে কোনো সময়ই এই ব্যবস্থা নিতে পারেন। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন, সাহায্য করবেন– আমাদের বিশ্বাস তাঁদের ঠাঁই হবে আমাদের ইতিহাস আলো-করা সেই কাফেলায়, যারা সব স্বপ্ন ও সুখকে বিসর্জন দিয়ে এই অঞ্চলে জিইয়ে রেখেছেন কোরআনের আলো। আল্লাহর মেহেরবানিতে এক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে। আলেমগণের সিলেবাসে তাদেরই তত্ত্বাবধানে কোরআন ও ইসলাম শিক্ষা রেখে তৈরি হয়েছে অনেক চমৎকার শিশু শিক্ষালয়। এখন এই ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্যে চাই উম্মাহর দরদী এক কাফেলা উদ্যমী মানুষ!

কাগজের মুদ্রা নয়–চাই হীরার মুকুট

এখানে আরেকটি বিষয় সযতনে উল্লেখ করতে চাই। বিষয়টি হলো, আজকাল দীনদার অনেক ভাইই তাদের সন্তানকে হাফেয বানাতে চান। তাদের জীবনসঙ্গিনীগণ এ বিষয়ে আরও গভীর আবেগে আকুল। মুমিন মুসলমান হিসাবে তো এমনটিই হওয়ার কথা। আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তার মা বাবাকে কেয়ামতের দিন এমন এক মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে উজ্জ্বল হবে– যদি সে সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে উদিত হয়! সুতরাং যে কোরআন মুতাবেক আমল করেছে তার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৪৫৫

হাদীসের এই অমর বাণীই সন্তানকে হাফেয বানাবার প্রেরণা যুগিয়েছে উম্মাহর ভাগ্যবান পিতামাতাদের। তাছাড়া যদি এইভাবে ভাবি– আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পবিত্র কোরআনের হাফেয। হাফেয ছিলেন তাঁর প্রিয়সঙ্গী আবু বকর, উমর, উসমান আলী রাযিআল্লাহু আনহুম। হাফেয ছিলেন উবাই ইবনে কাব আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। আর হাফেয ছিলেন বলেই তো উম্মাহর আকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম শাফিঈ রহ. পবিত্র রমযানে ষাটবার পুরো কোরআন তেলাওয়াত করতেন! আমার সন্তান হাফেয হওয়ার অর্থ এই কাফেলায় ঠাঁই করে নেয়া। আর আল্লাহ দয়াময়ের করুণা হলে মা-বাবা পাবেন হীরার মুকুট। এর বিপরীতে দু'দিনের এই পান্থশালার মুঠো মুঠো কাগজের মুদ্রার কী মূল্য আছে–শুনি!

আজকাল ভাগ্যবানের এই কাফেলা দীর্ঘ হচ্ছে। সঙ্গে কোথাও কোথাও পরিবেশ আচরণসহ নানা সংকটের কথাও উচ্চারিত হচ্ছে। অভিভাবকগণ যদি এই অঙ্গীকারে আপসহীন হন–আমার হীরার মুকুট চাই–তাহলে পরিশীলিত শিক্ষক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশসহ কোনো কিছুই সোনার হরিণ হয়ে থাকবার কথা নয়। এই জন্যে আলেমগণের সঙ্গে আবেগ আস্থা ও সামর্থ্য নিয়ে বসতে হবে। কামনা করি– এই পথ প্রসারিত হোক আদিগন্ত। আমীন।●

মানবজাতির হেদায়েতনামা ...

(৫০ পৃষ্ঠার পর)

তা মানবজাতিকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা তো করবেই না; বরং ব্যক্তি ও পরিবারের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষতি সাধনে সহায়ক হবে। শুধু তাই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি-অসুখ ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়বে যা আজ আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আজকের পৃথিবীতে যে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা তার একমাত্র কারণ এই মহাগ্রন্থের জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত না করা, ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা দেখুন! কোথাও এটুকু শান্তি ও নিরাপত্তা আছে কি? ব্যক্তি-ব্যক্তিতে অশান্তি, ঘরে ঘরে অশান্তি, সমাজে-সমাজে অশান্তি, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রেও অশান্তি, শুধু অশান্তিই বিরাজ করছে।

আসুন! আমরা সবাই আমাদের যিনি স্রষ্টা তার শিক্ষা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি। দেখবেন সোনালী যুগের সেই ঐতিহাসিক শান্তি আবার পৃথিবী স্বচক্ষে দেখবে ইনশাআল্লাহ।●

কোরআন বোঝার চেষ্টা : আমাদের করণীয়

মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ

কোরআন বোঝার চেষ্টা

কোরআনের মর্ম যেমন ঐশী আরবি শব্দগুলিও ঐশী। আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে তাঁর কালামের জন্য এই আরবি শব্দ নির্বাচন করেছেন। সুতরাং এই শব্দ-মর্ম দুয়ের সমষ্টি হলো আল-কোরআন। এজন্য কোরআন অনুসারীদের মাঝে যারা কোরআন মোতাবেক আমল করে, শুদ্ধ তেলাওয়াত পারে, কোরআনের অর্থও বোঝে, তারা সর্বোত্তম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে যে কোরআন নিজে শেখে এবং অপরকে শেখায়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেন–

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

(হে নবী) এ কল্যাণময় কিতাব আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা (তাদাব্বুর) করে এবং বোধসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে। –সূরা সাদ (৩৮) : ২৯

কেয়ামতের দিন যারা কোরআনকে পরিত্যক্ত করে রাখে, তাদের বিরুদ্ধে নবীজী অভিযোগ দায়ের করবেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.

আর রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার কওম এই কোরআনকে পরিত্যক্ত করে রেখেছিলো। –সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) কোরআনকে পরিত্যক্ত করে রাখার বিভিন্ন সুরতের মাঝে বলেন–

وَالرَّابِعُ هجر تدبره وتفهمه وَمَعْرِفَةُ مَا أَرَادَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ مِنْهُ.

চতুর্থ প্রকার হলো, কোরআনের উপর ফিকির না করা, কোরআন অনুধাবনের চেষ্টা না করা এবং কোরআনের বাণী দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য তা বোঝার চেষ্টা না করা। –আল-ফাওয়াইদ, ১/৮২

সুতরাং বুঝে বুঝে কোরআন পড়ার সামর্থ্য সত্ত্বেও যারা কোরআন বোঝার বিষয়ে উদাসীন, তারা অনেক বড় মাহরুমির শিকার। আবু বকর আজুররী রহ. (মৃত্যু: ৩৬০ হি.) বলেন–

أَلَا تَرَوْنَ رَحِمَكُمُ اللهُ إِلَى مَوْلَاكُمُ الْكَرِيمِ، كَيْفَ يَحُثُّ خَلْقَهُ عَلَى أَنْ يَتَدَبَّرُوا كَلَامَهُ، وَمَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُ عَرَفَ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَرَفَ عَظِيمَ سُلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَعَرَفَ عَظِيمَ تَفَضُّلِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْوَاجِبَ، فَحَذِرَ مِمَّا حَذَّرَهُ مَوْلَاهُ الْكَرِيمُ، وَرَغِبَ فِيمَا رَغَّبَهُ فِيهِ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ، وَعِنْدَ اسْتِمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ شِفَاءً، فَاسْتَغْنَى بِلَا مَالٍ، وَعَزَّ بِلَا عَشِيرَةٍ، وَأَنِسَ بِمَا يَسْتَوْحِشُ مِنْهُ غَيْرُهُ، وَكَانَ هَمُّهُ عِنْدَ تِلَاوَةِ السُّورَةِ إِذَا افْتَتَحَهَا: مَتَى أَتَّعِظُ بِمَا أَتْلُوهُ؟ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ مَتَى أَخْتِمُ السُّورَةَ؟ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ: مَتَى أَعْقِلُ عَنِ اللهِ الْخِطَابَ؟ مَتَى أَزْدَجِرُ؟ مَتَى أَعْتَبِرُ؟ لِأَنَّ تِلَاوَتَهُ لِلْقُرْآنِ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ بِغَفْلَةٍ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে কিভাবে তার কালাম বোঝার প্রতি আহ্বান করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা করে করে পড়বে, সে আল্লাহকে চিনতে পারবে, আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও কুদরতের কথা জানতে পারবে, মুমিনদের উপর আল্লাহর কী অনুগ্রহ তা আন্দায করতে পারবে, জানতে পারবে তার উপর আল্লাহ তাআলা কী কী ইবাদত ফরজ করেছেন। তখন সে নিজের উপর ঐ ইবাদতগুলো আবশ্যক করে নেবে। দয়ালু আল্লাহ তাকে যে বিষয়ে সতর্ক করেছেন সে বিষয়ে সতর্ক হবে। আল্লাহ যে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন সে বিষয়ে আগ্রহী হবে। তেলাওয়াত করার সময় বা শোনার সময় যার অবস্থা এমন হবে, কোরআন তার জন্য মহা উপশম সাব্যস্ত হবে। তখন সে মাল না থাকলেও মালদারের মতো ঐশ্বর্য বোধ করবে, দল ভারী না হলেও শক্তি বোধ করবে। অন্যরা যেখানে নিঃসঙ্গ সেখানেও তার একাকিত্ব ঘুচে যাবে। যখন কোনো সূরা তেলাওয়াত শুরু করবে তখন তার লক্ষ্য থাকবে, আমি আমার তেলাওয়াত থেকে উপদেশ কিভাবে গ্রহণ করবো, সূরা কখন শেষ করবো এই ফিকিরে থাকবে না। বরং তার লক্ষ হবে, আমার আল্লাহ আমাকে উদ্দেশ্য করে কী বলছেন আমি তা কিভাবে অনুধাবন করতে পারি, কখন সতর্ক হতে পারবো, কখন আমি উপদেশ মতো আমল করবো। কারণ কোরআনের তেলাওয়াত একটি ইবাদত। আর ইবাদত তো উদাসীনতার সাথে হয় না। আল্লাহ আমাদেরকে

আমল করার তাওফীক দান করুন।" –আখলাকু হামালাতিল কোরআন, ১/৩

তিনি আরও বলেন–

فَالْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ إِذَا تَلَا الْقُرْآنَ اسْتَعْرَضَ الْقُرْآنَ، فَكَانَ كَالْمِرْآةِ، يَرَى بِهَا مَا حَسُنَ مِنْ فِعْلِهِ، وَمَا قَبُحَ مِنْهُ، فَمَا حَذَّرَهُ مَوْلَاهُ حَذِرَهُ، وَمَا خَوَّفَهُ بِهِ مِنْ عِقَابِهِ خَافَهُ، وَمَا رَغَّبَهُ فِيهِ مَوْلَاهُ رَغِبَ فِيهِ وَرَجَاهُ، فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ، أَوْ مَا قَارَبَ هَذِهِ الصِّفَةَ، فَقَدْ تَلَاهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَكَانَ لَهُ الْقُرْآنُ شَاهِدًا وَشَفِيعًا وَأَنِيسًا وَحِرْزًا، وَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ، نَفَعَ نَفْسَهُ وَنَفَعَ أَهْلَهُ، وَعَادَ عَلَى وَالِدَيْهِ، وَعَلَى وَلَدِهِ كُلُّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

"সুতরাং বুদ্ধিমান মুমিন তেলাওয়াতের সময় নিজেকে কোরআনের সামনে দাঁড় করায়। তার সামনে কোরআন যেন একটি আয়না। যাতে সে তার কাজ-কর্মের ভালো-মন্দ দেখতে পায়। আল্লাহ তাকে যে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হয়, যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছেন সে বিষয়ে ভীত হয়। তেলাওয়াতের ফলে যার এমন বা তার কাছাকাছি অবস্থা সৃষ্টি হয়, সে যেন হক আদায় করে তেলাওয়াত করলো। যথাযথভাবে কোরআনের যত্ন নিলো। কোরআন এমন ব্যক্তির পক্ষেই কেয়ামতের দিন সাক্ষী হবে, সুপারিশ করবে, আখেরাতে তার বন্ধু ও রক্ষক হবে। যে নিজের ভেতর এমন হালত সৃষ্টি করতে পেরেছে, সে মূলত নিজের এবং পরিবার-পরিজনের সমূহ কল্যাণ সাধন করেছে। তার পিতা-মাতা ও সন্তানসন্ততির উপর দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় খায়ের ও বরকত ঢলে পড়েছে।" –আখলাকু হামালাতিল কোরআন, ১/২৮

ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন–

وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا شَيْءَ أَنْفَعُ لِلْقَلْبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالتدبر والتفكر ... وَهُوَ الَّذِي يُورِثُ الْمَحَبَّةَ والشوق وَالْخَوْف والرجاء والانابة والتوكل وَالرِّضَا والتفويض وَالشُّكْر وَالصَّبْر وَسَائِر الأحوال الَّتِي بهَا حَيَاة الْقلب وكماله، وَكَذَلِكَ يزْجر عَن جَمِيع الصِّفَات والافعال المذمومة وَالَّتِي بهَا فَسَاد الْقلب وهلاكه، فَلَو علم النَّاس مَا فِي قِرَاءَة الْقُرْآن بالتدبر لاشتغلوا بهَا عَن كل مَا سواهَا.

"মোটকথা, কলবের জন্য চিন্তা-ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করার চে' উপকারী কিছু নেই। এটাই অন্তরে আল্লাহর মহাব্বত, আল্লাহর প্রতি শওক-আগ্রহ, গুনাহের ভয়, মুক্তির আশা, আল্লাহমুখিতা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর সমর্পণ, শোকর-সবরসহ ঐ-সকল হালত সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে কলব ও হৃদয় সঞ্জীবন ফিরে পায়, পূর্ণতা লাভ করে। এবং এরই মাধ্যমে ঐ সমস্ত বদকাজ ও মন্দস্বভাব থেকে বাঁচা যায়, যেগুলো কলবকে নষ্ট করে বরং ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং মানুষ যদি জানতো কোরআন বুঝে বুঝে পড়ার উপকারিতা কী, তবে সব ছেড়ে এটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো।" –মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ১/১৮৭

বোঝা গেলো কোরআনের তাদাব্বুর অতি বরকতময় একটি আমল। এর অর্থ হলো, উপদেশ গ্রহণ ও আমল করার লক্ষ্যে ভক্তি ও ভালোবাসাসহ ধ্যানমগ্নতার সাথে প্রতিটি আয়াত পাঠ করা এবং বিচ্ছিন্ন মেজাজ-মর্জি ও চিন্তা-চেতনার প্রভাবমুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার উদ্দিষ্ট মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করা।

যারা আরবি জানেন না, তাদের কাছে কোরআনের তরজমা পৌঁছানো আরবি-জানা প্রাজ্ঞজনদের কর্তব্য। যাতে তারাও যোগ্যতা অনুপাতে কোরআনের বরকত পেয়ে ধন্য হয়। সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইবনে বাত্তাল রাহ. (মৃত্যু: ৪৪৯ হি.) বলেন–

... أَنَّ الْوَحْيَ كُلَّهُ مَتْلُوًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَتْلُوٍّ إِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَلَا يَرِد عَلَى هَذَا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً عَرَبًا وَعَجَمًا وَغَيْرَهُمْ لِأَنَّ اللِّسَانَ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ بِهِ الْوَحْيُ عَرَبِيٌّ وَهُوَ يُبَلِّغُهُ إِلَى طَوَائِفِ الْعَرَبِ وَهُمْ يُتَرْجِمُونَهُ لِغَيْرِ الْعَرَبِ بِأَلْسِنَتِهِمْ

"ওহী (মাতলু/গাইরে মাতলু) সবটুকুই আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই যে, (ওহীর সবটুকু আরবি, অথচ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব-অনারব সবার নিকট প্রেরিত হয়েছেন? কেননা যে ভাষায় ওহী নাযিল হয়েছে তা আরবি বটে, তবে নবীজী তা পৌঁছাবেন আরব জাতির নিকট আর তারা অনুবাদ করে পৌঁছাবে অনারবদের নিকট।" –ফতহুল বারী, ৯/১০

অবশ্য যাদের সময়-সামর্থ্য কম, তাদের উপর কোরআন বোঝার চে' ঈমান ও আমলের দায় বড়। কারণ কোরআন অনুযায়ী ঈমান রাখা এবং আমল করা সবার উপর ফরজ। কিন্তু যাকে বলে নিজে কোরআন বোঝা, সেটা সবার উপর ফরজ নয়। ইবনুল জাওযী রাহ. (মৃত্যু: ৫৯৭ হি.) বলেন–

أَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ عَيْنًا كَعِلْمِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى حِفْظِ مَا لَا يَجِبُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ الْأَوَّلِ وَاجِبٌ، وَطَلَبَ الثَّانِي مُسْتَحَبٌّ، وَالْوَاجِبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ.

"যতটুকু ইলম শেখা ফরজে আইন, যেমন হালাল-হারামের ইলম– এটা প্রাধান্য পাবে

কোরআনের যে অংশ হিফজ করা ওয়াজিব নয় তার উপর। সুতরাং প্রথমোক্ত ইলম তলব করা ফরজ আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম তলব করা মুস্তাহাব। আর ওয়াজিব মুস্তাহাবের উপর প্রাধান্য পায়।" –তালবীসে ইবলীস, ১৩৭

যাই হোক, তাদাব্বুরের বরকত যেন সবার হাসিল হয়, সবার কোরআন বোঝা যেন ত্রুটিমুক্ত হয় এবং ক্রমেই যেন এর বরকত বৃদ্ধি পায় সে জন্য কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের কিছু করণীয় নিম্নরূপ–

১. উদ্দেশ্য ও নিয়ত ঠিক করা

সকল কাজে উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি দুটোই সহীহ হওয়া জরুরি। কর্মপদ্ধতি ঠিক না হলে আল্লাহ তাআলার নেজাম অনুসারে ঐ কাজ ব্যর্থ হয়, কর্মপন্থা সুন্নাহবিরোধী হলে তা ভ্রষ্টতার জন্ম দেয়। আর নিয়ত ঠিক না হলে আল্লাহর দরবারে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসে এসেছে–

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"আমল (কবুল হওয়া না হওয়া) নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকের প্রাপ্য কেবল তা, যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে বলে গৃহীত হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের জন্য বা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য, তবে যে নিয়তে হিজরত করেছে তাই হবে।"

অন্য হাদীসে এসেছে–

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

"আল্লাহ কেবল ঐ আমল কবুল করেন, যা একমাত্র তাঁর জন্য করা হয় এবং শুধু তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।" –সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩১৪০

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ইলম শিখতে হয়, তা যদি কেউ দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে শেখে, তবে কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"
–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

তিরমিযী শরীফের ২৬৫৪ নং হাদীসে এসেছে, নবীজী বলেন–

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

"যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে (আমিও আলেম বলে) গর্ব করার জন্য, কিংবা অল্পবিদ্যা লোকের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য অথবা জনমানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ইলম শেখে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।"

সুতরাং, কোরআন বুঝার চেষ্টার ক্ষেত্রেও আমাদের নিয়ত হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম হাসিল করা, সে অনুযায়ী আমল করা, আত্মার রোগ-ব্যাধি নিরাময় করা, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং সওয়াব হাসিলের মাধ্যমে নিজের আখেরাত গড়া।

২. আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য চাওয়া

দ্বীনী ইলম আল্লাহ তাআলার বহুত বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা যার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন কেবল তাকেই ইলমের দৌলত দান করেন। সূরা আর-রহমানের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

الرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ.

"তিনিই রহমান (দয়াময় প্রভু) তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"

মানুষ কুরআনের সান্নিধ্যে আসুক, শয়তান কখনো তা চায় না। মানুষের কল্যাণের পথ রুদ্ধ করাই তার কাজ। কোনো বান্দা যখন কোরআন পড়া আরম্ভ করে তখন শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে হাজির হয়। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন–

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"তোমরা যখন কোরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়বে)।"
–সূরা নাহল (১৬) : ৯৮

এমনিভাবে সালাতুল হাজত পড়ে পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট কোরআনের সমঝ প্রার্থনা করা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা নবীজীকে যে দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ 'রাব্বি যিদনী ইলমা' বেশি বেশি পড়া উচিৎ। নেককার বান্দা, আলেম-ওলামা এবং পিতা-মাতার দোয়া অত্যন্ত বরকতময়। তাদের খেদমত করে দোয়া নেওয়া একান্ত জরুরি। এক রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন এবং জরুরতে বের হলেন। নবীজীর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তখন বালক বয়সী। তিনি নবীজীর জন্য প্রয়োজনীয় পানি এনে জায়গা মতো রেখে দিলেন। পানি উপস্থিত পেয়ে নবীজী খুবই খুশি হলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন–

ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বুকে জড়িয়ে এই দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে কোরআনের সমঝ দিয়ে দাও।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫

নিম্নোক্ত নূরানি দোয়াটিও মহাব্বতের সাথে বারবার পড়া যায়–

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

"হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা। আপনারই বান্দা-বান্দির সন্তান। আপাদমস্তক আমি আপনার কব্জার ভেতর। আমার বিষয়ে আপনার হুকুম কার্যকর। আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়সঙ্গত। (হে আল্লাহ!) আপনি যে সকল নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন, যা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন বা আপনার কোনো সৃষ্টিকে অবহিত করেছেন কিংবা নিজের কাছেই তা গায়েব করে রেখেছেন, সেই সকল নামের উসিলা দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, কোরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন, আমার বক্ষের আলো করে দিন। আমার দুশ্চিন্তা বিদূরক ও দুঃখ নিবারক বানিয়ে দিন।" –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৩৭১২

৩. গুনাহ থেকে তওবা করা

কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হলো গুনাহ। বিশেষত অহংকার। আল্লাহ তাআলা বলেন–

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

"পৃথিবীতে যারা অন্যায় অহংকার করে বেড়ায়, তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব।" –সূরা আরাফ (৭) : ১৪৬

কোরআন-ওয়ালার ইলম নষ্ট হয় ইলমের অহংকারের কারণে। আর নেককারের আমল নষ্ট হয় দ্বীনদারির অহমিকার কারণে। কেউ একটু কোরআন পড়া এবং বোঝা শুরু করতে না করতেই শয়তান এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, তুমি একজন সাধারণ মানুষ হয়েও অমুকের চে'ও কোরআন বেশি পড়, অমুকের চে'ও কোরআন তুমি ভালো বুঝ, অমুক তোমার সামনে কিছুই না, ইত্যাদি। কেউ আমলের দিকে একটু অগ্রসর হতে না হতেই শয়তান এই ওয়াসওয়াসা দেয় যে, তুমি আমলের দিক থেকে কত উপরে! অমুক বিশিষ্ট ব্যক্তিও তোমার ধারে কাছে নেই। শয়তানের এজাতীয় প্ররোচনা থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, 'গুরুরুল ইলমি ওয়াল ইহতিদা' (ইলমের বড়াই আর দ্বীনদারির অহংকার) বড় খতরনাক ব্যাধি। আর বিনয়-নম্রতা যে কোনো সভ্য-সুশীল মানুষের জন্যই শোভা এবং তা কোরআন-ওয়ালাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। নবীজী ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حَكَمَتَهُ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حَكَمَتَهُ.

"প্রত্যেক মানুষের মস্তকে একজন ফেরেশতার নিয়ন্ত্রণে লাগাম পরানো থাকে। ঐ লোক বিনীত হলে ফেরেশতাকে বলা হয়, এই ব্যক্তির লাগাম উঁচু কর। (ফলে তার মাথা উঁচু হয়)। আর যদি অহংকার করে, তবে বলা হয়, তার লাগাম নিচু কর (ফলে সে লাঞ্ছিত হয়)।" –আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী, হাদীস ১২৯৩৯ (হাইসামী রাহ. বলেন, ৮২/৮ إسناده حسن)

দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতকে ভুলে যাওয়া কোরআনের ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا

"আপনি যখন কোরআন পড়েন, তখন আপনার মাঝে এবং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে আমি এক অদৃশ্য পর্দা টেনে দিই।" –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৪৫

হৃদয় হলো ইলমের আধার। চোখ-কান-জিহ্বা ইলমের প্রবেশপথ। এগুলোকে গুনাহ থেকে পাক রাখা জরুরি। আল্লাহর ভয়, খাশিয়াত ও তাকওয়া ইলম প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"আল্লাহকে ভয় করে কেবল তারা, যারা ইলমের অধিকারী।" –সূরা ফাতির (৩৫) : ২৮

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আর আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদেরকে ইলম দান করবেন, তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।" –সূরা বাকারা (২) : ২৮২

বদরুদ্দীন যারকাশী রাহ. (মৃত্যু: ৭৯৪ হি.) বলেন–

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ وَفَهْمٌ وَتَقْوَى وَتَدَبُّرٌ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ لَذَّةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا.

"যার কোরআন বোঝার প্রস্তুতিমূলক ইলম নেই,

বোধ-বুদ্ধি, তাকওয়া-পরহেযগারি এবং চিন্তা-ভাবনা করার মতো যোগ্যতা নেই, সে কোরআনের মজা কিছুই বুঝবে না।" –আল-বুরহান, ২/১৫৫

৪. কোরআন ও আহলে কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা

কোরআনের সম্মান ঈমানের দাবি আর অসম্মান কুফর। এজন্য মুমিনের কর্তব্য, কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা, লেখা, দেখা ও রেখে দেয়ার কাজ অত্যন্ত যত্নের সাথে করা। অর্থ ও মর্ম আলোচনাকালে শ্রদ্ধাপূর্ণ সংযত ভাষা ব্যবহার করা। সাধ্যমত শরীর-কাপড় ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। কোলাহলমুক্ত পরিবেশে ভক্তি ও ভালোবাসা-মথিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করা। অন্তরে সন্ত্রস্তভাব জাগ্রত রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতীকসমূহকে সম্মান করবে, সেটা হবে অন্তরের আল্লাহ-ভীতির পরিচায়ক।" –সূরা হজ্ব (২২) : ৩২

কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধার অংশ হলো আহলে কোরআন অর্থাৎ হাফেজ, কারী এবং আলেমগণকে সম্মান করা ও ভালোবাসা। নবীজী তো দুইজন শহীদ সাহাবীর মাঝে যিনি কোরআন বেশি জানতেন তাকে আগে কবরে দিতেন। (সহীহ বোখারী, ১৩৪৭) এমন কি নবীজী ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

"শুভ্রকেশী বৃদ্ধকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অংশ। তেমনি কোরআনের ঐ সকল ধারক-বাহকদের সম্মান করা, যারা কোরআনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি যেমন করে না শৈথিল্য প্রদর্শনও করে না। ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও তাই।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৪৩

অন্য হাদীসে এসেছে–

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً.

"কেয়ামতের দিন কোরআন এসে (আহলে কোরআনের জন্য সুপারিশ করে) বলবে, হে আমার রব্ব! এই ব্যক্তিকে সাজিয়ে দাও। তখন লোকটিকে সম্মানের তাজ পরানো হবে। এরপর কোরআন আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এর সাজ আরও বাড়িয়ে দাও। তখন তাঁকে এক জোড়া সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর কোরআন বলবে, হে মালিক! তুমি তাঁর প্রতি রাজি-খুশি হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রাজি হয়ে যাবেন। তাঁকে বলা হবে, একেক আয়াত পড় আর জান্নাতের একেক স্তরে উঠতে থাক। অনন্তর প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে তাঁকে একেকটি নেকি বাড়িয়ে দেওয়া হবে।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৫

(قال الترمذي : حديث حسن)

আল্লাহ তাআলা বলেন–

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

"এসকল উপদেশ স্মরণ রেখো। আর আল্লাহ যে সমস্ত জিনিসকে মর্যাদা দিয়েছেন তার মর্যাদা যে রক্ষা করবে, আল্লাহর কাছে তার ঐ কাজ তার জন্য কল্যাণকর হবে।" –সূরা হজ্ব (২২) : ৩০

৫. উস্তায ও মুরুব্বির তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা

আল্লাহ তাআলা কোরআন নাযিল করে সাথে নবীজীকে কোরআনের শিক্ষকরূপে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদেরই একজনকে তাদের মাঝে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিলো।" –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৪

কোরআনের শিক্ষক হিসাবে নবীজীর আগমন অতি বড় নেয়ামত। সাহাবায়ে কেরাম এ নেয়ামতের কদর বুঝতেন। এ জন্য তারা আরবি ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের তালিম গ্রহণ করতেন নবীজীর কাছ থেকে। নবীজীর ওয়ারিশ হিসাবে এখন যারা কোরআনের শিক্ষক, আমাদের উচিত তাদেরও ভরপুর কদর করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বের সাথে আমাদেরকে তাশাহহুদ পড়া শেখাতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে কোরআনের একেকটি সূরা শেখাতেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৩

একবার নবীজী চারজন সাহাবীর নাম ঘোষণা করে হুকুম করেন–

خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

"তোমরা কোরআন গ্রহণ করো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছ থেকে; সালেম, মুআয ও উবাই ইবনে কাআবের কাছ থেকে।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৯৯

কিছু লোক এসে নবীজীর কাছে আরজ করলো,

أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ

"আমাদের সাথে এমন কিছু লোক দিন, যারা আমাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ শেখাবে। তখন নবীজী সত্তরজন আনসারী সাহাবী পাঠালেন, যাদেরকে ক্বারী বলা হতো।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৭৭

সাহাবায়ে কেরাম আরবি ভাষাভাষী, তাঁদের কাছে লিখিত কোরআনও ছিলো, তবু নবীজী কোরআন শেখার জন্য উস্তাজের পথনির্দেশ গ্রহণ করার আদেশ করেছেন, শিক্ষক পাঠিয়েছেন। প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ রাহ. বলেন–

عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট আমি মুসহাফ (কোরআন) সামনে রেখে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। (আমার পড়া সহীহ হলো কি না, আয়াতের বিশেষ কোনো মর্ম আছে কি না তা জানার আশায়) আমি প্রতি আয়াত শেষে (উস্তাদজির বক্তব্য শোনার জন্য) থেমে তাকে প্রশ্ন করেছি।" –আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী, হাদীস ১১০৯৭

আরও বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ

"তাবেঈ আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী বলেন, আল্লাহর রাসূলের যে সমস্ত সাহাবী আমাদেরকে কোরআন পড়াতেন, তাঁরা বলতেন যে, নবীজীর নিকট তাঁরা দশ আয়াত করে পড়তেন। দশ আয়াতের ইলম ও আমল শেখা শেষ না হলে অন্য দশ আয়াত শুরু করতেন না। তাঁরা বলেন, আমরা ইলম ও আমল উভয়টা শিখেছি।" –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৩৪৮২

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ قَالُوا: وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا نَبِيَّ اللهِ، وَفِينَا كِتَابُ اللهِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: ثَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَوَلَمْ تَكُنِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمْ شَيْئًا؟ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ، إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ

"তোমরা ইলম অর্জন করো তা বিদায় নেয়ার আগে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইলম কিভাবে বিদায় নেবে– হে আল্লাহর নবী! আমাদের মাঝে তো আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় নবীজী রুষ্ট হলেন অতঃপর বললেন, তোমাদের মরণ হোক! বনি ইসরাঈলের মাঝে কি তাওরাত-ইঞ্জিল ছিল না? কিন্তু (ইলম অর্জন ও দীন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) শুধু কিতাব তাদের কোন কাজে আসেনি। আরে! ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ (আহলে ইলম থেকে ইলম শিখে নেয়ার আগেই) আহলে ইলমের মৃত্যু হওয়া, ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ আহলে ইলম বিদায় নেওয়া।" –সুনানে দারেমী, হাদীস ২৪৬

নবীজীর এই নির্দেশ মোতাবেক সাহাবায়ে কেরামের মৃত্যুর আগে আগে তাঁদের কাছ থেকে তাবেঈগণ ইলম শিখে নিয়েছেন। এঁদের কাছ থেকে দ্বীন শিখে নিয়েছেন তাবে-তাবেঈনে কেরাম। তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেন এঁদের পরবর্তীরা। এভাবে প্রজন্মপরম্পরায় কোরআন-হাদীস শেখার ধারা প্রবর্তন করে নবীজী ইসলাম হেফাজতের সবচে' শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং ইসলামে (খৃস্টধর্ম বিনাশী সেন্ট পলের মতো) কোনো ভুঁইফোড় ব্যক্তি নিজেকে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বরূপে সমঝদার মানুষের নিকট প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, এমন ব্যক্তির কাছ থেকে কখনোই দ্বীন গ্রহণ করা হয় না। যিনি সমকালীন অধিকাংশ আলেম-ওলামার আস্থাভাজন নন, যার দ্বীনী ইলম অর্জনের উৎস আমাদের নিকট অজ্ঞাত, ইলম-আমলে যার উস্তাদগণের ঊর্ধ্বক্রম (সনদ-সূত্র) স্বীকৃত নয়, তার কাছ থেকে ইলম অর্জন করা নিরাপদ নয়। হতে পারে ইনি কোনো গোপন শত্রুর হাতে রিক্রুট হয়ে আছেন!

তাছাড়া আমরা সাধারণ মানুষ যদি যাচাই-বাছাই না করে যার তার বই পড়ি এবং যেমন তেমন লোকের বক্তব্য শুনি, তরজমা-তাফসীর পড়ি, তাহলে আমাদের ঈমান-আমল শংকার মধ্যে পড়ে যাবে। আমরা বুঝবো না, দ্বীনের কোন বিষয়ের জন্য কেমন দলিল আবশ্যক। তেমনি কোনটি দলিল আর কোনটি দলিল নয় তাও ধরতে পারবো না। দলিলের নামে কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কি না তাও আমরা সহজে বুঝে উঠতে পারবো না।

এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে বর্ণিত যে,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

"প্রত্যেক প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য নেককার উত্তরসূরিরা (পূর্বসূরিদের কাছ থেকে) এই দীনি ইলম ধারণ করবে। আর গুলুকারীদের বিকৃতি, ইসলামবিরোধী বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা বিদূরিত করবে (দ্বীনের স্বরূপ সংরক্ষণ করবে)।" –শরহু মুশকিলিল আছার, ৩৮৮৪

বোঝা গেল, দ্বীনী ইলমের শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কে নেককার হতে হবে। নেককার না হয়ে কেউ আলেম হতে পারবে না।

সাহাবী আবু দারদা রা. বলেন–

إِنَّكَ لَنْ تَكُونَ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ مُتَعَلِّمًا، وَلَنْ تَكُونَ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ بِمَا عَلِمْتَ عَامِلًا

"তুমি কারো কাছে পড়া ছাড়া কখনো আলেম হতে পারবে না এবং ইলম অনুযায়ী আমল না করলেও আলেম হতে পারবে না।" –সুনানে কুবরা বায়হাকী, হাদীস ৪৮৮

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহ. (মৃত্যু: ১১০ হি.) বলেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

"কোরআন-হাদীসের এই ইলম হলো দ্বীন। সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করবে ভেবে বুঝে দেখো।" –ভূমিকা, সহীহ মুসলিম

মাকহুল রাহ. (মৃত্যু: ১১৩ হি.) বলেন–

لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا عَنْ مَنْ شُهِدَ لَهُ بِالطَّلَبِ

"দ্বীনী ইলম কেবল ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে শেখা হবে, যার ইলম অর্জনের ব্যাপারে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।" –হিলয়াতুল আউলিয়া, আবি নুআইম আস্ফাহানী (মৃত্যু: ৪৩০ হি.) ৫/১৭৭

ইবনে মুফলিহ রাহ. (মৃত্যু: ৭৬৩ হি.) লিখেছেন,

وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهُ عَنِ الْعُدُولِ الصَّالِحِينَ الْعَارِفِينَ بِمَعَانِيهَا

"কোরআন শেখার অন্যতম আদব হলো, আস্থাযোগ্য নেককার এবং কোরআন বুঝে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে কোরআন শেখা।" –আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ, ২/৩১৩

ইমাম যুহরী রাহ. (মৃত্যু: ১২৪ হি.) বলেন–

لَا يُرْضِي النَّاسَ قَوْلُ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ، وَلَا عَمَلُ عَامِلٍ لَا يَعْلَمُ

"বে-আমল আলেমের এবং বে-ইলম আবেদের কথা মানুষকে তুষ্ট করবে না।" –সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী, ৫/৩৪১

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী রাহ. (মৃত্যু: ৩৭৩ হি.) বলেন–

ينبغي أن لا يؤخذ العلم إلا من أمين ثقة لأن قوام الدين بالعلم، فينبغي للرجل أن لا يأتمن على دينه إلا من يجوز أن يؤتمن على نفسه

নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছ থেকেই শুধু ইলম গ্রহণ করা উচিৎ। কেননা ইলম হলো দ্বীন ও ঈমানের মূল ভিত্তি।" –বুস্তানুল আরিফীন, ৩০৯

সুতরাং পূর্ব প্রজন্মের আলেমগণের মৃত্যুর আগে আগে পরবর্তী প্রজন্মের বিদ্যার্থীরা তাঁদের থেকে কোরআন-হাদীস শিখে নেবে এবং বুঝে শুনে উস্তাদ নির্বাচন করবে। তেমনি দ্বীন শেখার কোনো সহযোগী বই-কিতাব এবং কোরানের তরজমা-তাফসীর পড়ার জন্যও লেখক যাচাই করে নেবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো আর সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।' –সূরা তাওবা (৯) : ১১৯

মোটকথা, যিনি কোরআন-সুন্নাহর প্রতিষ্ঠিত অর্থ এবং উম্মতের ঐকমত্যের ব্যতিক্রম করেন না, যার কথাবার্তা একপেশে-অমার্জিত এবং সহিংস নয়, যিনি শরীয়তের ছোট ছোট বিষয়ও নিজের জীবনে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন, যিনি ইলম ও আমলে আদর্শস্থানীয় উস্তাদের দীর্ঘ সান্নিধ্য পেয়েছেন, আমরা এমন কাউকে উস্তাজ ও মুরুব্বি বানাবো। তাঁর তত্ত্বাবধানে কোরআন বোঝার চেষ্টা করবো। যাকে তাকে মুরুব্বি মেনে আমরা নিজের দ্বীন ও ঈমানকে অসম্মান করতে পারি না।

কোরআন বুঝার বিভিন্ন স্তর

আল্লাহ তাআলা বিশ্বের সকল শ্রেণীর সকল ভাষা ও মেধা-যোগ্যতার মানুষকে বারবার আহ্বান করে বলেছেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে?" –সূরা কামার ১৭, ২২, ৩২, ৪০

যিনি আরবি জানেন, তিনি যদি তাঁর স্তর থেকে শুধু কোরআনের সরল অর্থটুকু অনুধাবন করার চেষ্টা করেন, এতেই তিনি এ পরিমাণ উপদেশ লাভ করবেন, যা তার অন্তরকে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় আপ্লুত করে দেবে। ঈমান ও ইয়াকীনের নূরে নূরান্বিত করে দেবে। আর তিনি কোরআনের সকল আদেশ মান্য করার এবং সকল নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার বিপুল প্রেরণা লাভ করবেন। ঠিক তেমনি যিনি আরবি জানেন না, তিনিও যদি নির্ভরযোগ্য শাব্দিক অনুবাদ, মর্মানুবাদ কিংবা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ পড়েন বা শোনেন, তবে তিনিও পর্যাপ্ত উপদেশ লাভ করবেন এবং দ্বীন ও

শরীয়তের অনুসরণের মাঝে প্রশান্তি খুঁজে পাবেন।

মোটকথা, কোরআন এতটা সহজ যে, আরবি থেকে কিংবা অনুবাদ পড়ে বা শুনে সাধারণ যে কেউ একটু চেষ্টা করলেই কোরআনের সাধারণ উপদেশ এবং স্বতঃসিদ্ধ হেদায়েত বুঝে নিতে পারবে; কিন্তু কোরআনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বিধান উদ্ভাবন এবং ভুল ব্যাখ্যার জবাব দিতে সক্ষম হবে কেবল অসাধারণ জ্ঞানী-গুণীরা। এজন্য প্রত্যেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে একটি ক্ষুদ্র দল নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে এবং বহুমাত্রিক যোগ্যতা অর্জন করে কোরআনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে জাতিকে নির্দেশনা দান করবে। আল্লাহ তাআলা সে বিষয়টির প্রতি মুমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেক বড় দলের একটি অংশ বের হবে, যেন তারা দ্বীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং স্বজাতিকে সতর্ক করে যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসে। যাতে তারা সতর্ক হয়।" – সূরা তওবা (৯) : ১২২

আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে সমান যোগ্যতা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাননি। দেখা যায়, একজন মানুষ এক বিষয়ে যোগ্য হলেও অন্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সুতরাং যে যার বিষয়ে সীমাবদ্ধ থেকে প্রয়োজনের সময় প্রয়োজন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞজনের পরামর্শ মেনে কাজ করা স্বাভাবিক নিয়ম। আল্লাহ তাআলা এই দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"তাদের কাছে যখন শান্তির বা ভীতির কোনো খবর আসে, তখন তারা (যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা (দ্বীনী-দুনিয়াবি) কর্তৃত্বশীল, তাদের কাছে ঐ খবর পাঠিয়ে দিতো, তবে গভীর দৃষ্টিসম্পন্নরা মূল ব্যাপারটি বুঝতে পারতো।" –সূরা নিসা (৪) : ৮৩

আর আমরা একটি কথা সহজেই বুঝতে পারি, সকল সাহাবী দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ উপদেশ কোরআন থেকে লাভ করেছেন। কিন্তু যাকে বলে কোরআন গবেষণা ও তাফসীর, মাসআলা বলা, ফতোয়া দেওয়া বা জটিল সমস্যার সমাধান করা– তা করতেন কেবলমাত্র খোলাফায়ে রাশেদীন, মুআয ইবনে জাবাল, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখের মতো মাত্র কয়েকজন মহান সাহাবী। অন্য সাহাবীরা কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং তাদাব্বুরও করতেন। কিন্তু তাফসীর ও মাসআলার প্রয়োজন হলে প্রথমোক্তদের শরণাপন্ন হতেন। পরবর্তীকালেও এই উম্মতের যারা আরবি ভাষা ও হাদীসশাস্ত্রসহ ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন, কেবল তারাই তাফসীর করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا، وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ، وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ، وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ

"কোরআন তাফসীরের চার স্তর: এক প্রকার আরবরা (এবং আরবি-জানা লোকেরা) আরবি থেকেই বুঝতে পারে। আরেক প্রকার তাফসীর না-জানার ওযর (আরব-অনারব) কারো থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয় প্রকার তাফসীর জানেন আলেমগণ। আর চতুর্থ প্রকার তাফসীর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।" –তাফসীরে তাবারী, ইবনে জারীর (মৃত্যু: ৩১০ হি.) ১/৭০

সুতরাং আমাদের যাদের বিচরণ প্রথম দুই স্তরে, তাদের করণীয় কেবল তৃতীয় স্তরে পৌঁছা স্বীকৃত মুফাসসিরগণের তরজমা ও তাফসীর পড়া। উস্তাজের তত্ত্বাবধানে পড়া। বুঝে না আসলে কিংবা আলেম-ওলামার চিন্তা-চেতনা ও কর্মপন্থার বিপরীত কিছু মাথায় আসলে উস্তাযের শরণাপন্ন হওয়া, নিজ থেকে বাড়তি কিছু না বলা।

৬. আরবি ভাষা শেখার চেষ্টা করা

যে আরবি জানে, তার কাছে আরবি ভাষায় নাযিল হওয়া কোরআন পড়ার মজাই আলাদা। এটা কোরআন বোঝার চেষ্টায়রত যে কোনো ব্যক্তি স্বীকার করবেন। আমার আর আমার প্রিয়তমার মাঝে যদি কথা বলার জন্য দোভাষীর প্রয়োজন হয়, তাহলে এটা যেমন বড় আফসোসের ব্যাপার, কোরআনের মাধ্যমে আমার আল্লাহ আমাকে কী বলছেন তা বোঝার জন্য অনুবাদ নির্ভর হওয়াটাও তেমনি ভীষণ কষ্টের ব্যাপার। আমি অনুবাদের মাধ্যমে ভাসা ভাসা অর্থ হয়তো বুঝবো, কিন্তু কোরআনী শব্দের পরতে পরতে নিহিত নিগূঢ় রহস্যমালা, আরবি বর্ণনাশৈলীর অশেষ-অসীম তাৎপর্য, বিধান আহরণের সূক্ষ্ম ব্যাকরণিক তত্ত্ব, ভাষা-সাহিত্যের অনুপম মাধুর্য এবং আলংকারিক ছন্দ-সৌন্দর্য– এসব আমি কোথায় পাবো? আল্লাহ তাআলা বলেন– إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আমি একে আরবি কোরআনরূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" –সূরা ইউসুফ (১২) : ২

বোঝা গেলো, যারা আরবি ভালো পারবে তারা কোরআন ভালো বুঝবে। এজন্য কোরআনের ভাষা না শিখে এবং অন্যান্য পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন না করে কোরআন-গবেষকের আচরণ করা অনধিকার চর্চার শামিল। আল্লাহ তাআলা কোরআন থেকে মাসআলা-মাসায়েল বের করার আদেশ করেছেন। সুতরাং কোরআন থেকে মাসআলা বের করা যেমন ওয়াজিব, আল্লাহর এ আদেশ পালন করার জন্য যা যা পূর্ব শর্ত, তা পূরণ করাও ওয়াজিব। এই জাতীয় পূর্ব শর্তসমূহ পূরণ না করে যারা কোরআন নিয়ে মন্তব্য করে, তাদের সম্পর্কে নবীজী বলেন,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি কোরআন সম্বন্ধে ইলম ছাড়া মন্তব্য করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৬৯

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। জেনে রেখো, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।" –সূরা বনি ইসরাঈল (১৭) : ৩৬

৭. কোরআনের মূল আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা

কোরআনের আলোচ্য বিষয় মূলত আল্লাহর পরিচয়, তাওহীদ, রেসালত, আখেরাত, ইবাদত, মোআমালা, মোআশারা, সিয়াসত, আত্মশুদ্ধি, ভালো গুণ অর্জন, মন্দ গুণ বর্জন, মানুষের অধিকার, আল্লাহর হক, আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠন ইত্যাদি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন মহাকাশ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি যদি কোরআন তাফসীরের স্বীকৃত উসুল মোতাবেক কোরআন থেকে আবিষ্কার করা হয়, তবে তা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এগুলো কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের ভেতর পড়ে না। এসবের পেছনে পড়ে থাকলে কোরআনের মূল বিষয়গুলোর বুঝ-সমঝ হাসিল হয় না। একবার খেজুর চাষে পরাগায়নের প্রচলিত পদ্ধতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম সে বছর আর ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন না। কিন্তু খেজুরের ফলন কম হলো। তখন নবীজী বললেন–

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"তোমাদের এ-জাতীয় দুনিয়াবি বিষয় তোমরা নিজেরাই ভালো বোঝো।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৬৩

অর্থাৎ এমন অনেক উন্মুক্ত বিষয় আছে, যে ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ নিরব-নিশ্চুপ (অর্থাৎ যা নস বা নসের ইল্লত কোনোটার আওতায় আসে না), এগুলোকে মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষের নিজেদের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও আবিষ্কারের হাওয়ালা করে দিয়েছেন। এমন বিষয় যখন সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয় এবং ঈমান-আমলের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তখন তার উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ভালো-মন্দ মানুষ নিজেরাই ঠিক করে নেবে। একেই নবীজী বলেছেন, তোমাদের এ-জাতীয় দুনিয়াবি বিষয় তোমরা নিজেরাই ভালো বোঝো। সুতরাং তোমাদের মর্জি, কী করবে না করবে নিজেরা ঠিক করে নাও।

৮. সালাফে সালেহীনের বুঝের মাধ্যমে নিজের বুঝকে পোক্ত করা

কোরআন যে সমস্ত মৌলিক আকিদা ও বিধিবিধান প্রচারের জন্য আগমন করেছে, তার কোনোটি এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত-অনুদঘাটিত রয়ে গেছে এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। কারণ এর অর্থ হলো কোরআনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা যে, আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত মৌলিক বিষয় শিক্ষা দানের জন্য কোরআন পাঠিয়েছেন, এযাবৎ কাল পর্যন্ত কোরআন সেই শিক্ষা মানুষকে দান করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোরআন একটি দুর্বোধ্য কিতাব। নাউযুবিল্লাহ!

অতএব, কোরআনের কোনো আয়াত থেকে কেউ যদি এমন কোনো অর্থ বুঝে, যা সাহাবাযুগ থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, শরীয়তের চূড়ান্ত বিধান ও মহান পূর্বসূরীগণের ঐকমত্য-ভিত্তিক অর্থের পরিপন্থী, তবে আমরা নিশ্চিত ধরে নেবো, এটা কোরআনের অর্থ নয়, বিকৃতি। এটা কোরআনের ব্যাখ্যা নয়, অপব্যাখ্যা।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. (মৃত্যু ১০১ হি.)-এর যামানায় কিছু লোক তাকদীর অস্বীকার করে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে কোরআন-হাদীস থেকেই দলিল দেওয়া শুরু করলো! জনৈক ব্যক্তি খলিফার কাছে চিঠি লিখে বিষয়টির সমাধান জানতে চাইলেন। মহান খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয উত্তরে লিখেছেন–

وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا. لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ، وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ، وَمَا يُقْدَرْ يَكُنْ، وَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا نَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا

"যদি তোমরা প্রশ্ন তোলো যে, আল্লাহ অমুক আয়াত কেন নাযিল করেছেন, ঐ কথা আল্লাহ কেন বলেছেন! (যা থেকে অনুমান হয়, তাকদীর বলতে কিছু নেই! আসলে আয়াতের উপর এমন অর্থ

আরোপ করা ভুল) কারণ, তোমাদের পঠিত আয়াত সাহাবাগণও পড়েছেন এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা তাঁরা বুঝেছেন, তোমরা বুঝোনি। তোমাদের পঠিত এই আয়াতসমূহ পড়ার পরও তাঁরা তাকদীরে বিশ্বাসী ছিলেন। কার কী দুর্ভাগ্য আছে তা লেখা হয়ে গেছে আর তাকদীরে যা আছে তা ঘটবেই। আল্লাহ যা চান কেবল তাই হয়, আল্লাহ যা চান না তা কখনোই হয় না। আমরা নিজেরা নিজেদের লাভক্ষতির মালিক নই– এমন বিশ্বাস সত্ত্বেও পূর্ববর্তীগণ নেক আমল করতেন এবং খারাপ কাজ করতে ভয় পেতেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৩

সুতরাং আয়াতের যে মর্ম আমার বুঝে আসবে, তা আমি নবীজীর নির্দেশনার সঙ্গে অবশ্যই মিলিয়ে নেবো। আল্লাহ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর (কোরআনের) আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমরা তোমাদের আমল বিনষ্ট করো না।" –সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৩৩

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"আর আমি তোমার উপর এ-কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে তাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয় ব্যাখ্যা করে দাও।" –সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

এজন্য কোরআনের ঐ বুঝই কেবল গ্রহণযোগ্য, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার আলোকে সাহাবা-যুগ থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীত বুঝ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল বলে গণ্য। তাছাড়া নবীজী বলেছেন–

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ الى آخر الحديث.

"শুনে রাখো! আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তার সাথে অনুরূপ আরও দান করা হয়েছে। সাবধান! আশংকা হয়, কেউ পেট পুরে খেয়ে আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বলতে থাকবে, তোমরা শুধু এই কোরআন আঁকড়ে ধরো। সেখানে যা হালাল পাবে তাই শুধু হালাল জ্ঞান করবে। আর যা সেখানে হারাম পাবে তাই কেবল হারাম জানবে। (অথচ শরীয়তের হালাল-হারাম কোরআনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।) ওহে! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা এবং সুঁচালো ছেদন-দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত হালাল নয়। (যদিও তা কোরআনে নেই!)...। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৬

এতে বোঝা যায়, নবীজী তাঁর বাণী, কর্ম ও সমর্থনের মাধ্যমে কোরআনের মৌলিক অংশ ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। আর হালাল-হারামের বহু বিধান কোরআন নিজে সুস্পষ্টভাবে না বলে নবীজীর যিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে। কোরআনে সালাত, সওম, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির আদেশই কেবল রয়েছে, কিন্তু এর পূর্ণ বাস্তবরূপ শিখিয়েছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং নবীজীর সুন্নাহর আলোকে কোরআন বোঝা কোরআনেরই বড় দাবি।

পূর্ববর্তীগণ ইলম-আমলে পরবর্তীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ

সালাফ হলেন কোরআন-সুন্নাহর বাস্তব নমুনা, দীন ও শরীয়তের মুখপাত্র। এজন্য ইলম ও আমলে সালাফে আউয়াল তথা সাহাবীগণ পরবর্তীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নবীজীকে পেয়েছেন। কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তেমনি যারা সাহাবীকে পেয়েছেন তাঁরা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এটা এই উম্মতের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতেন–

أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ

এরা হলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী-সাহাবী। তাঁরা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠজন। তাঁদের হৃদয় সবার চেয়ে ভালো। তাঁরা অন্যদের চেয়ে গভীর ইলমের অধিকারী। আর তাঁরা সবচে বেশি লৌকিকতামুক্ত। আল্লাহই নবীর সান্নিধ্যের জন্য এবং দীন কায়েম ও বাস্তবায়নের জন্য তাঁদের নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝে নাও। তাদের বক্তব্য অনুসরণ কর। যথাসম্ভব তাদের আখলাক ও সীরাত গ্রহণ কর। কারণ, তারা সঠিক হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। –জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার ২/৯৭

ইলম-আমলে শ্রেষ্ঠ যুগের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ (অর্থাৎ যারা আমাকে পেয়েছে তাঁরা)। এরপর তারা যারা তাদের পরে আসবে (তাবিঈর যুগ)। এরপর হলো তারা, যারা তাদের পরে আসবে (তাবে-তাবেঈর যুগ)। –সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬৫২

সুতরাং আমাদের নিজেদের বুঝকে সাহাবায়ে

কেরামের বুঝের সাথেও মিলিয়ে নিতে হবে। যারা সাহাবায়ে কেরামের বুঝ গ্রহণ করবে, তারা মুক্তি পাবে। নবীজী ইরশাদ করেন–

...وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

...বনি ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিলো। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। একটি ছাড়া সবগুলো দল জাহান্নামে যাবে। সাহাবীরা আরজ করলেন, কোন সে দল ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী বললেন, আমি ও আমার সাহাবীরা যা কিছুর উপর আছি তার উপর যারা থাকবে। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৪১

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা ঈমানে প্রথমে অগ্রগামী হয়েছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। –সূরা তাওবা (৯) : ১০০

এজন্য বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের মহান পূর্বসূরী সালাফে সালেহীন এবং তাদের অনুসারী আলেমগণ আমাদের চেয়ে কোরআন বেশি বুঝতেন। কোরআনের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা, সর্বস্তরে কোরআন বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা এবং কোরআনি দাওয়াতের প্রেরণা আমাদের চেয়ে তাঁদের অন্তরে বেশি ছিলো। আর তাদের বুঝ গ্রহণ করাই মুক্তির পথ। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. (মৃত্যু ১০১ হি.) বলেন–

خذوا من الرأي ما كان يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم

কোরআন-সুন্নাহর ঐ বুঝই গ্রহণ কর, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সালাফের) বুঝের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ তাদের ইলম তোমাদের চে'ও বেশি। –ফজলু ইলমিস সালাফ, ৪

মনে রাখতে হবে, সালাফে সালেহীনের প্রতি যে কটু মন্তব্য করে, অন্তরে তাদের প্রতি যে অভক্তি পোষণ করে, সে হয় বেদীন, না হয় নাদান দোস্ত। পূর্বসূরীদের প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ যেন অন্তরে না আসে, এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনে গত হয়েছেন। আর ঈমানদারগণের বিষয়ে আমাদের অন্তরে কোন দ্বেষ বাকি রেখো না। আমাদের মালিক! তুমি বড় স্নেহময়, বড় দয়ালু। –সূরা হাশর (৫৯) : ১০

৩. কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক কিছু আমল

কোরআনে যে সমস্ত আমল-আখলাক ও ভালো গুণের কথা আছে, সেগুলো নিজের ভেতর আছে কি না, তেলাওয়াত থামিয়ে একটু ফিকির করা, নিজেই নিজের হিসাব নেওয়া–মোহাসাবা করা, বিশেষ বিশেষ আয়াত বারবার পড়া, ধীরস্থিরতার সাথে নামাযে-তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করা, অন্যের কাছ থেকে তেলাওয়াত শোনা, রাতের শান্ত-সমাহিত পরিবেশে তেলাওয়াত করা। ধীরে ধীরে ভালোবাসা-মথিত কণ্ঠে কোরআন পড়া, মুখস্থ করার প্রয়োজন না হলে মোটেই তাড়াহুড়া না করা। ঈমানের আয়াত আসলে ঈমান নবায়ন করা, জান্নাতের আয়াত আসলে জান্নাত প্রার্থনা করা, জাহান্নামের আয়াত আসলে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া। মনে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা জাগরুক রাখা। কোরআনের মুহাব্বত হৃদয়ে জাগ্রত করা– এই কোরআন কার কিতাব, কার মাধ্যমে আমরা তা পেয়েছি, দুনিয়া-আখেরাতের কী কী কল্যাণের আধার এই কোরআন, কোরআনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কী কী ইত্যাদি চিন্তা করা। শানে নুযূল সাথে রেখে কোরআন নাযিলের পরিবেশ-প্রতিবেশ অনুভব করার চেষ্টা করা, 'আসালীবুল কোরআন' বিষয়ে ধারণা অর্জন করা। নিজে ব্যক্তিগত খাতায় কিছু কিছু নোট করা। যেমন, 'আসহাবুল জান্নাহ' ও 'আসহাবুন নার' কারা কারা, এর একটা তালিকা করা, কোন কোন জিনিসকে আল্লাহ তাআলা ঈমানি গুণ বলে উল্লেখ করেছেন, কোরআন পড়ে পড়ে তার একটা তালিকা করা ইত্যাদি।

১২. কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি এড়ানোর উপায়

কোরআনের অর্থ ও মর্মের উৎসগুলো কী কী– এটা কোরআন-বুঝার চেষ্টার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের জানা থাকা দরকার।

কোরআনের এক জায়গায় একটি আয়াত সংক্ষেপে আসলে কখনো কখনো অন্য জায়গায় তার তফসিল আসে। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন–

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

সুতরাং আমি যখন (জিবরীলের মাধ্যমে) তা পাঠ করি, তখন আপনি এই পাঠের অনুগমন করুন। তারপর আমার উপরই এর মর্ম বর্ণনার দায়িত্ব। –সূরা কিয়ামাহ (৭৫) : ১৮-১৯

আর নবীজীর জীবন তো পুরোটাই কোরআনের বাস্তব মর্ম। আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাঠিয়েছেন মানুষের সামনে কোরআনের মর্ম বয়ান করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

আর আমি তোমার উপর এ-কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে তাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয় ব্যাখ্যা করে দাও। –সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

সুতরাং প্রথমে একটি আয়াতের অর্থ যেমন অন্য আয়াতে খুঁজে দেখতে হয়, তেমনি ঐ বিষয়ে কোনো হাদীস আছে কি না তারও খোঁজ নিতে হয়। অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্ম উদ্ধারের জন্য সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যও তৃতীয় উৎস হিসাবে সামনে রাখতে হয়। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, কোরআনের প্রত্যেকটি সূরা কোথায় নাযিল হয়েছে তা আমি জানি, কোন আয়াত কোন ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে তাও আমি জানি। কারো ব্যাপারে আমি যদি জানতে পারি, তিনি আমার চে'ও বেশি আল্লাহর কালাম সম্পর্কে অবগত আর সেখানে বাহনজন্তু উট যেতে পারে, তবে অবশ্যই আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য সফর করবো। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০০২

মূলত যারা কোরআন নাযিলের যুগের যত কাছের মানুষ, কোরআনের মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে তাদের কথা তত গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি কোরআনি শব্দের তৎকালীন ব্যবহারিক অর্থ এবং এ-ভাষার অন্যান্য নিয়ম-কানুন কোরআনের বুঝ হাসিলের অতি গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ উৎস। তবে শব্দের ব্যবহারিক অর্থ যাই হোক, আয়াতের অর্থ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হলে তা ব্যবহারিক অর্থের উপর প্রাধান্য পাবে। কারণ, সুন্নাহ কোরআন বোঝার অগ্রগণ্য উৎস। হাঁ, সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ না হলে চতুর্থ পর্যায়ে ভাষার উপর নির্ভর করতে হয়।

আর ঈমান-আমলে অগ্রসর, তাকওয়া-পরহেযগারিতে মজবুত এবং শুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি, যিনি দ্বীনের অন্যান্য শাখাতেও ভালো জ্ঞান রাখেন, এমন ব্যক্তির মাঝে কোরআন বোঝার বিশেষ একটা রুচি থাকে। তখন তিনি নিজের সুস্থ বোধ-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পঞ্চম পর্যায়ে কোরআনের এমন কিছু রহস্য উদ্ধার করতে সক্ষম হন, যা প্রথমোক্ত চার উৎসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। পূর্ববর্তী ও সমকালীন আলেমগণের এ-জাতীয় সমঝও কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে পঞ্চম পর্যায়ে অনেক মূল্যবান পাথেয়। এই পাঁচ উৎস সন্ধান করলে এবং উৎসগুলোর তরতিব রক্ষা করে তেলাওয়াত করলে কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি এড়ানো সম্ভব হয়।

কেউ যদি আগ থেকেই বিচ্ছিন্ন আকিদা-আমল, আধুনিক ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতাদর্শে জড়িয়ে থাকে, এরপর তার পক্ষে দলিল খোঁজার নিয়তে কোরআন পড়া আরম্ভ করে, তখন সে এই তরতিব লঙ্ঘন করে এবং মন-মতো কোরআনের অর্থ দাঁড় করায়। কোরআনের এক-দু'টি আয়াত পড়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, কিংবা এক-দু'টি হাদীস দেখে বা না-দেখেই নিজের বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের ব্যাপারে কোরআন থেকে দলিল নেয়া শুরু করে। ভেবেই দেখতে চায় না, কোরআনের এই আয়াত সম্পর্কে অন্য আয়াতে কিছু বলা আছে কি না, নবীজী আয়াতের কী ব্যাখ্যা করেছেন আর সাহাবায়ে কেরামই বা কী বুঝেছেন? এদিকটি লক্ষ্য না করা কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পড়ার অন্যতম কারণ।

সুতরাং আমরা যদি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিই, কোরআন বোঝার নিয়ম রক্ষা করি এবং যথাসম্ভব পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে যোগ্য উস্তাযের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হতে থাকি, তবে ইনশা আল্লাহ আমরা কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে ভুল থেকে বাঁচতে পারবো।

১৩. তাদাব্বুরের ফলাফল

কোরআনের তাদাব্বুরের সাথে যার সম্পর্ক আছে, তার মাঝে এবং যার সম্পর্ক নেই তার মাঝে পার্থক্য বিরাট। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

আর যখন তারা নবীর উপর নাযিলকৃত কালাম শোনে, তখন দেখবে তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, যেহেতু তারা সত্য বুঝে ফেলেছে। বলে উঠে, হে আমাদের রব্ব! আমরা ঈমান আনলাম, সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সঙ্গে আমাদের নামও লিখে দিন। –সূরা মায়েদা (৫) : ৮৩

একজন কোরআনওয়ালা কেমন হবে, সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ، وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ،

وَبِكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ، وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُونًا حَلِيمًا حَكِيمًا سِكِّيتًا

কোরআনের ধারক ব্যক্তিকে চেনা যাবে তার রাত কাটানোর অবস্থা দেখে, যখন সবাই ঘুমে বিভোর; চেনা যাবে তার দিন দেখে, যখন মানুষ রোজা-বিহীন; চেনা যাবে তার দুঃখ দেখে, যখন সবাই আনন্দে আত্মহারা; চেনা যাবে তার কান্না দ্বারা, যখন মানুষ হাসা-রসে মাতোয়ারা; চেনা যাবে তার নীরবতা দেখে, যখন সবাই গল্প-গুজবে মত্ত; চেনা যাবে তার বিনয়-স্থিরতা দ্বারা, যখন লোকেরা দম্ভ-অহংকারে বিবেকহারা। সুতরাং আহলে কোরআন হবে অশ্রুময়-বেদনার্ত, ধৈর্যশীল-প্রজ্ঞাবান এবং নীরবতা-প্রেমী। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩৬৭৩৫

১৪. কোরআনের প্রতি আহ্বান করা

নির্ভরযোগ্য তরজমা থেকে কোরআনের তরজমা পড়া, তাফসীর-গ্রন্থ থেকে তাফসীর পড়া, শোনা বা শোনানো এক কথা। আরেকটা হলো নিজেই তরজমা বা তাফসীর করা, নিজের বুঝের প্রতি অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের বুঝ খণ্ডন করা ইত্যাদি- এই সুরত আজ আমাদের আলোচ্যবিষয় নয়, এর জন্য আরও কিছু বিষয় লক্ষ্য করার আছে। এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করেছি তা মূলত প্রথম সুরত সম্পর্কিত। প্রথম ক্ষেত্রে একটি আদব হলো, নিজে যেমন উস্তাযের তত্ত্বাবধানে নির্ভরযোগ্য তরজমা ও তাফসীর পড়বে, অন্যকে শোনানোর সময়ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শোনাবে এবং সূত্র উল্লেখ করবে।

মনে রাখবে, কোরআন এমন এক অতুলনীয় জ্যোতি, পৃথিবীর আর কোনো ধর্মের কাছে যার কোনো নজির নেই। এজন্য যে কোনো মানুষকে একটু তেলাওয়াত করে তার সরল তরজমা শুনিয়ে দেওয়াই অনেক বড় দাওয়াত। এই দাওয়াত অব্যাহত রাখবে। যে আয়াত ও তার নিশ্চিত অর্থ জানা আছে কেবল তা অন্যের কাছে পৌঁছাবে এবং পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দাওয়াতের মূলনীতিসমূহ স্মরণ রাখবে। কোরআনের ঐ সমস্ত দাঈদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, যারা বিদআতি পন্থা আবিষ্কার করে। সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রা. সতর্ক করে বলেন-

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يُدْرِينِي -رَحِمَكَ اللَّهُ- أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ: بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ، الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ؟ وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا.

তোমাদের সামনে এমন একটা সময় আসছে, যখন মাল বেড়ে যাবে, সবার সামনে কোরআন খোলা থাকবে। মুমিন-মুনাফেক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, গোলাম-মুনিব সবাই কোরআন পড়বে। আশংকা হয়, সে সময় কেউ কেউ বলে উঠবে, কী ব্যাপার! আমি কোরআন পড়ি কিন্তু মানুষ আমার অনুসরণ কেন করে না? হাঁ, আমি মানুষের জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন না করলে তারা আমার অনুসরণ করবে না। তখন সে অন্য একটা পন্থা আবিষ্কার করবে। সুতরাং তোমরা এমন বিদআতি পন্থা থেকে দূরে থাকবে। বিদআত হলো গোমরাহি।

অবশ্য আমি তোমাদেরকে আহলে ইলমের পদস্খলনের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলবো। কারণ শয়তান কখনো কখনো জ্ঞানী ব্যক্তির মুখেও ভ্রান্ত কথা চালিয়ে দেয়। আবার মুনাফেক ব্যক্তিও তো কখনো কখনো হক কথা বলে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুআযকে বললাম, হে মুআয! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আমরা তা কীভাবে বুঝবো? বললেন, হাঁ তাই, তোমরা জ্ঞানীজনের ঐ সকল সন্দেহজনক কথা ত্যাগ করবে, যে ব্যাপারে অন্য আহলে ইলমগণ বলেন, 'এটা কেমন কথা!' তবে জ্ঞানীর এতটুকু পদস্খলন যেন তোমাকে তার থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে না দেয়। হতে পারে তিনি ফিরে আসবেন। আর হক জানতে পারলে তুমি তারই অনুসরণ করবে। কারণ হকের বিশেষ একটা নূর থাকে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬১১

আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমান-আমল হেফাজত করুন। সঠিকভাবে কোরআন বুঝার এবং কোরআনের উপর আমল করে পূর্বসূরীদের সঙ্গে জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। সকল কোরআনি কার্যক্রমের সহযোগী হওয়া এবং নিজের সন্তান-সন্ততিকে যে কোনো মূল্যে কোরআনের জরুরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার সৌভাগ্য নসিব করুন।

হে আল্লাহ! কোরআনের ওসিলায় তুমি আমার প্রতি রহম করো। কোরআনকে আমার জন্য নূর, রহমত ও হেদায়েত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! কোরআনের কোনো অংশ ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দাও, দিন-রাত কোরআন তেলাওয়াত করার তাওফীক দাও। হে রব্বুল আলামীন! হাশরের মাঠে এই কোরআনকে আমার পক্ষে দলিল বানিয়ো। আমীন! ছুম্মা আমীন!! ●

কুরআন মজীদের আয়াত-সংখ্যা
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক

এ প্রবন্ধ পাঠকালে সর্বদা মনে রাখতে হবে, মোট আয়াত-সংখ্যার পার্থক্য কুরআন মজীদের আয়াত কম-বেশের পার্থক্য নয়। এ পার্থক্য শুধু গণনা পদ্ধতির পার্থক্য। এ বাস্তব বিষয়টি প্রবন্ধের তিন নং অধ্যায়ে অনেক উদাহরণসহ স্পষ্ট করা হয়েছে। বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখা কর্তব্য।

প্রবন্ধের একটি অধ্যায় ছিল প্রফেসর আবদুস সামাদ সারেম রাহ.-এর কিতাব 'তারিখুল কুরআনে'র আয়াত-সংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে। বাংলাভাষায় কুরআন-সংকলনের ইতিহাস বিষয়ে লিখিত একটি কিতাবে তার আলোচনার হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাওয়ার কারণে বিশেষ সংখ্যায় তা প্রকাশ করা গেল না। আগামীতে আলকাউসারের শাওয়াল সংখ্যায় তা প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। সে লেখাটি যেহেতু এ প্রবন্ধেরই অংশ, তাই পাঠকের কাছে অনুরোধ থাকবে, প্রকাশের পর তারা যেন তা অবশ্যই পড়ে নেন। ওই অধ্যায়ে আদেশ-নিষেধ-হালাল-হারাম প্রভৃতিভিত্তিক আয়াত-সংখ্যার ভাগ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা আছে।

প্রবন্ধের শেষ অধ্যায় (فصل في التسامحات) তালেবে ইলমদের জন্য আরবী ভাষায় লেখা হয়েছে। প্রবন্ধের উর্দূ সংস্করণে তা ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ।

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

কুরআন মজীদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ কিতাব। যা তিনি তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল খাতামুন নাবিয়্যিন সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাব চিরন্তন ও চিরকালীন কিতাব। এর শিক্ষা-দীক্ষাও চিরন্তন ও চিরকালীন। আল্লাহ তাআলা নিজে এই কিতাবের হেফাজতের যিম্মাদারী নিয়েছেন। তাই এর পাঠ ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করে যাওয়ার আগে জিবরাইল আলাইহিস সালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অপরকে যে নির্দিষ্ট পাঠ ও বিন্যাসে কুরআন মজীদ শুনিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তা এখনও পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। কেয়ামত পর্যন্ত তা এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

বস্তুত এ উপদেশবাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।—সূরা হিজর (১৫): ৯

আল্লাহ তাআলা কুরআনের 'পাঠ' (نظم) সংরক্ষণ করেছেন। না আগে কখনো এতে সংযোজন-বিয়োজন বা বিকৃতি-পরিবর্তন ঘটেছে, না আগামীতে কখনো ঘটবে।

কুরআন পঠনের নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৈলী আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণ করেছেন। কুরআন পঠনের নির্দিষ্ট নিয়ম সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শিখেছেন। সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে তা পরবর্তীদের কাছে 'তাওয়াতুর' বা অসংখ্য সূত্রে পৌঁছেছে। কুরআন লিপিবদ্ধ-করণের নির্দিষ্ট শৈলী আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যে সাহাবী ওহী লিখেছেন সেই সাহাবীই পরবর্তী সময়ে 'আলমুসহাফুল ইমাম' লিখেছেন। আর 'আলমুসহাফুল ইমামে'র লিপিশৈলী (رسم الخط) "ইলমুল কিরাআহ"-এর আলেম-তালেবে ইলমদের কাছে রয়েছে। 'তাওয়াতুর' বা অসংখ্য সূত্রে তাঁদের কাছে তা পৌঁছেছে। ইলমুল কেরাআত বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে যত মুসহাফ বা কুরআনুল কারীমের কপি লেখা হচ্ছে ও ছাপা হচ্ছে তা এই লিখন-পদ্ধতি অনুযায়ী লেখা হচ্ছে।

কুরআন মজীদের অর্থ-মর্ম আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন। যখনই কেউ কুরআনুল কারীমে অর্থগত কোনো বিকৃতি সাধন করতে চেয়েছে এবং কোন আয়াতের 'মুতাওয়ারাছ' ও 'মুজমা আলাইহি' মর্ম তথা যুগ যুগ ধরে চলে আসা স্বীকৃত ও ঐকমত্যপূর্ণ মর্ম বদলে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা তার বিরুদ্ধে আহলে হক আলেমে দ্বীনদের দাঁড় করিয়েছেন এবং বিকৃতিকারীদের লাঞ্ছিত করে তাদের অপপ্রয়াস বানচাল করে দিয়েছেন।

কুরআনে প্রদত্ত সর্বশেষ ইলাহী শরীয়তকে হেফাজত করেছেন। এতে সংযোজন-বিয়োজন ও বিকৃতি সাধনের জন্য আধুনিকতাবাদী ও শরীয়ত অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে কৃত হাজারো অপচেষ্টা সত্ত্বেও শরীয়তে মুহাম্মাদী এখনও সংরক্ষিত ও সর্বজনবিদিত।

ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের যে আমলী রূপকাঠামো কুরআন মজীদে পেশ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তা এমনভাবে হেফাজত করেছেন যে, কুরআন নাযিলের পর দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও তার 'আমলী তাওয়ারুছ' বা কর্মগত ধারা ও প্রামাণিক মর্যাদা অটুট রয়েছে। এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

কুরআন মজীদের আমলী নমুনা ও 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন। সুন্নাতে নববী, সিরাতে নববী এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে তা সংরক্ষিত আছে।

কুরআনের ব্যাপক, বিস্তৃত ও গভীর শিক্ষা-দীক্ষা, কুরআনের হেদায়েত ও আদর্শ, কুরআনের বিধি-বিধান প্রভৃতি হেফাজতের জন্য যেসকল জিনিস সংরক্ষিত থাকা জরুরি ছিল তার সবকিছুই আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালের প্রেক্ষাপট, সে কালের ভাষা-পরিভাষা, সে কালের ইতিহাস, যিনি কুরআন শিখিয়ে গেছেন তার প্রথম শাগরেদদের (সাহাবায়ে কেরাম) জীবনচরিত, খাইরুল কুরূনের ইতিহাস– এ সবকিছু আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন।

হেফাজতের এই ধারা অব্যাহত থাকার জন্য যে যুগে যে ধরনের পদক্ষেপের দরকার ছিল গায়েবীভাবেই যেন তিনি তার ব্যবস্থা করছেন। প্রত্যেক যুগের কুরআনের ধারকদের তিনি তাওফীক দিয়ে যাচ্ছেন। কুরআন সংরক্ষণ, কুরআনের প্রচার-প্রসার এবং কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষার প্রচারের ক্ষেত্রে তারা যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার জরুরি অংশ তিনি হেফাজত করেছেন। কুরআনের বাহকদের ইজমা ও ঐকমত্য গোমরাহীমুক্ত থাকার জামানত দিয়ে তাদের ঐকমত্যকে প্রামাণিক মর্যাদা দান করেছেন। এমনকি উম্মতের সাধারণ কোন লোকও যদি এই কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে তাহলে সেও গোমরাহী থেকে মুক্ত থাকবে মর্মে ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه.

আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা বিভ্রান্ত হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।–মুয়াত্তা, ইমাম মালেক, হাদীস : ৩৮৫১; আততামহীদ, ইবনে আবদুল বার, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৩৩১

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা তাঁর খাস বান্দাদের কুরআনের ধারক-বাহক হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদেরকে বিস্ময়কর সব কাজের তাওফীক দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমের হেফাজত ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা উম্মতের নির্বাচিত ও খোশনসীব কিছু বান্দাদের থেকে যে সব ক্ষেত্রে খেদমত নিয়েছেন তার একটি ছোট্ট ক্ষেত্র হল, 'ইলমু আদাদি আয়িল কুরআন'। কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের সূচনা-শেষ এবং মোট আয়াত সংখ্যা সংক্রান্ত শাস্ত্র। যাদের এ সম্পর্কে জানাশোনা নেই তারা ধারণাও করতে পারবে না যে "ইলমুল কিরাআহ"-এর ইমামগণ এ ক্ষেত্রে কত কাজ করেছেন। এই ছোট্ট একটি বিষয়ে তারা কত বড় বড় কীর্তি রেখে গেছেন।

এ ছোট্ট বিষয়টিতে বিভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহর মেহেরবানিতে যে সব ইলমী খেদমত হয়েছে, উলামায়ে উম্মতের প্রতি আল্লাহর সে সব নেয়ামতের বড় একটি অংশ উল্লেখ করার জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কারণ ইবাদুর রহমান ও রাহমানের বান্দাদের উপর রহমান ও রহীম আল্লাহপ্রদত্ত নেআমতরাজির উল্লেখ-আলোচনাও 'নেআমতের শোকর' আদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া নেআমতের বিস্তারিত উল্লেখ ও আলোচনা দ্বারা নেআমত সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর হয়। আর অজ্ঞতা দূর হলেই মানুষ ভুল চিন্তা, ভুল কথন-বলন ও ভুল লিখন থেকে বাঁচতে পারে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআনুল কারীমের মোট আয়াত-সংখ্যা কত তা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আমাদের কতক ভাইয়ের একটু বেশিই শিথিলতা হয়ে গেছে। তারা 'মুসহাফ' (কুরআনুল কারীমের কপি) দেখে কুরআনুল কারীম হিফজ করেন, প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করেন, যার তাওফীক হয় তিনি কুরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীরও পড়েন। তাদের হাতের মুসহাফে প্রত্যেক সূরার শুরুতে সেই সূরার মোট

আয়াত সংখ্যা লেখা থাকে। প্রত্যেক আয়াতের শেষে সেই আয়াতের নাম্বারও লেখা থাকে। তারপরও তারা কখনো মুসহাফ থেকে মোট আয়াত-সংখ্যা গুণে দেখার কষ্টটুকু স্বীকার করেন না। যখন মোট আয়াত-সংখ্যা বলার প্রয়োজন পড়ে তখন শোনা কথার উপর ভিত্তি করে কোন সংখ্যা বলে দেন। তাদের মনে এই খেয়ালও আসে না যে, যে সংখ্যাটি উল্লেখ করা হচ্ছে তা বাস্তব কি না? তদ্রূপ আমাদের দেশের অনেক প্রকাশক মুসহাফ ছাপেন, তাদের ছাপা মুসহাফে প্রত্যেক সূরার শুরুতে সেই সূরার মোট আয়াত-সংখ্যা উল্লেখ করা থাকে, প্রত্যেক আয়াতের শেষে আয়াতের নাম্বারও দেওয়া থাকে, তারা তাদেরই প্রকাশিত মুসহাফ থেকে সবগুলো সূরার আয়াত-সংখ্যা হিসেব করে মোট আয়াত-সংখ্যা কত তা লিখতে পারেন। কিন্তু তা না করে মুসহাফের শুরুতে বা শেষে বাংলায় যে ভূমিকা বা পরিশিষ্ট লেখেন সেখানে শোনা কথার উপর ভিত্তি করে কুরআনুল কারীমের মোট আয়াত-সংখ্যা উল্লেখ করে দেন।

স্পষ্টতই এই কর্মনীতি একধরনের দায়িত্বহীনতা, যা থেকে বেঁচে থাকাটাই কাম্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মাধ্যমে আমাদের সেই ভাইদের খেদমতে এই দরখাস্ত পেশ করা হচ্ছে যে, আমাদের এ ধরনের শিথিলতা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কোনো কিছু লিখতে হলে বা বলতে হলে পূর্ণ তাহকীকের পর বলা উচিত এবং এমন কিছুই বলা উচিত যা বাস্তবতাসমর্থিত। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফীক দিন এবং জাযায়ে খায়ের দান করুন।

সুধী পাঠকের কাছে দরখাস্ত রইল, তারা যেন এই অধমকে তাদের দুআয় শামিল করেন। বিশেষভাবে এই প্রবন্ধের কবুলিয়্যাতের জন্য দুআ করেন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
২৫ মুহাররম, ১৪৩৭ হিজরী

অধ্যায়–১

কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের সূচনা-শেষ জানার গুরুত্ব

কুরআনুল কারীমে মোট একশ চৌদ্দটি সূরা। এতে সূরা আল কাউছারের মত ছোট সূরাও আছে আবার সূরা বাকারার মত বড় সূরাও আছে।

আমাদের সহজতার জন্য (এ ছাড়া আরও হেকমতও হয়তো আছে) আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক সূরাকে বিভিন্ন আয়াতে ভাগ করে দিয়েছেন। 'সূরা' ও 'আয়াত' এই উভয় নাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই দেওয়া। কুরআনুল কারীমের কয়েক জায়গায় এ দুইয়ের উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা যেহেতু কুরআনুল কারীমের সূরাগুলোকে এভাবে নাযিল করেননি যে, সম্পূর্ণ সূরা মিলে একটি বক্তব্য বা একটি বাক্য; বরং তিনি সূরাগুলো বিভিন্ন অংশে ভাগ ভাগ করে নাযিল করেছেন, প্রত্যেক ভাগ অপর ভাগ থেকে পৃথক এবং আল্লাহ তাআলা নিজেই এই ভাগগুলোর নাম রেখেছেন 'আয়াত', তাই কুরআনের পাঠ শেখার এটা একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ যে, তালেবে ইলম কুরআন শিক্ষাদানকারী উস্তাযের কাছ থেকে আয়াতের সূচনা ও শেষও জানবে। অর্থাৎ কোন আয়াত কোত্থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় এসে শেষ হয়েছে তা ভালোভাবে জানবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনুল কারীমের আয়াতের তেলাওয়াত শেখাতেন তখন তাদের এও শেখাতেন যে, আয়াতটি কোত্থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম যখন তাবেয়ীদের কুরআন শেখাতেন এবং তাবেয়ীগণ তাবে-তাবেয়ীদের কুরআন শেখাতেন তখন আয়াতের সূচনা ও শেষ কোথায় তাও তাদের শেখাতেন।

একটি সূরা যখন পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়ে যেত এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তা শিখে নিতেন তখন তারা এও শিখতেন যে, কোন আয়াত কোত্থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় এসে শেষ হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক সূরার মোট আয়াত সংখ্যা কত তাও তাদের শেখা হয়ে যেত। আয়াতের সূচনা-শেষ কোথায়– এটা জানার সাথে যেহেতু অনেক শরয়ী বিধি-বিধান সম্পৃক্ত, তাই প্রথম থেকেই এটিকে কুরআন শেখার ও কুরআন শিক্ষাদানের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এমনকি ইলমে কেরাআত ও ইলমে তাজবীদের ইমামগণ একে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে সংকলন করেছেন। علم عدد آيات القرآن (কুরআনুল কারীমের প্রত্যেক সূরার মোট আয়াত সংখ্যা এবং পুরো কুরআন মাজীদের মোট আয়াত সংখ্যা বিষয়ক শাস্ত্র) এরই ফসল। কারণ, একটি সূরার প্রত্যেকটি আয়াতের সূচনা-শেষ যখন নির্দিষ্ট হয়ে যায় তখন ঐ সূরায় মোট কতটি আয়াত আছে তা এমনিতেই স্থির হয়ে যায়। এভাবে সব সূরার মোট আয়াত সংখ্যা হিসাব করলে পুরো কুরআন মজীদে মোট কত আয়াত তাও সামনে এসে যায়। সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসহাফে প্রত্যেক আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন (০) দিয়ে আলামত

লাগানো হত না। আর প্রত্যেক আয়াতের শেষে নাম্বার লাগানোর কথা তো কারও কল্পনায়ই ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের "কামাল" হল, তারা যেমন কুরআন মজীদ হিফজ করেছেন, তেমনি কোন আয়াত কোত্থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় শেষ হয়েছে (فواصل الآيات) তাও হিফজ করেছেন।

فواصل الآيات (আয়াতের সূচনা-শেষ) জানার সাথে শরীয়তের কোন কোন বিধি-বিধান সম্পৃক্ত সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল, যেহেতু আল্লাহ প্রতিটি সূরাকে বিভিন্ন আয়াতে ভাগ ভাগ করে নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই উম্মতকে কুরআন মজীদ শিক্ষাদান করেছেন তাই যদি فواصل الآيات বা আয়াতের সূচনা-শেষ স্থির না থাকে তাহলে প্রতিটি সূরা ভাগ ও ছেদবিহীন একক কালাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দ্বিতীয় কথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদ শেখা ও শিক্ষাদান করা এবং কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করার বিভিন্ন ফযীলতের কথা বলেছেন। যার মধ্যে অনেক ফযীলত এমন আছে যা নির্দিষ্ট কিছু আয়াত এবং আয়াতের নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন অমুক সূরার অমুক আয়াতের এই ফযীলত, অমুক সূরার শুরুর বা শেষের দশ আয়াতের এই ফযীলত, মোট এতটি আয়াত (যেমন দুইশো আয়াত) তেলাওয়াত করার এই ফযীলত। যদি কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলো একটি অপরটি থেকে পৃথক না করা যায় এবং প্রতিটি আয়াতকে আলাদা করে গণনা করা না যায় তাহলে এ ধরনের হাদীসের উপর আমল করার কোন পথ বাকি থাকে না।

তৃতীয় কথা হল, ফরয ও নফল নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কেরাআত পড়তেন তার বর্ণনা সম্বলিত হাদীসসমূহে যেমনিভাবে নির্দিষ্ট কিছু সূরা পড়ার কথা এসেছে তেমনিভাবে নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক আয়াত পড়ার কথাও এসেছে। যদি এক আয়াতকে অপর আয়াত থেকে পৃথক করা না যায় এবং আয়াতসমূহকে আলাদাভাবে গণনা করা সম্ভব না হয় তাহলে কেরাআত পড়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। এ ধরনের আরও অনেক শরয়ী ও ফিকহী বিধি-বিধান আছে যা সংশ্লিষ্ট কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে।

ইলমুল আদাদ কি ইজতিহাদী?

অনেকে মনে করেন, কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা সম্পর্কিত এই শাস্ত্রটি ইজতিহাদী এবং তা ইলমুল কেরাআত-এর ইমামদের ইজতিহাদের ফসল। এ ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। বাস্তবতা হল, এই শাস্ত্রটি তাওকীফী[1]। সাহাবায়ে কেরাম তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিখেছেন। তাঁদের কাছ থেকে তাবেয়ীগণ এবং তাবেয়ীদের কাছ থেকে তাবে তাবেয়ীগণ শিখেছেন। এমনিভাবেই প্রত্যেক উত্তর-প্রজন্ম পূর্ব-প্রজন্ম থেকে তা শিখেছে। কোন কোন লেখকের এই ভ্রম হয়ে গেছে যে, হাদীসগ্রন্থসমূহে যখন তারা এমন কোন হাদীস পাননি, যাতে একসাথে কুরআন মজীদের একশো চৌদ্দটি সূরার কথা উল্লেখ আছে এবং প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যার সূচিও উল্লেখ করা হয়েছে তখন তারা এই মত প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, কুরআনুল কারীমের সূরাগুলোর আয়াত সংখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় ছিল না। এটি একটি স্থূল চিন্তা। ঐ লেখকের ভাবা দরকার ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উম্মত কুরআনও শিখেছে, হাদীসও শিখেছে। যে বিষয়টি কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সম্পৃক্ত তা হাদীসগ্রন্থসমূহে খোঁজার আগে ইলমুল কেরাআত-এর ইমামদের কাছে খোঁজ করা উচিত। যাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা তাওয়াতুর তথা অবিচ্ছিন্ন ও অসংখ্য সূত্রে পৌঁছেছে। তাদের কাছে অবিচ্ছিন্ন ও অসংখ্য সূত্রে যে নববী শিক্ষা পৌঁছেছে তাতে যদি আয়াত সংখ্যার বিষয়টি থাকে তাহলে আয়াত সংখ্যা প্রমাণিত হওয়ার জন্য তাই যথেষ্ট। আর এটিও একটি স্বীকৃত বাস্তবতা যে, প্রত্যেক শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস ও আছার এর ইলম সেই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের কাছেই বেশি থাকে এবং সেই ফনের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস ও আছারের যথাযথ অনুধাবনও তারাই করে থাকেন। এখন শুনুন ইলমুল কিরাআত এর ইমামদের বক্তব্য :

১. ইমাম আবু আমর উসমান ইবনে সায়ীদ আদদানী আন্দালুসী (৪৪৪ হি.), যিনি শুধু ইলমুল কিরাআত ও ইলমে তাজবীদের উপরই অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন, (علم عدد آيات القرآن) কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত তার মৌলিক গ্রন্থ 'আল বয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআনে'র প্রথম দুই অধ্যায়ে, এমন অনেকগুলো হাদীস ও আছার উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের আয়াতের বিশেষ কোনো সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে। এক, দুই, দুইয়ের অধিক, দশ, দশের অধিক সংখ্যার উল্লেখ এসেছে। উদাহরণত, দশ আয়াত করে কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দান করার কথা এসেছে। অথবা বিভিন্ন আয়াতের ফযীলত বা তাফসীর উল্লেখ করতে গিয়ে আয়াতের অংশবিশেষ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, অমুক আয়াতের ফযীলত বা তাফসীর এই,

[1] রাসূলের শিক্ষানির্ভর।

অথবা কোনো সূরার মোট আয়াত সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথবা বিশেষ কোন সূরার একটি আয়াতকে তার নাম্বার উল্লেখ করে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে প্রায় ষাটটি হাদীস ও আছার তিনি সনদ ও মতনসহ উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন–

ففي هذه السنن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرتها واشتهار نقلتها دليل واضح وشاهد قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا عن سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي السور على اختلاف ذلك واتفاقه مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأخوذ عنه وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تلقوا ذلك منه كذلك تلقيا كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القراءات سواء ثم أداه التابعون رحمة الله عليهم على نحو ذلك إلى الخالفين أداء فنقله عنهم أهل الأمصار وأدوه إلى الأمة وسلكوا في نقله وأدائه الطريق التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستنباط والاختراع ولذلك صار مضافا إليهم ومرفوعا عليهم دون غيرهم من أئمتهم كإضافة الحروف وتوقيفها سواء وهي إضافة تمسك ولزوم واتباع لا إضافة استنباط واختراع.

উক্ত বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, প্রসিদ্ধ রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত এই এতসংখ্যক হাদীস ও আছারে এই বিষয়টির স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, আমাদের আলেমগণ সালাফে সালেহীন থেকে علم عدد آيات القرآن (কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা সংক্রান্ত যে শাস্ত্র) আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, যার মধ্যে প্রত্যেক আয়াতের ভাগ ও প্রত্যেক সূরার মোট আয়াত সংখ্যাও আছে, এর যতটুকুর ব্যাপারে ইলমে কেরাআতের সব ইমামের বর্ণনা এক আর যতটুকুতে বিভিন্নতা আছে, এই সবকিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণকৃত। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এই ইলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাসিল করেছেন যেমনিভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন কেরাআতের ইলম হাসিল করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে তাবেয়ীগণ এই ইলম শিখেছেন এবং তাবে-তাবেয়ীদের কাছে তা পৌঁছিয়েছেন। তাবে-তাবেয়ীগণের কাছ থেকে প্রত্যেক শহরের ইমামগণ তা শিখেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তারা কোন ধরনের ইজতিহাদ করেননি। বরং বিভিন্ন কেরাআতের ইলম যেমনিভাবে তারা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে শুনে ও তাদের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষাগ্রহণ করে হাসিল করেছেন এরপর পরবর্তীদের কাছে তা পৌঁছিয়েছেন তেমনিভাবে কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা ও আয়াতসমূহের সূচনা-শেষের ইলমও (علم عدد آيات القرآن وفواصل آياته) তারা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে শুনে এবং তাদের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষাগ্রহণ করে হাসিল করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

প্রত্যেক শহরের ইমামদের দিকে যে আয়াত সংখ্যার নিসবত করা হয় (যেমন বলা হয়, মাদানী গণনা, কুফী গণনা, বসরী গণনা, শামী গণনা ইত্যাদি) তা এই কারণেই। যেমনিভাবে কেরাআতের ইমামদের দিকে কেরাআতের নিসবত করা হয়। এই নিসবত এ জন্য করা হয় না যে, তারা নিজেরা কেরাআত উদ্ভাবন করেছেন, ইজতিহাদ করে বের করেছেন। বরং এ জন্য নিসবত করা হয় যে, তারা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে কেরাআতের যে পদ্ধতি শিখেছেন তার অনুসরণ করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তা শিক্ষা দান করেছেন। এমনিভাবে আয়াত সংখ্যা ও আয়াতের সূচনা ও শেষ নির্ধারণ করার ইলম (علم عدد آيات القرآن وفواصل آياته) বিভিন্ন শহরের যেসব ইমামদের দিকে নিসবত করা হয় তার কারণ এই নয় যে, তারা তা উদ্ভাবন করেছেন; বরং এ জন্য নিসবত করা হয় যে, তারা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে শেখা বিদ্যাকে যথাযথভাবে ধারণ করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তা শিক্ষা দান করেছেন।–আল বায়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন, আবু আমর আদদানী, পৃ.৩৯; তাহকীক : ড. গানেম, প্রকাশক : মারকাযুল মাখতূতাত ওয়াত তুরাছ ওয়াল ওছায়েক, কুয়েত, ১৪১৪ হি.

ইমাম আবু আমর আদদানী এই বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রদান করার পর উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে যার খোঁজ-খবর নেই এবং হাদীস ও আছার সম্পর্কেও যার ধারণা নেই, এই দাবী করে বসেছে যে, আয়াত সংখ্যা ও আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণ করার ইলম ইজতিহাদনির্ভর ইলম এবং এই শাস্ত্রের অধিকাংশ বিষয়ই প্রাচীন মুসহাফসমূহ থেকে গৃহীত।

ইমাম আবু আমর আদদানী এই বে-খবর লেখকের বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে তার মতামত দলীল-প্রমাণসহ জোরালো ভাষায় খণ্ডন করেছেন, তিনি লেখেন–

وبطلان ما زعمه وفساد ما قاله غير مشكوك فيه عند من له أدنى فهم وأقل تمييز إذ كان المبين عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله من قرأ آية كذا وكذا، من قرأ الآيتين، ومن قرأ الثلاث الآيات، ومن

قرأ العشر إلى كذا، ومن قرأ ثلاث مئة آية إلى خمس مئة آية إلى ألف آية في أشباه ذلك مما قد مضى بأسانيده من قوله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا للمقدار الذي أراده وقصده وأشار إليه وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه وذلك بإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية وموضع الخمس ومنتهى العشر ولا سيما أن نزول القرآن عليه كان مفرقا خمسا خمسا وآية وآيتين وثلاثا وأربعا وأكثر من ذلك على ما فرط قبل وقد أفصح الصحابة رضي الله عنهم بالتوقيف بقولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل وجائز أن يعلمهم العشر كاملا في فور واحد ومفرقا في أوقات وكيف كان ذلك فعنه أخذوا رؤوس الآي آية آية

وإذا كان ذلك كذلك ولا يكون غيره بطل ما قاله من قدمناه وصح ما قلناه وكذلك القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة أن ذلك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام منه به لتوفر مجيء الأخبار بذلك واقتضاء العادة بكونه كذلك وتواطؤ الجماعة واتفاق الأمة عليه وبالله التوفيق.

সারমর্ম হল, ঐ লোক যা বলেছে তা নিঃসন্দেহে বাতিল। যার সামান্য বোধবুদ্ধি আছে সেও তা বুঝবে। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তা শিখিয়ে দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও বলেছেন যে, তারা রাসূলের কাছ থেকেই তা জেনেছেন ও শিখেছেন তারপর এই দাবী বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অমুক আয়াত পড়বে সে এই পুরস্কার পাবে বা তার এই ফায়দা হবে। যে অমুক দুই আয়াত পড়বে তার...। যে অমুক তিন আয়াত পড়বে সে ...। যে অমুক সূরার অমুক দশ আয়াত পড়বে সে...। এ ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে যেগুলোতে বিভিন্ন সংখ্যার কথা এসেছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন শিক্ষাদানের সময় এ বিষয়টি না শেখাতেন যে, আয়াত কোত্থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় এসে শেষ হয়েছে তাহলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম কীভাবে বুঝতেন যে 'অমুক আয়াত' দ্বারা কোন্ অংশ উদ্দেশ্য। 'অমুক দুই আয়াত' দ্বারা কোন্ দুই আয়াত উদ্দেশ্য। সে আয়াতদ্বয় কোত্থেকে শুরু হয়েছে আর কোথায় এসে শেষ হয়েছে? 'অমুক দশ আয়াত' বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ দশ আয়াত বুঝিয়েছেন। এই দশ আয়াত কোত্থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হবে?

কুরআন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অল্প অল্প করে নাযিল হত- পাঁচ আয়াত করে, এক-দুই আয়াত করে, তিন-চার আয়াত করে অথবা এরচে' কম বা বেশি। (তাহলে কুরআনের যে অংশ নাযিল হত সেগুলোর কোন আয়াত কোত্থেকে শুরু হয়েছে তা জানা ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে কুরআন শিখতেন?)

সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দশ আয়াত করে কুরআন শেখাতেন। ঐ দশ আয়াতে উল্লেখকৃত ইলমী ও আমলী বিষয়গুলো যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আয়ত্ত না হত ততক্ষণ পরবর্তী দশ আয়াতের সবক শুরু হত না। যদি তারা না-ই জানতেন যে, আয়াত কোত্থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় শেষ হয়েছে তাহলে তাদের এ কথার কী অর্থ যে-'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে দশ আয়াত দশ আয়াত করে কুরআন শিখতাম'।-আল বায়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪০

ইলমে কেরাআতের আরেক ইমাম আবুল কাসেম হুযালী, যিনি ইলমে কেরাআত হাসিল করার জন্য দূর-দূরান্ত সফর করে খ্যাত হয়েছেন বিশেষ করে ইলমে কেরাআতের ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন সনদ ও উঁচু সনদ তালাশে যিনি নজিরবিহীন[১] দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'কিতাবুল আদাদে' এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সারাংশও এই যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যা এবং আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণের ইলম ইজতিহাদী নয়; বরং তা তাওকীফী (ওহীনির্ভর)। কোনো এক লোক দাবী করেছিল এই শাস্ত্র অতটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তিনি তার কথা জোরালো ভাষায় খণ্ডন করেছেন। এখানে তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল-

واعجباه ممن يقول علم الوقف والابتداء علم، والعدد ليس بعلم، والوقف والابتداء محدث لعلم المعاني، والعدد كان في زمن أصحابه، وبه نزل القرآن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سورة هي

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, শামসুদ্দীন যাহাবী; গায়াতুন নিহায়াহ, ইবনুল জাযারী

ثلاثون آية تجادل عن صاحبها يوم القيامة، لكن الاختلاف فيه كالاختلاف في القرآن والتفاسير وغيرهما دل على أن منكره مبطل، وهو في قوله جاهل.

ذكرت هذا الفصل على الاختصار، ليجتنب قول هذا المبطل، وهو في قوله جاهل.

–কিতাবুল আদাদ, আবুল কাসেম হুযালী (৪০৩-৪৬৫ হি.) পৃ.৮০, তাহকীক : মুস্তফা আদনান এবং আম্মার আমীন; এই পুস্তিকা দুবাইয়ের 'মাজাল্লাতুশ শরীয়াতি ওয়াল কানুন'র ২৫ নং সংখ্যায় (বর্ষ : ১৪২৬ হি., যিলহজ্ব মোতাবেক ২০০৬ ইং, জানুয়ারি) ছাপা হয়েছে।

ইমাম আবুল কাসেম হুযালী কুরআনের আয়াত সংখ্যা বিদ্যার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং এর উপকারী দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা তাঁর উল্লিখিত পুস্তিকা থেকে দেখা যেতে পারে।

এ ছাড়া ইমাম আলামুদ্দীন সাখাভী রহ. (-৬৪৩ হি.) তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'জামালুল কুররা ওয়া কামালুল ইকরা'তে আয়াত সংখ্যা তাওকীফী হওয়ার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিন্তু দলীলসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন।

অধ্যায়–২

ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআন সম্পর্কে উম্মতের আলেমদের রচনাবলি

আয়াত সংখ্যা ও আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণ বিদ্যার উপরিউক্ত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণে তা হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য উম্মতের আলেমগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। যথা–

১. শিক্ষাদানের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ
২. এ শাস্ত্র সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা
৩. 'উলূমুল কুরআন' সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলীতে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা
৪. মুসহাফে আয়াতের চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে
৫. আয়াতের চিহ্নে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করার মাধ্যমে
৬. অনেক মুসহাফের ভূমিকায় কিংবা পরিশিষ্টে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার মাধ্যমে
৭. কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এবং কোথাও আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে
৮. ইলমে কেরাআতের অনেক কিতাবে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে
৯. কুরআন পরিচিতি ও কুরআন সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে
১০. স্বতন্ত্র গ্রন্থ, গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এই প্রবন্ধে শুধু দ্বিতীয় প্রকার খেদমত সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআন সম্পর্কে যুগে যুগে উলামায়ে উম্মতের রচনাবলী

প্রথমে আমরা কিতাবের জগৎ সম্পর্কে সম্যক অবগতি রাখেন এমন একজন অর্থাৎ ইবনুন নাদিম (জন্ম : ৩২০-এর আগে-পরে, মৃত্যু : ৪১২ হি.) এর 'আল ফিহরিসত' এ উল্লেখকৃত তালিকা উদ্ধৃত করছি।

ইবনুন নাদিম লেখেন–

الكتب المؤلفة في عدد آي القرآن :

أهل المدينة :

١. كتاب عدد المدني الأول لنافع
٢. كتاب العدد الثاني عن نافع
٣. كتاب العدد لعيسى
٤. كتاب بن العياش في عدد المدني الأول (وتحرف ابن العياش في بعض الطبعات إلى «ابن العباس»، فظن من ظن أن لابن عباس رضي الله عنهما كتاباً في عدد المدني الأول، وهذا تحريف شديد والظن المبني عليه أشد وأشنع-عبد المالك)
٥. كتاب إسماعيل بن أبي كثير في المدني الاخر
٦. كتاب نافع في عواشر القرآن.

أهل مكة:

٧. كتاب العدد لعطاء بن يسار
٨. كتاب العدد للخزاعي، كتاب حروف القرآن عن خلف البزار.

أهل الكوفة:

٩. كتاب العدد لحمزة الزيات
١٠. كتاب العدد لخلف
١١. كتاب العدد لمحمد بن عيسى
١٢. كتاب العدد للكسائي.

أهل البصرة:

١٣. كتاب العدد لأبي المعافا
١٤. كتاب العدد عن عاصم الجحدري
١٥. كتاب الحسن بن أبي الحسن في العدد.

أهل الشام:

١٦. كتاب يحيى بن الحارث الذماري
١٧. كتاب خالد بن معدان
١٨. كتاب اختلاف العدد لوكيع على مذهب أهل الشام وغيرهم. (وتحرف وكيع في بعض الطبعات إلى وكيل)

–আল ফিহরিসত, ইবনুন নাদিম, পৃ. ৫৬, দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৮ হি. ১৯৭৮ ইং

সামনে গিয়ে তিনি লেখেন–

ذكر أسماء قوم من القراء المتأخرين :

ابن المنادى: وهو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن ...وكان الغالب عليه علوم القرآن وتوفي سنة أربع وثلاثين وثلثمائة وله من الكتب كتاب اختلاف العدد ....

–আল ফিহরিসত, পৃ. ৫৮

আল ফিহরিসতের আরেক জায়গায় তিনি লেখেন–

ولأبي عبيد من الكتاب «كتاب غريب المصنف» ... و«كتاب عدد آي القرآن»

এখানে আমরা দেখলাম, ইবনুন নাদিম পুরনো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে পুরো ২০ টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত তাঁর পূর্বে এ বিষয়ে আরও গ্রন্থ লেখা হয়েছে যার উল্লেখ তিনি করতে পারেননি। এ তালিকায় আমরা এও দেখছি যে, এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ধারা প্রথম শতাব্দী থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইবনুন নাদিম যাঁদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের মৃত্যুসন নিম্নরূপ :

১. আতা ইবনে ইয়াসার মাদানী (১০৩ হি.)
২. খালেদ ইবনে মা'দান (১০৪ হি.)
৩. হাসান বসরী (হাসান ইবনে আবিল হাসান) (১১০ হি.)
৪. আসেম ইবনে আবিস সাব্বাহ আলজাহদারী বসরী (১২৮ হি.)
৫. ইয়াহইয়া ইবনে হারেছ আযযিমারী (১৪৫ হি.)
৬. হামযাহ ইবনে হাবিব আয যাইয়াত (১৫৬ হি.)
৭. নাফে' ইবনে আবদুর রহমান মাদানী (১৬৯ হি.) ইবনুন নাদিম এ বিষয়ে তার তিনটি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন।
৮. ঈসা, বেশি সম্ভব 'ঈসা' বলে ঈসা ইবনে ওয়ারদান মাদানী উদ্দেশ্য। তাঁর জন্ম হয় ১২০ হি., মৃত্যু ১৭০ এর কাছাকাছি।
৯. ইসমাঈল ইবনে আবি কাছীর [ইসমাঈল ইবনে জাফর ইবনে আবি কাছীর আনছারী] (১৩০-১৮০ হি.)
১০. আল কিসায়ী, আলী ইবনে হামযাহ (১৮৯ হি.)
১১. ইবনুল আইয়াশ
সম্ভবত ইনি আবু বকর ইবনে আইয়াশ। কেরাআতের বড় ইমাম ছিলেন। তার মৃত্যু ১৯৩ হি.
১২. আবু উবায়েদ আল কাসেম ইবনে সাল্লাম (২২৪ হি.)
১৩. খালাফ ইবনে হিশাম আল বাযযার (২২৯ হি.)
১৪. মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আবু আবদুল্লাহ আত তাইমী ইস্পাহানী (২৫৩ হি.)
১৫. ওয়াকী
বেশি সম্ভব, ইনি মুহাম্মদ ইবনে খালাফ ওয়াকী কাযী। তার মৃত্যু ৩০৬ হি.। ইবনুল জাওযী রহ. 'ফুনুনুল আফনান' গ্রন্থে কুরআনের হরফ সংখ্যার আলোচনায় ওয়াকী কাযী থেকে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন।
১৬. আল খুযায়ী
বাহ্যত আবু মুহাম্মদ খুযায়ী মক্কী উদ্দেশ্য। নাম : ইসহাক ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক। মৃত্যু: ৩০৮ হি. এর রমযান মাসে
১৭. ইবনুল মুনাদী আবুল হাসান আহমদ ইবনে জাফর (৩৩৬ হি.)
১৮. আবুল মুয়াফা
ইনি بريد بن عبد الله أبو المعافى الضرير

ইবনুন নাদিম রহ. ইলমে কেরাআতের আঠারোজন বড় বড় ব্যক্তিত্বের বিশটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। হতে পারে ইবনুন নাদিম এ ছাড়া আরও কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, যা আমার নজরে আসেনি। কিন্তু এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে যারা লিখেছেন তিনি তাদের সবার কথা উল্লেখ করেননি। আর তার মৃত্যুর পর এ বিষয়ে যারা লিখেছেন তাদের কথা উল্লেখের তো প্রশ্নই আসে না।

বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. (৭৪৫-৭৯৪ হি.) রচিত 'আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন' এর যে এডিশন বৈরুতের দারুল মারেফা থেকে ১৪১৫ হি. মোতাবেক ১৯৯৪ ইং সনে ছাপা হয়েছে তার টীকায় আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে যারা লিখেছেন তাদের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রদান করা হয়েছে। চৌদ্দ নং অধ্যায়ে (প্রথম খণ্ডের ৩৩৮ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) এই আলোচনা বিস্তৃত। আবু আমর আদদানী (৪৪৪ হি.) এর কিতাব 'আল বয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন' এর তাহকীককৃত এডিশনের ভূমিকায় (মুকাদ্দিমাতুত তাহকীক) ড. গানেম আলহামদও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছেন। ড. হেকমত বশীর ইয়াসীন এর শানদার কিতাব 'ইসতিদরাকাত আলা তারিখিত তুরাছিল আরাবী' এর দ্বিতীয় খণ্ডেও কিছু কিতাবের নাম এসেছে। তা ছাড়া শায়খ আবু ইউসুফ (الكفراوي)-কৃত প্রবন্ধেও (وقفات مع تحقيق د. بشير الحميري لكتاب سور القرآن وآياته المنسوب للفضل بن شاذان) সুন্দর একটি তালিকা আছে। এই চার তালিকার একটি উত্তম খুলাছা পাঠকের সামনে পেশ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এতে বরকত দিন এবং ঠিক ঠিক লেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরও কিছু কিতাব

১. কিতাবুন ফিহি ইখতিলাফু আদাদি আয়িল কুরআন ওয়া কালামিহি ওয়া মাক্কিয়িহি ওয়া মাদানিয়্যিহি (كتاب فيه اختلاف عدد آي القرآن وكلامه ومكيه ومدنيه)

আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উছমান আল মারওযী আলওররাক আলমুকরি (২৭০হি. -এর কাছাকাছি)
২. জুযউন ফিহি আদাদু সুওয়ারিল কুরআন ওয়া আদাদু আয়াতিহি ওয়া আদাদু কালিমাতিহি ওয়া হুরুফিহি ওয়া নিসফিহি ওয়া আছলাছিহি ওয়া আখমাছিহি ওয়া আছদাছি ... ।
(جزء فيه عدد سور القرآن وعدد آياته وعدد كلماته وحروفه ونصفه وأثلاثه وأخماسه وأسداسه وأسباعه وأثمانه وأعشاره ...)
আবু বকর মুহাম্মাদ (অথবা আহমদ) ইবনে মানসুর ইবনে ইয়াযীদ আলমুরাদী আররাযী ছুম্মাল কুফী আযযাইদী আলমুকরী (২৯০ হি. এর মধ্যে)
৩. আদ্দু আয়িল কুরআন (عد آي القرآن) : আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ইবনুল হাজ্জায ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে যিবরিকান ইবনে নখর আততাইমী আলবসরী মুআদ্দিল (৩২০ হি. এর দিকে)
৪.কিতাবু তাজযিআতিল কুরআন
(كتاب تجزئة القرآن), সংক্ষেপণ : ইবনুল মুনাদী (আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আলবাগদাদী (৩৩৬ হি.)
৫. আল কিতাবুল মুবাল্লিগু ইলালাল আদাদ (الكتاب المبلغ علل العدد), ইবনুল মুনাদী (৩৩৬ হি.)
৬.কিতাবু আদ্দিল আয়ি (كتاب عد الآي), আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী আদদায়বলী আশশামী (৩৪১ হি. এর পর)
৭. কিতাবু আদ্দিল আয়ি (كتاب عد الآي), আবু সাহল সালেহ ইবনে ইদ্রীস ইবনে সালেহ ইবনে শুআইব আলবাগদাদী আলওররাক আলমুকরি (৩৪৫ হি.)
৮. আদাদু আয়িল কুরআন (عدد آي القرآن), আবু হাফস উমর ইবনে আলী ইবনে মানসুর আলআমুলী আততাবারী (৩৫১ হি.)
৯. আদাদুল আয়ি (عدد الآي), আবু আলী আলফারসী আলহাসান ইবনে আহমদ (৩৭৭ হি.)
১০. কিতাবু আদাদি আয়িল কুরআন লিল মাক্কিয়্যি ওয়াল মাদানিয়্যায়নি ওয়াল কুফীয়্যি ওয়াল বাসরিয়্যি ওয়াশ শামিয়্যি ওয়াল মুত্তাফাক আলাইহি ওয়াল মুখতালাফ ফিহি
(كتاب عدد آي القرآن للمكي والمدنيين والكوفي والبصري والشامي والمتفق عليه والمختلف فيه)
আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে বিশর আততামীমী আলআনতকী (৩৭৭ হি.)
১১. আয়াতুল কুরআন (آيات القرآن)
১২. রুউসুল আয়াত (رؤوس الآيات) : উভয়টি আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মেহরান (৩৮১ হি.) এর রচনা
১৩. আদাদু সুওয়ারি ওয়াআয়িল কুরআন (عدد سور وآي القرآن) : ইবনে গলবুন আবুত তাইয়্যিব ইবনে আবদুল মুনইম (৩৮৯ হি.)
১৪. আদাদু আয়িল কুরআন আলা মাযহাবি আহলিল বসরাহ (عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة) : আবুল আব্বাস আলকাইয়াল আলবসরী (চতুর্থ শতক)
১৫. তানযীলুল কুরআন ওয়া আদাদু আয়াতিহি ওয়াখতিলাফুন নাসি ফিহি (تنزيل القرآن وعدد آياته واختلاف الناس فيه) : আবু যুরআহ আবদুর রহমান ইবনে যানজালাহ (চতুর্থ শতক)
১৬.আল ওয়াজিয ফি আদাদি আয়িল কুরআনিল আযীয (الوجيز في عدد آي القرآن العزيز) : আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলজাওহারী (৪০১ হি.)
১৭. কিতাবু আদাদি আয়িল কুরআনিল আযীম (كتاب عدد آي القرآن العظيم) : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইউনুস ইবনে হাশেম আল মিসসিসী আদদিমাশকী আল মুকরী (৪১১ হি.)
১৮. কিতাবু ইখতিলাফি কুররাইল আমসার ফি আদাদি আয়িল কুরআন (كتاب اختلاف قراء الامصار في عدد آي القرآن) : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান আলকায়রওয়ানী আল মালেকী আলমুকরি (৪১৫ হি.)
১৯. আততিবয়ান ফি মারিফাতি তানযীলিল কুরআন ওয়া ইখতিলাফু আদাদি আয়াতিল কুরআন আলা আকাবিলিল কুররা আহলিল বুলদান
(التبيان في معرفة تنزيل القرآن واختلاف عدد آيات القرآن على أقاويل القراء أهل البلدان) :
আবু হাফস আলআত্তার উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদ ইবনে আবিল ফাতহ আততামিমী (৪৩২ হি.)
২০. তা'দীলুত তাজযিআহ বাইনাল আয়িম্মাহ ফি শাহরি রমাযান (تعديل التجزئة بين الأئمة في شهر رمضان) : আবু মুহাম্মদ মক্কী ইবনে আবি তালেব (৪৩৭ হি.)
২১. কিতাবুল ইখতিলাফ ফি আদাদিল আ'শার (كتاب الاختلاف في عدد الأعشار) : প্রাগুক্ত
২২. কিতাবুন ফি আদদিল আয়ি (كتاب في عدد الآي) : আবুল আব্বাস আলমাহদুবী আহমাদ ইবনে আম্মার আততামিমী আলকায়রওয়ানী (৪৪০ হি. এর কাছাকাছি)
২৩. আলবয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন (البيان في عد آي القرآن) : আবু আমর উছমান ইবনে সায়ীদ আদদানী (৪৪৪ হি.)
২৪. উরজুযাতুন ফি আদাদি আয়িল কুরআন (أرجوزة في عدد آي القرآن) : আলফালী আলমুআদ্দিব (আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাল্লাক আলবসরী (৪৪৮ হি.)

২৫. কিতাবু আদ্দিল আয়ি (كتاب عد الآي) : আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আহমদ আররাযী (৪৫৪ হি.)

২৬. মানযুমাতুন ফি আদাদি আয়াতিল কুরআনিল কারীম (منظومة في عدد آيات القرآن الكريم) : আবুল খাত্তাব আহমদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ আলবাগদাদী আলহাম্বলী আসসূফী (৪৭৬ হি.)

২৭. তা'দাদুল আয়ি (تعداد الآي) : আবু মা'শার আততাবারী আবদুল কারীম ইবনে আবদুস সামাদ (৪৭৮ হি.)

২৮. মানযুমাতুন ফিস সুওয়ারিল মুত্তফিকাতিল আয়ি ওয়াল মুতামাছিলাতি ফিল আদ্দি (منظومة في السور المتفقات الآي والمتماثلات في العدد) : আবু মুহাম্মদ জাফর ইবনে আহমাদ ইবনে হুসাইন আসসাররাজ আলবাগদাদী (৪৭১-৫০০ হি.)

২৯. হাসরু জামিয়িল আয়িল মুখতালাফি ফি আদ্দিহা বাইনা আহলিল আমসার : আল মাদীনা, ওয়ামাক্কাহ, ওয়াশ শাম, ওয়াল বসরাহ, ওয়াল কুফাহ আলা তারতিবি সুওয়ারিল কুরআন ওয়া তওজীহুল হুজ্জাহ লিখতিলাফিহিম ফি যালিকা

(حصر جميع الآي المختلف في عدها بين أهل الأمصار: المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة، على ترتيب سور القرآن وتوجيه الحجة لاختلافهم في ذلك) :

৩০. আবুল হাসান শুরাইহ ইবনে মুহাম্মদ আলমুকরি (৫৩৭ হি.)

৩১. কিতাবুল ইখতিলাফ ফি আদাদি আয়িল কুরআন ওয়া যিকরি কালিমাতিস সুওয়ারি ওয়া হুরুফিহা ওয়া যিকরি তানযীলিল কুরআন মাক্কিয়িহি ওয়া মাদানিয়িহি ওয়া যিকরি আসমাইস সুওয়ার

(كتاب الاختلاف في عدد آي القرآن وذكر كلمات السور وحروفها وذكر تنزيل القرآن مكيه ومدنيه وذكر أسماء السور) :

আবুল ফযল হিজাযী ইবনে শাবুয়াহ ইবনুল গাযী আশশাবানী আলকাযবীনী (৫২৩ হি.)

৩২. কিতাবু মাবহাজিল আসরার ফি মারিফাতি ইখতিলাফিল আদাদ ফিল আখমাস ওয়াল আ'শার আলা নিহায়াতিল ইজাযি ওয়াল ইখতিসার

(كتاب مبهج الأسرار في معرفة اختلاف العدد في الأخماس والأعشار على نهاية الإيجاز والاختصار)

আবুল আলা আলহাসান ইবনে আহমদ হিন্দোওয়ানী আলআত্তার (৫৬৯ হি.)

৩৩. তালি মাবহাজুল আসরার (تالي مبهج الأسرار) প্রাগুক্ত

৩৪. নাযেমাতুয যহর (ناظمة الزهر) : আবু মুহাম্মাদ আল কাসেম আশশাতেবী (৫৯০ হি.) (এ শাস্ত্রের অধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের অন্যতম, কাব্যে রচিত)

৩৫. কিতাবু আদাদিল আয়ি (كتاب عدد الآي) : আবুল বাকা আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন আল উকবুরী (৬১৬ হি.)

৩৬. উরজুযাতুন ফি আদাদি আয়িল কুরআন আলা তারতীবি হিসাবিল জুমাল বি হাসাবিল আদাদিল কুফী (أرجوزة في عدد آي القرآن على ترتيب حساب الجمل بحسب العدد الكوفي) : রযীউদ্দীন আলহাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসসাগানী (৬৫০ হি.)

৩৭. যাতুর রাশাদ ফিল খিলাফ বাইনা আহলিল আদাদ (ذات الرشد في الخلاف بين أهل العدد) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শোলা আল মাওসীলী (৬৫৬ হি.)

৩৮. উরজুযাতুন ফি ইদ্দাতি আয়িস সুওয়ার, ওয়াকুল্লি আশারিন ফিল কুরআন আলাসতিলাহিল আদাদিল কুফী

(أرجوزة في عدة آي السور وكل عشر في القرآن على اصطلاح العدد الكوفي)

জালালুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মদ আলফাসী (৫৮০-৬৫৬ হি.)

৩৯. আদ্দু আয়িল কুরআন (عد آي القرآن) : আবদুস সালাম আযযাওয়াবী (৬৮১ হি.)

৪০. হাদীকাতুয যাহর ফি আদাদি আয়িস সুওয়ার (حديقة الزهر في عدد آي السور) : বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে উমর আল জা'বারী (৭৩২ হি.)

৪১. হুসনুল মাদাদ ফি মারিফাতি ফন্নিল আদাদ (حسن المدد في معرفة فن العدد) : প্রাগুক্ত

৪২. যাহরুল গুরার ফি আদাদি আয়াতিস সুওয়ার ওয়া যিকরুল আ'দাদ আলা হরফি আবি জাদ

(زهور الغرر في عدد آيات السور، وذكر الأعداد على حرف أبي جاد) :

আবু জাফর আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ আসসুলামী আন্দালুসী (৭৪৭ হি.)

৪৩. আদ দুররুন নাদীদ ফি আদাদি আয়িল কুরআনীল মাজীদ (الدر النضيد في عدد آي القرآن المجيد) : শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী সমরকান্দী (৭৮০ হি. এর কাছাকাছি)

৪৪. কাসীদাতু মাদহিল দুরার ফি আদাদি আয়িস সুওয়ার (قصيدة مدح الدرر في عدد آي السور) : প্রাগুক্ত

৪৫. আলআদাদুল মু'তাবার ফিল আওজুহি বাইনাস সুওয়ার (العدد المعتبر في الأوجه بين السور) : যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬ হি.)

৪৬. আলওয়াজিয ফি আদ্দি আয়িল কুরআনিল আযীয (الوجيز في عد آي القرآن العزيز) : ইবনে আইয়াশ শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আদদিমাশকী (৭৪৬-৮২২ হি.)

৪৭. মানযুমাতুন লামিয়্যাতুন ফি আদাদি আয়িল কুফিয়্যীন ফি খামসিও ওয়া আরবাইনা বাইতান (منظومة لامية في عدد آي الكوفيين في (٤٥) بيتا) শরফুদ্দীন আবু আবদুর রহমান উসমান ইবনে মুহাম্মদ আলগাযনবী আলহারাভী আলহানাফী (৮২৯ হি.)

৪৮. রিইয়ুয যমআন ফি আদ্দি আয়িল কুরআন (ري الظمآن في عد آي القرآن) : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক আল মানতুরী আল কাইসী আলগরনাতী (৮৩৪ হি.)

৪৯. মুসয়িফুল মুকরিয়িন ওয়ামুয়ীনুল মুশতাগিলিন বিমারিফাতিল ওয়াকফি ওয়াল ইবতিদা ওয়া আদ্দি আয়িল কিতাবিল মুবীন

(مسعف المقرئين ومعين المشتغلين بمعرفة الوقف والابتداء وعد آي الكتاب المبين) :
আবু শামাহ যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল কাদির আলগানাতী (৮৮২ হি. এর পর)

৫০. নাযমুল জাওয়াহের ফিখতিলাফিল আয়াতি বাইনা উলামায়িল আদাদ

(نظم الجواهر في اختلاف الآيات بين علماء العدد) :
তাহের ইবনে আরব আবুল হাসান ইস্পাহানী (৭৮৬-৮৮৯ হি. এর আগে)

৫১. কাশফুল হিজাব আন আজযায়িল আহযাব (كشف الحجاب عن أجزاء الأحزاب) : আন নাশশার সিরাজুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনে কাসেম আল আনসারী (৯৩৮ হি.)

৫২. আলজামিউল মুফীদ লিতালিবিল কুরআনিল মাজীদ (الجامع المفيد لطالب القرآن المجيد) : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে ওয়ায়েল আলহিলালী

৫৩. নাযমু জামিআতিল আশতাত ফি আদ্দিল ফওয়াসেলি ওয়ালআয়াত

(نظم جامعة الأشتات في عد الفواصل والآيات) :
ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আবু ইসহাক আলজামাল (১১০৭ হি.)

৫৪. মুরশিদুত তুল্লাব ফি আদ্দি আয়িল কিতাব (مرشد الطلاب في عد آي الكتاب) : প্রাগুক্ত

৫৫. লাওয়ামিউল বাদ্র ফি বুস্তানি নাযিমাতুয যহর (لوامع البدر في بستان ناظمة الزهر) : আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ ইবনে ইসমাঈল আলআইয়ুবী (১২৫২ হি.)

৫৬. তাহকীকুল বয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন (تحقيق البيان في عد آي القرآن) : মুতাওয়াল্লি মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ (১৩১৩ হি.)

৫৭. তাহকীকুল বয়ান ফিল মুখতালাফি ফি আদ্দিহি মিন আয়িল কুরআন

(تحقيق البيان في المختلف في عده من آي القرآن) : প্রাগুক্ত

৫৮. শরহু নাযিমাতুয যহর ফি আদ্দিল আয়াতি ওয়াতা'য়ীনি ফাওয়াসিলিল কুরআন

(شرح ناظمة الزهر في عد الآيات وتعيين فواصل القرآن) :
মূসা জারুল্লাহ ইবনে ফাতেমা আততুরকিস্তানী আলকাযানী আততাতারী (১২৯৫-১৩৬৯ হি.)

৫৯. আদাদু আয়িস সুওয়ার ওয়া কুল্লি আশারিন ফিল কুরআন (عدد آي السور وكل عشر في القرآن) : জামালুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে রজওয়ান আলফাসী

৬০. মানযুমাতুন ফি আয়িল কুরআন (منظومة في آي القرآن) : আবুল হাসান আলআনতাকী

৬১. নাফায়েসুল বয়ান বিশরহিল ফারায়েদিল হিসান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন

(نفائس البيان بشرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن)
: আবদুল ফাত্তাহ আলকাযী (১৪০৩ হি.)

ইবনুন নাদিম প্রদানকৃত তালিকা এবং পরবর্তীতে উল্লেখকৃত তালিকায় মোট ৮০ টি গ্রন্থের নাম এসেছে। যদি ভালোভাবে খোঁজ করা হয় তাহলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং সমসাময়িকদের রচনা মিলে আরো একটি তালিকা তৈরি হওয়া সম্ভব। এমনকি আমার অধ্যয়নে আছে এমন কিছু কিতাবের নামও এই তালিকায় আসেনি।

উল্লেখিত কিতাবগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে রিজাল শাস্ত্র, জীবনচরিতের উপর লেখা গ্রন্থাবলী এবং গ্রন্থ পরিচিতি সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি সে সব গ্রন্থও দেখা যেতে পারে, এই তালিকা তৈরিতে যেগুলোর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়-৩

বিভিন্ন গণনায় আয়াত সংখ্যার পার্থক্যের ধরন

সামনে যাওয়ার পূর্বে এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। তা হল, অনেক ভাই যখন মুসহাফের শুরুতে বা শেষে প্রদত্ত 'প্রকাশকের কথা'তে এ কথা পড়েন যে, বসরী গণনায় আয়াত সংখ্যা এত, কুফী গণনায় আয়াত সংখ্যা এত, মাদানী গণনায় এত, শামী গণনায় এত তখন তাদের মনে দু'টি প্রশ্ন জাগে–

এক. আয়াত সংখ্যার আলোচনায় মক্কা-মদীনা, বসরা-কুফার কথা কেন আসে? এ প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে সামনের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমাদের তো এই বিষয়ে পূর্ণ ও মজবুত ঈমান রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিল করে যেভাবে তা সংরক্ষণ করে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমানত যেভাবে সাহাবায়ে কেরামের কাছে রেখে গেছেন ঠিক সেভাবেই তা আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত

থাকবে। এতে সংযোজন-বিয়োজনের না কোনো অবকাশ আছে, না কোনো আশঙ্কা। কুরআনে সংযোজন-বিয়োজনের কোনো প্রশ্নই যেহেতু নেই তাহলে এই কথার কী অর্থ যে, বসরী গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০৪ এবং কুফী গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬? এই গণনায় কম কেন আর ঐ গণনায় বেশি কেন?

এই প্রশ্ন যাদের মনে জাগে তা এ জন্যই জাগে যে, আয়াত সংখ্যা পার্থক্য হওয়ার ধরন তাদের জানা নেই বা অন্তত এখন তাদের মনে নেই।

তাই সামনে যাওয়ার আগে আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে যে মামুলি পার্থক্য পাওয়া যায় তার ধরন স্পষ্ট করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

কথা আসলে স্পষ্ট, সবাই জানে যে, কুরআনে কারীম কোনো ধরনের সংযোজন-বিয়োজনের উর্ধ্বে। আয়াত সংখ্যার যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি-কমতির সাথে নয়। এই পার্থক্যের মূল কারণ আয়াত সংখ্যা গণনার পদ্ধতিগত পার্থক্য। আয়াত সংখ্যা গণনার পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হওয়ার কারণে সংখ্যায় কম-বেশি হয় কিন্তু আয়াত কম-বেশি হয় না। উদাহরণত সূরা ইখলাসের আয়াতগুলো দেখুন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

আমরা দেখছি সূরা ইখলাসে মোট চার আয়াত। কুফী গণনা, বসরী গণনা, মাদানী গণনায় (প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় গণনা) সূরা ইখলাসের মোট আয়াত সংখ্যা চার। কিন্তু মক্কী ও শামী গণনা অনুযায়ী সূরা ইখলাসের মোট আয়াত সংখ্যা পাঁচ। তা কীভাবে? সামনে দেখুন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

উভয় গণনা অনুসারে সূরা ইখলাস সম্পূর্ণ এক। শব্দ নয় শুধু, একটি অক্ষরেরও পার্থক্য নেই। কিন্তু এক গণনায় তার মোট আয়াত সংখ্যা চার আর অন্য গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা পাঁচ। পাঠক দেখতে পেয়েছেন তা কীভাবে হয়েছে।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ এই দুই বাক্য মাদানী, কুফী ও বসরী গণনায় এক আয়াত হিসেবে গণনা করা হয়েছে কিন্তু মক্কী ও শামী গণনায় দুই অংশকে দুই আয়াত ধরে গণনা করা হয়েছে। لَمْ يَلِدْ এক আয়াত, وَلَمْ يُوْلَدْ ভিন্ন আয়াত। গণনা পদ্ধতিতে বৈচিত্র কেন হল তা ভিন্ন বিষয়। এর আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে। এখন আমি দেখাতে চাইছি মোট আয়াত সংখ্যায় যে পার্থক্য পাওয়া যায় সেই পার্থক্যের ধরন কী?

কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তা আয়াত হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে হয়েছে এমন নয়; বরং এ জন্য হয়েছে যে, একটি বিশেষ অংশকে এক আয়াত ধরা হবে না দুই আয়াত– এ বিষয়ে গণনাপদ্ধতি বিভিন্ন হওয়ার কারণে। ভিন্নভাবে বললে বলতে হয়, এর সম্পর্ক গণনা পদ্ধতির সাথে, যা গণনা করা হচ্ছে তা কম বা বেশি হওয়ার সাথে নয়।

আরও কিছু উদাহরণ দেখুন

সূরা কুরাইশ :

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۝
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ
وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

কুফী, বসরী, শামী এই তিনও গণনায় সূরা কুরাইশে চার আয়াত যেমনটি আমরা উপরে দেখলাম। কিন্তু মক্কী, মাদানী প্রথম ও মাদানী দ্বিতীয় গণনা এই তিন গণনায় সূরা কুরাইশে মোট পাঁচ আয়াত। কিন্তু তা এই জন্য নয় যে তাদের মতে সূরা কুরাইশে (আল্লাহ মাফ করুন) কোনো কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে। বরং তার আসল কারণ হল তারা সূরা কুরাইশের আয়াতগুলো গণনা করেছেন এভাবে–

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۝
وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

উপরিউক্ত উভয় গণনা অনুসারে সূরা কুরাইশে একটি অক্ষরও কম-বেশি হয়নি। কিন্তু মোট আয়াত সংখ্যায় পার্থক্য হয়েছে। এর কারণ হল, দ্বিতীয় গণনা পদ্ধতি অনুসারে مِّنْ جُوْعٍ পর্যন্ত এক আয়াত ধরা হয়েছে এবং اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ কে ভিন্ন আয়াত ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রথম পদ্ধতি অনুসারে الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ এই পুরো অংশকে এক আয়াত ধরা হয়েছে।

সূরা আলকারিয়া : কুফী গণনা অনুসারে এই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা এগারো :

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ
يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوْشِ ۝ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَ
اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ
حَامِيَةٌ ۝

কিন্তু মাদানী ও মক্কী গণনা অনুসারে সূরা আলকারিয়ার মোট আয়াত সংখ্যা দশ। তবে তা এ জন্য নয় যে তাদের নিকট সূরা আলকারিয়ার আয়াত একটি কম। বরং তা এজন্য যে তারা সূরা

আলকারিয়ার প্রথম শব্দ اَلْقَارِعَةُ কে স্বতন্ত্র আয়াত ধরেন না বরং اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ এই পুরো অংশটিকে এক আয়াত ধরেন। অথচ কুফী গণনা অনুসারে এই অংশটিকে দুই আয়াত ধরা হয়েছিল। এদিকে বসরী ও শামী গণনা অনুসারে সূরা আল কারিয়ার মোট আয়াত সংখ্যা আট। এর কারণ– আল্লাহ মাফ করুন–এই নয় যে, তারা সূরা আলকারিয়া থেকে দুই বা তিন আয়াত বিয়োজন করে দিয়েছেন বরং তা এ জন্য যে, তারা সূরার আয়াতগুলো এভাবে গণনা করেছেন–

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

তো ইলমে কেরাআতের বিভিন্ন শহর, ভিন্নভাবে বললে ইলমে কেরাআতের বিভিন্ন ইমামগণের মাঝে কোন কোন সূরার মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে যে মতপার্থক্য দেখা যায় তার মূল কারণ আয়াত কম হওয়া বা বেশি হওয়া কিছুতেই নয়। বরং তার মূল কারণ আয়াত গণনার পদ্ধতিগত পার্থক্য।

কখনো এমনও হয়, একটি সূরার মোট আয়াত সংখ্যা সব গণনা পদ্ধতি অনুসারেই এক। কিন্তু কোন আয়াতের সূচনা-শেষ কোথায় তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। যেমন, সূরা আলআসর। সব গণনা পদ্ধতি অনুসারেই এই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা তিন। দ্বিতীয় মাদানী গণনা ছাড়া অন্যান্য গণনা পদ্ধতি অনুসারে সূরাটির আয়াত গণনা করা হয়েছে এভাবে–

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

আর দ্বিতীয় মাদানী গণনা অনুসারে আয়াত গণনা করা হয়েছে এভাবে–

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

সব গণনা পদ্ধতি অনুসারে আয়াত সংখ্যা তিন হওয়া সত্ত্বেও কোন্ আয়াতের শেষ কোথায় তা নিয়ে মতপার্থক্য হয়ে গেছে। কিন্তু সব পদ্ধতিতেই সূরার মূল পাঠ এক। কোন পদ্ধতিতেই মূল সূরায় কোন ধরনের কমবেশি হয়নি।

এই হাকীকত ও বাস্তব বিষয়টি যদি মনে থাকে তাহলে কখনো এই স্থূল প্রশ্ন আসবে না যে, কুরআন মজীদ সংযোজন-বিয়োজনের উর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মজীদের আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য কেন?

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। অনেকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে যায় এবং ধোঁকাবাজ লোকেরা অনেক সময় অনেক স্পষ্ট বিষয়েও মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয় তাই পূর্ববর্তীরা এ বিষয়টিও বলে দিয়ে গেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে আবি উমর আলআনদারাবী তাঁর কিতাব 'আলইযাহ' এর পনেরো নং অধ্যায়ের শুরুতে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

যার সারমর্ম : কুরআনের আয়াত গণনার ক্ষেত্রে সালাফের মাঝে যে পার্থক্য দেখা যায় বাস্তবে তা ইখতিলাফ নয়। বাহ্যত যদিও তা ইখতিলাফ মনে হয়। উদাহরণত আহলে কুফা صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ এ অংশকে স্বতন্ত্র আয়াত হিসেবে গণনা করে। কিন্তু অন্যান্যরা তার পরবর্তী অংশ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ কে মিলিয়ে, কুফী গণনায় যা সূরা সাদ এর দ্বিতীয় আয়াত, পুরো অংশকে সূরা সাদ এর প্রথম আয়াত ধরেছে। (এখন কুফী গণনায় যেখানে দুই আয়াত হয়েছে, তা-ই অন্যান্য গণনায় এক আয়াত।)

এমনিভাবে আহলে কুফা قَالَ فَالْحَقُّ ۗ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ (সূরা সাদ, আয়াত : ৮৪) এই অংশ একটি স্বতন্ত্র আয়াত ধরেছে। কিন্তু অন্যান্য গণনায় পরবর্তী অংশ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ কে মিলিয়ে এক আয়াত ধরা হয়েছে অথচ এ অংশটি কুফী গণনা অনুসারে স্বতন্ত্র একটি আয়াত (৮৫ নাম্বার আয়াত)

তদ্রূপ (সূরা সাদ এর ৩৮ নং আয়াত) وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّ غَوَّاصٍ এই অংশকে বসরী গণনায় স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়েছে। বসরী গণনায় পরবর্তী অংশ وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ কে মিলিয়ে সম্পূর্ণ অংশকে এক আয়াত ধরা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য গণনা পদ্ধতিতে غَوَّاصٍ পর্যন্ত এসে এক আয়াত এবং তার পরবর্তী অংশ থেকে নিয়ে الْأَصْفَادِ পর্যন্ত এক আয়াত মোট দুই আয়াত ধরা হয়েছে।

ইমাম আনদারাবী রহ. বলেন, এ ধরনের পার্থক্য মূলত বাহ্যিক ও নামের পার্থক্য। এই পার্থক্য আসলে ইখতিলাফ নয়। এটা গণনা পদ্ধতির পার্থক্য, কুরআনের আয়াত কমবেশি হওয়ার পার্থক্য নয়। এই বাহ্য ইখতিলাফের কারণেই কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে ইখতিলাফ শোনা যায়। কেউ বলে, মোট আয়াত সংখ্যা এত, আর কেউ বলে মোট আয়াত সংখ্যা এত (উদাহরণত কুফী গণনায় ৬২৩৬ এবং বসরী গণনায় ৬২০৪ ...) তো এখানে বিষয় এমন নয় যে, এক পক্ষ কুরআনকে বেশি বলছে আর অপর পক্ষ কম বলছে অথবা এক পক্ষ কুরআনের কোন অংশকে কুরআন মানছে আর

অপর পক্ষ (আল্লাহ মাফ করুন) তা কুরআনের অংশ বলে মানছে না। বিষয়টি আদৌ এমন নয়।—আলইযাহ ফিল কেরাআত, ইমাম আহমদ ইবনে আবী উমর আলআনদারাবী রহ., ১৫ নং অধ্যায়, শিরোনাম : ذكر عد آي القرآن وكلامه وحروفه جملة, তাহকীক : গানেম আলহামদ

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত বয়ান উপরিউক্ত স্পষ্ট বিষয়টি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে যথেষ্টের চেয়েও বেশি হবে।

অধ্যায়-চার

আয়াত গণনার ইলমী মারকাযসমূহ এবং ইলমী মারকাযের ইমামগণ

উম্মতে মুসলিমার স্বর্ণযুগে বড় বড় ইসলামী শহরগুলো বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রের মারকায ছিল। কোন কোন শহরে নির্দিষ্ট একটি শাস্ত্রের চর্চা বেশি হত আবার অন্য শহরে অন্য শাস্ত্রের চর্চা বেশি হত। আর কোন কোন খোশ কিসমত শহর এমন ছিল যাতে সকল ইসলামী মৌলিক শাস্ত্রগুলোরই চর্চা ছিল এবং বড় জোরদার ও ব্যাপক চর্চা ছিল।

মুসলিম মনীষীগণ ইসলামী দেশসমূহের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন। কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ এবং ফিকহ এই তিন শাস্ত্রের ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যে শহরেই এই শাস্ত্রসমূহের চর্চা হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যেন সেই চর্চার ফসল সংরক্ষিত রাখা হয়।

ইলমে কেরাআতের চর্চায় সবচে' আগে বেড়ে ছিল ঐ ইসলামী শহরগুলো যেখানে খলীফায়ে রাশেদ আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযিআল্লাহু আনহু তেলাওয়াতে কুরআন এবং ইলমে কেরাআত ও তাজবীদে দক্ষ প্রশিক্ষকসহ এক নুসখা করে 'আল মুসহাফুল ইমামে'র কপি পাঠিয়েছিলেন।

বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য মতানুসারে তিনি মক্কা, শাম, বসরা, ও কুফায় এক কপি করে পাঠিয়েছিলেন। এক কপি মদীনার জন্য রেখেছিলেন। আর এক কপি রেখেছিলেন নিজের কাছে।

খাইরুল কুরুনে ইলমে কেরাআত ও ইলমে কেরাআতের সকল শাখার বড় ইমামগণ এই শহরসমূহেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইলমে কেরাআতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 'ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআন' এর চর্চাও এই শহরসমূহেই বেশি হয়েছে। সুতরাং আয়াত গণনার মারকায বা কেন্দ্র হিসেবে এই পাঁচ শহরই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে : ১. মদীনা ২. মক্কা ৩. কুফা ৪. বসরা ৫. শাম। এ ছাড়া হিমসের সাথে সম্পৃক্ত একটি গণনা পদ্ধতিও আছে যা অতটা প্রসিদ্ধ নয়।

মদীনা মুনাওয়ারাহ এর কারীদের[৩] মাঝে দুটি গণনা প্রচলিত ছিল। একটির নাম (المدني الأول) প্রথম মাদানী গণনা। দ্বিতীয়টির নাম (المدني الثاني) দ্বিতীয় মাদানী গণনা। তো পাঁচ শহরে ছয় ধরনের গণনা হয়েছিল। এই গণনা পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি নিম্নে প্রদত্ত হল।

প্রথম মাদানী গণনা (মাদানী আওয়াল)

আহলে কুফা এই গণনা পদ্ধতি আহলে মদীনার বরাতে বর্ণনা করে। কিন্তু মদীনার কোন বিশেষ ইমামের নাম নেয় না। পক্ষান্তরে ইমাম নাফে' ইবনে আবি নুআইম মাদানী, ইন্তেকাল ১৬৯ হি. (সাত কারীর এক কারী) এই পদ্ধতি আবু জাফর ইয়াযীদ ইবনে কা'কা' (১৩২ হি.) এবং শাইবা ইবনে নিসাহ (১৩০ হি.) এর বরাতে বর্ণনা করেন। অনির্দিষ্ট 'আহলে মদীনা' এই পদ্ধতির ভিত্তি। বাহ্যত এটি আহলে মদীনার অনেক কারীর মাসলাক ছিল। ইবনুল মুনাদী রহ. এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম নাফে'র পুরাতন শাগরেদ যেমন ওরশ ও অন্যান্যরা এই পদ্ধতিরই প্রবক্তা ছিলেন। এক সময় মিসরে এই পদ্ধতিটি প্রসিদ্ধ ছিল।[৪] এই গণনা পদ্ধতি অনুসারে কুরআন মজীদের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৭।[৫]

---

[৩] 'কারী' দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ইলমে কেরাআতের ইমাম। বর্তমান সময়ের পরিভাষা অনুযায়ী যাকে কারী বলা হয় সে নয়। এখনতো যে কোনো কুরআন পাঠকারী বা কুরআন শিক্ষাদানকারীকেই কারী বলা হয়।

[৪] 'আল ইযাহ ফিল কেরাআতে' (২১৪ পৃষ্ঠায়) একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে যাতে আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর গণনা তা-ই ছিল। অর্থাৎ ৬২১৭।

[৫] 'আল বয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন', আবু আমর উসমান ইবনে সাঈদ আদদানী (৪৪৪ হি.), তাহকীক : গানেম আলহামদ, প্রকাশক: মারকাযুল মাখতুতাত ওয়াতুরাছ ওয়ালওছায়েক, কুয়েত ১৪১৪ হি., ১৯৯৪ ইং, পৃষ্ঠা ৬৭ ও ৭১
'তানযীলুল কুরআন ওয়াআদাদু আয়াতিহি ওয়াইখতিলাফুন নাসি ফিহি', শায়খ আবু মুআয আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যানজালাহ আল মুকরি'র ইমলা (চতুর্থ শতকের মুসলিম মনীষী) তাহকীক : গানেম আলহামদ, মা'হাদুল ইমাম শাতেবী লিদদিরাসাতিল কুরআনিয়্যাহ এর পত্রিকা (সংখ্যা ২, যিলহজ্ব ১৪২৭ হি.) পৃ. ২৭৫-২৭৬;
'আল ইযাহ ফিল কিরাআহ', আহমদ ইবনে আবি উমর আলআনদারাবী (৫০০ হি. এর পর), পৃষ্ঠা : ২১৪
(প্রকাশ থাকে যে, হয়তো লিপিকারের ভুলের কারণে কিংবা লেখকের বিভ্রান্তির কারণে 'আল ইযাহ ফিল কেরাআতে' মাদানী আওয়ালের জায়গায় মাদানী দুওম আর মাদানী দুওমের জায়গায় মাদানী আওয়ালের সংখ্যা লেখা হয়েছে। এতে বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক হবে না।)
'ফুনূনুল আফনান ফি উয়ূনি উলূমিল কুরআন', আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.), তাহকীক : হাসান যিয়াউদ্দীন ইতর, দারুল বাশায়েরেল ইসলামিয়া, বৈরুত লেবানন, ১৪০৮ হি., ১৯৮৭ ইং, পৃ. ২৩৮-২৩৯, ২৪১-২৪২।

দ্বিতীয় মাদানী গণনা (মাদানী দুওম)

এই গণনা পদ্ধতি ইমাম ইসমাঈল ইবনে জাফর মাদানী (১৮০ হি.) সুলায়মান ইবনে মুসলিম ইবনে জাম্মায (১৭০ হি. এর পরে) থেকে রেওয়ায়েত করে এবং সুলায়মান ইবনে মুসলিম তা আবু জাফর ও শাইবা থেকে রেওয়ায়েত করেন। আবু জাফর ও শাইবার উপরই এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি। প্রথম মাদানী গণনায় তারা দু'জন রাবী ছিলেন অর্থাৎ তারা প্রথম মাদানী গণনা রেওয়ায়েত করেছেন কিন্তু তা তাদের অবলম্বনকৃত গণনা পদ্ধতি ছিল না। দ্বিতীয় মাদানী গণনা পদ্ধতি তাদের অবলম্বনকৃত গণনা পদ্ধতি। যদিও এই গণনা পদ্ধতির নেসবত তাদের শাগরেদের শাগরেদ ইসমাঈল ইবনে জাফর মাদানীর দিকে বেশি প্রসিদ্ধ। কিন্তু আসলে এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি তারা দু'জন। ইসমাঈল শুধু রেওয়ায়েতকারী।

এই গণনা পদ্ধতিতে আবু জাফর ও শাইবার মাঝে ছয় জায়গায় ইখতিলাফ হয়েছে। এক জায়গায় আবু জাফর স্বতন্ত্র আয়াত ধরেন কিন্তু শাইবা তাকে স্বতন্ত্র আয়াত ধরেন না। আর পাঁচ জায়গা সম্পূর্ণ এর বিপরীত অর্থাৎ শাইবা এই পাঁচ জায়গায় স্বতন্ত্র আয়াত ধরেন আর আবু জাফর সব জায়গায় পূর্ববর্তী আয়াতের অংশ ধরেন। সুতরাং শাইবার বর্ণনায় দ্বিতীয় মাদানী গণনায় আয়াত সংখ্যা ৬২১৪ আর আবু জাফরের বর্ণনায় ৬২১০।

পশ্চিমের ইসলামী অঞ্চলসমূহে অনেককাল যাবৎ দ্বিতীয় মাদানী গণনাটি প্রচলিত ছিল। সেখানে এখনও এই সংখ্যায় ছাপা মুসহাফ পাওয়া যায়। যাতে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৪।[২]

মক্কী গণনা

এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে কাছীর মক্কী (১২০ হি.) যিনি সাত কারীর একজন প্রসিদ্ধ কারী। মক্কী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৯। আবুল আব্বাস ফাযল ইবনে শাযান রাযী, আবু আমর আদদানী এবং ইবনে যানজালাহ এ মতই ব্যক্ত করেছেন।[১]

শামী গণনা

এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইয়াহসাবী (১১৮হি.) এর শাগরেদ ইয়াহইয়া ইবনে হারেছ আযযিমারী (১৪৫ হি.)। এই গণনা পদ্ধতি অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২২৬।[২] শামী গণনা অনুসারে আয়াতের সংখ্যা

'জামালুল কুররা ওয়াকামালুল ইকরা', আলামুদ্দীন সাখাবী (৫৫৮-৬৪৩ হি.), তাহকীক : আলী হুসাইন আলবাওয়াব, মাকতাবাতুত তুরাছ, মক্কা মুকাররমা ১৪০৮ হি., খণ্ড : ১, পৃ. ১৮৯, অধ্যায় : أقوى العدد في معرفة العدد
'বাসায়েরু যাবিত তাময়ীয ফি লাতায়িফিল কিতাবিল আযীয' মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ফায়রোজাবাদী (৮১৭ হি.) তাহকীক : আব্দুল আলীম তহাবী, আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
'আততিবয়ান লিবা'দিল মাবাহিছিল মুতাআল্লাকাতি বিল কুরআন', শায়েখ তাহের জাযায়েরী (১২৬৮-১৩৩৮ হি.) তাহকীক : শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ., মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালাব, পৃ. ২০৫-২০৭
'মানাহেলুল ইরফান ফি উলূমিল কুরআন', শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম যুরকানী (১৩৬৭ হি.) মাকতাবা নিযার মুস্তফা আল বায ১৪১৯ হি., ১৯৯৮ ইং, খণ্ড : ১, পৃ. ২৭৯-২৮৩
[২] দেখুন প্রথম মাদানী গণনার জন্যে উল্লেখকৃত গ্রন্থাবলীর সংশ্লিষ্ট অংশ। তবে হ্যাঁ 'আল ঈযাহ ফিল কেরাআতে' ভুলে প্রথম মাদানী গণনাকে দ্বিতীয় মাদানী গণনা আর দ্বিতীয় মাদানী গণনাকে প্রথম মাদানী গণনা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে!!
মুজাম্মাউল মালিক ফাহদ থেকে ১৪১১ হি. দ্বিতীয় মাদানী গণনা অনুসারে মুসহাফ ছাপা হয়েছে। এর আগে লিবিয়ার মন্ত্রণালয় থেকে দ্বিতীয় মাদানী গণনা (মাদানী দুওম) অনুযায়ী মুসহাফ ছাপা হয়েছিল। যার দ্বিতীয় এডিশন ১৩৯৯ হি. মোতাবেক ১৯৭৯ ইং -এ প্রকাশিত হয়।
[১] 'আলবয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন', পৃ. ৭৯; 'তানযীলুল কুরআন ও আদাদু আয়াতিহি' ইবনে যানজালাহ, প্রাগুক্ত
গত শতকে মিশরের শায়খুল কুররা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আলী হাদ্দাদ আলহুসাইনী (১৩৫৭ হি.) 'সাআদাতুদ দারাইন ফি বয়ানি ওয়াআদ্দি আয়ি মু'জিযিছ ছাকালাইনে' মক্কী গণনা অনুসারে আয়াত সংখ্যা ৬২১৯ হওয়ার বর্ণনাটিকেই সবচে' সঠিক বর্ণনা বলেছেন।
আর কোন কোন লেখক যে লেখেন মক্কী গণনা অনুসারে আয়াত সংখ্যা ৬২১২ তা আসলে মক্কার এক কারী হুমাইদ ইবনে কায়স আলআরাজ এর গণনা। সাধারণভাবে আহলে মক্কার গণনা অনুসারে আয়াত সংখ্যা ৬২১৯।
وعن حميد بن قيس الأعرج حين حسب آي القرآن قال: فبلغ ست آلاف آية ومئتي آية واثني عشرة آية، وقد قيل إن عدد أهل مكة منسوب إلى أبي المنذر أبي بن كعب الأنصاري، والله أعلم،
(ইবনে আব্দুল কাফী এর প্রাগুক্ত কিতাব, কুতুবখানা আযহারিয়া এর মাখতুতার ফটোকপি, নং ৬২১, উলূমুল কুরআন, মোট পাতা : ১১১, পাতা ৭ দ্রষ্টব্য)
[illegible]
[২] 'আলবয়ান', পৃ. ৮১-৮২; ইবনু আবদিল কাফী, পৃ. ৮; আলঈযাহ', পৃ. ২১৫; 'ফুনূনুল আফনান', ইবনুল জাওযী, পৃ. ২৪১

লাগানো মুসহাফ ছাপা আকারে পাওয়া যায়। ১৪৩০ হি. মোতাবেক ২০০৯ ইং জর্ডান আওকাফ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তা ছাপা হয়েছে।

বসরী গণনা

এ গণনা পদ্ধতির কেন্দ্রীয় রাবী আইয়ুব ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ও আসেম আলজাহদারী। উভয়ই বসরার বড় দুই ইমাম। আইয়ুব ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ইলমে কেরাআতে বে নজীর ছিলেন। ২০০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আসেম আলজাহদারীর পিতা ছিলেন আবুস সাব্বাহ আলআজ্জাজ। তাঁর পিতার নাম মায়মুন ছিল বলেও কেউ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর নাতি শাগরেদ ছিলেন। ১২৮ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। বসরী গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০৪। আবু আমর আদদানী (৪৪৪ হি.) এবং ইবনে আবদুল কাফী (৪০০ হি. এর কাছাকাছি) বসরী মুসহাফসমূহের বরাতে এই সংখ্যাই বলেছেন; এবং লিখেছেন—

وهو العدد الذي عليه مصاحفهم حتى الآن

অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত বসরার অধিবাসীদের মুসহাফসমূহে এই সংখ্যাই প্রচলিত।[9]

কুফী গণনা

কুফী গণনার কেন্দ্রীয় রাবী হলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আবদুর রহমান আসসুলামী (৭৪ হি.)। এই গণনায় কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।[10]

কুফী গণনা আগেও বেশি প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও গোটা ইসলামী বিশ্বে অধিকাংশ মুসহাফ এই গণনা মোতাবেকই প্রকাশিত হয়। আরব-আজম, ইরাক-ইরান, পাশ্চাত্য-মধ্যপ্রাচ্য, পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্ত হোক বা প্রাচ্যের শেষ প্রান্ত সব জায়গায় কুফী সংখ্যা অনুসারেই নম্বর লাগানো হয়। হ্যাঁ, কোন কোন এলাকায় কুফী গণনার মুসহাফের পাশাপাশি শামী সংখ্যা বা দ্বিতীয় মাদানী গণনার মুসহাফও পাওয়া যায়।[11]

কুফী গণনা এত প্রসিদ্ধ যে, সাত কেরাতের মধ্যে আসেম কুফীর কেরাআতওয়ালা মুসহাফই শুধু কুফী গণনা অনুসারে ছাপে না; বরং অন্যান্য কেরাআতের মুসহাফও কুফী গণনা অনুসারে ছাপে। কারণ আয়াত গণনার ভিন্নতা আর কেরাআতের ভিন্নতা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এবং এই উভয় ভিন্নতা ও ইখতিলাফের কোনোটাই কমবেশ হওয়ার ইখতিলাফ নয়। উদাহরণস্বরূপ আল জাযায়েরের শারিকায়ে ওতানিয়্যাহ ১৯৮১ সালে ওয়ারশ (একজন ইমাম) এর রেওয়ায়েত করা ইমাম নাফে মাদানী রহ. এর কেরাআত মোতাবেক একটি মুসহাফ ছেপেছে। ইমাম নাফে মাদানী গণনার রাবী। তার গণনা হল প্রথম মাদানী গণনা। কিন্তু তার কেরাআত মোতাবেক লিখিত এই মুসহাফে আয়াতের চিহ্ন ও নম্বর লাগানো হয়েছে কুফী গণনা অনুসারে। সুতরাং এর মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

ইবনুল জাওযী লিখেছেন—

وأما الشامي: فمنسوب إلى عبد الله بن عامر اليحصبي، ويروى عن قوم أن أيوب بن تميم زعم أنه (أي عدد أهل الشام) عدد عثمان بن عفان، والأول أصح

কেউ কেউ লিখেছেন শামী সংখ্যা ৬২৫০। এটি ভুল। এটি তো আবুল লাইছ সমরকন্দী রহ. শামের এক ব্যক্তির (যার নাম উল্লেখ করা হয়নি) দিকে সম্বন্ধিত করে উল্লেখ করেছেন। শামী সংখ্যা তিনি নিজেও ৬২২৬ই লিখেছেন।
দ্রষ্টব্য : 'বুসতানুল আরেফীন', পৃ. ২০০ (অধ্যায় : ৪৮) মাতবায়াতে মাইমানিয়্যাহ মিসর ১৩১১ হি., তাম্বীহুল গাফেলীনের হাশিয়ায়।

قال الراقم: وأما عدد ٦٢٢٥ فرواية عن يحيى الذماري، قال راويها ابن ذكوان أنها لعلها محمولة على إسقاط البسملة من العد، كما في البيان ص ٨٢ ، وأما عدد ٦٢٢٧ فمنشؤها أن ابن الجوزي مع أنه ذكر في الإجمال عدد ٦٢٢٦ لكنه عند التفصيل ذكر في سورة الكهف من العدد الشامي أنه ١٠٧ آيات، وصارت المجموع ٦٢٢٧، مع أن الأكثرين صرحوا بكون مجموع آيات الكهف في العدد الشامي ١٠٦، وهذا هو الموافق لما ذكره ابن الجوزي في الإجمال، وراجع «سور القرآن وآياته» المنسوب إلى الفضل بن شاذان ص ١٧١ وكتاب العدد للهذلي.

[9] 'আলবয়ান' পৃষ্ঠা : ৮০; ইবনে আবদুল কাফী, পাতা : ৭-৮।
উল্লেখ্য যে, সূরা সাদ (৩৮ নং সূরা) এর ৮৩ নং আয়াতের পরবর্তী অংশ قال فالحق والحق أقول এই অংশের ব্যাপারে আয়াত সংখ্যা সংক্রান্ত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের কেউ বলেছেন আসেম আলজাহদারী এটিকে ভিন্ন আয়াত ধরেছেন। আর তাদের কেউ বলেছেন, আইয়ুব ইবনুল মুতাওয়াক্কিল এ অংশকে ভিন্ন আয়াত ধরেছেন। যদি এটিকে ভিন্ন আয়াত ধরা হয় তাহলে সূরা সাদ এর মোট আয়াত সংখ্যা ৮৬ হয়ে যায় এবং এর ফলে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২০৫। কিন্তু এর প্রবক্তা আসেমই হোন বা আইয়ুব— এটা তার নিজস্ব গণনা। সাধারণভাবে বসরী গণনায় সূরা সাদ এর আয়াত সংখ্যা ৮৫ এবং মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০৪।
আর বসরী সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে যে ৬২১৬ এর উল্লেখ করা হয় তা এক ধরনের ভুল বৈ কিছু নয়। এটা 'বসরী গণনা' নয়; বরং বসরার কোন বিশেষ ইমামের গণনা। যেমন 'আলবয়ানে' (৮১ পৃষ্ঠায়) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বসরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৬। বরং ৮০ পৃষ্ঠাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. (যিনি এক সময় বসরায় ছিলেন) এর বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৬।

[10] আনাদু সুওয়ারিল কুরআন ওয়াআয়াতিহি ওয়াকালিমাতিহি ওয়াহুরুফিহি, ইমাম আবুল কাসেম ইবনে আবদুল কাফী, পাতা ৮, ৯; 'আলবয়ান', আবু আমর আদদানী, পৃ. ৬৯; এবং পূর্বে উল্লেখকৃত অন্যান্য উৎসগ্রন্থ

[11] প্রথম মাদানী গণনা, বসরী গণনা এবং মক্কী গণনা অনুসারে আয়াতের নম্বর লাগানো মুসহাফ মাখতূত বা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে তো পূর্বে ছিলই, এখনও নিঃসন্দেহে কোথাও আছে কিন্তু এই লেখাটি প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনিভাবে এই তিন গণনার কোন গণনা অনুযায়ী কোন মুসহাফ ছাপা হয়েছে কিনা তাও এখন পর্যন্ত (২৬.০২.১৪৩৭ হি.) আমি জানতে পারিনি। আসলে এর জন্য আলাদাভাবে খোঁজ তালাশেরও সুযোগ এখনও হয়নি।

এখান থেকে এই স্পষ্ট বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এল যে, আয়াত গণনার ইখতিলাফ আয়াত বেশ-কম হওয়ার ইখতিলাফ নয়। যদি এই এখতিলাফ আয়াত বেশ-কম হওয়ার ইখতিলাফ হত তাহলে নাফে মাদানীর কেরাআত মোতাবেক মুসহাফে কুফী সংখ্যা লাগানো সম্ভব হত না। নাফের গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৭, অথচ কুফী গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। যদি এই ভিন্নতা ও ইখতিলাফ কুরআনের মূলপাঠে কম-বেশি হওয়ার ইখতিলাফ হত তাহলে দুই সংখ্যার মাঝে যে ১৯ এর পার্থক্য তা কী দিয়ে পুরা করা হত? অথচ ঐ মুসহাফ যারা ছেপেছেন তারা কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হয়েই নাফের কেরাআতে কুফী সংখ্যা লাগিয়ে দিয়েছেন। আসলে এখানে কোন প্রশ্ন উত্থাপনেরই সুযোগ নেই কারণ এই ইখতিলাফ ও ভিন্নতা সৃষ্টিই হয়েছে গণনা পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে। আয়াত কম-বেশ হয়েছে এমন নয়। প্রবন্ধের শুরুতে আমি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে পেশ করেছিলাম।

উপরিউক্ত মুসহাফটি লেখার খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন প্রসিদ্ধ কুরআন লিপিকার মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ শারীফী। ১৩৯৮ হিজরির ২৬ রমযানুল মুবারক এটি লেখা শেষ হয়। আলজাযায়েরের প্রসিদ্ধ কারীগণ (ইলমে কেরাআতের বিশেষজ্ঞগণ) এর প্রুফ দেখেছেন। ১৩৯৯ হিজরির সফর মাসে আলজাযায়েরের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই মুসহাফটি ছাপার অনুমতি প্রদান করা হয়। বেরাদারে মুহতারাম শায়খ সালমান আবু গুদ্দাহ হাফিজাহুল্লাহ এই মুসহাফের একটি কপি মারকাযুল দাওয়াহ আলইসলামিয়াকে হাদিয়া দিয়েছেন। فالحمد لله حمدا كثيرا، وجزاه الله في الدارين خيرا এই মুসহাফের শেষে تعريف بهذا المصحف الشريف শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে, এতে কুফী গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আয়াতের মোট সংখ্যা ৬২৩৬।

«واتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب، على حسب ما ورد في كتاب «ناظمة الزهر» للإمام الشاطبي وشرحها لأبي عيد رضوان المخللاتي وكتاب أبي القاسم عمر بن محمد ابن عبد الكافي وكتاب تحقيق البيان للأستاذ الشيخ محمد المتولى شيخ القراء بالديار المصرية سابقا، وآي الذكر على طريقتهم ٦٢٣٦ ستة آلاف ومئتان وست وثلاثون آية»

এই গণনা পদ্ধতিগুলোর বিস্তারিত বয়ান

আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে যারা লিখেছেন তারা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বয়ান লিখেই কথা শেষ করে দেননি যে, অমুক গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা এত আর অমুক গণনা অনুসারে আয়াত সংখ্যা এত। বরং সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পুরো একশো চৌদ্দ সূরার বিস্তারিত বয়ান লিখেছেন যে, কোন গণনায় কোন্ আয়াতের শেষ কোথায়। আমি শুধু আবু আমর আদদানী এর 'আলবয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন' থেকে কিছু অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করে দিচ্ছি। এতে ঐ লেখকগণ যে কী পরিমাণ মেহনত করেছেন তার কিছুটা আন্দাজ হবে।

'আলবয়ানে'র কিছু শিরোনাম :

باب ذكر الأعداد والى من تنسب من أئمة الأمصار ومن رواها عنهم

আয়াত সংখ্যা গণনার বিভিন্ন পদ্ধতি, কোন্ গণনা পদ্ধতি কোন শহরের ইমামদের এবং কারা তাদের থেকে তা রেওয়ায়েত করেন

باب ذكر السند الذي أدى إلينا هذه الأعداد عن هؤلاء الأئمة

এই ইমামগণ থেকে এই গণনা পদ্ধতিগুলো কোন্ সনদে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে

باب ذكر جملة عدد كلم القرآن وحروفه واختلاف الأيات عن السلف وبالله التوفيق

কুরআনের শব্দ সংখ্যা ও অক্ষর সংখ্যা

باب ذكر جملة عدد آي القرآن في قول كل واحد من أئمة العادين

আয়াত সংখ্যা গণনাকারী বিভিন্ন ইমামের নিকট আয়াতের মোট সংখ্যা কত?

باب ذكر جملة سور القرآن ونظائرها في العدد والمكي منها والمدني والمختلف فيه من الآي

কোন্ গণনায় কোন্ সূরার মোট আয়াত সংখ্যা কত? প্রত্যেক গণনা অনুযায়ী মোট আয়াত সংখ্যা হিসেবে সমপরিমাণ আয়াতওয়ালা সূরা কয়টি ও কী কী? কোন্ সূরা মক্কী, কোন্ সূরা মাদানী ইত্যাদি।

باب ذكر النظائر من السور اللائي يتفق عدد آيهن في قول كل واحد من العادين

সকল গণনা পদ্ধতি অনুসারে যেসব সূরার মোট আয়াত সংখ্যা এক।

باب ذكر ما انفرد العادون بعده وإسقاطه من جملة المختلف فيه من الآي

যে অংশকে কোনো ইমাম স্বতন্ত্র আয়াত সাব্যস্ত করেছেন আর কোনো ইমাম পূর্বের বা পরের আয়াতের অংশ সাব্যস্ত করেছেন তার বয়ান। কোন গণনায় মোট কত জায়গায় এমন হয়েছে?

باب ذكر البيان عن معرفة رؤوس آي السور وشرح علل العادين فيما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه من ذلك

আয়াতের সূচনা শেষ নির্ধারণ করতে গিয়ে যেখানে সবাই একমত হয়েছেন বা যেখানে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে সেখানে কার কী দলিল?

এ ধরনের আরও অধ্যায় আছে। এরপর আসে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় অংশ। যেখানে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বয়ান করা হয় যে, কোন্ গণনা অনুসারে কোন্ সূরায় কত আয়াত। প্রত্যেক গণনা অনুসারে কোন্ আয়াতের শেষ কোথায়। আয়াতের শেষ শব্দ উল্লেখ করে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আয়াতের কোনো অংশ দেখতে মনে হয় যে এখানেই আয়াতের শেষ কিন্তু কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেই তাকে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়নি– তাও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন সূরায় মোট কত শব্দ, মোট কত অক্ষর এ সবকিছু বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর একটি বিস্তারিত অধ্যায় কুরআনের পারা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য রাখা হয়েছে। শেষ অধ্যায়, যার মাধ্যমে গ্রন্থ শেষ করা হয়েছে তার শিরোনাম হল–

باب في كم يستحب ختم القرآن وسيرة الصحابة والتابعين في ذلك

কত দিনে কুরআন মজীদ খতম করা মুস্তাহাব। এ ক্ষেত্রে সাহাবা তাবেয়ীনের কর্মপন্থা কী ছিল?

শুধু এ গ্রন্থটির কিছু অধ্যায়ের শিরোনাম দেখেই আন্দাজ করা যায় আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে যারা লিখেছেন তারা এই শাস্ত্রকে কত বিস্তারিত আকারে লিখেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা কত কুরবানী দিয়েছেন।

এই গণনা পদ্ধতিগুলোর সনদ কী?

যেমনটি পূর্বে ইশারা করা হয়েছে 'ইলমে আদাদ' বা আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহে এই গণনা পদ্ধতিগুলোর সনদও উল্লেখ হয়েছে। যে ইমামগণের উপর এই গণনা পদ্ধতিগুলোর ভিত্তি, তাদের পর্যন্ত এ গ্রন্থসমূহের সনদ কী এই শাস্ত্রে যারা বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন তারা তা নিজেদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ঐ পূর্বসূরি ইমামগণের নিজ নিজ গণনা পদ্ধতির উৎস কী তাও তারা বিস্তারিত কেউবা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। একটি মৌলিক কথা ইমাম আবু আমর আদদানীও লিখেছেন; তিনি বলেন–

وهذه الأعداد وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة فإن لها لا شك مادة تتصل بها وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف إذ كان كل واحد منهم قد لقي غير واحد من الصحابة وشاهده وأخذ عنه وسمع منه أو لقي من لقي الصحابة مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع بل كانوا أهل تمسك واتباع

তার বক্তব্যের সারমর্ম হল, প্রত্যেক গণনা পদ্ধতিতে যে ইমামকে ভিত্তি হিসেবে বলা হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, ঐ গণনা পদ্ধতি ঐ ভিত্তি ইমামের নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণাপ্রসূত। এঁরা সকলেই ছিলেন তাবেয়ী ইমাম, সুন্নাতের অনুসারী এবং সালাফের তরীকার পাবন্দ। তাদের প্রত্যেকে একাধিক সাহাবী বা তাবেয়ীর সাক্ষাৎ-ধন্য হয়েছিলেন। তাদের কাছ থেকে তারা ঈমান ও কুরআন শিখেছিলেন। হাদীস ও রেওয়ায়েত শুনেছেন। সুতরাং কুরআনের আয়াত সংখ্যার ইলমও তারা সেই সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেই হাসিল করেছিলেন। -'আলবয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন', পৃষ্ঠা : ৭০

এটিতো একটি মৌলিক কথা নতুবা আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে যে ইমামগণ লিখেছেন তারা বিস্তারিতভাবে প্রত্যেক গণনা পদ্ধতির উৎস বর্ণনা করেছেন। কূফী গণনা পদ্ধতি, যা সবচেয়ে বেশি অনুসৃত, তার উৎস হল খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবি তালেব এর গণনা পদ্ধতি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে যত রেওয়ায়েত পাওয়া যায় তার সবগুলো থেকেই তা প্রমাণিত। কোন রেওয়ায়েতেই এর বিপরীত কিছু নেই।[১২]

এমনিভাবে যে ইমামগণের উপর অন্যান্য গণনা পদ্ধতির ভিত্তি, তারাও নিজেদের গণনা পদ্ধতি তাবেয়ীদের কাছ থেকেই হাসিল করেছিলেন যারা সরাসরি বড় বড় সাহাবীদের কাছ থেকে তা শিখেছেন।

ইলমে আদাদ তাওকীফী ও রাসূলের শিক্ষানির্ভর হওয়া সত্ত্বেও গণনা পদ্ধতিতে ভিন্নতা সৃষ্টি হল কীভাবে

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ইলমে আদাদ বা আয়াত সংখ্যার ইলম পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বসূরিদের কাছ থেকে সরাসরি শিখেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু আমর আদদানী ও ইমাম হুযালীর বক্তব্যও উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই শাস্ত্রের অন্য বড় ইমামগণ এই মতই পোষণ করেন। এখানে স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু লোকের মনে এই খটকা জেগেছে যে, যদি আয়াত সংখ্যার ইলমের ভিত্তি ইজতিহাদ ও নিজস্ব মতামত না হয়, যদি আয়াত সংখ্যার ইলমের ভিত্তি

---

[১২] আবু আমর আদদানী লিখেছেন–

وأما عدد أهل الكوفة فرواه حمزة الزيات عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا (أي موقوفا عليه)....

عن محمد بن عيسى قال حكي عدد أهل الكوفة عن علي فيما ذكره سليم عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي وسليم عن حمزة عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال (أي السلمي) عدد أهل الكوفة عنه (أي عن علي)

-'আলবয়ান, পৃ. ৬৯ আরও দেখুন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলী

হয় সরাসরি নবীজীর তা'লীম তাহলে গণনা পদ্ধতিতে ভিন্নতা সৃষ্টি হল কেন এবং মোট আয়াত সংখ্যার পার্থক্য হল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আমরা আলামুদ্দীন সাখাবী রহ. এর কাছে পাব। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

তাঁর আলোচনার সার সংক্ষেপ হল, আয়াতের সূচনা শেষ নির্ধারণ ও আয়াত গণনার ক্ষেত্রে যে ইখতিলাফ ও ভিন্নতা দেখা যায় তার আসল কারণ এই যে, এটি শেখানোর ক্ষেত্রেই এই ভিন্নতা ছিল। নিজস্ব রায় ও মতের ভিন্নতার কারণে এই ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়। যদি মতভিন্নতার কারণে এই ভিন্নতা সৃষ্টি হত তাহলে কূফী গণনায় যে الم কে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়েছে আর المر কে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়নি তার পক্ষে কী যুক্তি দাঁড় করাবে?

এমনিভাবে المص কে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা আর المر কে স্বতন্ত্র আয়াত না ধরার কী ব্যাখ্যা দেওয়া হবে?

কূফী গণনায় ن، ق، ص، طس এবং এই বিচ্ছিন্ন হরফগুলোকে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়নি কিন্তু طه، طسم এবং يس কে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়েছে। এর পক্ষে যুক্তি কী? ...

ইমাম আলামুদ্দীন রাহ. অন্যান্য গণনা থেকেও এ ধরনের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে যেখানে আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণ করা হয়েছে তার পক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না। তারপর তিনি লেখেন, বিভিন্ন সূরার অধীনে প্রত্যেক গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাতে এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ আছে যার অনিবার্য দাবি এই যে, আয়াত গণনার পদ্ধতিসমূহের ভিত্তি রায় ও ইজতিহাদ নয় বরং তার ভিত্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা (تعليم وتوقيف)

এ ক্ষেত্রে আলামুদ্দীন সাখাবী রহ. উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আননাকিত নামে একজনের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেছেন যাতে আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণ করা হয়েছে রায় ও ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে। উদাহরণত সূরা নিসার ৪৪ নং নায়াত وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ আহলে কূফা এই অংশটিকে স্বতন্ত্র আয়াত ধরেন কিন্তু উবায়দুল্লাহ আননাকিতের বক্তব্য হল, যুক্তির দাবিতে السَّبِيلَ শব্দে এসে আয়াত শেষ হতে পারে না। কারণ এ অবস্থায় পূর্বাপরের সাথে আয়াতের শেষাংশের কোন মিল থাকে না। আলামুদ্দীন রহ. বলেন, আননাকিতের পুরো কিতাবই এ ধরনের। অথচ আয়াত সংখ্যার ইমামের ভিত্তি যেমনিভাবে কথা পূর্ণ হওয়ার উপর নয় তেমনি এর ভিত্তি ছন্দমিলের উপরও নয় বরং গোড়া থেকেই এই ইলমের ভিত্তি হল তা'লীম ও তাওকীফ অর্থাৎ রাসূলের শিক্ষা।

তিনি আরও লেখেন, কারো মনে যদি এই প্রশ্ন জাগে যে, তা'লীম ও তাওকীফ তথা রাসূলের শেখানো পদ্ধতিই যদি এই ইলমের ভিত্তি হয় তাহলে তো এখানে ইখতিলাফ না থাকার কথা। তার বোঝা উচিত কেরাআতের ইখতিলাফ যেমন ইজতিহাদী নয়; বরং তাওকীফী। কেরাআতের যে অংশের পঠনপদ্ধতি সব কেরাআত অনুসারেই একরকম আর যে অংশের পঠন পদ্ধতিতে বৈচিত্র আছে এই উভয় অংশই যেমন তাওকীফী, উভয় অংশই যেমন রাসূলের শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক, তেমনি আয়াত সংখ্যার ক্ষেত্রেও যে ভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে তাও তাওকীফী। গোটা আয়াত সংখ্যার ইলমের ভিত্তিই নববী তা'লীম ও তাওকীফ।

আলামুদ্দীন রহ. লেখেন, এর পক্ষে একটি দলীল হল এই হাদীস–

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কুরআনের কোন এক সূরার আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে আমাদের মাঝে ইখতিলাফ হল। আমাদের একজন বলল, পঁয়ত্রিশ, আরেকজন বলল, ছত্রিশ[১৩]। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আমাদের ঘটনা খুলে বললাম। এ কথা শুনে (রাগে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর তিনি আলী ইবনে আবি তালেব রা. কে আস্তে করে কিছু বললেন। তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের বলেছেন, যেভাবে তোমাদের কুরআন শেখানো হয়েছে সেভাবেই তোমরা কুরআন পড়বে।

আলামুদ্দীন রহ. বলেন, এই হাদীসে এ বিষয়টির দলীল আছে যে, আয়াত সংখ্যা নববী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। আর চিন্তা করলে বোঝা যাবে, এই হাদীসে এ বিষয়েরও দলীল আছে যে উভয় সংখ্যাই সঠিক (অর্থাৎ নববী তা'লীমনির্ভর সকল গণনাই সঠিক এবং এ ক্ষেত্রে প্রমাণিত ও অনুসৃত কোন পদ্ধতিকে বাতিলও বলা যাবে না এবং এ নিয়ে বিবাদেও লিপ্ত হওয়া যাবে না)।

-'জামালুল কুররা ওয়াকামালুল ইকরা', আলামুদ্দীন সাখাবী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩১-২৩৪

---

[১৩] জামালুল কুররাতে ত্রিশ ও বত্রিশ লেখা হয়েছে অথচ 'আলবয়ান', পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯, তাফসীরে তবারী খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩ ও মুসনাদে আহমাদে (৮৩২) পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ আছে। এই কিতাবগুলো যেহেতু সনদসহ কিতাব তাই এগুলোর রেওয়ায়েতই অগ্রগণ্য হবে।

(وهذا سياق من سياقات الحديث المعروف الذي رواه الحاكم وابن حبان وأورده منهما الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج ٩ ص ٢٦، فيحتمل أن يكون من باب ذكر كل ما لم يذكره الآخر، ويحتمل أن تكون الواقعة مختلفة - الراقم)

আসলে আয়াত সংখ্যার ভিন্নতা ইখতিলাফে তানাওউ এর অন্তর্ভুক্ত। আর ইখতিলাফে তানাওউ আসলে ইখতিলাফই নয় বরং তা তানাউয়ে সুন্নাত বা সুন্নাহর বিভিন্নতার একটি শাখা। অর্থাৎ রাসূল থেকেই এখানে একাধিক পদ্ধতি প্রমাণিত।

কাইফিয়্যাতে সালাত বা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি কী এ বিষয়টিও তাওকীফী বা রাসূলের শিক্ষানির্ভর বিষয়। কিন্তু তাতেও তো এমন অনেক বিষয় আছে যাতে ইখতিলাফ হয়েছে। তাই কোন বিষয় তাওকীফী বা রাসূলের শিক্ষানির্ভর হলেই তাতে আর ইখতিলাফ হতে পারবে না এ ধারণা একটি ভুল ধারণা। ইখতিলাফে তানাওউয়ের এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পদ্ধতিই সুন্নাহ ও নববী শিক্ষা থেকে গৃহীত। একজন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তো অপরজন আরেকটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এতে বাহ্যত ইখতিলাফের মত মনে হলেও আসলে এখানে কোন ইখতিলাফ নেই।

তাওকীফী ও রাসূলের শিক্ষানির্ভর হলে যুক্তি ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয় কেন?

উল্লিখিত বয়ান দ্বারা এই খটকাও হয়তো দূর হয়ে গেছে যে, যদি আয়াত সংখ্যা তাওকীফী ও রাসূলের শিক্ষানির্ভর হয় এবং আয়াত সংখ্যার ক্ষেত্রে যে ভিন্নতা দেখা যায় তাও নববী শিক্ষার বিভিন্নতার কারণেই হয়ে থাকে তাহলে আমরা আয়াত সংখ্যার ইলম সম্পর্কে লিখিত কিতাবাদিতে আকলী দলীল কেন দেখতে পাই। যেমন বলা হয় কুফী গণনায় এই শব্দে এসে আয়াত শেষ হয়েছে তার যুক্তি হল এই ... আর বসরী গণনায় এখানে এসে আয়াত শেষ হয়েছে। এর কারণ হল এই ...

এ কথা ঠিক যে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত কিতাবাদিতে এ ধরনের আকলী দলীল ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয় কিন্তু তা যে শুধু ঐ স্থানে উল্লেখ করা হয় যেখানে বিভিন্ন গণনার মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে এমন নয়, যেখানে আয়াতের শেষ কোথায় নির্ধারণে ইখতিলাফ হয়নি সেখানেও আকলী দলীল উল্লেখ করা হয়। আসলে এই আকলী দলীল ও ব্যাখ্যা 'বয়ানে হিকমত' বা 'হিকমত বর্ণনা' করার মত (অথবা তালেবে ইলমদের মাঝে প্রচলিত ভাষায় বললে এটি نكتة بعد الوقوع এর অন্তর্ভুক্ত।) বিষয়টি এমন নয় যে এখানে আকলী দলীল উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এই আকলী দলীলের উপর ভিত্তি করেই কোথায় এসে আয়াত শেষ হবে তা নির্ধারণ করা হচ্ছে। বিষয়টি কিছুতেই এমন নয়, কারণ আহলে ফনের ইজমা এবং বাস্তবতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, আয়াত সংখ্যার ভিত্তি তাওকীফ ও রাসূলের শিক্ষা, রায় ও ইজতিহাদ নয়।

আকলী হিকমত তো আসরারে শরীয়তের কিতাবাদিতে সকল তাওকীফী বিষয় এবং তাআব্বুদী হুকুম আহকামের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তা তো শুধু হেকমতই, হুকুম ও বিধানের ভিত্তি ও 'ইল্লত' নয়। আর অধিকাংশ হিকমতই 'সম্ভাবনা'[১৪] পর্যায়ের। তাই শুধু হেকমত বয়ান করার কারণে কোন বিষয় তাওকীফী হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়।

অগ্রগণ্য গণনা কোনটি?

উল্লিখিত গণনাগুলোর মধ্যে সব গণনাই যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং সবগুলো গণনাই 'আসসুন্নাহ' ও নববী শিক্ষা থেকে গৃহীত তাই এ গণনাগুলোর মধ্য থেকে যে গণনাই গ্রহণ করা হোক তা মাসনূন ও সুন্নাহ সমর্থিত গণনাই হবে। এ কারণেই খাইরুল কুরুন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সবগুলো গণনা পদ্ধতি অনুসারেই মুসহাফে আয়াতের চিহ্ন লাগানো হয়েছে, পরবর্তীতে আয়াতের নম্বরও লাগানো হয়েছে কিন্তু কোনো আলেমের পক্ষ থেকে কোনো মুসাল্লাম ও মুতাওয়ারাছ তথা স্বীকৃত ও যুগ পরম্পরায় পূর্বসূরিদের থেকে প্রাপ্ত গণনা পদ্ধতির উপর কোন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। আপত্তি উত্থাপনের কোন সুযোগও ছিল না। কারণ সবগুলো গণনাই আকাবির তাবেয়ী ও সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে 'আসসুন্নাহ' (রাসূলের শিক্ষা) থেকে গৃহীত।

তো এই সবগুলো পদ্ধতি মাসনুন হওয়ার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই কিন্তু যেমনটি আমরা জানি, তানাওউয়ে সুন্নাত বা একই বিষয়ে একাধিক সুন্নত পদ্ধতি থাকলে বিভিন্ন সুন্নত পদ্ধতির মধ্যে কখনো একটি পদ্ধতিকে 'রাজেহ' (অগ্রগণ্য) অথবা 'আফজল' (অধিক উত্তম) বলা হয়। উসূলে শরীয়ত ও শরীয়তের মূলনীতির আলোকে শাস্ত্রের ইমামগণ তা বলে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যও বিভিন্ন ধরনের হয়। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অগ্রগণ্য বা অধিক উত্তম হওয়ার কারণও বিভিন্ন রকমের হয়।

আয়াত গণনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন কোন পদ্ধতিকে কতেক ইমাম রাজেহ বা অগ্রগণ্যও বলেছেন। একাধিক ইমামের বক্তব্যে কুফী গণনাকে 'আফজল' ও অধিক উত্তম বলার কথা আমি পেয়েছি। হতে পারে অন্য গণনাকে অন্য কোন ইমাম 'আফজল' বলেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি এমন কিছু পাইনি।

এখানে কুফী গণনা 'আফজল' হওয়ার ব্যাপারে কয়েকজন মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

---

[১৪] দেখুন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর কিতাব 'আহকামে ইসলাম আকল কি নযর মে' (ভূমিকা)

১. ইমাম আদদারানী বলেছেন–

اعلم أن عدد أهل الكوفة أعلى الأعداد إسنادا، وأصحها في القياس تأويلا.

-আলইয়াহ ফিল কেরাআত, পৃষ্ঠা : ২১৯, অধ্যায় : ১৬

২. আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেছেন,

وإنما ذكرنا الكوفي لأنه المعتمد عليه من الأعداد

-ফুনূনুল আফনান, পৃষ্ঠা : ৩৩০

৩. ইমাম ইবরাহীম আলজা'বারী লিখেছেন,

ثم أنص على فواصلها على العد الكوفي لأنه الأشهر في بلادنا والأثبت.

-হুসনুল মাদাদ ফি ফন্নিল আদাদ, পৃষ্ঠা : ৫১

এই মনীষীগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ কথাই বলেছেন যে, কুফী গণনা অগ্রগণ্য।

অধ্যায়–৫

আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে দু'টি ভিত্তিহীন বক্তব্য

আগের আলোচনাতে আমরা দেখেছি, মুতাওয়ারাছ ও মুতালাক্কা বিল কবুল তথা যুগ পরম্পরায় পূর্বসূরিদের থেকে প্রাপ্ত এবং সর্বজনস্বীকৃত গণনা পদ্ধতিগুলোতে ৬২০৪ এর কম এবং ৬২৩৬ এর বেশি কোন সংখ্যা নেই। প্রথমটি বসরী গণনার আয়াত সংখ্যা আর দ্বিতীয়টি কুফী গণনার আয়াত সংখ্যা।[১৫]

এ বিষয়টিকেই ইবনুল জাওযী রহ. পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন–

«فقد وقع إجماع العادين على أن القرآن ستة آلاف ومئتا آية، ثم اختلفوا في الكسر الزائد على ذلك...»

অর্থাৎ 'আয়াত গণনাকারীদের এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০০ এর কিছু বেশি। কত বেশি তা নিয়ে তাদের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে।'

এরপর ইবনুল জাওযী রহ. দুইশো এর কত বেশি সে সম্পর্কে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেখানে ৬২০৪ এর কম এবং ৬২৩৬ এর বেশি কোন সংখ্যার কথা উল্লেখ নেই।

আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত কিতাবসমূহের, (যা প্রায় একশোর কাছাকাছি) যে কিতাবই অধ্যয়ন করা হোক ইবনুল জাওযী রহ. উল্লেখকৃত ইজমার কথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে সামনে আসবে।[১৬]

আশ্চর্যের বিষয় হল আমাদের এই উপমহাদেশের ঐ মুতাওয়ারাছ ও মাসনূন সংখ্যাসমূহের বাইরে এবং ইলমে আদাদ ও ইলমে কেরাআতের ইমামদের ইজমার বিপরীত দুটি সংখ্যা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অনেক লোক ঐ ভুল দু'টি সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই জানে না। সংখ্যা দু'টি হল ৬৬১৬ ও ৬৬৬৬। এ দুটোর মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ ৬৬৬৬-ই অধিক প্রচলিত।

আলহামদু লিল্লাহ সহীহ সংখ্যা লেখার মত ও বলার মত লোক এই উপমহাদেশেও অনেক আছে এবং আগে থেকেই ছিল। বাংলাদেশেও অনেক আছে এবং আগে থেকেই ছিল। তবে বাস্তবতাবিরুদ্ধ সংখ্যা দু'টির যত চর্চা হয়েছে এতটা না হওয়া উচিত ছিল। আমরা যদি শুধু আল্লাহ তাআলার এই ফরমান ولا تقف ما ليس لك به علم (যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশনা–

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

(যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে)-এর উপর আমল করি তাহলে কোন ভুল ও অবাস্তব সংখ্যা প্রসিদ্ধি লাভ করবে না।

মোটকথা, উল্লিখিত উভয় সংখ্যা (৬৬১৬ ও ৬৬৬৬) সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন সংখ্যা। এই দুই সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

৬৬১৬ এই সংখ্যার উৎপত্তি কোত্থেকে?

এই ভুল সংখ্যাটি সাধারণ মানুষের মাঝে বেশি প্রচলিত নয়। কিন্তু বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'কুরআন মাজীদ ও তাজভীদে'র ২ পৃষ্ঠায় যেহেতু তা উল্লেখ করা হয়েছে তাই আলিয়ার কিছু ছাত্রদের মাঝে তা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।[১৭] জালালুদ্দীন সুয়ূতী

---

[১৫] আবুল কাসেম আলহুযালী যদিও হিমসী গণনার ক্ষেত্রে ৬২৫৪ অথবা ৬২৫৬ এর কওল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই এই কওলকে শায কওল (বিচ্ছিন্ন মত) বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

«وأما عدد أهل حمص ...، وهو شاذ»

হিমসী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা মূলত ৬২৩২ (ফুনূনুল আফনান, বাশীরুল ইউসর শরহু নাযিমাতিয যহর, আবদুল ফাত্তাহ কাযী, পৃষ্ঠা : ২১)

আর আবুল লাইছ সমরকন্দী যদিও নাম অনুল্লেখিত কোন শামীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, আয়াত সংখ্যা ৬২৫০ কিন্তু তিনি নিজেই লিখেছেন, আসলে শামী সংখ্যা ৬২২৬।

[১৬] ইমাম কুরতুবী, যারকাশী ও সুয়ূতী রাহ.ও এই ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপন কিছুটা অন্যরকম হওয়ার কারণে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। সামনে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

[১৭] উল্লেখ্য, জনাব প্রফেসর ড. আনওয়ার-উল-করীম এই ভুলটি সংশোধন করার জন্য জুমাদাল উলা ১৪৩০ হি. তে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানান এবং তাদের সামনে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত উপস্থিত করেন। ঐ সময় আমি নিজেও লেখকের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে কথা

রহ. এর 'আলইতকানে' নাসেখ (লিপিকার) বা রাবীর ভুলের কারণে দীর্ঘ একটি সময় এই সংখ্যাটির উল্লেখ ছিল। এ কারণে পরবর্তী কোন কোন লেখকের লেখায়ও তা চলে এসেছে!

ঘটনা হল জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলইতকান ফি উলূমিল কুরআনে'র ১৯ নং অধ্যায়ে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি একদিকে তো আবু আমর আদদানী রহ. এর কথা উল্লেখ করেছেন যে, আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের কিছুটা বেশি। কত বেশি এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে যেমন, ২০৪, ২১৪, (২১৭), ২১৯, ২২৬, এবং ২৩৬[১৮]

অন্যদিকে তিনি ইবনুদ দুরাইসের বরাতে এই রেওয়ায়েতও উল্লেখ করেছেন–

عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: جميع آي القرآن ستة آلاف وست مائة وست عشرة آية.

অর্থাৎ উসমান ইবনে আতা নিজের পিতা আতা আল খুরাসানী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরআনে মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার ছয়শো ষোল।[১৯]

আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে সুয়ূতী রহ. আলইতকানে শুধু এই রেওয়ায়েতই উল্লেখ করেননি বরং আবু আমর আদদানী এর উপরোক্ত কথাও উল্লেখ করেছেন এবং আবু আব্দুল্লাহ মাওসিলী রহ. এর কিতাব 'যাতুর রশাদ ফিল আদাদ' থেকে এনে মুতাওয়ারাছ ও মুসাল্লাম (যুগ পরম্পরায় চলে আসা স্বীকৃত) গণনা পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ পূর্বাপর কথা ও আলোচনা ছেড়ে দিয়ে মাঝখান থেকে শুধু উছমান ইবনে আতা এর রেওয়ায়েতটি নিয়েছেন এবং লিখে দিয়েছেন মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬১৬[২০]

অথচ–

এক. এই রেওয়ায়েত নিঃসন্দেহে 'মা'লুল'। এতে নাসেখের (লিপিকারের) কিংবা রাবীর ভুল হয়ে গেছে। কারণ মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশো'র চেয়ে কিছুটা বেশি হওয়ার ব্যাপারে আহলে ফনের ইজমা রয়েছে। সুতরাং ছয় হাজার তিনশোর কাছাকাছি কোন সংখ্যার দাবী করা হলেও তা ইজমা-বিরুদ্ধ হবে, ছয় হাজার ছয়শো ষোল'র কথা বলা হলে তা অবশ্যই 'ইজমাবিরুদ্ধ' হবে। যদি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে (যাকে আপন যুগের রঈসুল মুফাসসিরিন বা মুফাসসিরগণের শিরোমণি বলা হত) ৬৬১৬ সংখ্যাটি সহীহ সনদে সাবেত হয় তাহলে আহলে ফন এ ব্যাপারে কীভাবে ইজমা করে ফেললেন যে, মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশোর কিছু বেশি?

দুই. সুয়ূতী রাহ. عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء এই সনদে ৬৬১৬ সংখ্যাটি উল্লেখ করেছেন অথচ আবু আমর আদদানী এর কিতাব 'আলবয়ানে' এই সনদেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ৬২১৬ এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে,

عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: عدد آي القرآن ستة آلاف ومائتا آية وست عشرة آية.

-'আলবয়ান', পৃ. ৮০

ইবনুদ দুরাইসের কিতাবের চেয়ে আবু আমর আদদানীর কিতাব বেশি প্রচলিত ছিল। তাছাড়া ইবনুদ দুরাইসের আলোচনার বিষয় ফাযায়েলে কুরআন, আয়াত সংখ্যা নয়। আয়াত সংখ্যার আলোচনা সেখানে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে আর আবু আমর আদদানীর কিতাব সরাসরি আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত। তাই আবু আমর আদদানীর রেওয়ায়েত রাজেহ (অগ্রগণ্য) হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তাতে উল্লেখকৃত সংখ্যা যখন ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক না হচ্ছে।

তিন. খোদ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. 'আদদুররুল মানছুরে' ইবনে মারদুইয়া এর বরাতে উসমান ইবনে

বলি। আল্লাহর শোকর, তারা এ অনুরোধ রক্ষা করে ভুলটি সংশোধন করে দিয়েছেন এবং ৬৬১৬ সংখ্যাটি বাদ দিয়ে এর স্থলে লেখা হয়েছে, 'কূফী গণনামতে আলকুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬'।

দ্রষ্টব্য, দাখিল নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'কুরআন মাজীদ ও তাজভীদ', পৃষ্ঠা : ১০, ৩য় সংস্করণ : আগস্ট ২০১৪ ইং। আরো উল্লেখ্য যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'ইসলাম শিক্ষা' বইয়ে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে ৬২৩৬ এই সঠিক সংখ্যাটি উল্লেখ করার পর একেবারেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে লেখা হয়েছে, 'মতান্তরে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬'। এ ভুল সংশোধনের জন্য তাদের অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের জানামতে তা এখনো সংশোধিত হয়নি।

[১৮] আবু আমর আদদানী রহ. এর কথা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে 'আলইতকানে' তাসামুহ হয়ে গেছে। আমি আবু আমর আদদানী এর কিতাব 'আলবয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন' দেখে তাসামুহ ঠিক করে দিয়েছি।

[১৯] 'আলইতকান', খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৮, অধ্যায় : ১৯

[২০] নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান (১৩০৭ হি.), 'আবজাদুল উলূম', খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৩; তাশ কুবরী যাদাহ (৯৬৮হি.), 'মিফতাহুস সাআদাহ ওয়ামিসবাহুস সিয়াদাহ', খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৫৬, শিহাবুদ্দীন আলূসী রহ. (১২৭০ হি.), 'রূহুল মাআনী', খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪, এর এবং সাইয়েদ আমীর আলী কর্তৃক রচিত 'মাওয়াহেবুর রহমানে' (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৩– ভূমিকা) এই 'তাসামুহ' হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন। এই মনীষীদের দরজা বুলন্দ করুন। তাদের ইলম থেকে আমাদের উপকৃত করুন এবং তাদের 'যাল্লাত' (অনিচ্ছাকৃত ভুল) থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমীন। এই তাসামুহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সামনে আসছে।

আতা এর পিতা আতা আলখোরাসানী থেকেই এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন–

جميع آي القرآن ستة آلاف ومائتا آية وست عشرة آية

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশো ষোল।–'আদদুররুল মানসুর', খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২২

চার. খোদ আতা আলখোরাসানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত সংখ্যা ৬২১৬ই উল্লেখ করেছেন, ৬৬১৬ নয়। দেখুন, 'ফুনূনুল আফনান', ইবনুল জাওযী, পৃষ্ঠা : ১০০ (১৪০৮ হিজরীর এডিশন)

পাঁচ. ইমাম আবু আমর আদদানী উল্লেখ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর দুই শাগরেদ (মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেন, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৬।–'আলবয়ান', পৃষ্ঠা : ৮০

এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, তাঁরা তাদের উস্তায আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ৬৬১৬ নয় বরং ৬২১৬ ই শুনেছেন এবং এ ক্ষেত্রে 'আল ইতকানে'র রেওয়ায়েতের পরিবর্তে তার পাঁচশো বছর আগের কিতাব 'আলবয়ান' ও ইবনে মারদুইয়াতে উল্লেখকৃত ঐ রেওয়ায়েতই সঠিক, যা খোদ সুয়ূতী রহ. নিজের কিতাব 'আদদুররুল মানসুরে' গ্রহণ করেছেন।[21]

ছয়. খোদ সুয়ূতী রহ. 'আলইতকানে'ই ইলমে আদদের বিশেষজ্ঞ আলেম আবু আব্দুল্লাহ আলমাওসিলী এর বরাতে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত এক এক সূরা করে প্রত্যেক সূরাতে মোট কত আয়াত তা উল্লেখ করেছেন। এবং আয়াত গণনার ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় আহলে ফনের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে তা বয়ান করেছেন। কিন্তু কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেই মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ এর বেশি হয় না।

সাত. জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর প্রসিদ্ধ ও মাকবুল তাফসীর তাফসীরে জালালাইন পুরো পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। এর প্রথম অংশ (সূরা বাকারা থেকে সূরা বানী ইসরাঈল পর্যন্ত) তাঁর নিজের রচনা। আর দ্বিতীয় অংশ তাঁর উস্তায জালালুদ্দীন মাহাল্লী এর রচনা। এ কিতাবেও প্রত্যেক সূরার শুরুতে আয়াত সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও কোথাও তিনি বিভিন্ন গণনা পদ্ধতিতে যে ভিন্নতা আছে তাও দেখিয়েছেন। সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শুরুতে তিনি সূরাগুলোর যে আয়াত সংখ্যা লিখেছেন তার সবগুলোই স্বীকৃত ও অনুসৃত গণনাপদ্ধতিগুলোর সংখ্যা। এর বাইরে তিনি কিছু লেখেননি। তবে লিপিকারের ভুল ও মুদ্রণপ্রমাদ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

আট. আয়াত গণনার যতগুলো মুসাল্লাম ও মুতাওয়ারাছ (যুগ পরম্পরায় পূর্বসূরিদের থেকে প্রাপ্ত ও স্বীকৃত) পদ্ধতি আছে যদি সবগুলোকে একসাথে মিলিয়ে হিসাব করা হয় তাও ৬৬১৬ সংখ্যাটি সঠিক প্রমাণিত হয় না।

নয়. যদি একটি অস্পষ্ট রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে এই প্রসিদ্ধ কথাটি মেনে নেওয়া হয় (যা আসলে সহীহ নয়) যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রত্যেক সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে একটি স্বতন্ত্র আয়াত হিসেবে ধরতেন এবং এর ভিত্তিতে ১১২ বাড়ানো হয় তাহলেও ৬৬১৬ পুরা হয় না।

শেষোক্ত এই দুই কথা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পড়ুন এই প্রবন্ধের সামনের অধ্যায়ে।

এসব কিছুর পরও কেউ যদি কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে ৬৬১৬ কেই উল্লেখ করে একে সহীহ মনে করে এমনকি কুরআনের আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে শুধু এই একটি সংখ্যাকেই উল্লেখ করে তাহলে একে মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। তবে বেখেয়ালিতে ভুল হয়ে গেছে। কারও প্রতি ভিন্ন ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। কিন্তু ভুলের ক্ষেত্রে কোনভাবেই কারও তাকলীদ করা জায়েয নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ. নিজের তাফসীরে লিখেছেন, 'কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ গণনা করা হয়েছে। অধিক বিশুদ্ধ বক্তব্য অনুসারে আয়াত সংখ্যা ৬৬১৬। (-আলইতকান) -তাফসীরে মাজেদী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩

এখানে 'অধিক বিশুদ্ধ বক্তব্য অনুসারে' এই অংশটি দরিয়াবাদী রহ. এর নিজের পক্ষ থেকে বাড়ানো। আলইতকানে এমন কিছু নেই। আলইতকানে তো উসমান ইবনে আতা এর মা'লুল ও মুনকার রেওয়ায়েতে এই সংখ্যাটির উল্লেখ আছে। এর আগ-পরের কথার সাথে এর কোন মিল নেই এবং বাস্তবতার সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই। তো আলইতকানে উল্লেখকৃত সঠিক কথা ছেড়ে দিয়ে দরিয়াবাদী রহ. একটি মা'লুল ও মুনকার কথা নিয়েছেন এবং না জানার কারণে তাকে 'অধিক বিশুদ্ধ' উপাধি দিয়েছেন। এই কাজটি তার শান মোতাবেক হয়নি।

---

[21] على أن عثمان بن عطاء ضعيف له مناكير وأباطيل، فإن أصر أحد على أن لفظ الرواية كما جاء في «الإتقان» لا كما جاء في «البيان» فليعلم أن مدار الخبر على عثمان بن عطاء، وهو ضعيف له مناكير وأباطيل، وإذا كان الخبر من أصله منكرا فكيف يصح الاعتماد عليه، فهو ليس بحجة لا في عدد ٦٦١٦ ولا في عدد ٦٢١٦، ولكن الأول ضم إلى نكارة الإسناد نكارة المتن أيضا، وأما العدد الثاني فنكارته في الإسناد فقط، اللهم إلا إذا كان له إسناد آخر إلى ابن عباس رضي الله عنهما من غير طريق عثمان بن عطاء، فافهمه جيدا (عبد المالك)

মজার বিষয় হল, তিনি নিজে তার তরজমা ও তাফসীরে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শুরুতে সেই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা লিখেছেন। সেগুলো হিসাব করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬, যা কুফী সংখ্যা। তাহলে ৬৬১৬ কোথায় গেল? এবং অধিক বিশুদ্ধ বক্তব্যের আর কী থাকল?

ব্যস, কোন ধরনের তাহকীক ছাড়া আলইতকানে একটি সংখ্যার উল্লেখ দেখে এবং সে সংখ্যাটি জনমুখে প্রসিদ্ধ সংখ্যাটির (৬৬৬৬) কাছাকাছি পেয়ে তা উল্লেখ করে দিয়েছেন এবং আগ বেড়ে শুধু ধারণার ভিত্তিতে তাকে 'অধিক বিশুদ্ধ' বলে দিয়েছেন অথচ তার ভিত্তি একটি মা'লূল ও মুনকার রেওয়ায়েত। এ কারণে তিনি নিজেও এই সংখ্যার উপর চলতে পারেননি বরং প্রত্যেক সূরার শুরুতে মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করে উক্ত সংখ্যাটি অমূলক হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

৬৬৬৬ এর হাকীকত কী?

আমাদের এই উপমহাদেশে মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে ৬৬৬৬ সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। সংখ্যাটি তো আসলে ভিত্তিহীন, বাস্তবতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই তবু এই সংখ্যাটি কীভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। এই অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এই সংখ্যাটি ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ উল্লিখিত বাস্তবতার আলোকে তা ভিত্তিহীন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপরও আরও স্পষ্ট করার জন্য কিছু কথা আরজ করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

এ সংখ্যাটি একেবারেই ভিত্তিহীন

মোট আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে ৬৬৬৬ এই সংখ্যাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ–

১. ইলমু আদাদিল আয়াত বা আয়াত সংখ্যার ইলম যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাওকীফী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষানির্ভর। এ জন্য সেই গণনাই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যার সনদ আহলে ফন ইমামদের সূত্রে আকাবির সাহাবা ও তাবেয়ীগণ পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ যে গণনা পদ্ধতির ভিত্তি হবে সাহাবায়ে কেরামের তালীম অর্থাৎ সরাসরি তাদের শেখানো গণনা পদ্ধতিই নির্ভরযোগ্য বলে ধর্তব্য হবে। ৬৬৬৬ এই সংখ্যাটি তো এমন 'আজনবী' যে, কোন সাহাবী ও তাবেয়ী তো দূরের কথা ইলমে আদাদ ও ইলমে কেরাআতের কোন ইমামের সাথেও এর দূরতম সম্পর্ক নেই।

২. ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআনের ইমামগণ (আয়াত সংখ্যা শাস্ত্রবিদগণ) এ গণনার কথা উল্লেখই করেননি। আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে যারা লিখেছেন তারা মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক 'গরীব' (অপরিচিত) ও 'শায' (বিচ্ছিন্ন) কওলও উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমাদের জানামতে তাদের কেউ 'গরীব' ও 'শায' কওল হিসেবেও এর কথা উল্লেখ করেননি। তাবেয়ীদের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে উম্মতের আলেমগণ কর্তৃক লিখিত প্রায় শতের কাছাকাছি (ছাপা আকারে কিংবা পাণ্ডুলিপি আকারে) কিতাবের মধ্যে কোন কিতাবে কেউ এই সংখ্যাটিকে নির্ভরযোগ্য কওল হিসেবে নয়, 'গরীব' বা 'শায' কওল হিসেবেও উল্লেখ করেছেন, ইনশাআল্লাহ এমনটিও কেউ দেখাতে পারবে না।

৩. ইলমে কেরাআতের কোন ইমাম থেকে এ সংখ্যার কথা বর্ণিত হয়নি।

৪. ইলমে কেরাআতের বিস্তৃত গ্রন্থাবলীতে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আলোচনা থাকে। কিন্তু আমাদের জানামতে ইলমে কেরাআতের কোন নির্ভরযোগ্য ও বরাত দেওয়ার মত কিতাবে একটি মারজূহ কওল হিসেবেও এর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৫. উলূমুল কুরআনের কিতাবাদিতে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে সাধারণত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় থাকে। উলূমুল কুরআন সম্পর্কে সুয়ূতী রহ. কৃত 'আলইতকান'ই বেশি প্রসিদ্ধ। বা বেশি হলে কেউ হয়তো বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. কৃত 'আলবুরহান'ও চেনেন। অথচ তাদের আগে এবং পরে উলূমুল কুরআন ও কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। না 'ইতকান' ও 'বুরহানে', না অন্য কোন কিতাবে একটি মারজূহ কওল হিসেবেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬. খাইরুল কুরূন এবং খাইরুল কুরূনের শত শত বছর পর পর্যন্ত কোন তাফসীরের কিতাবেও এই সংখ্যাটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমাদের জানামতে পরবর্তী যুগের তাফসীরের কিতাবাদির মধ্যে নির্ভরযোগ্য, মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ও হাওয়ালাযোগ্য কোন কিতাবে একটি মারজূহ কওল হিসেবেও এর উল্লেখ নেই।

৭. এই সংখ্যাটি মুতাওয়ারাছ ও মুতালাক্কা বিল কবুল (যুগ পরম্পরায় চলে আসা শাস্ত্রজ্ঞগণ কর্তৃক স্বীকৃত) সংখ্যাসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক।

৮. এই সংখ্যাটি আহলে ফনের ইজমা এর সাথে সাংঘর্ষিক।

পূর্বের অধ্যায়ে আহলে ফনের (শাস্ত্রজ্ঞগণ) ইজমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশো'র কিছুটা বেশি। এই 'কিছুটা বেশি' কত, তাও শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেছেন, অর্থাৎ ৪, ১৪, ১৭, ১৯, ২৬, ৩৬। তাই স্বীকৃত সংখ্যাগুলোর সর্বনিম্ন হল, ৬২০৪ আর সর্বোচ্চ ৬২৩৬। একটি বিচ্ছিন্ন বক্তব্য ৫৪ এর কথাও আছে। যা ধর্তব্য নয়। বিচ্ছিন্ন

বক্তব্য হিসেবেও এর চেয়ে বেশি কোন সংখ্যার কথা শাস্ত্রজ্ঞগণ উল্লেখ করেননি।

৯. এই সংখ্যা অনুসারে ফাওয়াসেলে আয়াত (আয়াতের সূচনা-শেষ) নির্ধারণের না কোন সনদ আছে, না কোন নমুনা। কোন মুতাওয়ারাছ অথবা মুতালাক্কা বিল কবুল মুসহাফে (ছাপা হোক বা পাণ্ডুলিপি আকারে) এই সংখ্যা লাগানো হয়েছে এমনটি দেখানো যাবে না। এমন কোন নির্ভরযোগ্য মুসহাফ লিপিকার বা নির্ভরযোগ্য মুসহাফ প্রকাশক পাওয়া যাবে না যারা তাদের লিপিকৃত বা প্রকাশিত মুসহাফে আয়াতের শেষে আয়াতের চিহ্ন লাগানোর ক্ষেত্রে বা আয়াতের নম্বর লাগানোর ক্ষেত্রে এই সংখ্যার অনুসরণ করেছেন। বাস্তবতা হল, এর কল্পনাও করা যায় না যে, কোন আহমক একটি ভিত্তিহীন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আয়াতের শেষে চিহ্ন বা নম্বর লাগাবে।

১০. পরবর্তী যুগের শিথিলতাপ্রবণ লোকদের মধ্যে যারা এই সংখ্যাটি লিখেছেন তাদেরকে অন্যরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আগে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। উদাহরণত বর্তমানে দায়িত্বশীলতার অভাব রয়েছে এমন প্রকাশকদের মধ্যে যারা তাদের প্রকাশিত মুসহাফ এর শুরুতে অথবা শেষে কুরআনুল কারীম সম্পর্কে পরিসংখ্যান পরিচিতিমূলক তথ্যাদি উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। আপনি সেই মুসহাফে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লিখিত আছে তা একত্রিত করুন, যদি ঐ প্রকাশক চান তাহলে তিনি নিজেও যদি সেই মুসহাফে উল্লেখকৃত নম্বর অনুসারে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সব আয়াত নম্বরের সমষ্টি বের করেন তাহলে দেখা যাবে মোট আয়াত সংখ্যা হয়েছে কুফী গণনা অনুসারে ৬২৩৬[২২]। ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টির কাছাকাছিও আপনি পৌঁছতে পারবেন না।

অথবা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাবী (১২৪১ হি.) এর মত শিথিলতাপ্রবণ টীকাকার যদি এই সংখ্যা লিখে দেয় তো আপনি নিজেই হাশিয়াতুস সাবীতে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সমষ্টি বের করুন, দেখবেন তা আপত্তিকর এই সংখ্যার কাছে ধারেও পৌঁছেনি।

ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টির কাছাকাছিও আপনি পৌঁছতে পারবেন না। কোন মতের প্রবক্তা যদি এতটাই ধারণা ও আন্দাজের ভিত্তিতে কথা বলেন যে, তার বিস্তারিত বয়ান তার সংক্ষিপ্ত বয়ানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে আর তার কথার উপর কীভাবে নির্ভর করা হবে?

১১. শেষ কথা হল, নতুন করে আবিষ্কার করা কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেও এই সংখ্যা পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

যেমনটি আমরা পূর্বে বার বার উল্লেখ করেছি যে, আয়াত সংখ্যার ইলম তা'লীম ও তাওকীফ-নির্ভর। এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে যাতে শুধু মূলনীতি নয়, মূলনীতি ও বিস্তারিত বিবরণ সবকিছুই সংকলিত হয়েছে। এ শাস্ত্রের বড় বড় ইমাম আছেন। সব যুগেই এই শাস্ত্রের দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ লোক ছিল, বর্তমানেও আছে। আহলে ফনের ইজমার বিপরীতে এবং মুতাওয়ারাছ ও মুতালাক্কা বিল কবুল গণনা পদ্ধতিসমূহের বিপরীতে নতুন কোন গণনা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত। এরপরও যদি ধরে নেওয়া হয় যে কেউ এই অসম্ভব দাবী করল- মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে যেহেতু ইখতিলাফ আছে তাই আমরা লম্বা আয়াতগুলোকে ভাগ করে কিছু আয়াতে নম্বর বাড়িয়ে কোনোভাবে ৬৬৬৬ পুরো করে দেখিয়ে দেব। তাহলে এই সিনাজুরির সামনে আমরা আদবের সাথে বলব, এ কথা বলে তো তারা স্বীকার করেই নিল যে, এ সংখ্যাটি অনুসৃত ও স্বীকৃত কোন সংখ্যা নয় এবং শাস্ত্রের কোন ইমাম থেকেও তা বর্ণিত নয়। তারা ব্যস, জোড়াতালি দিয়ে এ সংখ্যাটি আবিষ্কার করতে চাচ্ছে। তো তাদের কথা ও কর্মনীতি থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে খোদ তাদের দৃষ্টিতেই এটি একটি নব-আবিষ্কৃত সংখ্যা। তথাপি আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, লম্বা আয়াতগুলোতে যে আপনি আরও কিছু জায়গায় নম্বর লাগাবেন সেটার ভিত্তি কী হবে?

তার একটি সম্ভাব্য সুরত এই হতে পারে যে, কিছু জায়গা এমন আছে যেখানে অন্য কোন স্বীকৃত গণনা পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়েছে কিন্তু কুফী গণনায় সেগুলোকে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়নি। ঐ সব জায়গায় স্বতন্ত্র আয়াত ধরার কারণে যত সংখ্যা হয় সেই সংখ্যাটিকে কুফী সংখ্যার (স্বীকৃত সংখ্যাগুলোর মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি) সাথে যোগ করা হবে। এমন করলে তা 'তালফীক' (জোড়াতালি

---

[২২] মুসহাফে সাধারণত আয়াত সমাপ্তির চিহ্ন ব্যবহার করা হয় ○। আয়াতের মাঝখানে যেসব স্থানে কুফী গণনা পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন স্বীকৃত গণনা পদ্ধতিতে আয়াতের সমাপ্ত ধরা হয়েছে তার জন্য অনেক মুসহাফ লিপিকারগণ ০ চিহ্ন ব্যবহার করেন। কখনো এমন হয়, কোন প্রকাশক এ দ্বিতীয় চিহ্নটিকে প্রথম চিহ্ন মনে করে এতে আয়াতের নাম্বার দিয়ে দিয়েছেন। এমন অসর্তক প্রকাশকদের কথা ভিন্ন। এ অসতর্কতারই ফল হল যে, কোন কোন মুসহাফে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৮ বা ৬২৩৭ হয়ে যায়। সামনে কোন অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দেওয়া) হবে এবং সকল স্বীকৃত পদ্ধতির খেলাফ হওয়ায় তা 'মুনকার' বলে বিবেচিত হবে। তদুপরি যদি এমন করা হয় তারপরও কাজ হবে না। কারণ এ স্থানগুলোর সর্বোচ্চ সংখ্যা হল ১২৯।[২৩]

৬২৩৬ এর সাথে যদি এই সংখ্যা যোগ করা হয় তাহলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৩৬৫ যা ৬৬৬৬ থেকে অনেক কম।

ফাওয়াসিল (فواصل) শব্দটি ফাসেলাহ (فاصلة) এর বহুবচন। 'ফাসেলা' দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, আয়াতের শেষ শব্দের শেষ হরফ। যার পরে আয়াত সমাপ্তি চিহ্ন লাগানো হয়। এখন সেই চিহ্নে নম্বরও লেখা হয়। আয়াতের মাঝখানেও এমন অনেক শব্দ আসে যেগুলোকে দেখতে আয়াতের শেষ শব্দের মত দেখা যায়। যেহেতু কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেই সেই জায়গাগুলোকে আয়াতের শেষ অংশ বলে ধরা হয়নি তাই সেই জায়গাগুলো (مشبه بالفواصل) বা ফাসেলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও আসলে সেগুলো ফাওয়াসেল নয়।

তো দ্বিতীয় সম্ভাব্য সুরত এই হতে পারে যে, সে সব জায়গাকে ফাওয়াসেলের মত মনে হয় কিন্তু আহলে ফনের এই ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে তা ফাওয়াসেল নয়, কোন গণনা পদ্ধতিতেই সে জায়গাগুলোকে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়নি, যদি ইজমার খেলাফ করে ঐ ফাসেলাগুলোকেও স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয় তাও সেই ভিত্তিহীন সংখ্যাটি (৬৬৬৬) পূর্ণ করা সম্ভব হবে না।

মুশবিহ বিল ফাওয়াসেল বা ফাসেলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জায়গাগুলোর তালিকা ইমাম আবু আমর আদদানী রহ. দিয়েছেন। সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। এর সমষ্টি দাঁড়ায় ২৩০।[২৪] ৬২৩৬ এর সাথে ২৩০ যোগ করলে ৬৪৬৬ হয়, ৬৬৬৬ নয়।

কেউ যদি আরও বিরুদ্ধ পথ ধরে, ইজমার খেলাফ করে, একবার ১২৯ কে শামিল করে তারপর আবার ইজমার খেলাফ করে সেই সমষ্টির সাথে ২৩০ যোগ করে তারপরও মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫৯৫, সেই ভিত্তিহীন সংখ্যা (৬৬৬৬) নয়।

কাউকে এমনও বলতে শোনা গেছে যে, এক কওল মোতাবেক بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ প্রত্যেক সূরার অংশ। সুতরাং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মাধ্যমেই আমরা একশো চৌদ্দ আয়াত পেয়ে যাচ্ছি।

এ সম্পর্কে আরজ হল, প্রথমত এই কওলটি যয়ীফ এবং জুমহুরের মতের খেলাফ সহীহ ও দলীলসম্মত মত হল সূরার শুরুতে যে بِسْمِ اللّٰهِ লেখা হয় তা পুরো কুরআনের একটিমাত্র আয়াত, সূরাসমূহের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য যা নাযিল করা হয়েছে। এ কারণেই তারাবীহের নামাযে কুরআন খতমের সময় কোনো একটি সূরার শুরুতে জোরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া হয়, প্রত্যেক সূরার শুরুতে নয়।[২৫]

দ্বিতীয় কথা হল, উপরিউক্ত দুর্বল মতানুসারে যদি بِسْمِ اللّٰهِ কে প্রত্যেক সূরার অংশ ধরা হয় তাও এই বিষয়টি জরুরি হয়ে যায় না যে, এই মতানুসারে بِسْمِ اللّٰهِ প্রত্যেক সূরার শুরুতে একটি স্বতন্ত্র আয়াত হবে এবং সূরার প্রথম আয়াত হবে। বরং بِسْمِ اللّٰهِ তো প্রথম আয়াতের অংশও হতে পারে। ঐ দুর্বল মতের প্রবক্তা কি এ কথা বলেছেন যে بِسْمِ اللّٰهِ প্রত্যেক সূরার প্রথম আয়াত এবং স্বতন্ত্র আয়াত। আয়াত সংখ্যা উল্লেখের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোন আলেম এই দুর্বল মত উল্লেখই করেননি। মুতাওয়ারাছ এবং মুতালাক্কা বিল কবুল গণনা পদ্ধতিগুলোতে তো তা ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনি।

---

[২৩] بعض ناقلین مصحف ایسے مقامات میں ہ کی علامت لگایا کرتے ہیں [illegible]

[২৪] 'আলবয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন', আবু আমর আদদানী, পৃষ্ঠা : ১৩৯-২৯৭;
তিনি যদিও ৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,
وجملة الفواصل اللاتي يشبهن رؤوس الآي وليس معدودات بالإجماع مئتان وثمان وعشرون فاصلة
কিন্তু তিনি বিস্তারিত যে বর্ণনা দিয়েছেন তার যোগফল হয় ২৩০।

[২৫] আহকামুল কুরআন (হযরত থানভী রাহ.-এর তত্ত্বাবধানে রচিত) খণ্ড : ১/১, পৃষ্ঠা : ৫; ইলাউস সুনান, যফর আহমদ উসমানী খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২২-২২৮

তৃতীয় কথা হল, এই দুর্বল মতটির নিসবত করা হয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর দিকে। অথচ আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয় যে তার গণনায় আয়াত সংখ্যা ৬২১৬, ৬৬৬৬ নয়। আর তাঁর দিকে ৬৬১৬ এর যে নিসবত করা হয় তা যে ভিত্তিহীন পূর্বের অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ কথা হল, কুফী ও মক্কী গণনায় সূরা ফাতেহায় ○ এই চিহ্ন লাগানো হয়েছে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মীমের পরে। এবং কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেই এবং কোন কেরাআতেই সূরা তওবার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং যারা প্রত্যেক সূরার শুরুতে লেখা بِسْمِ اللهِ কে প্রত্যেক সূরার স্বতন্ত্র আয়াত ধরে জোর-জবরদস্তি করে মোট আয়াত সংখ্যা বাড়াতে চান তাদের জানা উচিত, এই অপকৌশল অবলম্বন করলেও তারা সংখ্যা পাবেন ১১২ টি। ১১৪ টি নয়। কারণ সূরা ফাতেহার শুরুতে যে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আছে কূফী গণনাতে তাকে এমনিতেই স্বতন্ত্র একটি আয়াত ধরা হয়েছে আর সূরা তওবার শুরুতে بِسْمِ اللهِ লেখা হয়নি। তো ৬২৩৬ এর সাথে ১১২ যোগ করলে ৬৩৪৮ হয়, ৬৬৬৬ নয়। যদি কেউ তিনো 'মুনকার' পদ্ধতির ফলাফল একত্রিত করতে চায় তাহলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে (৬২৩৬ + ১২৯ + ২৩০ + ১১২) ৬৭০৭। তাও ৬৬৬৬ হলো না।

এ কারণেই বলা হয়েছে যে, ভুল পথ অবলম্বন করে, তাওকীফে মুতাওয়ারাছ থেকে সরে বিচ্ছিন্ন পথ ধরে এবং ইমামদের ইজমার বিরোধিতা করে যদি কোন বেদআতী গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারও করা হয় তাও এই সংখ্যার হিসাব মেলানো সম্ভব নয়। আর কোন ভিত্তিহীন সংখ্যার ঠিকানা এমনই হওয়া উচিত।

যদি এই অপকৌশল অবলম্বন করে এই সংখ্যাটির হিসাব মেলানোও যেত তবু তা ভুল সংখ্যাই থাকত। কারণ তাওকীফে নববী, তালীমে সাহাবা এবং ফনের ইমামদের ইজমার বিপরীতে কোন সংখ্যা অপকৌশলের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হতে পারে না।

এই ভিত্তিহীন সংখ্যাটি কীভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল?

এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতির দাবী রাখে। তবে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। বাস্তবতা হল, আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের লিখিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমাদের এই উপমহাদেশের প্রাচীন কুতুবখানাগুলোতে অল্প কয়েকখানা কিতাবমাত্র পাওয়া যায়। তা-ও হয়তো এমন কোনাকানিতে যে মুসহাফ প্রকাশকগণ তো দূরের কথা ইলমে কেরাআতের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ আলেমগণেরও হয়তো তার কোন খবর নেই। ইসলামী বিভিন্ন শাস্ত্রে উর্দূ ভাষার একটি বড় গ্রন্থভাণ্ডার থাকলেও এ বিষয়ে উর্দূ ভাষায় স্বতন্ত্র রচনা বা আরবী গ্রন্থের তরজমা প্রায় নেই বললেই চলে। কারী ফাতহ মুহাম্মাদ রহ. শাতেবী রহ. কৃত 'নাযিমাতুল যাহর' এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছিলেন 'কাশিফুল 'উসর' নামে, 'সিরাজুল গায়াত ফি আদাদিল আয়াত' নামে তাঁর লিখিত একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও আছে। তার শাগরেদ কারী রহীম বখশ লিখেছিলেন 'হেদায়াতুর রহীম ফি যিকরিল আয়াতিল হাকীম' আর কারী আবুল হাসান আজমী দামাত বারাকাতুহুম লিখেছেন 'নাসরুল মারজান ফি তা'দাদি আয়িল কুরআন'। কিন্তু এ পুস্তিকাগুলোর কোনটিই খুব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। সারকথা, এ বিষয়ে উর্দূভাষার ভাণ্ডার প্রায় খালি।

এর বিপরীতে শুরু থেকেই হিন্দুস্তানীদের মধ্যে তাসাওউফের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাই ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. (৩৭৩ হি.) এর 'বুস্তানুল আরেফীন' যা তাসাওউফ ও আদাব বিষয়ে লিখিত, এখানে বেশি প্রচলিত ছিল। উর্দূ ভাষায় এর একাধিক তরজমাও হয়ে গিয়েছিল। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে কলকাতা থেকে ১৮৬৮ হি. এবং মুম্বাই থেকে ১৩০৪ হিজরীতে কিতাবটি ছেপে প্রকাশিতও হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে মুফতী সা'দুল্লাহ মুরাদাবাদী (১২১৯-১২৯৪ হি.) কুরআনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াবলী নিয়ে 'নাওয়াদেরুল বয়ান ফি উলূমিল কুরআন' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এরপর তিনি নিজেই তা সংক্ষেপ করে 'খুলাসাতুল নাওয়াদের' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন যা তাঁর জীবদ্দশায় ছাপা হয়। দারুল উলূম দেওবন্দের কুতুবখানা থেকে এই শেষোক্ত বইটির একটি ফটোকপি আমার জন্য সংগ্রহ করেছেন মওলবী মুশতাক আহমদ নূরপুরী।

মুফতী সা'দুল্লাহ রহ. এর এই রেসালা, যা ফার্সীতে লেখা হয়েছিল, খুব প্রসার লাভ করেছিল। এর উর্দূ তরজমাও হয়েছিল। এই পুস্তিকায় মুফতী সাহেব রহ. আয়াত সংখ্যার আলোচনা 'বুস্তানুল আরেফীনের' উদ্ধৃতিতে লিখেছিলেন। খোদ বুস্তানুল আরেফীনও অনেক প্রচলিত ছিল। 'খুলাসাতুন নাওয়াদের' এবং এর উর্দূ তরজমা 'সিরাজুল কারী' এর বদৌলতে 'বুস্তানুল আরেফীনে'র আয়াত সংখ্যার আলোচনা সাধারণ পাঠকদের মাঝে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সমরকান্দী রহ. এর 'বুস্তানুল আরেফীন' আদাব ও আখলাক সম্পর্কে লিখিত একটি ভালো কিতাব। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কুরআনের পারা, শব্দ, হরফ ও আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

'বুস্তানুল আরেফীন' ইলমে কেরাআতের কিতাব নয় ইলমে আদাদেরও কিতাব নয়। উলুমুল কুরআন বা ইলমে আদাদেরও কিতাব নয়। উলুমুল কুরআন বা মুতাআল্লিকাতে কুরআনেরও কিতাব নয়। এর লেখক ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দীকেও ইলমে কেরাআতের বা ইলমে আদাদের বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না।

বলা হয় লেখক 'বুস্তানুল আরেফীন'কে বড়, মধ্যম ও ছোট– তিনভাবে লিখেছেন। বাহ্যত ছোট ও সংক্ষিপ্তাকারে যেটা লেখা হয়েছিল তা-ই বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্তটার বিভিন্ন নুসখায়ও বেশ অমিল দেখা যায়। আমাদের সংগ্রহে গ্রন্থটির তিনটি ছাপা এডিশন এবং কয়েকটি হস্তলিখিত নুসখা আছে। উর্দুতে তরজমাকৃত একটি নুসখাও আছে। এগুলোতে যদি শুধু কুরআন-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আলোচনাও দেখা হয় তাও দেখা যাবে একটির সাথে অপরটির বেশ অমিল।

যেহেতু আলোচ্য সংখ্যাটির (৬৬৬৬) একমাত্র উৎস 'বুস্তানুল আরেফীনে'র একটি ইবারত, যা ভুল বোঝার কারণে এই সংখ্যাটিকে প্রসিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাই মুনাসিব মনে হচ্ছে, প্রথমে 'বুস্তানুল আরেফীনে'র সম্পূর্ণ ইবারত উল্লেখ করি এরপর সংশ্লিষ্ট ইবারতের ব্যাখ্যা করি। আল্লাহই তাওফীকদাতা। তাঁর কাছেই তাওফীক প্রার্থনা করছি।

আহমদ আলবাবী আলহালাবী এর মাতবায়ায়ে মাইমানিয়া মিসর থেকে ১৩১১ হিজরীতে 'বুস্তানুল আরেফীনে'র একটি এডিশন আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. এরই অপর গ্রন্থ 'তাম্বিহুল গাফেলীনে'র সঙ্গে ছাপা হয়েছে। যেহেতু এই নুসখাটি প্রাচীন এবং তুলনামূলক বেশি সহীহ তাই এই নুসখা থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি–

«الباب الثامن والأربعون بعد المئة في عدد آيات القرآن وكلماته.

قال الفقيه رحمه الله تعالى: اختلف القراء في عدد آي القرآن.

والمختار من الأقوال، وهو عدد الكوفيين، وهو العدد المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنها ستة آلاف ومئتان، وست وثلاثون آية.

وقد قالوا غير هذا.

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: آيات القرآن ستة آلاف ومئتان، وثمان عشرة آية.

وري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جميع القرآن ستة آلاف ومئتان وست عشرة آية.

وفي عدد إسماعيل بن جعفر المدني: ست آلاف ومئتان وأربع عشرة آية.

وفي عدد المكيين ستة آلاف ومئتان واثنا عشرة آية.

وفي عدد البصريين ستة آلاف وأربع آيات.

وفي عدد أهل الشام: ستة آلاف ومئتان وست وعشرون آية.

وعن إبراهيم التيمي أنه قال: ستة آلاف ومئة وتسع وتسعون آية.

وقال بعض أهل الشام: ستة آلاف ومئتان وخمسون آية.

وفي قول العامة: ستة آلاف وست مئة وست وستون آية.

'একশো আটচল্লিশ নং অধ্যায় : কুরআনের আয়াত ও শব্দ সংখ্যা সম্পর্কে'

ইলমে কেরাআতের ইমামগণের মাঝে কুরআনের আয়াত সংখ্যা নিয়ে বক্তব্য ভিন্নতা রয়েছে। অগ্রগণ্য বক্তব্য হল, ৬২৩৬। এটি কুফী গণনা এবং এটি আলী ইবনে আবি তালেব রা. থেকে বর্ণিত।

এ ছাড়া ভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।

* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, কুরআনের আয়াত ৬২১৮
* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, ৬২১৬
* ইসমাঈল ইবনে জাফর মাদানীর গণনায় ৬২১৪
* মক্কী গণনায় ৬২১২
* বসরী গণনায় ৬০০৪
* আহলে শামের গণনায় ৬২২৬
* ইবরাহীম তাইমীর গণনায় ৬১৯৯
* শামের কেউ বলেছেন ৬২৫০
* আর 'আম্মাহ'র বক্তব্য অনুসারে ৬৬৬৬ আয়াত।'

এই হল 'বুস্তানুল আরেফীনে'র বয়ান। আর এই বয়ানের শেষ বাক্য 'আম্মাহ'র বক্তব্য অনুসারে ৬৬৬৬ আয়াত-ই হল সেই বাক্য যার অর্থ ভুল বোঝার কারণে হিন্দুস্তানী কতেক প্রকাশক ও লেখক এ কথা লিখে ফেলেছেন যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। এ সংখ্যার ছয় ছয়ের আকর্ষণের কারণে তা সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। এমনকি অনেক মানুষ এ ছাড়া অন্য কিছু জানেই না।

'বুস্তানুল আরেফীনে'র উপর্যুক্ত আলোচনা সম্পর্কে পর্যালোচনা

ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. কথা শুরু করেছিলেন এই বলে, 'কুররা অর্থাৎ কেরাআতের ইমামগণের গণনায় মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে ভিন্নতা পাওয়া যায়।

১. 'মুখতার কওল' অর্থাৎ আহলে ফনের পছন্দসই কওল হল কুফী গণনার সংখ্যা, এই গণনাটি আলী রা. থেকে বর্ণিত। এই গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

২. এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর গণনা অনুসারে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা ৬২১৮।[২৬] এরপর যথাক্রমে উল্লেখ করেছেন–

[২৬] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর গণনা মূলত কুফী গণনা। ৬২১৮ এর সাথে সূরা ফাতেহার সাত আয়াত এবং সূরা

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর গণনা, যার সংখ্যা ৬২১৬

৪. ইসমাঈল ইবনে জাফর আলমাদানী এর কওল, যা মূলত মাদানী দুওম বা দ্বিতীয় মাদানী গণনা, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৪

৫. মাদানী আওয়াল বা প্রথম মাদানী গণনা তিনি উল্লেখ করেননি। এই গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৭।

৬. মক্কী গণনার সংখ্যা ৬২১২ (এটি হুমাইদ মক্কী রহ. এর গণনা অনুসারে, মূল মক্কী গণনার সংখ্যা হল, ৬২১৯)

৭. বসরী সংখ্যা ৬২০৪

৮. শামী সংখ্যা ৬২২৬

৯. কতেক আহলে শামের গণনা অনুসারে ৬২৫০ (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এটি 'শায কওল' বা বিচ্ছিন্ন বক্তব্য।)

১০. ইবরাহীম তাইমী মাদানীর গণনা অনুসারে ৬১৯৯। সামনে আসছে (এ গণনাটিও শায)

এ সব কিছু লেখার পর 'বুস্তানুল আরেফীনে' লেখা হয়েছে–

وفي قول العامة: ستة آلاف وست مئة وست وستون آية

আর 'আম্মাহ'র বক্তব্য অনুসারে ৬৬৬৬ আয়াত।

এখন প্রশ্ন হল, 'আম্মাহ' (العامة) এর অর্থ কী? এই শব্দটির বিভিন্ন অর্থ আছে। 'ইখতিলাফুল ফুকাহা'র কিতাবাদিতে এই শব্দটি সাধারণত 'জুমহুর' ও 'অধিকাংশে'র অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মুখতালাফ ফিহ মাসায়েলে' বা যেসব মাসআলায় ইখতিলাফ থাকে সেগুলোর আলোচনায় ব্যবহৃত হলে শব্দটির এই অর্থই বেশি প্রসিদ্ধ। এ কারণে অনেকেই বলেছেন, 'জুমহুরে'র নিকট মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক হাক্কানী রহ. 'আলবয়ান ফি উলূমিল কুরআনে' (৩০২ পৃষ্ঠায়) এ কাজটিই করেছেন। আর আমাদের দেশের এক লেখক এক কদম আগে বেড়ে 'আম্মাহ' (عامة) শব্দকে 'ইজমা' এর অর্থে ধরে নিজের মাসিক পত্রিকায় লিখে দিয়েছেন, সর্বসম্মতিক্রমে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। তাদের ভাবা উচিত ছিল যে, ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. নিজেই যখন কুফী গণনাকে 'মুখতার' (গ্রহণীয় ও অগ্রগণ্য) বলছেন তখন এখানে 'আম্মাহ' (عامة) শব্দের অর্থ 'জুমহুর' ও ইজমার অর্থে কীভাবে হয়। ইজমা ও জুমহুরের মতের বিরোধী কওল 'মুখতার' কীভাবে হয়? এরপর কুফার সকল ইমাম, মদীনা, মক্কা, বসরা এবং শামের ইমামদের গণনার সংখ্যার আলোচনা উপরে চলে আসল, তাদের মধ্যে থেকে কেউ এই সংখ্যাটির কথা উল্লেখ করলেন না, তাহলে এই 'জুমহুর' ও 'সবাই' কোত্থেকে এলেন যারা এই চারটি ছয়ের কথা বললেন? আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. নাম নিয়ে বা না নিয়ে ঐ সময়ের সকল ইসলামী শহরের আলোচনা করে নিয়েছেন যে, এই শহরগুলোর গণনার মোট সংখ্যা কত ছিল। তাহলে এই জুমহুর কোত্থেকে এলেন যারা এই সবার বিপরীতে একটি সংখ্যা উল্লেখ করছেন। কোন বক্তব্যের মর্ম উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আকলে সালীম ও সুস্থবিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগানো, পূর্বাপর লেখা এবং আহলে ফনের কাছে স্বীকৃত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। কিন্তু 'বুস্তানে'র উপরিউক্ত ইবারত বোঝার ক্ষেত্রে তারা এই বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখেননি। যদি তারা এই বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করতেন তাহলে তালাশ করতেন যে 'আম্মাহ' (عامة) শব্দটি আরও কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় কি না। 'আম্মাহ' (عامة) এর প্রচলিত অর্থ আম মানুষও হয়। অর্থাৎ সমাজের সেই শ্রেণির লোক যারা সহীহ ইলম রাখে না। এ কারণে তারা রসম-রেওয়াজ ও সমাজে প্রচলিত কথা-বার্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং রসম-রেওয়াজ, ভিত্তিহীন ও অসার কথা ও বিষয় আবিষ্কারও করে।

পূর্বাপর বিবেচনা, ইবারতের মর্ম উদ্ধারের সাধারণ আকলী মূলনীতি এবং আহলে ফনের স্বীকৃত নিয়ম-কানুন এই সব কিছুর দাবী এই যে, যদি বাস্তবেই আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. এই ইবারত এভাবেই লিখে থাকেন «وفي قول العامة», এখানে রাবী বা লিপিকারের কোন ভুল না হয়ে থাকে, আমাদের সামনে এখন যেমন আছে ঠিক তেমনই তাঁর কলম থেকে বের হয়ে থাকে, তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে 'আম্মাহ' (عامة) শব্দটি আম মানুষের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. এর যমানায় কোন এলাকার কোন ফেরকার আম মানুষের মাঝে হয়তো এই সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সকল ইসলামী শহরের ইমামদের গণনা উল্লেখ করে শেষে আম মানুষের মাঝে প্রচলিত এই সংখ্যাটিও উল্লেখ করেছেন। তাঁর বলা উদ্দেশ্য ছিল, এই সংখ্যাটি সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত যা ইসলামী শহরসমূহের ইমামদের অনুসৃত ও স্বীকৃত গণনাগুলোর বিপরীত হওয়ার কারণে বাতিল ও ভিত্তিহীন।

ফালাক ও সূরা নাসের ১১ আয়াত যোগ করলে ৬২৩৬ই হয়। একটি অমূলক ধারণার উপর ভিত্তি করে ১৮ বাদ দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর গণনার ফল ৬২১৮ বলা হয়েছে। এ বিষয়টির (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর গণনা কুফী গণনা) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মূলত ফযল ইবনে আব্বাস রাযী। ইমাম ইবনে আবদুল কাফী রাহ. তা নকল করেছেন।

এই সময়ের ইলমে কেরাআত ও ইলমে তাজবীদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমে কেরাআত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান হযরত মাওলানা কারী আবুল হাসান আ'যমী দামাত বারাকাতুহুম ২৭.০২.১৪৩৭ হিজরী জুমাবার দিবাগত রাতে আমাকে ফোনে বলেছেন, এখানে 'আম্মাহ' (عامة) দ্বারা উদ্দেশ্য জাহেল লোক। জানি না কবে এবং কীভাবে জাহেল লোকদের মাঝে এটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। ব্যস, এ সংখ্যাটি ভিত্তিহীন।'

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামিয়া দারুল উলূম করাচি এর ইলমে কেরাআত বিভাগের প্রধান হযরত মাওলানা কারী আবদুল মালিক দামাত বারাকাতুহুম এ বিষয়ে প্রেরিত আমার এক প্রশ্নের জবাবে (২৪.০৩.১৪৩৭ হি.) লিখেছেন,

واضح رہے کہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ (۶۶۶۶) والے عدد کی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ عدد الآی سے متعلق فن کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور بستان العارفین "جو ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں اگرچہ اس کا تذکرہ ہے اور اس کو العامۃ کی طرف منسوب کیا ہے "جس سے مراد بظاہر عوام الناس ہے" مگر چونکہ یہ اس فن کی کتاب نہیں ہے اور اس میں منکر روایات بھی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔

প্রকাশ থাকে যে, ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি (৬৬৬৬) এ সংখ্যাটির কোন সনদ নেই। কারণ আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত শাস্ত্রীয় কিতাবাদিতে এর উল্লেখ নেই। আর 'বুস্তানুল আরেফীনে' যা আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. এর কিতাব, যদিও এর উল্লেখ আছে এবং العامة এর দিকে সম্বন্ধ করে তা উল্লেখ করা হয়েছে, বাহ্যত তা দ্বারা আম মানুষ উদ্দেশ্য, কিন্তু যেহেতু তা এ শাস্ত্রের কিতাব নয় এবং তাতে অনেক মুনকার রেওয়ায়েত আছে তাই এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এখন দেখার বিষয় হল, কোন ধরনের আম মানুষের মাঝে ছয় ছয়ের এই সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর জবাব আমরা পাব আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. এর নিকটতম সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, ইলমে কেরাআতের ইমাম আবুল কাসেম হুযালী রহ. (৪০৩-৪৬৫ হি.) এর বক্তব্যে।

ইমাম হুযালী রহ. অনুসৃত ও স্বীকৃত গণনা পদ্ধতিগুলোর মোট আয়াত সংখ্যা বয়ান করার পর কিছু 'শায' (বিচ্ছিন্ন) ও 'গরীব' (অপরিচিত) কওলও উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি স্পষ্ট লিখেছেন–

ولا خلاف في ستة آلاف ومئتين، إلا ما روي عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: ستة آلاف ومئة وسبع وتسعون.

ولا عبرة بقول الروافضة والعامة: ستة آلاف وست مئة وست وستون، وزعموا أن آيات نزلت في أهل البيت وفي علي كتمها الصحابة، وقد ضلوا ضلالا بعيدا، وخسروا خسرانا مبينا، إذ لو كتموا بعضه، لجاز أن يكتموا الكل أو يحرفوه.

وأيضا كان علي آخر الخلفاء، ومصحفه معلوم، ولو ترك منه شيء لأظهره في مصحفه، ولذكره في وقت خلافته، ألا ترى ما روى كميل بن زياد قال: خرج علي رضي الله عنه يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء؟ قال: لا ، إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج كتاباً فيه الزكاة و الديات، أو علما أعطاه الله رجلاً، وقيل: أو فهماً.

يحققه قوله عزوجل: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون»، حفظه من الزيادة والنقصان ومن التحريف والتبديل، ولو كان كذالك لما خص بستة آلاف وست مئة وست وستين، ولجاز الزيادة عليها، أو النقصان منها، أو ذكره بعض أهل العلم كيف، ومن أهل البيت الحسن والحسين وجعفر بن محمد وغيرهم، وابن عباس حبر القرآن وترجمانه، ولم يأت عن هؤلاء الأكابر، وهم فحول الأمة وعلماءها، شيء يخالف ما رويناه، أو يزيد على ما نقلناه، فكيف يرى كتم أربع مئة آية، وعشرآيات، أو ثلاثين آية.

دل على أن الزيادة على ما روينا محال، ومن زاد فيه أو نقص منه على ماروينا فقد كفر بالله العظيم، وخرق الإجماع، ولا حكم للاشتغال بكلام أهل البدع وإيراده!»

এই পুরো বয়ান আবুল কাসেম হুযালী রাহ.-এর। তিনি আয়াত গণনার অনুসৃত ও স্বীকৃত পদ্ধতিগুলো বরং কিছু 'গরীব' ও 'শায' বক্তব্য উল্লেখ করার পর স্পষ্ট লেখেন–

ولا عبرة بقول الروافضة والعامة: ستة آلاف وست مئة وست وستون

অর্থাৎ 'রাফেযী আম মানুষের এই কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই যে, মোট আয়াত ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি'।

সামনে গিয়ে বলেন, এরা দাবী করে যে, আহলে বাইত ও আলী রা. সম্পর্কে কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল যা সাহাবীগণ গোপন করেছেন। এই দাবী যারা করে তারা চরম গোমরাহ, চরম ক্ষতিগ্রস্ত ...।

এরপর ইমাম হুযালী রহ. এই মর্মে দলীল পেশ করেছেন যে, কুরআনুল কারীম সংযোজন-বিয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই স্বীকৃত ইসলামী আকিদাও

বারবার উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন সংরক্ষিত। আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনুল কারীমের হেফাজতের যিম্মাদারি নিয়েছেন এবং তিনি তার ঘোষণাও দিয়েছেন। তাই কুরআনুল কারীমে না কোন সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে আর না এতে সংযোজন-বিয়োজন হওয়া সম্ভব।–কিতাবুল আদাদ, আবুল কাসেম হুযালী, তাহকীক : ড. মুস্তফা আদনান ও ড. আম্মার আমীন, মাজাল্লাতুশ শরীয়াতি ওয়াল কানুন, সংখ্যা : ২৫, জিলহজ্ব ১৪২৬ মোতাবেক জানুয়ারি ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা : ৭৪-৭৫

এ কিতাবের পিডিএফ কপি আমি আমার শাগরেদ মুহাম্মাদ শাহাদাত সাকিব থেকে পেয়েছি।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, আবুল কাসেম হুযালী রহ. ৬৬৬৬ কে রাফেযী আম মানুষের কথা বলেছেন। কট্টর শিয়াদের রাফেযী বলা হয়। তিনি العامة শব্দকে الرافضة শব্দের উপর عطف করেছেন। এই عطف হল عطف تفسيري। উদ্দেশ্য হল, রাফেযী আম মানুষ। এই عطف টি عطف تفسيري হওয়ার একটি আলামত হল, তিনি এই বক্তব্যটি খণ্ডন করতে গিয়ে শুধু রাফেযীদের মতামত উল্লেখ করেছেন এবং তা খণ্ডন করেছেন। العامة এর উপর আলাদাভাবে 'রদ' করেননি।[২৭]

রাফেযীদের সব ফের্কা তাহরীফে কুরআন বা কুরআনে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবক্তা নয়। কিন্তু তাদের অনেকেই এই স্পষ্ট কুফরী আকীদা পোষণ করে। এরা সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে। রাফেযীদের মধ্যে যারা এই কুফরী আকীদা পোষণ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, আসল কুরআন ছিল (আল্লাহ মাফ করুন) সতের হাজার আয়াত। কেউ কেউ এ কথাও বলে যে, ঐ কুরআন 'গারে সুররা মান রআ'তে প্রতীক্ষিত মাহদীর কাছে আছে যিনি কিয়ামতের আগে বের হবেন(?) নাউযুবিল্লাহ।[২৮]

এ কারণেই আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. তা ইঙ্গিতে রদ করেছেন আর আবুল কাসেম হুযালী রহ. বিস্তারিতভাবে রদ করেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, তাওকীফে নববী ও তা'লীমে সাহাবা অর্থাৎ নববী শিক্ষা ও সাহাবায়ে কেরামের শেখানো পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কোন সূরার বড় কোন অংশকে দুই বা তিন আয়াত গণনা করা অথবা ছোট ছোট দুই-তিন অংশকে এক আয়াত হিসেবে গণনা করার কারণে ইলমে আদাদের ইমামদের মাঝে গণনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ভিন্নতা এবং সেই ভিন্নতার কারণে মোট আয়াত সংখ্যায় বিভিন্নতা তো হয়েছে, যা হুযালী রহ. নিজেই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি ৬৬৬৬ এই সংখ্যাটি রদ করতে গিয়ে এ কথা বলেননি যে কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেই এই সংখ্যাটি (৬৬৬৬) পূর্ণ হয় না। কারণ এই সংখ্যাটির কথা প্রথম যারা বলেছে তারা গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে এ সংখ্যাটির কথা বলেনি। অর্থাৎ তারা এ কথা বলেনি যে, বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি আছে, এক গণনা পদ্ধতি অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। বরং তারা এ কথা বলেছে এই কুফরী আকীদা থেকে– বর্তমান কুরআনে আয়াত সংখ্যা কম, আসল কুরআনে আয়াত সংখ্যা আরও বেশি ছিল, যা গোপন করা হয়েছে। সেই আয়াতগুলো যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৬৬৬। (نعوذ بالله العظيم) এ কারণে ইমাম হুযালী রহ. গণনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে তাদের কথা রদ করেননি। 'কুরআন সংরক্ষিত' এই মানসুস আলাইহি ও মুজমা আলাইহি (সর্বস্বীকৃত) ঈমানী আকীদার কথা উল্লেখ করে তাদের রদ করেছেন।

আবুল কাসেম হুযালী রহ. এর কিতাবুল আদাদ যা মূলত তাঁর কিতাব 'আলকামেল ফি কেরাআতে'র অংশ আজ থেকে দশ বছর আগেও পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। কিতাবুল কামেল থেকে শুধু 'আদাদুল আয়াত' বা 'আয়াত সংখ্যা'র অংশটি

---

[২৭] শিয়াদের পরিভাষায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর লোকদেরকে عامي এবং العامة বলা হয়। (দেখুন, লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনুন নাদিমের জীবনী এবং শিয়াদের কিতাব 'উসূলুল কাফী'-এর সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েত।) তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কোন আলেম কট্টর শিয়াদের العامة বলতেই পারেন।

تعجب کی بات ہے کہ شیعہ عالم ابو علی طبرسی (۵۴۸ھ) نے "مجمع البيان لعلوم القرآن" ج۱ ص۱۸ میں لکھا ہے: فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً ونقصاناً. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى.

یہ حشویہ عامہ دراصل روافض ہی کے ہیں خواہ خود طبرسی انہیں "اصحابنا" پر عطف کرکے ذکر کرتے ہیں، بہر حال۔ حشویہ عامہ جو نقصان من القرآن کے [illegible] کے قائل تھے [illegible] انہیں نے [illegible] میں ۶۶۶۶ کا عدد رائج کیا فلا حول ولا قوة الا بالله

[২৮] শিয়া রাফেযীদের তাহরীফের আকীদা সম্পর্কে জানতে দেখুন :
১. 'ইরানী ইনকিলাব', মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী রহ.
২. 'শিয়া সুন্নী ইখতিলাফাত আওর সিরাতে মুস্তাকীম', মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ.
৩. শিয়া লেখক নুর তবারাসী এর কিতাব 'ফাসলুল খিতাব ফি ইসবাতি তাহরীফি কিতাবি রব্বিল আরবাব'

আর যে শিয়ারা এই কুফরী আকীদা পোষণ করে না তাদের সম্পর্কে জানতে দেখুন :
১. 'ফাসলুল খিতাব ফি তাহরিফি কিতাবি রব্বিল আরবাব', মুহাম্মদ যাকারিয়া আললামিরনী
২. 'উলূমুল কুরআন' হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী
৩. 'আহকাত তানযীল', ড. খালেদ মাহমুদ খ. : ২, পৃ. : ৩৩-৪২

'মাজাল্লাতুশ শরীয়া ওয়াল কানুনে' (১৪২৬ হি.) ছেপেছে। যদি হুযালী রহ. এর এই কিতাব এই উপমহাদেশে প্রচলিত থাকত অথবা আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. এর 'বুস্তানুল আরেফীনে' এই সংখ্যাটির শুধু উল্লেখ না থাকত বরং আবুল কাসেম হুযালী রহ. এর কিতাবের মত বিস্তারিত আলোচনা থাকত তাহলে মানুষ এর দ্বারা ভুল বোঝাবুঝির মাঝে পড়ত না। 'বুস্তানে' যে কথাটিকে ইজমার বিরোধী আম মানুষের কথা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, এবং কথাটিকে স্পষ্টভাবে বাতিল ও ভিত্তিহীন বলার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি, শুধু একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে সেই কথাটিকে জুমহূরের কওল ভেবে নেওয়া হয়েছে। যে কথার ভিত্তি ছিল 'কুরআন সংরক্ষিত'র মত মৌলিক আকীদার অস্বীকার, যে কথার উৎস ছিল কুরআনে সংযোজন-বিয়োজন ঘটার মত কুফরী আকীদা সে কথাটিকে শুধু গণনা পদ্ধতির পার্থক্যের মত ভাবা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সেটিকে জুমহূরের গণনা সংখ্যা এবং সর্বোত্তম গণনা সংখ্যা মনে করা হয়েছে। যারা এই মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছেন তারা কখনো এ কথা ভাবেননি যে, আম্মের সেই গণনা পদ্ধতি কোনটি এবং এই গণনা পদ্ধতি ইলমে কেরাআতের কোন ইমাম ও কোন মারকাযের? এই মত অনুসারে কখনো আয়াতের শুরু-শেষ নির্ধারণ এবং নম্বর লাগানো হয়েছে কি? কিংবা তা আদৌ সম্ভব কি? ব্যস, শাস্ত্রের বাইরের একটি কিতাবের একটি অস্পষ্ট ইবারতকে ভুল বুঝে শুধু ধারণা-আন্দাজের ভিত্তিতে কথার পর কথা বানানো হয়েছে।

এই ধারণা-আন্দাজের ভিত্তিতে যারা কথা বলেন তাদের সম্পর্কে তো পূর্বের অধ্যায়ে কিছু পর্যালোচনা করা হয়েছে আলহামদু লিল্লাহ। আরও কিছু পর্যালোচনা সামনের অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, ৬৬৬৬ সংখ্যাটির প্রবক্তা সেই রাফেযী আম মানুষের উপর আবুল কাসেম হুযালী রহ. বিস্তারিত রদ লিখেছেন তারা কুরআনে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবক্তা, যা স্পষ্ট কুফরী আকীদা। পক্ষান্তরে 'বুস্তানুল আরেফীনে'র ইবারত ভুল বুঝে যে সকল প্রকাশক ও লেখক মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ লিখেছেন, তারা কখনো কুরআনে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবক্তা নন। বরং হেফাজতে কুরআন তথা 'কুরআন সংরক্ষিত' এই আকীদার উপর তাদের পূর্ণ ঈমান আছে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তো এই সংখ্যা এই ধারণা করে লিখেছেন যে, যদি বাস্তবেই সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যা হিসাব করা হয় তাহলে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ই হবে। কিন্তু তারা নিজেরা কখনো গুণে দেখার কষ্টটুকু স্বীকার করেননি। তাই বাস্তবতা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়নি। আর কেউ কেউ এমন আছেন যারা জানেন যে, যদি মুসহাফ খুলে গণনা করা হয় তাহলে মোট সংখ্যা ৬৬৬৬ হবে না বরং ৬২৩৬ হবে। তারপরও তারা সেই ভুল সংখ্যাটি বলেন ও লেখেন। তা এই জন্য যে, তারা ঐ সংখ্যাটিকে ভুল মনে করেন না বরং কূফী, বসরী, মাদানী, মক্কী গণনার মত কোন গণনা পদ্ধতির সংখ্যা মনে করেন। কখনো তারা এই তাহকীকের প্রয়োজন অনুভব করেননি যে, এমন কোন গণনা পদ্ধতি কি আছে? থাকলে তা কার? শাস্ত্রের কোন কিতাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে? এর সনদ কী? এই পদ্ধতি অনুসারে আয়াতের শুরু-শেষ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে কি না। ব্যস, এ ছিল এক ধরনের অসতর্কতা বা এক ধরনের বেখেয়ালি যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু তারা তা পারেননি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ও আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে জায়গা দিন। আমীন।

এই ভিত্তিহীন সংখ্যাটি কীভাবে উম্মুল মুমিনীনের দিকে মানসুব হয়ে গেল?

অন্যায়ের পর অন্যায় এই যে, এই ভিত্তিহীন সংখ্যাটিকে কোন কোন পুস্তিকায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর দিকে নিসবত (যুক্ত) করে দেওয়া হয়েছে। আর কিছু লোক এই ভিত্তিহীন নিসবতের আশ্রয় নিয়ে এই ভুল সংখ্যাটির উপর জমে থাকার বৈধতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। অথচ এই সংখ্যাটি সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে এর সাথে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর নাম যুক্ত করা হয়েছে। যেমনিভাবে বাস্তবতার সাথে এই সংখ্যার কোন সম্পর্ক নেই তেমনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই।

উম্মুল মুমিনীনের দিকে এ সংখ্যাটি যুক্ত হওয়ার হাকীকত হল, মুফতী সা'দুল্লাহ রহ. 'বুস্তানুল আরেফীন' সামনে রেখে 'খুলাসাতুন নাওয়াযেরে' আয়াত সংখ্যার আলোচনা করেছেন। তিনি 'বুস্তানুল আরেফীনে'র ইবারত وفي قول العامة এর ফার্সী তরজমা করেছিলেন–

در قول عامہ شش ہزار و شش صد و شصت و شش

অর্থাৎ এবং عامہ এর বক্তব্য অনুসারে ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি।

পরবর্তীকালে যখন 'সিরাজুল কারী' নামে 'খুলাসাতুন নাওয়াযেরে'র উর্দূ তরজমা হয়েছে তখন

অনুবাদক عامہ শব্দটিকে عائشہ পড়েছেন এবং উপরোক্ত ইবারতের এই তরজমা করেছেন,

اور حضرت عائشہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کہتی ہیں

-সিরাজুল কারী, পৃষ্ঠা : ৩৪, মাতবায়ে কাইয়ূমী, কানপুর, এপ্রিল ১৯২৬ ইং[২৯]

তো 'সিরাজুল কারী'র লেখক যদিও পাঠকবর্গের জন্য 'সিরাজ' (বাতি) পেশ করেছেন। কিন্তু তার নিজের বাতিতে আলো কম ছিল, তাই তিনি অনুবাদ করার সময় عامہ শব্দটিকে عائشہ পড়ে শুরুতে নিজের পক্ষ থেকে حضرت শব্দ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তার এই মারাত্মক ভুলই পরবর্তীদের জন্য দলীল হয়ে গেছে। إنا لله وإنا إليه راجعون

প্রকাশ থাকে যে, এই ভুলের কারণে ধোঁকা খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ–

১. 'সিরাজুল কারী' স্বতন্ত্র পুস্তিকা নয় বরং তা 'খুলাসাতুন নাওয়াসেরে'র তরজমা। পুস্তিকার শুরুতে তিনি লিখেছেন–

مرد باتمیز حافظ عبد العزیز نے مجھ سے کہا کہ چند فصل مشتمل بر قواعد ضروری علم قراءت وتجوید کے اگر تحریر کئے جائیں، ہر آئنہ موجب منافع خواص وعوام ہوگا، سو میں نے یہ مناسب جانا کہ رسالہ خلاصۃ النوادر تصنیف مولوی محمد سعد اللہ صاحب کا ترجمہ کیا جائے کہ باوجود اختصار کے مشتمل اور منافع کے ہے

–সিরাজুল কারী, পৃষ্ঠা : ৩৪

তো এই পুস্তিকা যেহেতু 'খুলাসাতুন নাওয়াসেরে'র অনুবাদ তাই দেখা উচিত 'খুলাসাতুন নাওয়াসেরে' কী আছে। 'খুলাসাতুন নাওয়াসেরে'র যে নুসখা লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল তার ফটোকপি দারুল উলূম দেওবন্দের কুতুবখানা থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি। তাতে عامة শব্দ আছে, عائشة নয়। حضرت শব্দটিও সেখানে নেই।–খুলাসাতুন নাওয়াসের, পৃ. : ৭

২. খুলাসাতুন নাওয়াসেরে আয়াত সংখ্যার আলোচনা 'বুস্তানুল আরেফীন' থেকে নেওয়া হয়েছে। মুফতী সা'দুল্লাহ রহ. লিখেছেন–

فقیہ ابو اللیث در بستان می آرد: در عدد آیات اختلاف بسیار است، کہ ذکر کردہ اند شش ہزار و ششصد و شش آیہ است، و این قول راجح و مختار است، و منسوب بسوئے علی مرتضی کرم اللہ وجہہ ...... و در قول عامہ شش ہزار و ششصد و شصت و شش۔

'বুস্তানুল আরেফীনে'র অসংখ্য ছাপা নুসখা ও পাণ্ডুলিপি আছে। আমার কাছেই কম-বেশি দশ নুসখা আছে। সব নুসখাতেই এখানে عامة শব্দ আছে, عائشة নয়।

৩. যে কথাটি বাতিল ও বাস্তবতাবিরুদ্ধ এবং যার সূচনা হয়েছে বাকেরী আম মানুষ থেকে তা সাহাবী কেন, সাধারণ কোন আলেমেরও কথা হতে পারে না। তাহলে তা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর কওল কীভাবে হবে।

৪. খুলাসাতুন নাওয়াসের এবং সিরাজুল কারী উভয় পুস্তিকায় আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনার পর আয়াত সংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত ছক প্রদান করা হয়েছে। এতে কূফী গণনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য গণনার মোট আয়াত সংখ্যার উল্লেখ আছে। একটি ঘরে آیات عامہ (আয়াতে আম্মাহ অর্থাৎ আম মানুষের সংখ্যা) এর শিরোনামে ৬৬৬৬ লেখা হয়েছে। কিন্তু তাতে আয়েশা রা. এর গণনার ভিন্ন কোন ঘর নেই। প্রশ্ন হল, সিরাজুল কারীতে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে عامہ শব্দটিকে عائشہ বানিয়ে নেওয়ার কারণে عامہ এর গণনা সংখ্যার উল্লেখই আসেনি। তাহলে তিনি ছকে এসে عامہ এর সংখ্যা কোত্থেকে উল্লেখ করছেন? আসলে তিনি খুলাসাতুন নাওয়াসেরের ছকে যে عامہ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে তা ঠিক ঠিক পড়েছেন। কিন্তু খুলাসাতুন নাওয়াসেরে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে যেখানে عامہ শব্দ এসেছে সেখানে তিনি عامہ কে عائشہ পড়েছেন। এটি ছিল তার ভুল। ছকে عامہ শব্দ দেখে তাঁর সতর্ক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আফসোস তিনি সতর্ক হননি।

মোটকথা, 'খুলাসাতুন নাওয়াসের' এর অনুবাদক 'খুলাসাতুন নাওয়াসেরে'র পাঠ ভুল পড়ে যে ভুল অনুবাদ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে একটি ভিত্তিহীন বিষয়কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া শুধু নাজায়েযই নয়, তার প্রতি বে-আদবীও বটে।

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ মারহুম মাদ্রাসা পড়ুয়া আলেম ছিলেন না, জেনারেল শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু তিনি উর্দূ-ফার্সী জানতেন, দ্বীনী বিষয়ে তার ভালো পড়াশোনাও ছিল। তিনি আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা প্রথমে সে সময়ের পত্রিকা 'প্রতিধ্বনি'তে ছাপা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই প্রবন্ধ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে লিখিত তার প্রবন্ধসমগ্র 'কুরআন প্রসঙ্গ' ছাপা হয়। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ঢাকা থেকে এর একটি এডিশন বের হয় ১৯৭০ সালে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত এই প্রবন্ধ

"سراج القاری کا ایک نسخہ اور مجھے مولانا عبد المجید بن خلیل الرحمن نے رنگپور سے لاکر دیا ہے، بعد میں اس کے کئی ایڈیشن طبع ہوئے، ہر ایک میں یہ غلطی موجود ہے، اس رسالے کے مصنف مولانا کا سراغ ابھی مجھے نہیں مل سکا ہے۔

সময় থেকে মওলবী সাঈদুল হক এর ফটোকপি সংগ্রহ করেছেন। এতে ড. শহীদুল্লাহ মরহুম 'সিরাজুল কারী' থেকে আয়াত সংখ্যার ছক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি সিরাজুল কারী'র উক্ত ভুলের কারণে ধোকায় পড়েননি। তিনি লিখেছেন, মোটামুটিভাবে আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬ বলা হয়। অধিকন্তু বলা হয় যে ইহা হযরত আইশাহর গণনা। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।–কুরআন প্রসঙ্গ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ৯৮

আসলে সুস্থ রুচিবোধ ও সঠিক চিন্তাশক্তি আল্লাহ তাআলার বড় নেআমত যা সবাই পায় না।

ভিত্তিহীন নেসবতের আরও এক ভিত্তিহীন বরাত

এই ভিত্তিহীন নেসবতের আরও একটি ভিত্তিহীন বরাত আছে। হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী রহ. 'উলুমুল কুরআন' সম্পর্কে ছোট্ট একটি কিতাব লিখেছিলেন। সেখানে তিনি আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে এক বাক্যের একটি নোট লিখেছেন–

تعداد آیات قرآن: شمار حضرت عائشہ کے مطابق ۶۶۶۶ ہے۔

অর্থাৎ 'কুরআনুল কারীমে আয়াত সংখ্যা : হযরত আয়েশা রা.-এর গণনা অনুসারে ৬৬৬৬।

বরাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন–

তারীখুল কুরআন, সারেম, পৃষ্ঠা : ১১৯; ফুনূনুল আফনান, ইবনুল জাওযী

শামসুল হক আফগানী রহ. ছিলেন বড় ও প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর পুস্তিকায় এ কথাটি চলে আসায় তা একটি সহীহ ও সঠিক কথা মনে করা হয় এবং এর উপর নির্ভর করে পরবর্তী অনেক লেখক নিজেদের লেখায় তা উল্লেখ করেন, কখনো তার বরাতে কখনো তার নাম না নিয়ে। আফগানী রহ. এর জন্ম ৭ রমযান ১৩১৮ হি., ইন্তেকাল হয় ১৪০৩ হি. মোতাবেক ১৯৮৩ ইং। এ কিতাবটি যখন লেখেন তার বেশ বয়স হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি নানা ব্যস্ততা ও অসুস্থতার নাযুক সময় পার করছিলেন। তাই এ কিতাবে অধিকাংশ জায়গায়ই তিনি নির্ভর করেছিলেন মরহুম প্রফেসর মাওলানা আবদুস সামাদ সারেমের (যিনি জামেআ ভাওয়ালপুরে তার সহকর্মী ছিলেন) 'তারীখুল কুরআনে'র উপর। অনেক ক্ষেত্রে মূল উৎসগ্রন্থ নিজে খুলে দেখার সুযোগ তাঁর কম হয়েছিল।

মোটকথা, শামসুল হক আফগানী রহ. আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে এক লাইনের, বরং আধা লাইনের যে নোট লিখেছিলেন তার জন্য বরাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আবদুস সামাদ সারেমকৃত 'তারীখুল কুরআন' পৃষ্ঠা : ১১৯ ও ইবনুল জাওযীর 'ফুনূনুল আফনানে'র।

ইবনুল জাওযী রহ. এর 'ফুনূনুল আফনান ফি উয়ূনি উলূমিল কুরআন' ছাপা হয়েছে। এর সর্বোত্তম নুসখা হল যা ড. হাসান যিয়াউদ্দীন ইতর এর তাহকীকে ছেপেছে। পাঁচের অধিক পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে তিনি এই নুসখা প্রস্তুত করেছেন। এ কিতাবে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ২৩৬ থেকে ৩২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় একশো পৃষ্ঠাব্যাপী এই আলোচনা। এই পুরো আলোচনায় কিংবা কিতাবের অন্য কোন জায়গায় ৬৬৬৬ এর উল্লেখ নেই; বরং তিনি আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা শুরুই করেছেন এ কথা বলে–

«فقد وقع إجماع العادين على أن القرآن ستة آلاف ومائتا آية، ثم اختلفوا في الكسر الزائد على ذلك...»

আয়াত গণনাকারী (ইমাম)গণের এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশো। ইখতিলাফ শুধু এ বিষয়ে যে দুইশো'র চেয়ে বেশি আয়াত কত?–ফুনূনুল আফনান, পৃষ্ঠা : ২৪১-২৪৩, তাহকীক : হাসান যিয়াউদ্দীন ইতর, দারুল বাশায়েরেল ইসলামিয়া, বৈরুত।

এই কিতাবের পুরাতন এডিশন বের হয়েছিল আলমাগরিবের দারুল বাইযা থেকে। ১৯৭০ সনে তা ছাপা হয়। সেই এডিশনেও এই ইবারত এ রকমই।

ইবনুল জাওযী যখন নিজেই বলছেন যে, আয়াত গণনাকারী ইমামগণের এ ব্যাপারে ইজমা আছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশোর কিছু বেশি। অর্থাৎ তিনশো'র কাছাকাছিও নয় তখন তাঁর কিতাবেই আবার ৬৬৬৬ এর কথা কীভাবে আসে? আমরা ইবনুল জাওযীর এই কিতাব আগাগোড়া পড়েছি, আয়াত সংখ্যার আলোচনা কয়েকবার পড়েছি কিন্তু এই সংখ্যার উল্লেখ পাইনি। আয়াত সংখ্যার আলোচনায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর নামই নেই। বরং পুরো কিতাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর নাম এসেছে শুধু দুই জায়গায়, যে দুই জায়গায় আয়াত সংখ্যার কোন আলোচনাই নেই।

বাহ্যত শামসুল হক আফগানী রহ. ফুনূনুল আফনান নিজে খুলে দেখেননি। আবদুস সামাদ সারেমের কিতাবে এর বরাত দেখে নাম লিখে দিয়েছেন। এ জন্য আবদুস সামাদ সারেমের কিতাবের নাম লিখে পৃষ্ঠা নম্বর লিখেছেন কিন্তু 'ফুনূনুল আফনানের' নাম লিখে পৃষ্ঠা নম্বর লেখেননি। যদি তিনি নিজে ফুনূনুল আফনান খুলে দেখতেন তাহলে হয়তো এ বরাত দিতেন না। কারণ তাতে না আছে এই সংখ্যা, না উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার দিকে এই সংখ্যার নেসবত। এর বিপরীতে বরং সেখানে শাস্ত্রের ইমামদের ইজমা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের কওল উল্লেখ করতে গিয়ে যতগুলো সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ৬২০৪ এর কম এবং ৬২৩৬ এর চেয়ে বেশি কোন সংখ্যা নেই।

বাকি থাকল আবদুস সামাদ সারেমকৃত 'তারীখুল কুরআনের' বরাত। এর হাকীকত হল, আবদুস সামাদ সারেম রহ. তাঁর এ কিতাবে আয়াত গণনা পদ্ধতি ও আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেছেন। এতে তিনি আয়াত সংখ্যার একটি ছকও প্রদান করেছেন। ছক উল্লেখ করার আগে তিনি লিখেছেন–

یہ شمار یا تو صحابی کے شاگرد تابعی کی طرف منسوب ہے، یا مقام کی طرف، حضرت عثمان کا شمار شامی مشہور ہے، اور عبد اللہ بن عامر بن الحصین کی طرف منسوب ہے، حضرت علی کا شمار کوفی مشہور ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود کا مدنی اول، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مدنی دوم مشہور ہے۔

এই গণনা পদ্ধতি হয়তো সাহাবীর শাগরেদ তাবেয়ী'র দিকে মানসুব (সম্বন্ধিত)। অথবা স্থান ও শহরের দিকে মানসুব। হযরত উসমান রা. এর গণনা শামী গণনা হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে হুসাইন এর দিকে মানসুব। হযরত আলী রা. এর গণনা কুফী গণনা হিসেবে প্রসিদ্ধ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর গণনা মাদানী আওয়াল এবং হযরত আয়েশা রা. এর গণনা মাদানী দুওম বা দ্বিতীয় মাদানী গণনা হিসেবে প্রসিদ্ধ।–'তারীখুল কুরআন', আবদুস সামাদ সারেম, পৃষ্ঠা : ১১৮, প্রকাশক : ইদারায়ে ইলমিয়্যাহ, ৫ নং ধনিরাম রোড, আনারকলি লাহোর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৩ ইং; পৃষ্ঠা : ১১৭, মাকতাবায়ে মুঈনুল আদব উর্দূ বাজার লাহোর, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নতুন সংস্করণ, ১৯৮০ ইং

আবদুস সামাদ সারেম রহ. উপরোক্ত কথার বরাত দিয়েছেন এভাবে–"'ফুনুনল আফনান ফি আজায়িবিল কুরআন, ইবনুল জাওযী; ইতকান, মীনারুল হুদা"

এখানে আমরা দেখছি আবদুস সামাদ সারেম রহ. হযরত আয়েশা রা. এর গণনা মাদানী দুওম বা দ্বিতীয় মাদানী গণনা বলছেন। এ কথার স্বপক্ষে তিনি যে কিতাবগুলোর বরাত দিয়েছেন তাতে আমরা এ কথা পাইনি। কিন্তু এখান থেকে এ কথা তো বোঝা গেল যে, তাঁর মতে আয়েশা রা. এর গণনা সংখ্যা তা-ই যা মাদানী দুওম বা দ্বিতীয় মাদানী গণনার সংখ্যা। আর এ কথা পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, দ্বিতীয় মাদানী গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৪, অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে ৬২১০। সে হিসেবে সারেম রহ. এর মতে হযরত আয়েশা রা. এর গণনায় আয়াত সংখ্যা ৬২১৪ অথবা ৬২১০। তাই এই ভিত্তিহীন সংখ্যাটি আবদুস সামাদ সারেম রহ. এর গ্রন্থের বরাতে আয়েশা রা. এর দিকে নেসবত করাও ঠিক নয়। কিন্তু এই ভুল কেন হল? এর কারণ হল, আবদুস সামাদ সারেম রহ. আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে প্রথমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি আয়াত সংখ্যার একটি ছক দিয়েছেন। নিম্নে তা হুবহু উল্লেখ করা হল।

আয়েশার গণনা সংখ্যা : ৬৬৬৬	শামী : ৬২৫০
ইবনে মাসউদের সংখ্যা : ৬২১৮	বসরী : ৬২১৬
আহলে মক্কার সংখ্যা : ৬২১২	কুফী : ৬২৩৬
ইরাকী : ৬২১৪	
ইসমাঈল ইবনে জাফর মাদানী : ৬২১৪	
আম্মাহ-এর কওল : ৬৬৬৬	

–তারীখুল কুরআন, আবদুস সামাদ সারেম, পৃষ্ঠা: ১১৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৩ ইং

এ ছকে অনেকগুলো ভুল-ত্রুটি আছে। সামনে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে যে কথাটি উল্লেখ করা জরুরি তা হল, এই ছকে প্রথমে লেখা হয়েছে حضرت عائشہ کا شمار ۶۶۶۶ অর্থাৎ 'হযরত আয়েশা রা.-এর গণনা সংখ্যা ৬৬৬৬'। ছকের শেষে আবার লেখা হয়েছে, قول عام ۶۶۶۶ অর্থাৎ 'আম্মাহ বা সাধারণ মানুষের কওল হল, ৬৬৬৬'।

এখানে 'আম্মাহ' এর কওল বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা তো সারেম রহ. 'বুস্তানুল আরেফীনে'র কথা না বুঝে তাকলীদ করে লিখে দিয়েছেন। (তবে তিনি এইটুকু কাজ ভালো করেছেন যে এই কওলটি শুধু ছকে উল্লেখ করেছেন এবং عام কে 'জুমহুর' বানিয়ে দেননি।) কিন্তু 'হযরত আয়েশা রা. এর গণনা সংখ্যা ৬৬৬৬ এটি একটি বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা। তবে এই ভুল বাহ্যত আবদুস সামাদ সারেম রহ. এর নয়; বরং এই ভুল লিপিকারের। সারেম রহ. হয়তো এমন লিখেছিলেন, 'হযরত আয়েশা এর গণনা সংখ্যা ৬২১৪ (বা ৬২১০)' কিন্তু লিপিকার বে-খেয়ালির কারণে ৬৬৬৬ পড়েছে।

এই ভুল যে লিপিকারের, তার পক্ষে দু'টি দলীল রয়েছে–

এক. সারেম রহ. স্পষ্টভাবে লিখে এসেছেন, 'হযরত আয়েশা রা. এর গণনা মাদানী দুওম বা দ্বিতীয় মাদানী গণনা হিসেবে প্রসিদ্ধ'। তাহলে ছকে গিয়ে তিনি এর খেলাফ কথা কীভাবে লিখবেন? মাদানী দুওম বা দ্বিতীয় মাদানী গণনা ৬৬৬৬ নয়, ৬২১৪ বা ৬২১০।

দুই. যদি সারেম রহ. এর কাছে হযরত আয়েশা রা. এর গণনা ৬৬৬৬ই হয় তাহলে তিনি ছকে এই সংখ্যাটিকে عام (আম মানুষের) এর কওল কীভাবে বলেন।

বোঝা গেল যে এটি লিপিকারের ভুল। যদি বলা হয় যে, এই ভুল সারেম রহ. থেকেই হয়েছে তাহলে

এর একমাত্র উৎস 'সিরাজুল কারী'র সেই ভুল যার হাকীকত পূর্বে স্পষ্ট করা হয়েছে।

মনে হয় শামসুল হক আফগানী রহ. সারেম রহ. এর কিতাব থেকে পূর্ণ আলোচনা পড়েননি। ব্যস, ছকের শুরুতে এ বাক্য লেখা দেখেছেন 'হযরত আয়েশা রা. এর গণনা সংখ্যা ৬৬৬৬' আর তা যে লিপিকারের ভুল তা বিবেচনা না করেই নিজের কিতাবে তা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করুন। জান্নাতুল ফেরদাউসে তাঁকে উঁচু মাকাম দান করুন। ভুল কার না হয়। কিন্তু কারও ভুলকে দলীল বানিয়ে নেওয়া এবং তা প্রচার করতে থাকা গুনাহ। হ্যাঁ, কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কোন লেখাকে ভুল বলার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। কখনও এমনও হয় একটি কথা ভুল নয়, কিন্তু কারও কাছে তা ভুল বলে মনে হয়, তিনি যথেষ্ট তাহকীক না করে এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করেই তা ভুল বলে মত প্রকাশ করে বসেন। এই কর্মপন্থাও ভুল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন অসতর্কতা থেকে রক্ষা করুন।

সতর্কতা ও তাহকীকের হক আদায় করার সামান্য প্রয়াস হিসেবে হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী রহ. এর উপরোক্ত কথার উপর যে পর্যালোচনা লেখা হল তা প্রকাশ করতে প্রায় পনেরো বছর দেরি করা হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে তাহকীক অধ্যয়ন ও তত্ত্ব-তালাশ জারি ছিল। দেশের ও দেশের বাইরের উলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা ও চিঠি মারফত সুওয়াল-জওয়াবও জারি ছিল। এরপর দুআ ও ইস্তেখারা করে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এ কথাগুলো লেখা হয়েছে, শুধু আমানতে ইলমের হক আদায় করার জন্য এবং হযরত আফগানী ও মাওলানা সারেম রহ. ও অন্যান্যদের কল্যাণকামিতার প্রেরণায় তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

والله على ما نقول وكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير

এ পর্যালোচনার উপরও পর্যালোচনা হতে পারে। সবাইকে এ পর্যালোচনার উপর দলীলনির্ভর পর্যালোচনা করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

'ইসলামী বিশ্বকোষে' উম্মুল মুমিনীনের বরাত কোত্থেকে এল?

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৮২ এর জুন এ 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হয়। তাতে 'আয়াত' সংক্রান্ত প্রবন্ধে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে, 'হযরত আইশা (রাঃ) এর মতে ৬৬৬৬'। বিশ্বকোষের এই লেখা থেকে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে তাই বাস্তবতা সামনে আসার জন্য আরজ করা হচ্ছে যে, এই 'বিশ্বকোষ' ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়নি। এটি মূলত লাইডেনের 'শর্টার এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামের' অনুবাদ। কিন্তু তা হুবহু অনুবাদ নয়। প্রথমে বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এর অনুবাদ, সংযোজন ও পরিমার্জনের কাজ হয়। কিন্তু কোন কারণে তা ছাপা হয়নি বা ছাপা সম্ভব হয়নি, যতটুকু কাজ হয়েছে তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাতে নযরে ছানী ও সংযোজনের কাজ হয় এবং ১৯৮২ সালে তা ছাপা হয়। আমাদের সামনে এর যে এডিশন আছে তা ২০০৭ সনে ছেপেছে। ১৯৮২ সনে ছাপা এডিশনও আমরা দেখেছি। উভয় এডিশনে এ কথা আছে যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর মতে আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। দেখে আশ্চর্য লাগল তাই লাইডেন থেকে প্রকাশিত মূল এডিশন 'শর্ট এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম' খুলে দেখা হল। কিন্তু দেখা গেল সেখানে 'আয়াত' সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন প্রবন্ধই নেই। বরং শব্দটি লিখে 'কুরআন' -এর প্রবন্ধ দেখার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু সে প্রবন্ধে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নেই। এবং আয়েশা রা. এর দিকে সম্বন্ধকৃত এ সংখ্যার নামগন্ধও নেই। 'আয়াত' সম্পর্কে প্রবন্ধ আছে THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, Leiden, E.J. Brill এ। কিন্তু সে প্রবন্ধেও এ কথা নেই। আমরা তো এই প্রবন্ধে যতগুলো আরবী-ইংরেজি-জার্মানি গ্রন্থের বরাত দেওয়া হয়েছে সবগুলো খুলে দেখেছি, আমরা নিশ্চিত যে, তার কোনোটাতেই এ ধরনের কোন কথা নেই। প্রবন্ধে যে গ্রন্থগুলোর বরাত দেওয়া হয়েছে এখানে সেগুলোর নাম উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে, কোনো পাঠক চাইলে যেন নিজে খুলে দেখতে পারেন–

১. 'আলজামে লি আহকামিল কুরআন', কুরতুবী, খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ৫৭
২. 'আলইতকান', সুয়ূতী, অধ্যায় : ১, ১৯, ২৮, ৫৯, ৬২, ৬৩
৩. Kleinere schriften, by H. L. Fleischer, Vol : 1, Page no : 619, Footnote : 2
৪. The Foreign Vocabulary of the Quran, by Arthur Jeffery, Page no : 72-73
৫. Die Verszahlung des Koran, by Anton Spitaler, Munchen (1935)
৬. Das Wort OTH als "Offenbarungszeichen Gottes" by Carl A. Keller, Basel- Buchdruckerei E. Hoenen (1946)
৭. Introduction to the Quran, by Rechard Bell, Page no : 153- 154

মূল ইংরেজিতে ইবনে মনযূরকৃত 'লিসানুল আরবে'র বরাতও ছিল। এই মোট আটটি গ্রন্থ হল। এর কোনোটিতেই না এ কথা আছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬, আর না কোনোটিতে মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর নাম এসেছে। বরং ৫ নং বইটির ২৮ পৃষ্ঠায় অনুসৃত ও স্বীকৃত সাত গণনা পদ্ধতির প্রতিটির মোট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যার সর্বনিম্ন সংখ্যা ৬২০৪ আর সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬২৩৬।

আর ৭ নং বইটির যে সংস্করণ লেখকের ছাত্র W. Montgomery Watt প্রকাশ করেছে তার ২০৬-২১৩ পৃষ্ঠায় সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রতিটি সূরার আয়াত সংখ্যা উল্লেখসহ বিস্তারিত তালিকা দেওয়া আছে। যা মুসহাফে মিসরীর মোতাবেক (অর্থাৎ যার মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়াবে ৬২৩৬)।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, উপরোক্ত আটটি গ্রন্থের কোনোটিতেই না ৬৬৬৬ এর উল্লেখ আছে, আর না এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর নাম এসেছে।[৩১]

প্রশ্ন হল, নযরে ছানীর সময় ফাউন্ডেশন এ কথাটি কেন বাড়াল, কোত্থেকে তারা তা বাড়াল? মূলের উপর তারা যখন কিছু বাড়াল তখন তাদের তো উচিত ছিল এর বরাত দেওয়া কিন্তু তারা কোন বরাত উল্লেখ করেননি। প্রবন্ধের শেষে বরাত তো সেগুলোই যা মূল ইংরেজিতে ছিল। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এ বরাতগুলোতে উম্মুল মুমিনীনের দিকে সম্বন্ধকৃত এ কথা নেই।

১৯৩৩ সালে কায়রো থেকে লাইডেনের এই বিশ্বকোষটির আরবী অনুবাদ বের হয়। এর দ্বিতীয় এডিশন বের হয় ১৯৬৯ এ। সেখান থেকে এ প্রবন্ধ পড়া হল, কিন্তু সেখানেও এ কথা নেই।

লাহোর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত শানদার এনসাইক্লোপেডিয়া দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া, যা থেকে ফাউন্ডেশনের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ উভয়টিতে প্রচুর তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও এরূপ কোন কথা নেই। 'আয়াত' শিরোনামের প্রবন্ধেও নয়, 'কুরআন মাজীদ' শিরোনামের প্রবন্ধেও নয়। দেখুন–

ক. Shorter Encyclopedia of Islam, Leiden, E.J. Brill

খ. The Encyclopedia of Islam, Leiden, E.J. Brill

গ. দায়েরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া, কায়রো, ১৯৬৯; খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৫

ঘ. উর্দূ দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া, দানেশগাহ পাঞ্জাব লাহোর, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৪-৩২৬, প্রবন্ধ শিরোনাম : 'আয়াত', দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৪২২ হি. মোতাবেক ২০০২ ইং এবং খণ্ড : ১৬/১, পৃষ্ঠা : ৩১৮-৬১৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২৫ হি. মোতাবেক মার্চ ২০০৪ ইং

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ সংশোধন-পরিমার্জনের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা তাহকীকের হক আদায় করেননি। অসতর্কতাকে পুঁজি বানিয়ে পরিমার্জন করতে গিয়ে একটি ভিত্তিহীন কথা যোগ করে দিয়েছেন এবং কথাটির উৎস-বরাতও উল্লেখ করেননি। বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ পরিমার্জনের কাজে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ মরহুমও ছিলেন। তার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি তার প্রবন্ধ সমগ্র 'কুরআন প্রসঙ্গে' এ কথাটি বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে মত দিয়েছেন। তাই মনে হচ্ছে এই ভুলটি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নযরে ছানী করার সময় হয়েছে। ১৯৮২ এর সম্পাদনা পরিষদ এবং ২০০৭ এর সম্পাদনা পরিষদের মধ্যে যারা এখনও জীবিত আছেন আমরা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তারা কেউ বলতে পারেননি যে, এ কথাটি কার পরামর্শে এবং কিসের ভিত্তিতে যোগ করা হয়েছে। বোঝা গেল ৬৬৬৬ এই সংখ্যা উল্লেখ করার জন্য এবং তা উম্মুল মুমিনীনের দিকে নিসবত করার জন্য সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষকে দলীল বানানো নিরর্থক। কারণ তা একটি ভিত্তিহীন কথার ভিত্তিহীন হাওয়ালা।

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে এ কথা একবার ছেপে যাওয়ায় তা পরবর্তীদের জন্য 'হাওয়ালা' (বরাত) হয়ে গেছে। যারা যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্যতা রাখেন না বা যাচাই-বাছাইয়ে অভ্যস্ত নন, এমনিভাবে যারা কোথাও হাওয়ালা ও বরাত দেখলে সরাসরি বরাতগ্রন্থ থেকে বিষয়টি খুলে দেখার কষ্ট স্বীকার করেন না, তারা কোন ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঐ ধরনের কথা ও হাওয়ালাকেও একটি স্বীকৃত বিষয় হিসেবে কবুল করে নেন যেগুলোতে যাচাই-বাছাই ও মূলগ্রন্থ খুলে দেখার দরকার পড়ে।

পরবর্তীতে যখন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকেই বড় ইসলামী বিশ্বকোষ তৈরি করা হয়েছে তখন প্রবন্ধকাররা এই ভুল কথা ও ভুল নিসবতটাই উল্লেখ

---

[৩১] উক্ত সূত্রগুলোর মধ্যে অন্য ভাষার বইগুলোর পিডিএফ বা মূল কপি সংগ্রহ করে দিয়েছে মাহদী (নিউইয়র্ক), উসমান (হাউস্টন, টেক্সাস) ও সাঈদুল হক। জার্মান ভাষার বইগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির যাচাই করে দিয়েছেন আমাদের ছাত্র আবদুল্লাহ সুহাইবের ভাগ্নি ও ভাগ্নির জার্মান বান্ধবী Selma Heinig। Selma Heinig তার রিপোর্টে লিখেছেন, Neither the number 6666, nor Aisha radiallahu anha, have been mentioned। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

করে দিয়েছেন। আর হাওয়ালা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন হাওয়ালা উল্লেখ না করে, শুধু সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের কথা বলে দেওয়া হয়েছে!! এরপর যখন আল কুরআন বিশ্বকোষ তৈরি করা হয়েছে সেখানেও এই ভুল কথা ও ভুল নিসবত উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। আর হাওয়ালা হল- 'ইসলামী বিশ্বকোষ' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৭। অর্থাৎ একটি ভিত্তিহীন কথার ভিত্তিহীন হাওয়ালার উপর ভিত্তি করে আরেকটি ভিত্তিহীন হাওয়ালা। আশা করছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই বিশ্বকোষগুলোর পরবর্তী এডিশনে এই ভুলটি সংশোধন করে দেবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরও কিছু ভিত্তিহীন বরাত

১. 'জামালুল ফুরকান', পৃষ্ঠা : ৫৮
আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৬০ জামেয়া মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

এই পুস্তিকায় আলোচিত ভিত্তিহীন সংখ্যাটিকে (৬৬৬৬) উম্মুল মুমিনীনের দিকে নিসবত করা হয়েছে। এরপর এই সংখ্যাটিকে 'রাজেহ' মত দিয়ে বন্ধনীতে শুধু এটুকু লেখা হয়েছে (ইবনে কাছীর)। না কোন কিতাবের নাম, না খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরের উল্লেখ। অথচ ইবনে কাছীর রহ. এর তাফসীরে ইবনে কাছীর, তারীখে ইবনে কাছীর, ফাযায়েলুল কুরআন ও জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান প্রভৃতি গ্রন্থে এ কথা নেই। ইবনে কাছীরের অন্য কোন কিতাবেও এ কথা নেই। অন্য কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেও এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর রহ. এর কোন হাওয়ালা আসেনি। কেউ যদি ইবনে কাছীর রহ. এর কোন কিতাব থেকে এই হাওয়ালার যথার্থতা দেখাতে পারেন, আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

২. 'আহসানুল বয়ান ফি উলূমিল কুরআন', ড. হাসানুদ্দীন আহমদ, প্রকাশক : ইসলামিক বুক সার্ভিস, নয়াদিল্লি, প্রকাশকাল : ২০১০ ইং

এ কিতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় সেই ভুল সংখ্যা ও উম্মুল মুমিনীনের দিকে ভুল নিসবত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন হাওয়ালা নেই। অধ্যায়ের শেষে বা গ্রন্থের শেষে কোন গ্রন্থপঞ্জিও নেই। কমপক্ষে একজন ডক্টর থেকে এমন হওয়া উচিত ছিল না।

এখন মনে এল 'আহসানুল বয়ানে'র কথা এখানে উল্লেখ না করা দরকার ছিল। কারণ এই লেখক ভিত্তি ছাড়া কথাটি হাওয়ালা ছাড়া লিখেছেন। কোন ভিত্তিহীন হাওয়ালার হাওয়ালা দিয়ে লেখেননি। এরপরও এ কারণে এর উপর সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল যে ডক্টরের লেখা গ্রন্থ হওয়ার কারণে না আবার কেউ একে দলীল মনে করে বসে। অথচ তার অবস্থা হল, তিনি বসরী গণনার 'মাদার' বা ভিত্তি-ব্যক্তিত্বের নাম 'আসেম ইবনে 'আজ্জাজ' এর জায়গায় লিখেছেন আসেম ইবনে হাজ্জাজ এবং লিখেছেন যে, ইনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন এরপর তার গণনা সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ৬২১৬। অথচ এই আসেম ছিলেন তাবেয়ী। তাঁর ইন্তেকাল ১২৮ হি. আর তাঁর গণনা সংখ্যা ৬২০৪ বা ৬২০৫ (৬২১৬ নয়) যেমনটি পূর্বে হাওয়ালাসহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদ্রূপ ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'শামের মুসলিমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর অনুসরণ করত যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। এ মতানুসারীদের মতে কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৫০।'

সাহাবায়ে কেরামের যুগের ইতিহাস, ইসলামী শহরসমূহের ইতিহাস এবং ইলমে আদাদ সম্পর্কে দুই বাক্যের একটি ইবারাতে যেখানে এতগুলো স্পষ্ট ভুল পাওয়া যায় সেখানে যদি ছয় ছয়ের সংখ্যাটির ভুল নিসবতসহ উল্লেখ করা হয় তাহলে আর তা আশ্চর্যের কী?

ভিত্তিহীন কওলের অন্যায় তরফদারি

আফসোসের বিষয় হল, আমাদের দেশের কিছু কিছু লোক এই ভুল সংশোধন না করে তার অন্যায় তরফদারিতে নেমেছে। উদাহরণত-

১. একজন তার মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে এক জায়গায় আয়াত সংখ্যায় যে বিভিন্নতা দেখা যায় তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তা লিখন পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে হয়েছে। আমার যতটুকু জানা, একথাটি একেবারেই 'আজনবী' ও আনকোরা একটি কথা। আমার জানামতে ইলমে আদাদ, ইলমে কেরাআত এবং উলূমুল কুরআনের কোন ইমাম এমন কথা বলেননি। এ কথা যেমন সূত্রহীন তেমনি তা বাস্তবতাবিরুদ্ধও। তাছাড়া সকল ইসলামী শহরে মুসহাফ লেখার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে মুসহাফ লেখার ক্ষেত্রে মুসহাফে উছমানীর লিপিশৈলীই (رسم الخط) অনুসরণ করা হবে। তাই লিপিশৈলী যদিও বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন রকম ছিল কিন্তু মুসহাফ লেখার জন্য শুধু মুসহাফে উসমানীর লিপিশৈলীই মুতাওয়ারাছ এবং মুতালাক্কা বিল কবুল তথা অনুসৃত ও উম্মাহ কর্তৃক গ্রহণীয় ছিল। তাই লিপিশৈলীর বিভিন্নতার কারণে আয়াত গণনা পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হয়েছে- এ কথা একেবারেই ভুল। গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতার মূল কারণ- যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- তাওকীফ; আর কিছু নয়।

সামনে গিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তার কলম থেকে কীভাবে তা বের হল বুঝে আসছে না। সে কথাটিকে শুধু বাস্তবতাবিরুদ্ধ বললে কম বলা হবে। তিনি লিখেছেন, 'হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কোরআন শরীফে আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬ খানা।'

অথচ কুরআন সংকলনের ইতিহাস এবং উসমান রা. কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুসহাফসমূহ সম্পর্কে যার সামান্য পড়াশোনাও আছে তিনি জানেন যে, এই মুসহাফসমূহে সূরাসমূহের শুরুতেও মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ ছিল না এবং আয়াতের শুরুতে বা শেষেও কোন চিহ্ন লাগানো হয়নি। যদি মুসহাফে উসমানীতে প্রতি আয়াতের শেষে আয়াত সমাপ্তির চিহ্ন লাগানো থাকত, তাতে প্রত্যেক সূরার শুরুতে সেই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা থাকত তাহলে সকল ইসলামী শহরে তারই প্রচলন ঘটত। ইলমে আদাদ, ইলমে কেরাআত এবং উলূমুল কুরআনের সকল ইমামের এ ব্যাপারে ইজমা ও ঐকমত্য থাকত, যেমনিভাবে মুসহাফে উসমানীর লিপিশৈলীর ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে। মুসহাফে উসমানীতে আয়াতের সমাপ্তির চিহ্ন না লাগানো এবং প্রত্যেক সূরার শুরুতে আয়াতের মোট সংখ্যা উল্লেখ না করার একটি বড় হিকমত তো এই ছিল যে, আয়াত গণনা পদ্ধতিতে বিভিন্নতা শুরু থেকেই ছিল। আর এই বিভিন্নতার উৎস ও 'আসল' (أصل) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীম ও শিক্ষাতেই ছিল। তাওকীফে নববীর উপর ভিত্তি করেই এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের তা'লীমে বিভিন্নতা ছিল। সুতরাং 'সুন্নাহ' দ্বারা প্রমাণিত এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মুতালাক্কা বিল কবুল বিভিন্ন গণনা পদ্ধতিকে বাতিল করে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি, যা অনুসৃত ও স্বীকৃত তা ঐ ইসলামী শহরসমূহের ইমামদের মাধ্যমেই উত্তর-প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে যে শহরসমূহে উসমান রা. একজন প্রশিক্ষকসহ এক কপি করে মুসহাফ পাঠিয়েছেন। মক্কা, শাম, কুফা এবং বসরা এই শহরগুলোতে একজন করে মুয়াল্লিমসহ এক কপি করে মুসহাফ তিনি পাঠিয়েছিলেন। মদীনায় এক কপি রেখে দিয়েছিলেন। আর নিজের কাছে রেখেছিলেন এক কপি। এই সবগুলোই মুসহাফে উসমানী এবং সবগুলোই তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদি এই মুসহাফগুলোতে আয়াত গণনার বিশেষ কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হত এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা হত ৬৬৬৬ তাহলে সাহাবা-তাবেয়ীন ও পরবর্তী ইমামদের মাঝে এ বিষয়ে বর্ণনা বিভিন্ন হওয়া সম্ভবই ছিল না। তাহলে সকল ইসলামী শহরে, কুরআন ও উলূমুল কুরআনের সকল মারকাযে একটি গণনা পদ্ধতির উপরই আমল করা হত এবং আমরা কূফী সংখ্যা, বসরী সংখ্যা ও মক্কী সংখ্যা এ ধরনের শব্দই শুনতাম না। হায় ঐ পত্রিকার লেখক যদি নিজের আবিষ্কৃত এ কথার স্বপক্ষে একটি ভিত্তিহীন হাওয়ালাও উল্লেখ করতে পারতেন!

অন্যত্র একজন প্রশ্ন করেছেন,

"কোরআন শরীফের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ না ৬২৩৬? এমদাদিয়া ও আশরাফিয়া লাইব্রেরীর ছাপা কোরআন শরীফে দ্বিতীয় সংখ্যাটি দেয়া হয়েছে। গণনায়ও তাই পেলাম। কিন্তু ইসলামী বইয়ে পড়েছি, আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ খানা। আসলে সংখ্যাটি কত?"

উত্তরে তিনি লিখেছেন,

"পবিত্র কোরআনের আয়াত সংখ্যার বিষয়টা মোটেও বিতর্কিত নয়। দু'টি সংখ্যা দাঁড়িয়েছে গণনার বিভিন্নতার কারণে। মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার ছয়শত ছিষট্টি খানা। সূক্ষ্ম গণনায় এ সংখ্যাই পাওয়া গেছে। কেউ কেউ ছোট ছোট একাধিক আয়াত পৃথকভাবে গণনা না করে দুই বা তিন আয়াতকেও এক আয়াত ধরেছেন। এভাবেই আয়াতসংখ্যা কারও কারও গণনায় কমে গেছে।"

এ কথা তো শতভাগ ঠিক যে, আয়াত সংখ্যার বিভিন্নতা শুধু আয়াত গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণেই হয়েছে। কিন্তু এই গণনা পদ্ধতি শুধু রায়ের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আবিষ্কার করা কিছু ছিল না। বরং যেমনটি পূর্বে শাস্ত্রের ইমামদের হাওয়ালায় বলা হয়েছে, গণনা পদ্ধতির ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণই তাওকীফে নববী ও তা'লীমে সাহাবার উপর। কিন্তু এ কথা বলা যে, সূক্ষ্ম গণনা পদ্ধতিতে গণনা করার পর আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ই হয়- একেবারে ভিত্তিহীন কথা। তার বলা উচিত ছিল এই সূক্ষ্ম পদ্ধতি খায়রুল কুরূনের কোন্ ইসলামী শহরের ইমামদের মাঝে প্রচলিত ছিল। এ গণনা পদ্ধতি কোন্ সাহাবী থেকে প্রাপ্ত। এ গণনা অনুসারে আয়াতের সূচনা ও শেষে কে চিহ্ন লাগিয়েছে এবং কোন্ মুসহাফে তা লাগানো হয়েছে। ইলমে আদাদ সম্পর্কে লিখিত শতাধিক গ্রন্থাবলীর কোন্ গ্রন্থে বা পুস্তিকায় এ গণনা পদ্ধতির উল্লেখ আছে। যিনি এ ধরনের একটি গণনা পদ্ধতির কথা দাবী করেছেন তিনি নিজে কি সে পদ্ধতি অনুসারে আয়াতের সূচনা ও শেষ নির্ধারণ করে দেবেন?

তিনি যে মুসহাফ দেখে তেলাওয়াত করেন সেই মুসহাফে কি এই সূক্ষ্ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে? তিনি যে মুসহাফ সামনে রেখে কুরআনুল কারীমের তরজমা করেছেন এবং তাফসীরের যে অনুবাদ করেছেন তাতে কি এই গণনা পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে না কূফী গণনা পদ্ধতি?

তার অনুবাদকৃত তাফসীরে যে মুসহাফ প্রদত্ত হয়েছে তার প্রত্যেক সূরার শুরুতে এবং অনুবাদে প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লেখা হয়েছে তা একত্রিত করলে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়াবে ৬২৩৬, ৬৬৬৬ নয়।

সূক্ষ্ম গণনা পদ্ধতির কথা তো ভিন্ন, কোন সাধারণ গণনা পদ্ধতি অনুসারেও এ সংখ্যা (৬৬৬৬) সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। যেমনটি পূর্বে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু ইলমের আমানত আদায়ের জন্য এবং খায়ের খাহি ও কল্যাণকামিতার প্রেরণা নিয়েই এ কথাগুলো লেখা হয়েছে। নতুবা আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি অনেক শ্রদ্ধা আছে। উম্মতের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে যে আজিমুশ শান খেদমত তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন তার ব্যাপারে আমার মনে যথেষ্ট কদর আছে।

এই আলোচনায় যে তাঁর সতর্কতার প্রকাশ ঘটেনি তার একটি দলীল এও যে, তিনি আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. এর কিতাবের নাম লিখেছেন 'বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন' অথচ আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. এর কিতাবের নাম 'বুস্তানুল আরেফীন' বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন নয়; বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন তো শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রহ. এর কিতাব। সে কিতাবে আয়াত সংখ্যার আলোচনা কোথায়?

এরপর তিনি বলেছেন, 'বুস্তানে' আয়াত সংখ্যার পুরো বহছ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ কর্তৃক বয়ানকৃত। অথচ 'বুস্তানে' আয়াত সংখ্যার আলোচনায় আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ'র নামও আসেনি। তার হাওয়ালা তো এসেছে শব্দ সংখ্যা ও হরফ সংখ্যার আলোচনায়।

আগবেড়ে তিনি এ কথাও লিখে দিয়েছেন, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইলমে তাজবীদের ইমাম। জানা নেই এ কথা তিনি কোথায় পেয়েছেন। আমরা তো তাজবীদ ও কেরাআতের একজন সাধারণ আলেম হিসেবেও তার নাম পাইনি।

এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, তিনি বুস্তানের হাওয়ালায় আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে এমন কথা নকল করেছেন যা বুস্তানে নেই। তিনি বুস্তানের হাওয়ালায় নকল করেছেন,

"কোরআন শরীফের আয়াতসংখ্যা সর্ব-সম্মতিক্রমে ৬৬৬৬ খানা। সাহাবী ইবন মসউদের (রা.) মতে ৬২১৮ খানা, মদীনাবাসিগণের মতে ৬২১৪ খানা, শামবাসীদের মতে ৬৬৫০ খানা, বসরাবাসীদের মতে ৬৬১৬ খানা, কূফাবাসীদের মতে ৬৬৩২ খানা।"

অথচ যদি ৬৬৬৬ সবার ঐকমত্যপূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., মদীনার সকল ইমাম, শাম, বসরা এবং কুফার সকল ইমামের আলাদা আলাদা সংখ্যা কোত্থেকে এল? তাঁদের গণনা সংখ্যা যদি আলাদা হয় তাহলে আর অন্য সংখ্যা 'ঐকমত্যপূর্ণ' হয় কীভাবে?

আসলে তিনি এখানে عامة শব্দকে جميع (সর্বজন) ও اجماع (ঐকমত্যপূর্ণ) এর অর্থে ধরেছেন। অথচ শব্দটি এখানে عوام বা আম মানুষের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (এবং কারী আবুল হাসান আ'যমী দামাত বারাকাতুহুমের ভাষায় 'জাহেলদের' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

তিনি আহলে শামের গণনা সংখ্যা লিখেছেন ৬৬৫০, যা ভুল। 'বুস্তানে' আহলে শামের গণনা সংখ্যা লেখা হয়েছে ৬২২৬ এবং সেটাই সঠিক। তিনি আহলে বসরার গণনা সংখ্যা লিখেছেন ৬৬১৬, এটাও ভুল। 'বুস্তানে' আহলে বসরার সংখ্যা লেখা হয়েছে ৬২০৪ এবং সেটাই সঠিক। আহলে কুফার গণনা সংখ্যা লিখেছেন ৬৬৩২, এটাও ভুল। 'বুস্তানে' আহলে কুফার গণনা সংখ্যা লেখা হয়েছে ৬২৩৬, এবং এটাই সঠিক। সম্ভবত সংখ্যার এই ভুলগুলো প্রুফের ভুলের কারণে হয়েছে। আমার শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, এই পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, যা পরবর্তীতে কুরআন বিষয়ক প্রশ্নোত্তর সমগ্রতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা তাকলীদযোগ্য তো নয়ই হাওয়ালাযোগ্যও নয়। কারণ তা বাস্তবতার পরিপন্থী।

এমনিভাবে সেখানে আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর হাওয়ালায় বিষয়বস্তু অনুসারে কুরআনুল কারীমের যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'বুস্তানে' একেবারেই নেই, না আবদুল আযীযের হাওয়ালায় না অন্য কারো হাওয়ালায়। আর এমনিতে সে সংখ্যাগুলো বাস্তবতা সমর্থিতও নয়।

২. এই পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায়[৩১] অন্য একজন লেখক এই ভিত্তিহীন সংখ্যাটির এই বলে তরফদারি করেছেন যে আয়াত সংখ্যা গণনার পদ্ধতিগত বিভিন্নতার কারণে মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। জালালাইনে প্রত্যেক সূরার শুরুতে আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন কওল লেখা হয়েছে। তার আলোকে পুরো কুরআনের আয়াত সংখ্যা শুমার করতে গেলে একাধিক সংখ্যা বেরিয়ে আসবে এটাই স্বাভাবিক। আর সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যেই সবচেয়ে বড় সংখ্যা হল ৬৬৬৬। তিনি লিখেছেন, আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে সকল মতামত সামনে রেখে নতুন করে যদি গণনা করা হয় তাহলে আরও অনেক ধরণের সংখ্যা বের হতে পারে। এটা একেবারে সাধারণ বিষয়। এটা একান্তই স্বাভাবিক এবং এটা পুরনো তথ্যেরই ফলাফল—নতুন কিছু নয়।

---

[৩১] এই সংখ্যাটি দশ-বারো বছর আগে আমার ভাই হাফেয মাওলানা আবদুল মাজীদ আমাকে দিয়েছিল। এই পত্রিকা থেকেই আমি আফগানী রহ. এর সেই ইবারত সম্পর্কে জানতে পারি যার সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সব ক্ষেত্রে উন্নতি ও বরকত দান করুন। আমীন।

এ সম্পর্কে আদবের সাথে শুধু তিনটি কথা আরজ করব–

এক. শুধু জালালাইন নয়, যে কোন নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত তাফসীরের কিতাবে সূরার শুরুতে মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে যত কওল উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে কোন কওল হিসেবেই মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ হয় না। যে সূরাগুলোর মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে গণনার বিভিন্নতার কারণে সংখ্যার পার্থক্য পাওয়া যায় সেখানে জালালাইনে তো সাধারণত দুটি সংখ্যাই উল্লেখ করা হয়, কখনো কখনো তিনটি সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। আমরা সেই সবগুলি কওল সামনে রেখেই হিসাব করেছি। সব কওল অনুযায়ীই মোট আয়াত সংখ্যা অনুসৃত ও স্বীকৃত সংখ্যাগুলোর মধ্যেই থাকে। অর্থাৎ ৬২৩৬ বা তার চেয়ে কম। ছয় ছয়ের কোন নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। আমরা আরও কিছু তাফসীর থেকে আয়াত সংখ্যা হিসাব করেছি। সবগুলোর ফলাফল এরকমই বের হয়।

প্রশ্ন হল, তিনি যে মুসহাফ দেখে তেলাওয়াত করেন, মানুষ যে মুসহাফ দেখে তেলাওয়াত করে তাতে কূফী গণনা পদ্ধতি অনুসারে আয়াত নম্বর লাগানো হয়েছে যার সমষ্টি দাঁড়ায় ৬২৩৬। তা উল্লেখ না করে আপনি যদি অন্য কোন স্বীকৃত সংখ্যা উল্লেখ করতেন তবুও আপত্তি উঠত যে, যে সংখ্যা অনুযায়ী আমল চলছে তা রেখে অন্য সংখ্যা উল্লেখের কী অর্থ? একটি সংখ্যাই যখন উল্লেখ করবেন তখন সেই সংখ্যাটিই উল্লেখ করুন যে সংখ্যা অনুসারে আপনাদের এখানে বরং গোটা ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ মুসহাফে আয়াতের চিহ্ন ও নম্বর লাগানো হয়েছে। কিন্তু আপনি না সেই সংখ্যা উল্লেখ করেছেন আর না অন্য কোন অনুসৃত ও স্বীকৃত সংখ্যা। আপনি এ সব কিছুকে ছেড়ে শুধু ধারণার ভিত্তিতে একটি ভিত্তিহীন সংখ্যার (৬৬৬৬) তরফদারি করছেন। সোজা পথ হল, তিনি যদি যে কোন তাফসীরের কিতাব থেকে তাতে সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হিসাব করে অথবা ইলমে আদাদ বা ইলমে কেরাআতের যে কোন কিতাব থেকে তাতে যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হিসাব করে ৬৬৬৬ সংখ্যাটি বের করে দিতেন তাহলে কথা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এ তো কখনো সম্ভব হবার নয়।

আর যদি যেমনটি তিনি ইশারা করেছেন, বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি তালফীক করে (জোড়াতালি দিয়ে) অনেক সংখ্যা বের করা সম্ভব তো এ ব্যাপারে কথা হল, প্রথমত এই তালফীকের পদ্ধতি তা'লীমে সাহাবা, আহলে ফনের ইজমা এবং উম্মতের আমলে মুতাওয়ারাছ এর বিপরীত হওয়ার কারণে নাজায়েয হবে। দ্বিতীয়ত যদি এরূপ করাও হয় তো পূর্বে বাস্তবতার আলোকে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, নব উদ্ভাবিত কোন পন্থায়ও এই ছয় ছয়ের সংখ্যা পুরা করা যায় না।

এ কথাগুলোও শুধু আমানতে ইলম রক্ষার জন্য লেখা হয়েছে। লেখকের প্রতি আমার অন্তরে যে আযমত ও মহব্বত আছে তা আল্লাহই জানেন।

৩. একটি প্রকাশনী থেকে 'কেরাআতুল কুরআন নূরানী কুরআন শরীফ' শিরোনামে প্রকাশিত একটি মুসহাফের শুরুতে এই দাবী করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে ৬৬৬৬ টি আয়াত। কিন্তু মুহাক্কিক আলেমগণ কোন কোন স্থানে দুই আয়াতকে এক আয়াত বলার কারণে উপরোক্ত সংখ্যাটি এখন নেই। কিন্তু আয়াত সবই আছে। যদিও আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

এ দাবীতে পরোক্ষভাবে এই দাবীও রয়েছে যে, পূর্বে মুসহাফে যেভাবে আয়াতের চিহ্ন লাগানো হয়েছিল তাতে মোট আয়াত সংখ্যা হত ৬৬৬৬। কিন্তু পরবর্তীতে কোথাও কোথাও দুই আয়াতকে এক আয়াত ধরে গণনা করায় আয়াত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২৩৬।

এই প্রকাশনীর দায়িত্বশীলদের খেদমতে আদবের সাথে প্রশ্ন করছি–

ক. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর নামে যে কথা লেখা হয়েছে তার সনদ কোথায়? অথবা অন্তত পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য হাওয়ালা?

খ. সেই মুসহাফ কোথায় বা সেই মুসহাফের আলোচনা কোথায়, যেখানে এমনভাবে আয়াত সমাপ্তির চিহ্ন লাগানো হয়েছে যে, সে অনুযায়ী মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬৬৬।

গ. কোন্ মুহাক্কিক আলেমগণ কোথাও কোথাও দুই আয়াতকে এক আয়াত ধরে গণনা করেছেন? তাঁরা কারা এবং কোন্ কালের? কিসের ভিত্তিতে তারা এ কাজ করেছেন? ঐ দুই দুই আয়াত কোনগুলো যেগুলোকে তারা এক আয়াত ধরে গণনা করেছেন? এ বিষয়গুলো নির্ভরযোগ্য হাওয়ালাসহ লেখা উচিত ছিল।

এটা কত আফসোসের কথা যে, একটি ভিত্তিহীন সংখ্যাকে আসল সংখ্যা গণ্য করা হয়েছে আর যে আয়াত সংখ্যা মুসহাফে আছে, যা সাহাবা যুগ থেকে চলে আসছে, যার ভিত্তি তাওকীফে নববী হওয়ার ব্যাপারে এবং যা মা'ছুর ও মুতাওয়ারাছ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে, সেই সংখ্যাকে পরবর্তীতে উদ্ভাবিত একটি সংখ্যা গণ্য করা হচ্ছে। সাথে সাথে এই অপবাদও আরোপ করা হচ্ছে যে, এই গণনা পদ্ধতিতে কতেক আলেম

কর্তৃক নতুন গণনা পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণে এই সংখ্যাটি (৬২৩৬) সৃষ্টি হয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

فيا أسفا عليكم كيف رضيتم بعدٌ وعدد، عما في زعمكم محدثان مخترعان ورضيتم بهما في المصحف الكريم! وأنتم تحاربون البدعة وأهلها في زعمكم!! إنا لله وإنا إليه راجعون!

পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ

এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে অতিরিক্ত আরও কিছু বিষয়সহ তার সারসংক্ষেপ হল–

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনুল কারীমের পাঠ ও তেলাওয়াত শিক্ষা দান করেছেন।

২. সাহাবায়ে কেরাম ফাওয়াসেলে আয়াত বা আয়াতের সূচনা-শেষ কোথায় এই বিষয়টিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকেই শিখেছেন।

৩. এই ইলম অর্থাৎ আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণের ইলম (পরবর্তীতে যার শাস্ত্রীয় নাম হয়েছে علم الفواصل যাকে علم العدد অথবা علم عدد الآيات القرآني ও বলা হয়) সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে তাবেয়ীগণ শিখেছেন এবং তাদের কাছ থেকে তাবে-তাবেয়ীগণ শিখেছেন।

৪. তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগেই ইলমুল ফাওয়াসেল সম্পর্কে বড় বড় ইমাম ও শাস্ত্রজ্ঞ তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। যারা এই শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক কিতাবও লিখেছিলেন। পরবর্তীযুগে এই শাস্ত্রে কিতাব রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি এক সময় এই শাস্ত্রে লিখিত গ্রন্থসংখ্যা শত অতিক্রম করে যায়। এ ছাড়া ইলমুল কেরাআত এবং উলূমুল কুরআন সম্পর্কে লিখিত অসংখ্য কিতাবাদিতে এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ থাকে। এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধও আছে অনেক।

এ শাস্ত্রে এত গ্রন্থ রচিত হওয়ার কিছু কারণ হল– ক. বিষয়ের গুরুত্ব, খ. আগের কালে আয়াতের শুরু ও শেষ কোথায় তার জন্য মুসহাফে কোন চিহ্ন লাগানো হত না। যারা তিলাওয়াত শিখত তারা তেলাওয়াত শিক্ষার পাশাপাশি আয়াতের শুরু ও শেষ কোথায় তাও শিখত ও মনে রাখত। তখনকার সময়ের অধিকাংশ লোক আরবী ভাষা জানার কারণে এবং কুরআনের শৈলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকার কারণে তাদের জন্য তা সহজ ছিল। তা সত্ত্বেও সতর্কতাবশত অনেক শিক্ষক তার ছাত্রদের প্রত্যেক সূরার প্রত্যেক আয়াতের শেষ শব্দ লিখিয়ে দিতেন। কিংবা তিনি নিজে এ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা লিখে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তারা পুস্তিকার শুরুতে এই শাস্ত্রে তার ও তার উস্তাযগণের সনদ কী তাও উল্লেখ করে দিতেন।

পরবর্তীতে যখন আয়াতের সমাপ্তিতে চিহ্ন লাগানোর পন্থা চালু হল তখনও শত শত বছর পর্যন্ত ঐ চিহ্নের সাথে আয়াতের নম্বর লেখার ধারা চালু হয়নি। পূর্বোক্ত সতর্কতার ধারা অব্যাহত রেখে পরবর্তী যুগের ইলমে আদাদের আলেম ও ইমামগণ মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি এই শাস্ত্রে রচনার ধারাও অব্যাহত রাখেন। আয়াতের শেষে নম্বর লাগানোর পদ্ধতি চালু হওয়ার পরও সে ধারা কম বেশি জারি ছিল।

৫. ঐ অনুসৃত গণনা সংখ্যাগুলির সংক্ষিপ্ত বয়ান নিম্নরূপ–

১. মাদানী আওয়াল : ৬২১৭
২. মাদানী দুওম : ৬২১৪; অন্য বর্ণনায়: ৬২১০
৩. মক্কী : ৬২১৯
৪. শামী (দামেশকী) : ৬২২৬
৫. হিমসী : ৬২৩২
৬. বসরী : ৬২০৪
৭. কূফী : ৬২৩৬

এই সবগুলো সংখ্যাই মুতাওয়ারাছ ও মুতালাক্কা বিল কবুল তথা অনুসৃত ও সর্বজনগৃহীত। তবে চতুর্থ শতকের পর হিমসী সংখ্যাটির ধারা আর চালু থাকেনি।

৬. এই সংখ্যাগুলোর মাঝে আগেকার সময়েও সব চেয়ে বেশি মুতালাক্কা বিল কবুল ছিল কূফী সংখ্যাটি। এখনও এই সংখ্যার উপরই আমল চলছে বেশি। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে কূফী সংখ্যা অনুসারে আয়াতের শেষে নাম্বার লাগানো মুসহাফই অধিক। আর আমাদের এই উপমহাদেশে শুধু কূফী সংখ্যা অনুসারেই আয়াতের শেষে নম্বর লাগানো হয়। কোন কোন অঞ্চলে যদিও মাদানী দুওম ও শামী সংখ্যা অনুসারে মুসহাফ পাওয়া যায় তবে সেখানেও কূফী সংখ্যা অনুসারে প্রস্তুতকৃত মুসহাফই বেশি।

৭. এই সংখ্যাগুলোর মাঝে যে সামান্য ভিন্নতা দেখা যায় তার মূল কারণ গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতা। আর এই বিভিন্নতার ভিত্তিও তাওকীফে নববী এবং তা'লীমে সাহাবা তথা রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের শেখানো পদ্ধতি। প্রবন্ধের শুরুতেই এই হাকীকতকে উদাহরণসহ ভালোভাবে স্পষ্ট করা হয়েছিল। কেউ চাইলে নিজেও তা দেখতে পারে। শামী সংখ্যা এবং মাদানী দুওম এর গণনা অনুসারে ছাপা মুসহাফ ইন্টারনেটে আছে। সেখান থেকে তা পড়া যাবে। কূফী সংখ্যা অনুসারে মদীনার কারী (যিনি সাত কারীর একজন গুরুত্বপূর্ণ কারী) ইমাম নাফে মাদানীর কেরাআত সম্বলিত মুসহাফ আমাদের কাছেও আছে যা অন্যান্য অকাট্য ও স্পষ্ট দলীলের পাশাপাশি এ কথার একটি উজ্জ্বল দলীল যে, আয়াত গণনা করার অনুসৃত ও স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোর মাঝে যে ভিন্নতা দেখা যায় তা আয়াত কম-বেশি হওয়ার কারণে নয়; বরং গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হওয়া শুধু সংখ্যার কম-বেশ।

৮. এ কথা একেবারে নিশ্চিত যে, 'আলইতকানে' উল্লেখিত একটি রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর দিকে যে কথা সম্বন্ধ করা হয়েছে যে, তার মতে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬১৬, সেই রেওয়ায়েতটি মুনকার, মা'লুল এবং মুসাহহাফ (مصحف) এবং এই সংখ্যাটি একেবারেই বাস্তবতা বিরোধী।

৯. এ কথা আরও নিশ্চিত যে, মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে ৬৬৬৬ এর যে সংখ্যাটি আমাদের এই উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ তা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বাতেল একটি সংখ্যা। যা 'বুস্তানুল আরেফীনে'র একটি ইবারাত ভুল বোঝার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আর উম্মুল মুমিনীন আয়েশার রা. দিকে এই সংখ্যা সম্বন্ধ করাটা অনুবাদ বা অনুলিপির ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। খেয়াল না করে এক বুযুর্গ তাঁর কিতাবে এটি লিখে ফেলেছেন। আর এখান থেকে পরবর্তী কোন কোন কিতাবে তা চলে এসেছে।

এই অঞ্চলে যদিও এই সংখ্যাটি অনেক প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু সঠিক আয়াত সংখ্যায় এর সামান্য কোনও প্রভাবও পড়েনি। এমনিভাবে মুসহাফে আয়াতের শেষে চিহ্ন লাগানো বা আয়াত নম্বর লাগানোর ক্ষেত্রেও এর কোন আছর পড়েনি। যে অঞ্চলে এই ভুল সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ হয়েছে সেখানকার ছাপা কোন মুসহাফে বা পাণ্ডুলিপি আকারে থাকা কোন মুসহাফেই এ সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হয়নি। বরং এ সব মুসহাফ কুফী সংখ্যা অনুযায়ী। যাতে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। কেউ যদি না মেনে এ ভুল সংখ্যাটি বলেও তো সে নিজে যে মুসহাফ তেলাওয়াত করে, যে মুসহাফ দেখে হিফজ করে সেই মুসহাফেও মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। এমনকি কোন প্রকাশক যদি না জেনে নিজেদের প্রকাশকৃত মুসহাফের শুরুতে বা শেষে 'প্রকাশকের কথা'য় এ কথা লেখে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ তো আপনি যদি সেই মুসহাফে প্রত্যেক সূরার শুরুতে ঐ সূরার যে মোট আয়াত সংখ্যা লেখা আছে তা আলাদা একটি কাগজে লিখে হিসাব করেন অথবা প্রত্যেক আয়াতের শেষে যে চিহ্ন ও নম্বর লাগানো আছে তা গুনে হিসাব করেন তাহলে মোট সংখ্যা বের হবে সেই অনুসৃত সংখ্যা (৬২৩৬)।[৩২] এটি আল্লাহ তাআলার এক কুদরত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা এবং মুসলিম উম্মাহর কারামত যে, কুরআনের শব্দ-মর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও বিধি-বিধান সংরক্ষিত থাকা যদিও মোট আয়াত সংখ্যা কত–তা সংরক্ষিত থাকার উপর নির্ভর করে না তদুপরি আল্লাহ তা সংরক্ষণ করেছেন। যারা ভুল সংখ্যা বলে বা ভুল সংখ্যা লেখে খোদ তাদের মুসহাফেও আল্লাহ তাআলা সেই সংখ্যাটি ঢুকতে দেননি।

فالحمد لله حمدا كثيرا، والشكر لله شكرا جزيلا۔
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا وبالقرآن
كتابا منزلا محفوظا.

হানাফী ফকীহগণ ও আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ কী বলেন?

আমরা হানাফী মাসলাকের অনুসারী। আর আমাদের ইলমী ও ফিকরী সনদ আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ সম্পর্কে হানাফী ফকীহগণ ও আকাবিরে দেওবন্দ কী বলেন তা দেখে নেওয়া আমাদের জন্য উত্তম হবে। যদিও এটি ফিকাহ শাস্ত্রের মাসআলা নয়। বরং তা উলূমুল কুরআনের মাসআলা আরও নির্দিষ্ট করে বললে তা ইলমে কেরাআতের মাসআলা। গুরুত্বের বিবেচনায় যাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইলমু আদাদিল আয়াত, ইলমুল আদাদিল আয়াতিল কুরআনী প্রভৃতি শিরোনামে এটিকে ব্যক্ত করা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে বিবেচ্য হল, ইলমে আদাদ ও ইলমে কেরাআতের ইমামগণ কী বলেছেন এবং এই শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে কী আছে? আলহামদু লিল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তো পূর্বে গত হয়েছে। শাস্ত্রের ইমামদের স্পষ্ট বক্তব্য এবং শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ও মৌলিক গ্রন্থাবলীর হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ৬৬৬৬ একটি ভিত্তিহীন ও বাস্তবতাবিরোধী সংখ্যা। শাস্ত্রের কোন ইমাম থেকে তা প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা, বর্ণিতও হয়নি, এ শাস্ত্রের কোন গ্রন্থে এর উল্লেখও নেই। এটি তো একটি স্বীকৃত কথা যে, প্রত্যেক শাস্ত্রে সেই শাস্ত্রের পারদর্শীদের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। يرجع في كل فن إلى أهله এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত।

আলহামদু লিল্লাহ! আয়াত সংখ্যার ক্ষেত্রেও হানাফী ফকীহগণ নিজেদের মূলনীতি অনুসারে শাস্ত্রজ্ঞদের মতানুসারেই মত প্রদান করেছেন। তাদের মতবিরোধী কিছু তারা বলেননি। এমনিভাবে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দও এ ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞদেরই অনুসরণ করেছেন। তাদের মতবিরোধী কিছু তারা বলেননি। পরবর্তী যুগের কোন লেখক থেকে কোন ভুল হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা। সেটা তাসামুহ 'যাল্লাত' (বিচ্যুতি, পদস্খলন) বলেই বিবেচিত হয়। তাসামুহ না তাকলীদ ও অনুসরণযোগ্য কিছু, আর না তা 'মাসলাক' ও 'মাশরাবে'র অংশ।

[৩২] তবে দু'-একটি মুসহাফে মোট সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে ৬২৩৮। এর কারণ জানার জন্য পড়ুন অধ্যায় ৭

ফিকহে হানাফীর কিছু কিতাবের হাওয়ালা

১. শামসুল আইম্মাহ সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) 'আলমাবসূতে' লিখেছেন,

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن الإمام يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الأحسن؛ لأن السنة في التراويح الختم مرة وبما أشار إليه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يختم القرآن مرة فيها؛ لأن عدد ركعات التراويح في جميع الشهر ستمائة وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء، فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها.

অর্থাৎ হাসান (ইবনে যিয়াদ) রহ. আবু হানীফা রহ. থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইমাম তারাবীর প্রত্যেক রাকাতে দশ আয়াতের মত পড়বে।

সারাখসী রহ. বলেন, এটিই ভালো। কারণ তারাবীহতে একবার খতম করাই সুন্নাত। আর আবু হানীফা রহ. যা বলেছেন সে অনুযায়ী একবারই খতম হয়। কারণ একমাসে তারাবীহর রাকাত সংখ্যা হয় ছয়শো। আর কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার ও কিছু বেশি। তাই প্রত্যেক রাকাতে যদি দশ আয়াত পড়া হয় (অর্থাৎ কোন কোন রাকাতে এক দুই আয়াত বেশি) তাহলে তারাবীহের মাঝে খতম পুরা হয়ে যাবে।–'আলমাবসূত', সারাখসী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৬, কিতাবুত তারাবীহ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ফি হাক্কি কদরিল কেরাআহ

শামসুল আইম্মাহ রহ. হানাফী ফকীহগণের আকাবিরদের একজন। তিনি লিখেছেন যে, মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার এবং কিছু বেশি। স্পষ্টই ছয়শো ছেষট্টিকে 'কিছু' বলা হয় না। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইবারত عشر آيات ونحوها চিন্তা করে দেখার মত। এতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাকাতে দশ আয়াতের মত পড়বে। কারণ যদি শুধু দশ আয়াত পড়া হয় তাহলে দুইশো ছত্রিশ বাকি থেকে যায়। (প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. কুফার অধিবাসী ছিলেন। আর কূফী গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।) তাই খতম করার জন্য কোন কোন রাকাতে এগারো-বারো আয়াতও পড়তে হবে। যদি তাঁদের মনে এই ভুল কথাটি থাকত যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ তাহলে প্রত্যেক রাকাতে দশ আয়াতের মত পড়ার কথা না বলে এগারো আয়াতের মত পড়ার কথা বলতেন। প্রত্যেক রাকাতে এগারো আয়াত পড়া হলে ছয়শো রাকাতে মোট ৬৬০০ আয়াত হয়। তাই তাঁর মনে যদি ৬৬৬৬ সংখ্যাটি থাকত তাহলে তিনি এক রাকাতে দশ আয়াত পড়ার কথা বলতেন না এবং সারাখসী রহ.ও মোট আয়াত সংখ্যা 'ছয় হাজার ও কিছু' এভাবে বলতেন না। কারণ হাজারের হিসেবে ছয়শো ছেষট্টিকে 'কিছু' বলা হয় না। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী রহ. 'আলমাবসূতে' যে কথা লিখেছেন সে কথা আরও অনেক হানাফী ফকীহও লিখেছেন। দেখুন–

২. ইমাম কাযীখান (৫৯২ হি.)
ফাতাওয়া খানিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৭-২৩৮

৩. আবুল হাসান আলমারগিনানী, হেদায়া গ্রন্থকার
'মুখতারাতুন নাওয়াযেল' খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৯

৪. বুরহানুদ্দীন মাহমুদ ইবনে সদরুশ শরীয়া (৫৫১-৬১৬ হি.)
'আলমুহীতুল বুরহানী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫৩, কিতাবুস সালাত, অধ্যায়: ১৩, ইদারাতুল কুরআন করাচি, ১৪২৪ হি.

৫. ফখরুদ্দীন উসমান ইবনে আলী আযযাইলায়ী (৭৪৩ হি.)
'তাবয়ীনুল হাকায়েক শরহু কানযুদ দাকায়েক' খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫

৬. আকমালুদ্দীন আলবাবরতী (৭৮৬ হি.)
আল ইনায়া শরহুল হিদায়া খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ৮০৯

৭. ফরীদুদ্দীন আলিম ইবনুল আলা (৭৮৬ হি.)
'ফাতাওয়া তাতারখানিয়া' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২৪

৮. আবু বকর ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আলহাদ্দাদ আযযাবিদী (৮০০ হি.)
'আলজাওহারাতুন নাইয়িরাহ শরহু মুখতাসারুল কুদূরী', খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৮

৯. বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি.)
'আলবিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫৭

১০. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি.)
'ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর' (হেদায়ার শরাহ), খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৯

১১. কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (৮৭৯ হি.)
'মাজমুআতু রাসায়েলিল আল্লামাহ কাসেম' পৃ.২৪৯, 'রিসালাতুন ফিত তারাবীহ ওয়াল বিতর', দারুন নাওয়াদের, লেবানন, প্রকাশকাল : ১৪৩৪ হি., ২০১৩ ইং

১২. ইবনে আমীরীল হাজ আলহালাবী (৮৭৯ হি.)
'হালবাতুল মুজাল্লী শরহু মুনয়াতিল মুসল্লী' খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৩৭১

১৩. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
'মিরকাতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতুল মাসাবীহ', বাবু ফাযাইলিল কুরআন, আলফাসলুস সানী, اقرأ وارتق ... এই হাদীসের অধীনে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'আহলে ফন ও শাস্ত্রজ্ঞদের ঐকমত্যে মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের কম নয়। ছয় হাজারের চেয়ে বেশি। বিভিন্ন গণনা অনুসারে ৬২০৪, ৬২১৪, ৬২১৯, ৬২২৫ (বলা উচিত ছিল ৬২২৬), ৬২৩৬।' ৬২৩৬ এর বেশি কোন সংখ্যা তিনি উল্লেখ করেননি।

আরও দ্রষ্টব্য; তাঁর কিতাব 'ফাতহু বাবিল ইনায়া', খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৯
১৪. আশশুরুনবুলালী আলহাসান ইবনে আম্মার (১০৬৯ হি.)
'ইমদাদুল ফাত্তাহ শরহু নূরুল ইযাহ' পৃষ্ঠা : ৪৫৯
১৫. শাইখী যাদাহ আবদুর রহমান ইবনুশ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান (১০৭৮ হি.)
'মাজমাউল আনহুর শরহু মুলতাকাল আবহুর' খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৩
১৬. 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী', ফতোয়ার এই প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত গ্রন্থটিতে আছে,

في القرآن ست مئة عاشرة وثلاث وعشرون عاشرة، كذا في «السراج الوهاج»

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে ছয়শো তেইশটি দশক আছে।-সিরাজুল ওয়াহহাজ
- 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী', খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২৩

এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, যে সব মুসহাফে আয়াত গণনার জন্য প্রতি দশ আয়াতের পরে চিহ্ন লাগানো হত সেগুলোতে দশের চিহ্ন সংখ্যা হল সর্বমোট ছয়শো তেইশটি। অর্থাৎ ছয় হাজার দুইশো ত্রিশ আয়াত। অতিরিক্ত থাকে 'ছয়'। দশের কম হওয়ার কারণে তার জন্য ভিন্নভাবে দশের চিহ্ন লাগানো হত না। ৬৬১৬ বা ৬৬৬৬ তো দূরের কথা, যদি মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৪০ও হত তাও দশকের মোট সংখ্যা ৬২৩ না হয়ে ৬২৪ হত।

১৭. ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.)
'রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার', খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৭

ফিকহে হানাফীর এই প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ ও ফকীহগণের হাওয়ালা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আকাবির হানাফী ফকীহগণ ইলমে কেরাআত ও ইলমে আদাদের ইমামদের মতই মোট আয়াত সংখ্যা 'ছয় হাজার ও কিছু' ই বলেন। ৬৬১৬ বা ৬৬৬৬ বলেন না। (তালাবায়ে কেরাম এখানে فصل في التسامحات ও অধ্যয়ন করুন, যা এ প্রবন্ধের উর্দু সংস্করণে ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ।)

আকাবিরে দেওবন্দের হাওয়ালা

হিন্দুস্তানের ঐ সকল আকাবির যারা মাশায়েখে দেওবন্দের ইলমী, ফিকরী ও সুলুকী সনদের ভিত্তিমূল এবং মাশায়েখে দেওবন্দের চার তবকার আকাবিরের মধ্য থেকে কারো লেখায় বা কথায় আমার জানামতে এই তাসামুহ হয়নি। অর্থাৎ কেউ ৬৬৬৬ সংখ্যাটির উল্লেখ করেননি। এর বিপরীতে তাঁদের মাদ্রাসা, মক্তব ও হেফজখানাগুলোতে যে মুসহাফের মাধ্যমে কুরআনে কারীম শেখানো হয় ও হিফজ করানো হয় তার সবগুলোই কূফী সংখ্যা অনুসারে। আকাবিরে দেওবন্দের সবাই কূফী কেরাআত অনুসারে কুরআন শেখেন ও শিক্ষা দান করেন। কূফী কেরাআত অনুসারেই তারা তেলাওয়াত করেন এবং তারাবীহতে কুরআন খতম করেন। তাদের কেউ কূফী সংখ্যার উপর কখনো আপত্তি করেননি। আপত্তির কল্পনাও করা যায় না, সম্ভাবনা তো দূরের কথা। তাদের কেউ কূফী সংখ্যাকে মারজুহও বলেননি। তাদের কেউ কুরআনুল কারীমের তরজমা করে থাকলে বা তাফসীর লিখে থাকলে কূফী সংখ্যার মুসহাফেই তা করেছেন। এই সবকিছু তাদের পক্ষ থেকে ঐকমত্যপূর্ণ কর্মগত ঘোষণা যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। কিন্তু তারা অন্য কোন মাসনূন ও মুতাওয়ারাছ সংখ্যাকে অস্বীকার করেন না। এমনিভাবে তারা কোন ভুল ও নবউদ্ভাবিত সংখ্যাকে সঠিকও মনে করেন না।

এই ফিতরী ও স্বভাবজাত বিষয়টি ছাড়াও আকাবিরে দেওবন্দের কিছু সুনির্দিষ্ট হাওয়ালাও আছে যার দ্বারা এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা ছয় ছয়ের দুই সংখ্যার (৬৬৬৬ ও ৬৬১৬) কোনটিরই প্রবক্তা নন। বরং তারা অনুসৃত ও স্বীকৃত সংখ্যাগুলোরই প্রবক্তা। দেখুন-

১. হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. (১২৬৯-১৩৪৬ হি.)
'বাযলুল মাজহুদ ফি হাল্লি সুনানি আবিদাউদ', খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৮ (কিতাবুস সালাত, তারতীল অধ্যায়)
২. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. (১৩১৫-১৪০২হি.) তিনি 'আলকাওকাবুদ দুররি' এর হাশিয়ায় বাযলুল মাজহুদের মত লিখেছেন,

«قال الداني: وأجمعوا على أن عدد آي القرآن ستة آلاف آية، ثم اختلفوا في ما زاد، فقيل: ومئتا آية وأربع آيات، وقيل: وست وثلاثون، وقيل غير ذلك»

-'আলকাওকাবুদ দুররি আলা জামিয়িত তিরমিযী', খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৯, ...فإن منزلك এই হাদীসের অধীনে।

এখানে শায়খুল হাদীস রহ. সর্বনিম্ন সংখ্যা ৬২০৪ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬২৩৬ উল্লেখ করে মাঝখানের সংখ্যাগুলোর দিকে وقيل غير ذلك বলে ইশারা করেছেন।

শাইখুল হাদীস রহ. তাঁর বরকতপূর্ণ রিসালা 'ফাযায়েলে কুরআনে' উপরোক্ত হাদীসের 'ফায়েদা'য় লিখেছেন-

"আল্লামা দানী রহ. এ ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞদের ঐকমত্য নকল করেছেন যে, কুরআন শরীফের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার। (এর কম নয়) অতিরিক্ত সংখ্যাটির ব্যাপারে গণনার ভিন্নতা আছে। তিনি নিম্নোক্ত কওলগুলো উল্লেখ করেছেন ২০৪, ১৪, ১৯, ২৫, ৩৬" (-ফাযায়েলে কুরআন, ফাযায়েলে আমল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫১২, রচনাকাল : যিলহজ্ব ১৩৪৮ হি. অর্থাৎ সে সময় দেওবন্দের দ্বিতীয় সারির আকাবিরগণ জীবিত ছিলেন)

এখানে শায়খুল হাদীস রহ. ক্রমান্বয়ে বসরী, মাদানী দুওম, মক্কী, শামী সংখ্যা (যদিও তিনি ৬২২৫ লিখেছেন, লেখা দরকার ছিল ৬২২৬, দানী রহ. এর 'আলবয়ানে' ৬২২৬ ই আছে) এবং কুফী সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। মাদানী আওয়াল রয়ে গেছে। হযরতের বর্ণনাশৈলী থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শাস্ত্রজ্ঞদের মতে সর্বনিম্ন সংখ্যা ৬২০৪ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬২৩৬।

শায়খুল হাদীস রহ. আকাবিরে দেওবন্দের চতুর্থ সারির উপরের পর্যায়ের আকাবিরদের একজন। তিনি কারী মুহাম্মাদ তাইয়েব রহ. ও মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এর সারির।

رحمة الله تعالى رحمة واسعة

৩. মাওলানা মুহাম্মদ মালেক কান্ধলভী (১৪০৯ হি.)

আকাবিরের অনেকের জীবদ্দশায়ই 'আততাহরীর ফি উসূলিত তাফসীর' নামে একটি কিতাব লেখেন। কিতাবের শুরুতে মাওলানা যফর আহমদ উছমানী রহ. (১৩১০-১৩৯৪ হি.) ও হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ. (১৩১৭-১৩৯৪ হি.) এর শানদার তাকরীয (অভিমত) আছে। প্রথম জনের তাকরীয লেখা ২০ শাওয়াল ১৩৮০ হি. তে আর দ্বিতীয় জনের, যিনি লেখকের পিতাও, তাকরীয লেখা হয় ৬ সফর ১৩৮২ হিজরীতে। এ কিতাবে আয়াত সংখ্যাগুলোর সর্বোচ্চ সংখ্যা (৬২৩৬) -এর কওলটিই শুধু লেখা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে,

"এটিই জুমহুরের কওল এবং ইমাম কিসায়ী এই সংখ্যাটি হযরত আলী রা. এর থেকে বর্ণনা করেছেন।"

-'আততাহরীর ফি উসূলিত তাফসীর' পৃষ্ঠা : ৪৪, প্রকাশক : কুরআন মহল, মুকাবেলে মওলবী মুসাফির খানা করাচি।

এখানে মনে রাখতে হবে 'আততাহরীরের' লেখক আবুল লাইস সমরকান্দী রহ. এর 'বুস্তানুল আরেফীনে'র হাওয়ালায় হরফ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি আবুল লাইস রহ. এর কিতাবে উল্লেখকৃত قول عامة কে উল্লেখ করেননি, বরং কুফী সংখ্যাকেই জুমহুরের কওল বলেছেন।

'আততাহরীরে'র শুরুতে যে দুই বুযুর্গের তাকরীয আছে তারা উভয়েই আকাবিরে দেওবন্দের চতুর্থ সারির মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত। 'আততাহরীরে'র লেখকের 'মানাযিলুল ইরফান ফি উলূমিল কুরআন' নামে আরও একটি কিতাব আছে। এটি 'আততাহরীরে'র পরে লেখা। এতে ১০৯-১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইলমে আদাদ সম্পর্কে লম্বা আলোচনা আছে কিন্তু ছয় ছয়ের কোন কওল সেখানেও লেখেননি।[৩৩]

৪. জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরের ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদের কিতাব 'আছারুত তানযীল' দু'খণ্ডে ছেপেছে। এর শুরুতে কারী মুহাম্মদ তাহিরিব রহ. (১৩১৭-১৪০৩ হি.) এর তাকরীয আছে। ০৬.০৪.১৩৮৪ হি. তে এ তাকরীযটি লেখা।

এ কিতাবে ড. খালেদ মাহমুদ লিখেছেন, "আয়াত গণনার ক্ষেত্রেও ইসলামী বিশ্বে কুফী গণনা পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হয়েছে বেশি। ইমাম শাতেবী রহ. 'নাযেমাতুয যহরে' (কুফী গণনা অনুসারেই) কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ লিখেছেন।[৩২] কুরআনুল কারীমের কোন কোন অংশ এক আয়াত কি দুই আয়াত- এ নিয়ে যে বর্ণনার বিভিন্নতা রয়েছে সে কারণেই মোট আয়াত সংখ্যায় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু এতে এমন মনে করা যাবে না যে, কুরআনুল কারীমের কোন অংশ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। বিষয়টি এমন নয় কিছুতেই। এটি এমন কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। ذلك الكتاب لا ريب فيه"

—'আছারুত তানযীল খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৯, প্রকাশক: দারুল মাআরেফ লাহোর।

৫. হযরত মাওলানা কারী ফাতহ মুহাম্মদ রহ. (১৪০৭ হি.) যিনি যুগের ইলমে কেরাআতের ইমাম পর্যায়ের ছিলেন এবং কারী রহীম বখশ পানিপতীসহ বড় বড় মনীষীদের উস্তায ছিলেন। তিনি 'কাশেফুল উসর' নামে ইমাম শাতেবীর কিতাব 'নাযেমাতুয যুহর' এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এতে তিনি অনুসৃত সংখ্যাগুলোর কথাই উল্লেখ করেছেন। ছয় ছয়ের কোন সংখ্যার নামও নেননি।

কারী ফাতহ মুহাম্মদ রাহ. দারুল উলূম করাচিতে (পাকিস্তানে দারুল উলূম দেওবন্দের তুরজুমান) দীর্ঘদিন যাবৎ ইলমে কেরাআত ও তাজবীদ বিভাগের প্রধান ছিলেন। এ শাস্ত্রে তার মান কত উঁচু ছিল তা আন্দায করার জন্য হযরতুল উস্তাযের 'নুকূশে রফতেগাঁ' ৩১১-৩১৮ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে তাঁর স্বতন্ত্র একটি কিতাবও পেয়েছি। 'সিরাজুল গায়াত ফি আদ্দিল আয়াত'। বেরাদারে আযীয যহীরুদ্দীন বাবর এর পিডিএফ কপি পাঠিয়েছে। এতেও শুধু অনুসৃত সংখ্যাগুলোরই উল্লেখ আছে। ৬৬১৬ বা ৬৬৬৬ এর নাম নিশানাও নেই।

---

[৩৩] 'মানাযিলুল ইরফানে'র কথা তো আলহামদু লিল্লাহ তালেবে ইলমী যমানায়ই জানা ছিল। খোদ আমার বড় ভাইজানের কাছেও এর নিজস্ব নুসখা ছিল। লেখক তাঁর সরাসরি উস্তাযও। কিন্তু 'আততাহরীরে'র কথা আমার জানা ছিল না। এর নুসখা আমাদের দাওয়া বিভাগের তালেবে ইলম রেজওয়ানুল ইসলাম এর কাছে পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দিন, ইলমে নাফে ও আমলে সালেহ এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

[৩২] [illegible]

৬. হযরত মাওলানা কারী আবুল হাসান আ'যমী দামাত বারাকাতুহুম।
দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমে কেরাআত ও তাজবীদ বিভাগের প্রাক্তন প্রধান হযরত মাওলানা আবুল হাসান আযমী দামাত বারাকাতুহুম 'নাছরুল মারজান ফি তাদাদি আয়াতিল কুরআন' নামে ইলমে আদাদ সম্পর্কে একটি রিসালা লিখেছেন। এতে তিনি প্রসিদ্ধ সাতটি সংখ্যার কথাই উল্লেখ করেছেন। সকল গণনা পদ্ধতি অনুসারে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেকটি সূরার আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং আয়াতের শুরু ও শেষও চিহ্নিত করেছেন। এই রিসালাতেও ছয় ছয়ের কোন সংখ্যার নাম নিশানাও নেই। এই রিসালার দ্বিতীয় এডিশন ছাপা হয় ১৪২১ হিজরীতে।

কারী আবুল হাসান আ'যমী দামাত বারাকাতুহুম আমাকে ফোনে এ কথাও বলেছেন যে, 'ছয় ছয়ের এই সংখ্যাটি জাহেলদের কথা। জানি না এই ভুল সংখ্যাটি কীভাবে প্রচলিত হয়ে গেল?'

৭. কারী আবদুল মালিক দামাত বারাকাতুহুম
জামেয়া দারুল উলূম করাচির ইলমে কেরাআতের প্রধান এবং আততাখাসসুস ফিল কেরাআতি ওয়াত তাজবীদের মুশরিফ হযরত মাওলানা কারী আবদুল মালিক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর বক্তব্য পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন, ৬৬৬৬ সংখ্যাটি ভিত্তিহীন।

অধ্যায়-৬

বাস্তবেই কি দেওয়ানবাগী সাহেব সঠিক সংখ্যার সংস্কারক?

জনাব 'মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী' সাহেব নিজের ব্যাপারে এই দাবী করেন যে, তিনি যুগের সংস্কারক ও ইসলামের পুনর্জীবনদানকারী। তার ভক্তরা তাকে 'সূফী সম্রাট' 'মুহাম্মদী ইসলামের পুনর্জীবনদানকারী' ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধি দিয়ে থাকে। তাদের দাবী যে তারা মুহাম্মদী ইসলামের অনুসারী আর মুসলিম উম্মাহ ইয়াযীদী ইসলামের অনুসারী।

তিনি দ্বীনে ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে বিকৃত করে সেই বিকৃত দ্বীন ও শরীয়তের নাম দিয়েছেন 'মুহাম্মদী ইসলাম'। তার এই মুহাম্মদী ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে জানতে অধমের লেখা গ্রন্থ 'তাসাউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' (পৃষ্ঠা : ২৪৮-২৯২) দেখা যেতে পারে।

দেওয়ানবাগী সাহেবের ভক্তরা 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' শিরোনামে একটি বই বের করেছে। তাদের দাবি, এতে তারা এমন সব বিষয়াবলী সংকলন করেছে যা দেওয়ানবাগী সাহেবের তাজদীদী কারনামা হিসেবে গণ্য হয়। বাস্তবতা হল, এতে যদি এমন কোন বিষয় থাকে, যে ব্যাপারে দেওয়ানবাগী সাহেবের মুখ দিয়ে সঠিক কথা বের হয়েছে তো তিনিই প্রথম তা বলেছেন এমন নয় বরং তার আগে আরও অনেকে এ কথা বলেছেন। দেওয়ানবাগীও হয়তো বলেছেন। আর এতে দেওয়ানবাগী সাহেবই প্রথম বলেছেন এমন যা আছে তা তাজদীদ নয় বরং ইহদাছ ফিদ্দিন বা দ্বীনে নব-সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো তাজদীদ বলা হলে পৃথিবীর সব যিন্দিক ও বেদআতীকেই মুজাদ্দিদ বলা লাগবে।

যা হোক এখানে যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হল, উপরোক্ত 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' নামক বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় শাবান ১৪১৬ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১৯৯৬ ইং। একই মলাটে দুই খণ্ড। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪০। প্রকাশক : সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এই এডিশনে আয়াত সংখ্যার আলোচনা নেই।

দ্বিতীয় এডিশনে গ্রন্থটির দুই খণ্ড আলাদা মলাটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে রবীউল আউয়াল ১৪২৪ হি. মোতাবেক মে ২০০৩ ইং আর দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে যিলকদ ১৪২৬ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ২০০৫ ইং। দ্বিতীয় এডিশনের প্রথম খণ্ডে, যা ২০০৩ ইং সনে প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও আয়াত সংখ্যার আলোচনা নেই।

আয়াত সংখ্যার আলোচনা এসেছে দ্বিতীয় এডিশনের দ্বিতীয় খণ্ডে, যা ছেপেছে ২০০৫ ইং সনে।

এ খণ্ডের নবম অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'পবিত্র কুরআনের সঠিক আয়াত সংখ্যা নিরূপণ'!! এতে দাবী করা হয়েছে যে, সারা পৃথিবীতে দেওয়ানবাগী সাহেবই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি সঠিক আয়াত সংখ্যা নির্ধারণ করে মানুষের ভুল সংশোধন করেছেন। একদিকে 'তাজদীদে'র দাবী অন্যদিকে এই প্রকাশ্য মিথ্যাচার!!

إنا لله وإنا إليه راجعون

মুফতে মুজাদ্দিদ বনে যাওয়ার জন্য এরা যে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে এবং যে মিথ্যাচার করেছে সংক্ষিপ্ত আকারে তা চিহ্নিত করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

এক.

প্রথমে দেওয়ানবাগী সাহেবের এই কল্পিত তাজদীদের ইতিহাস তার ভক্তদের জবানিতে শুনুন। 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কারে' লেখা হয়েছে–

"প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহান সংস্কারক মোহাম্মদী ইসলামের পুনর্জীবনদানকারী সূফী সম্রাট হযরত দেওয়ানবাগী (মাঃ আঃ) হুজুর কেবলা সুদীর্ঘ প্রায় ৮ বছর যাবৎ সূফী ফাউন্ডেশনের গবেষকদের নিয়ে পবিত্র

কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা করেছেন। এরই এক পর্যায়ে কুরআনের আয়াত সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে দেখা গেল, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,২৩৬ টি। এ সংখ্যা সঠিক কিনা-বিভিন্নভাবে তা যাচাই করা হয়েছে। প্রতিটি সূরার আয়াত সংখ্যা ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটারের সাহায্যে যোগ করে সর্বাবস্থায়ই যোগফল একই রূপ পাওয়া গেছে। আর সে সংখ্যা হচ্ছে-৬,২৩৬টি। সূফী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে যখনই এ সংখ্যা প্রকাশ করা হল তখনই এদেশের মুসলমানদের বিশেষ করে আলেমদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। কেউই যেন পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,২৩৬টি বলে মেনে নিতে পারছিলেন না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পর্যন্ত প্রথমদিকে এ বিষয়টি মেনে নিতে চাননি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, কেউই গণনা করে দেখেননি যে পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত?" -'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩২

আট বছরের এই গবেষণার সূচনা কবে হয়েছিল তা এ গ্রন্থের এ খণ্ডের ভূমিকাতেই পাওয়া যায়। সেখানে দেওয়ানবাগী সাহেবের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে-

"১৯৯৮ সালে আল কুরআন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রফেসর, উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী গবেষকদের নিয়ে পবিত্র কুরআন গবেষণা প্রকল্প চালু করেন।"-'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৪৯

১৯৯৮ ইং থেকে ২০০৫ ইং পর্যন্ত মোট আট বছর হয়। আট বছরব্যাপী এই গবেষণার সময়ই প্রথম দেওয়ানবাগী সাহেব ও তার সহযোগীদের কাছে এ বিষয়টি ধরা পড়ে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। এ জন্যই তারা 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কারে'র প্রথম এডিশনে, যা ১৯৯৬ ইং সনে ছাপা হয়েছিল, আয়াত সংখ্যার এই কল্পিত তাজদীদের দাবী করতে পারেননি। তদ্রূপ ২০০৩ ইং সনে যখন দ্বিতীয় এডিশনের প্রথম খণ্ড ছাপা হচ্ছিল তখনও তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারেননি যে, মুসহাফে প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লেখা হয়েছে সেগুলো একত্রিত করে যে যোগফল দাঁড়ায় তা ঠিক কি না। এ জন্যই প্রথম খণ্ডের শুরুতে তাজদীদী কাজের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে এর কথা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এর উল্লেখ করতে হয়েছে ২০০৫ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে।

পাঠক এ বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখবেন যে, দেওয়ানবাগী সাহেব আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন ১৯৯৮ ইং এর পরে। সামনে আপনার এই তারিখটির প্রয়োজন পড়বে।

আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে গবেষণা তারা কীভাবে করেছেন তার আলোচনাও এখানে এসেছে। প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে সংখ্যা মুসহাফে লেখা থাকে তা তারা একত্রিত করেছেন। যোগফল ৬২৩৬ বের হওয়ায় তারা পেরেশান হয়েছেন যে ঘটনা কী? তাই বারবার গণনা করা হয়েছে। যোগফল যখন প্রতিবারই ৬২৩৬ বের হয়েছে তখন এতটুকু কথা তো বুঝে এসেছে এই সংখ্যাটি সঠিক। কিন্তু বাস্তবতা না জানার কারণে এই সংখ্যাটিকেই একমাত্র সঠিক সংখ্যা মনে করে বসেছেন।

এতে বোঝা গেল যে, তাদের এটিও জানা নেই যে, আয়াত সংখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা ইলমে কেরাআত এবং উলূমুল কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। হয়তো তাদের এও জানা নেই যে, আয়াত গণনায় অনুসৃত ও স্বীকৃত যে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তার সবগুলোই তাওকীফে নববী ও তালীমে সাহাবার উপর ভিত্তি করেই ছিল। তাদের হয়তো এ কথাও জানা নেই, এ শাস্ত্র সম্পর্কে শতের অধিক কিতাব লেখা হয়েছে এবং এ শাস্ত্রে লিখনীর ধারা তাবেয়ীগণের যুগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। উলূমুল কুরআন এবং ইলমে কেরাআতের কিতাবাদিতে এ সম্পর্কে লম্বা লম্বা আলোচনা আছে। আলাদা করা হলে যা স্বতন্ত্র পুস্তিকার রূপ লাভ করবে।

তারা (দেওয়ানবাগী ও তার গবেষকরা) হিফজ ও নাজেরার ছোট বাচ্চাদের মত প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লেখা থাকে সেগুলোকে একত্রিত করে যোগফল বের করেছেন। এরপর একেই শুধু গবেষণা নয় 'তাজদীদ' (সংস্কার) বলে দাবী করা শুরু করেছেন। এ কথা চিন্তা করেননি যে সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লেখা হয়েছে তা কে লিখেছে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে লিখেছে? ভাববেনই বা কীভাবে তাদের তো খবরই নেই, এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ অনেক ইমাম আছেন। এ শাস্ত্রের অনেক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আছে। আর আয়াত সংখ্যার আলোচনা ইলমে কেরাআতের একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। তারা বড় সরলভাবে এ কথা লিখে দিয়েছেন-

"লক্ষ্য করার বিষয় যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত? এটা গণনা ও হিসাবের ব্যাপার, মাসলার কোন ব্যাপার নয়।"-'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৩

এই হল মুজাদ্দিদ সাহেব ও তার অনুসারীদের জ্ঞানের দৌড়। তাকে কে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে, আয়াত সংখ্যার বিষয়টি হিসাব ও গণনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটা কেন অপরিহার্য হবে যে তা কোন মাসআলা নয়? আখের আয়াত গণনা করা হবে কিসের ভিত্তিতে? যদি কোন মুসহাফে প্রত্যেক

সূরার শেষে সেই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা নোট করে জমা করা হয়ে থাকে অথবা প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লেখা থাকে সেগুলোর যোগফল বের করা হয় তো প্রশ্ন হল, মুসহাফের লিপিকার মুসহাফে যে আয়াত সংখ্যা লিখেছেন তা কিসের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন? সেই 'ভিত্তি' কোন শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে? তা কোন ইমাম থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং কোন সনদে? আর এই ইমামদের কাছে তার সনদ কী? এই বেচারাদের এ সকল বিষয়ের কোন খবরই নেই। তারা চিন্তাও করেনি যে, বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপা হওয়া মুসহাফে যদি আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে ভিন্নতা দেখা যায় তাহলে ফায়সালা করা হবে কীভাবে? উভয় সংখ্যাকেই কি সহীহ বলা হবে, নাকি একটিকে সহীহ আর আরেকটিকে লিপিকারের ভুল? তাদের খবরই নেই যে, এটি ইলমে কেরাআতের অনেক বড় একটি মাসআলা। নবীযুগ ও সাহাবাযুগ থেকে যার শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ চলছে এবং এটি শুধু একটি মাসআলাই নয় বরং একটি বিস্তৃত শাস্ত্র। যে শাস্ত্রের স্বতন্ত্র পাঠদান কেন্দ্র ছিল, এ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ অনেক ইমাম ছিলেন। যে শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং যে শাস্ত্রে পারদর্শী লোক এখনও অনেক আছে।

দুই.

এই দাবি যে, সূফী ফাউন্ডেশন থেকে যখন এই সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তখন মুসলমানদের বিশেষ করে আলেমদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পর্যন্ত এ বিষয়টি মেনে নিতে চাননি– এই দাবিটি আপত্তিকর। এটি ভিন্ন কথা যে, কেউ যদি আসল বিষয়টি না জানেন, শুধু ভুল সংখ্যাটিই তিনি শুনেছেন তো তার জানা বিষয়ের বিপরীত কথা শুনে তিনি পেরেশান হতে পারেন। এমন হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যারা আহলে ইলম, ইলমে আদাদ সম্পর্কে যাদের পড়াশোনা করার সুযোগ হয়েছে তারা ৬২৩৬ সংখ্যাটি শুনে কোনরূপ পেরেশান হবেন না। বরং তারা এ বিষয়টি দেখে বড় আশ্চর্য হবেন যে, সূফী সম্রাট এমন বিষয়টি আজ জানলেন? তারা এ দেখে আশ্চর্য হবেন যে, জানাশোনা বিষয় সম্পর্কে যে লোকের কোন খবর নেই সে কোন কারণে মুসহাফে লেখা আয়াত সংখ্যার যোগফল বের করে মুজাদ্দিদ বনে যায় কীভাবে?

আয়াত গণনা করার অনুসৃত ও স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক গণনা পদ্ধতি অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যায় কিছুটা ভিন্নতা দেখা যাবে। কিন্তু এই ভিন্নতা গণনা পদ্ধতির ভিন্নতা। আয়াত কম-বেশি হওয়ার পার্থক্য নয়। প্রত্যেক গণনা পদ্ধতি অনুসারেই কুরআন এক, আয়াতও এক। কিন্তু গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে কুরআনের কোন অংশকে এক গণনা পদ্ধতিতে এক আয়াত ধরা হয়েছে আর অন্য গণনা পদ্ধতিতে দুই আয়াত ধরা হয়েছে। তাই মোট আয়াত সংখ্যায় কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। পাঠক এ বিষয়টি পড়ে এসেছেন। সূফী ফাউন্ডেশনের কথা শুনে আহলে ইলম অবশ্যই আশ্চর্য হয়েছেন যে, যারা আয়াত গণনার মুসাল্লাম ও মুতাওয়াবাহ গণনা পদ্ধতিগুলোর কথা উল্লেখ করেনি বা উল্লেখ করতে পারেনি, যারা এ কথাই বলতে পারেনি যে, ৬২৩৬ এই সংখ্যাটি কুফী গণনা পদ্ধতি অনুসারে। বসরী গণনা অনুসারে আয়াত সংখ্যা ৬২০৪। মাদানী আওয়াল অনুসারে ৬২১৭, মাদানী দুওম অনুসারে ৬২১৪ (অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে ৬২১০), মক্কী গণনা অনুসারে ৬২১৯, শামী গণনা অনুসারে ৬২২৬, হিমসী গণনা অনুসারে ৬২৩২। যারা এ বিষয়গুলো বলতে পারেনি তারা কীভাবে 'সংস্কারক' হয়।

শামী সংখ্যা ও মাদানী দুওমের সংখ্যার মুসহাফ ছাপা হয়েছে। শামী সংখ্যা অনুসারে ছাপা হওয়া মুসহাফে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সকল সূরার আয়াত সংখ্যা যোগ করা হলে যোগফল দাঁড়াবে ৬২২৬। মাদানী দুওমের সংখ্যা অনুসারে ছাপা মুসহাফের আয়াত সংখ্যা যোগ করা হলে যোগফল বের হবে ৬২১৪। কিন্তু উভয় মুসহাফেই পুরো কুরআন আছে। উভয় মুসহাফেই সব আয়াত আছে। এক মুসহাফে আয়াত বেশি আরেক মুসহাফে আয়াত কম বিষয়টি এমন নয়। ইলমে আদাদ সম্পর্কে খবর না থাকার কারণে যারা মোট আয়াত সংখ্যা কত তা উল্লেখ করতে গিয়ে ৬২৩৬ কেই একমাত্র সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করে তাদের জন্য তাজদীদের দাবী কীভাবে শোভা পায়?

এ বিষয়টি আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, সূফী ফাউন্ডেশন থেকে ৬২৩৬ সংখ্যাটি প্রকাশ করার পর তোলপাড় কেন সৃষ্টি হবে? মুসলমানদের মাঝে বিশেষ করে আলেমদের মাঝে? যে কথা আরব ও অনারবের শত শত আলেম বারবার লিখেছেন, যে কথা বিভিন্ন মুসহাফের শেষে বিভিন্ন ভাষার প্রকাশকগণ ও মুসহাফ প্রকাশনার দায়িত্বশীলগণ অনেক অনেকবার লিখেছেন। খোদ বাংলা ভাষায় এ কথা দেওয়ানবাগী সাহেবের অনেক আগে লেখা হয়েছে। তারা দাবী করে যে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং সনে দেওয়ানবাগী সাহেব মহান সংস্কারকের দায়িত্ব লাভ করেন এবং ৫ এপ্রিল ১৯৮৯ ইং তিনি 'ইসলাম ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী' খেতাব লাভ করেন এবং তাদের বক্তব্য অনুসারে ১৯৯৮ ইং সনে তিনি আল কোরআন গবেষণা কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠা করেন[৩৭] এবং এ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর গবেষণার একপর্যায়ে তারা ৬২৩৬ সংখ্যাটির কথা প্রথম জানতে পারেন। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য তাদের বইয়ে উদ্ধৃতিতে পাঠক পড়ে এসেছেন।

এই তারীখসমূহের অনেক আগেই বাংলা ভাষায় অনেক আলেম ও আলেম নন এমন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কলমে এ সংখ্যাটি লেখা হয়ে তা এতটা প্রচারিত হয়েছে যে এর কোন সীমা নেই। এত পুরনো ও প্রচারিত একটি কথা শুনে তোলপাড় কেন হবে? হ্যাঁ, সব সময় সব অঞ্চলেই অজ্ঞ লোক থাকে এবং অনেক সময় কোনো কোনো আলেমেরও প্রসিদ্ধ কোনো কথা জানা থাকে না। এমন কেউ যদি এ সংখ্যাটি প্রথম শুনে তো তার কিছুটা আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক। খোদ আপনাদের এই প্রসিদ্ধ বিষয়টির অসম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে কত বছর লেগেছে?

তিন.

তারা এও লিখেছেন,

"হযরত ওসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনকে ৩০ পারায় বিভক্ত করা হয়েছে। এতে রয়েছে ১১৪ সূরা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এর আয়াত সংখ্যা কত? মুসলমানরা জানতো পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি। পবিত্র কুরআনে ১১৪ টি সূরার প্রত্যেকটির শুরুতেই আয়াত সংখ্যা লেখা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা কেউই পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত; তা হিসাব করে দেখিনি। এমনকি তার প্রয়োজনও অনুভব করিনি। বাল্যকাল হতেই আমরা শুনে এসেছি যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,৬৬৬টি। পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা আসলে কয়টি? এ প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন মহান সংস্কারক, মোহাম্মদী ইসলামের পূনর্জীবনদানকারী, সূফী সম্রাট হযরত দেওয়ানবাগী (মাঃ) (আঃ) হুজুর কেবলা। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহামানব, যিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতের সঠিক ও নির্ভুল সংখ্যা নিরূপন করে মুসলিম জাতির ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ টি নয়, ৬২৩৬ টি।"

-'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩২

আমাদের প্রশ্ন হল, হযরত উসমান রা. এর খিলাফতকালে কুরআনুল কারীমকে ৩০ পারায় ভাগ করা হয়েছে–এ কথার দলিল কী? দয়া করে এ সম্পর্কে অন্তত একটি নির্ভরযোগ্য সনদ উল্লেখ করুন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আপনাদের বক্তব্য অনুসারে দেওয়ানবাগী সাহেব মুসহাফের প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লেখা আছে সেগুলোকে যোগ করে যোগফল বের করে বলেছেন, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। তাহলে আয়াত সংখ্যা নিরূপণকারী দেওয়ানবাগী সাহেব হলেন কীভাবে? আয়াত সংখ্যা তো পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। আপনাদের দাবি অনুসারে দেওয়ানবাগী সাহেব ও তার সহযোগীরা শুধু আয়াত সংখ্যাগুলো যোগ করার কষ্টটুকু স্বীকার করেছেন, তো এইটুকু দ্বারা তিনি আয়াত সংখ্যা নিরূপণকারী কীভাবে বনে গেলেন? বিভিন্ন গণনা পদ্ধতির কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারে আয়াত সংখ্যা কত– এটাতো খায়রুল কুরূন থেকেই প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যেক গণনা পদ্ধতির উৎসই নববী তাওকীফ ও সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা। এরপর আর এ কথা বলার কী উদ্দেশ্য যে কুরআনুল কারীমের সঠিক আয়াত সংখ্যা নিরূপণকারী প্রথম ব্যক্তিত্ব জনাব দেওয়ানবাগী সাহেব? মূর্খতার কারণে এ কথাটি বলা হয়েছে নাকি এটি জেনে বুঝে করা প্রকাশ্য মিথ্যাচার?

তৃতীয় প্রশ্ন হল, মুসহাফ থেকে অথবা তাফসীর গ্রন্থ থেকে প্রত্যেক সূরার শুরুতে লেখা আয়াত সংখ্যা যোগ করে মোট আয়াত সংখ্যা বলার কাজও বাংলার জমিনে অনেক আগেই হয়েছে। ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর একটি প্রবন্ধে এ কাজ করেছেন, ড. মুস্তাফিজুর রহমান স্বলিখিত গ্রন্থ 'কুরআন পরিচিতি'তে এ কাজ করেছেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের হওয়া আল কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সূচিতে এ কাজ করা হয়েছে এবং প্রফেসর ড. আনওয়ারুল করীমও এ কাজ করেছেন।

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ রহ. এর প্রবন্ধ তাঁর প্রবন্ধসমগ্র 'কুরআন প্রসঙ্গ' এ ছাপা হয়েছে। 'চরিতাভিধান' এর (৪১৬ পৃষ্ঠার) বয়ান অনুসারে ১৯৬২ ইং সনে এর প্রথম এডিশন ছাপা হয়। আমার সামনে এর যে এডিশন আছে তাতে সে সময়ের কলকাতা আলিয়া ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আলহাজ বেলায়েত হুসাইন এর ভূমিকা আছে। এটি ছাপা হয় জিলহজ ১৩৮৯ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ ইং এ।[৩৮]

এ প্রবন্ধে তিনি ইতকান, সিরাজুল কারী, তাফসীরে বাইযাবী ও তাফসীরে জালালাইনের বর্ণনা অনুসারে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সকল

[৩৭] 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯

[৩৮] ঢাকা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি থেকে এ প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট অংশ ফটোকপি করে আনেন মওলবী সাঈদুল হক। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার সহযোগী সাথীকে 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন। আমীন।

সূরার আয়াত সংখ্যা বিস্তারিতভাবে ছকে প্রদান করেন। এটি ভিন্ন কথা যে, সব কিতাবের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য নুসখা না পাওয়ার কারণে বা কোন লেখকের তাসামুহ হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা এ ধরনের অন্য কোন কারণে তার প্রদানকৃত ছকটিতে নযরে ছানীর অবকাশ হয়তো আছে কিন্তু এ ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই যে, এ কাজ তিনি অনেক আগেই করেছেন। কূফী গণনা অনুসারে যে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ হয় তাও তিনি এ প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন। আর ৬৬৬৬ সংখ্যাটি এবং এই সংখ্যাটিকে আয়েশা রা. এর দিকে মানসুব করা সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তার ইবারত হল–

"মোটামুটিভাবে আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬ বলা হয়। অধিকন্তু বলা হয় যে ইহা হযরত আইশাহর গণনা। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।"

তিনি এও লিখেছেন,

"ভারতবর্ষে কুফার আয়াত গণনা মান্য করা হয়।" –কুরআন প্রসঙ্গ, ড. শহীদুল্লাহ্, পৃষ্ঠা : ৯৮, প্রকাশক : মুহাম্মদ ছফীউল্লাহ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স

পূর্বে বলা হয়েছে, শুধু ভারতবর্ষে নয়, প্রত্যেক যুগে ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে কূফী সংখ্যা অনুসরণ করা হত। আর এ যুগে তো প্রায় গোটা ইসলামী বিশ্বেই এই সংখ্যার অনুসরণ করা হয়। মাদানী দুওম ও শামী সংখ্যা কোথাও কোথাও থাকলেও সেখানেও কূফী সংখ্যারই আধিক্য।

ড. মুস্তাফিজুর রহমানের 'কুরআন পরিচিতি' এর প্রথম সংস্করণ বের হয় ১৯৯২ ইং সনে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯৯৯ ইং সনে। প্রকাশক : খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা।

উভয় সংস্করণে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যার তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং পুরো কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬-ও উল্লেখ করা হয়েছে। তো ফল দাঁড়াল এই যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন বড় ব্যক্তিত্ব দেওয়ানবাগী সাহেব কর্তৃক আল কুরআন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ছয় বছর আগে এই তালিকা প্রদান করেছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আল কুরআনুল কারীমের অনুবাদের প্রথম এডিশন তো বের হয়েছিল তখন যখন ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'ইসলামিক একাডেমি' ছিল। এরপর এতে সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ চলতে থাকে। আঠারোতম এডিশনের সময় এতে তৃতীয়বারের মত পরিমার্জন করা হয়। এই এডিশন ছাপা হয় জুমাদাল উলা ১৪১৭ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১৯৯৬ ইং সনে। এই এডিশনে সূরার সূচিতে প্রত্যেক সূরার নামের সাথে সেই সূরার আয়াত সংখ্যা লেখা হয়েছে এবং সূচির শেষে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬-ও লেখা হয়েছে। এর ১৯ তম এডিশন বের হয় জানুয়ারি ১৯৯৭ ইং। এতেও আয়াত সংখ্যার তালিকা এবং মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ লেখা হয়েছে। এই উভয় এডিশন নিঃসন্দেহে দেওয়ানবাগী সাহেব কর্তৃক আল কুরআন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে বের হয়েছে। তাদের গবেষণা কেন্দ্র, যেমনটি পাঠক পড়ে এসেছেন, ১৯৯৮ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে তিনি সর্বপ্রথম জানতে পারেন এই কেন্দ্রে কাজ শুরু হওয়ার পর। এ বিষয়টিও তার ভক্তদের বক্তব্যেই পাঠক পড়ে এসেছেন। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা সামনে রেখে দেওয়ানবাগী সাহেবের সূফী ফাউন্ডেশন ওয়ালাদের নিম্নোক্ত বক্তব্য পড়ুন–

"পরবর্তীতে মহান সংস্কারক মোহাম্মদী ইসলামের পুণর্জীবনদানকারী সূফী সম্রাট হযরত দেওয়ানবাগী (মাঃ আঃ) হুজুর কেবলার বক্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পবিত্র কুরআন শরীফে সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি বলে উল্লেখ করেছে।"–'সূফী সম্রাটের যুগান্ত কারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৪, প্রকাশক : সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাবে রহমত, ১৪৭ আরামবাগ, ঢাকা; দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৫ ইং; প্রথম এডিশন (যাতে আয়াত সংখ্যার আলোচনা ছিল না বরং এই এডিশনে উভয় খণ্ড একই মলাটে ছিল) জানুয়ারি ১৯৯৬ ইং

এই প্রকাশ্য মিথ্যাচার (তাও তা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নয় একটি প্রতিষ্ঠানের উপর) সম্পর্কে কোন পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। পাঠক শুধু তারিখগুলো মিলিয়ে দেখুন, ব্যস।

তো তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এই যে, সূরাসমূহের আয়াত সংখ্যা যোগ করার কাজও তো বাংলা ভাষায় আপনার অনেক আগেই হয়েছিল তাহলে আপনারা সংস্কারের দাবী করছেন কোন কথার উপর? আপনারা তো দেওয়ানবাগী সাহেবকে শুধু সংখ্যা যোগ করা আর যোগফল বেরকারী সংস্কারক নয়, আয়াত সংখ্যা নির্ধারণকারী ও নিরূপণকারী সংস্কারকও বানিয়ে দিয়েছেন অথচ আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণের কাজ রাসূলের যুগেই হয়ে গিয়েছিল।[৩৭] আর বিভিন্ন গণনা

[৩৭] আবু আমর আদদানী (৩৭১-৪৪৪ হি.), আল বয়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন, পৃষ্ঠা : ২১-৪০; ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ ইং), কুরআন প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা : ১০২-১০৬

পদ্ধতির কোন্ গণনা পদ্ধতিতে মোট আয়াত সংখ্যা কত তা খায়রুল কুরুনেই প্রসিদ্ধ ছিল। ইলমে আদাদ সম্পর্কে লিখিত যে কোন কিতাব পড়লেই বিষয়টি জানা যাবে। তাহলে আপনাদের এই সংস্কারের দাবীর কী অর্থ?

চতুর্থ প্রশ্ন হল আপনাদের সকল হিসাব-কিতাবের ভিত্তি যখন সূরার শুরুতে লেখা সংখ্যা তো যে সব মুসহাফের আয়াত সংখ্যা হিসাব করে যোগফল ৬২৩৬ বের করতে পারবেন না সেখানে আপনারা কী করবেন। ইসলামিক একাডেমি থেকে তিন খণ্ডে আল কুরআনুল কারীমের যে অনুবাদ বের হয়েছে সেখানে আয়াত সংখ্যা হিসেব করলে বের হবে ৬২৩৭। মোহাম্মদী লাইব্রেরি ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোন কোন মুসহাফ থেকে অথবা নাদিয়াতুল কুরআন থেকে ছাপা হওয়া কোন কোন মুসহাফ থেকে আয়াত সংখ্যা হিসাব করা হলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৬২৩৮। ১২৯৮ হিজরীতে আস্তানা (তুরস্ক) থেকে যে মুসহাফ প্রকাশিত হয়েছে তার আয়াত সংখ্যা হিসাব করলে মোট সংখ্যা পাওয়া যাবে ৬২৪৪।[*] এ ক্ষেত্রে দেওয়ানবাগী সাহেব ও তার লোকজন কী বলবেন? তাদের পুরো আলোচনা পড়লে তো মনে হয় তারা বিভিন্ন গণনা পদ্ধতির কারণে বা অন্য কোন কারণে মোট আয়াত সংখ্যার পার্থক্য দেখা দিলে সেটিকে (আল্লাহ মাফ করুন) আয়াত কমবেশ হওয়ার পার্থক্য মনে করেন। অথচ বিষয়টি এমন নয়। সব মুসহাফেই কুরআনের মতন (পাঠ) এক। এক বাক্য তো দূরের কথা এক শব্দেরও কম বেশ নেই। তাহলে মোট সংখ্যার এই পার্থক্য কেন দেখা দিল? প্রকাশকের ভুল হল কোথায়? আয়াত গণনার বিষয়টি যদি কোন মাসআলাই না হয়, শুধু গণনা করার দ্বারাই কাজ শেষ হয়ে যায় তাহলে তারা এই জটিলতাগুলোর সমাধান করবেন কীভাবে? (পাঠক এ সম্পর্কে এ প্রবন্ধের ৭ নং অধ্যায় পড়ুন।) হায় তারা যদি সংস্কারের দাবী করার আগে এই মাসআলার হাকীকত বোঝার চেষ্টা করতেন।

পঞ্চম প্রশ্ন হল, আমাকে শুধু এতটুকু বলুন, এই বাক্যটি আপনাদের কলম থেকে কীভাবে বের হল "তিনিই বিশ্বের প্রথম মহামানব, যিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতের সঠিক ও নির্ভুল সংখ্যা নিরূপন করে মুসলিম জাতির ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি নয়, ৬২৩৬টি।" - 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩২

এই এক বাক্যে একসাথে কতগুলো মিথ্যাচার করা হয়েছে দেখুন-

১. আয়াত সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে মিথ্যাচার, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে এবং পুরো প্রবন্ধ জুড়েই স্পষ্টভাবে যা বয়ান করা হয়েছে যে, আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণের কাজ রাসূলের যুগেই হয়ে গিয়েছিল এবং যারা কুরআনের হাফেজ ছিলেন বা কুরআনের আলেম ছিলেন তারা প্রত্যেক সূরার মোট আয়াত সংখ্যাও জানতেন। আর অন্যদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা কমপক্ষে নিজেরা কুরআনুল কারীমের যতটুকু অংশ হিফজ করতেন তার মোট আয়াত সংখ্যা জানতেন।

২. এক যুগ ও এক অঞ্চল নয়, সর্বকালের সকল মুসলমানের ব্যাপারে এ কথা যে, তারা ভুলের মাঝে ছিল।

৩. শুধু আম মানুষ নয়, আম মানুষ ও আলেম সমাজ নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর সবাই আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে ভুলের মাঝে ছিল।

৪. এই দাবী, দেওয়ানবাগীই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি এ কথা বলেছেন যে, আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। অথচ দেওয়ানবাগী এ কথা বলেছেন ১৯৯৮ ইং এর পর। আর ৬২৩৬ এই কুফী সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে হযরত আলী রা. থেকে। আলী রা. এর ইন্তেকাল ৪০ হিজরী মোতাবেক ৬৬১ ইংরেজিতে। তো যে কথা ৬৬১ ইং এর পূর্বে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং যা এরও আগে রাসূলের তালীমে ছিল তার প্রথম প্রবক্তা দেওয়ানবাগী সাহেব কী করে হন, যার জন্মই হয়েছে ১৯৪৯ ইং এ?[*] ! إنا لله وإنا إليه راجعون

চার.

এমনিতে তো সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে প্রত্যেক যুগের অসংখ্য হাওয়ালা দেখানো যাবে যে যুগে যুগে শত শত আলেম সঠিক সংখ্যাটি লিখেছেন ও বলেছেন। এই বলা ও লেখাতেই এ সংক্রান্ত ভুল সংখ্যাগুলোর খণ্ডন আছে। এরপরও কোন ভুল বোঝাবুঝির কারণে কোন ভুল সংখ্যা সৃষ্টি হলে বা-খবর আহলে ইলমরা তা ভুল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন। আর অধিকাংশ আলেমগণ শুধু সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করাটাই যথেষ্ট মনে করেছেন। তাদের মতে সঠিক সংখ্যা লিখে ব্যাপকভাবে প্রচার করাই ভুল সংখ্যা মিটে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইলমে আদাদ সম্পর্কে যুগে যুগে রচিত কিতাবাদির একটি তালিকা এ প্রবন্ধে ২ নং অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোর প্রত্যেকটিতে সংক্ষিপ্তভাবে বা বিস্তারিতভাবে সঠিক সংখ্যার উল্লেখ আছে। এছাড়া

[*] দ্রষ্টব্য, আল বুরহানুল কাওবীম ফিল হাজাতি ইলা অদ্দিল আয়িল কুরআনিল কারীম, আহমদ আফিন্দী আমীন, আলমানার (৯।৫), মিশরে প্রকাশিত, ১৩৪২ হি. এর জুমাদাল উলা সংখ্যা

[*] দেওয়ানবাগী সাহেবের জন্মসন 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধের অধিকাংশ উৎসগ্রন্থেও (যেগুলোর উদ্ধৃতি এ প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে দেয়া হয়েছে) সঠিক সংখ্যার উল্লেখ আছে। খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ অনেক কিতাবের হাওয়ালা পাঠক ইতিমধ্যে পড়েছেন। এ সত্ত্বেও প্রতিটি কিতাব দেওয়ানবাগী সাহেবের ভক্তদের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, যারা এ কথা বলেছে যে, দেওয়ানবাগী সাহেবই বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি যে কুরআনুল কারীমের সঠিক আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

نعوذ بالله من الكذب والكاذبين

তারপরও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষ করে আমাদের এ উপমহাদেশে বিংশ শতকের কতক আলেমের হাওয়ালা এখানে উল্লেখ করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। যাদের লেখায় হয়তো ৬২৩৬ সংখ্যাটির উল্লেখ এসেছে অথবা উল্লেখের পাশাপাশি ৬৬৬৬ সংখ্যাটিরও 'রদ' করা হয়েছে। এখানে আমি সব হাওয়ালা তো উল্লেখ করব না তবে যে হাওয়ালাই উল্লেখ করব তা ১৯৯৮ ইং এর আগের হাওয়ালা।

শুধু বিংশ শতকের কিছু হাওয়ালা ১৯৯৮ ইং এর আগ পর্যন্ত

বিংশ শতকের প্রারম্ভ জানুয়ারি ১৯০১ ইং চান্দ্রমাসের হিসেবে শাওয়াল ১৩১৯ হি. দাঁড়ায়। আর ১৯৯৮ ইং সূচনা হয়েছে ১৪১৯ হিজরীর রমযানুল মুবারকে। তাই আমরা শুধু ১৯০১ ইং মোতাবেক ১৩১৯ হি. থেকে ১৯৯৮ ইং মোতাবেক ১৪১৮ হি. পর্যন্ত সময়ের কিছু হাওয়ালা উল্লেখ করব যাতে মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে ৬২৩৬ সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এই সংখ্যার পাশাপাশি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৬৬৬৬ সংখ্যাটি একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি। কেউ তা উল্লেখ করে থাকলে খণ্ডন করার জন্য উল্লেখ করেছে। এই তথ্যগুলো থেকেই আন্দাজ করা যাবে যে শুধু এই শতকে পুরো বিশ্বে কত বেশি ও কত আঙ্গিকে এই সঠিক সংখ্যার উল্লেখ হয়েছে।

মুসহাফের পরিশিষ্টে ৬২৩৬ সংখ্যাটির উল্লেখ

প্রথমে আমরা নমুনাস্বরূপ বিংশ শতকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত কিছু মুসহাফের কথা উল্লেখ করছি। যেগুলোর পরিশিষ্টে কূফী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ স্পষ্টবাক্যে লেখা হয়েছে। শুধু এই সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকেই আন্দাজ করা যাবে যে, পুরো বিশ্বে শুধু এই শতকে এই সংখ্যাটি কত বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। আগের যুগের কথা তো বাদই দিলাম।

১. আলমুসহাফুল মিসরী

রবিউস সানী ১৩৩৭ হি. মিসরের কায়রোতে প্রস্তুতকৃত এবং ১৩৪২ হি. মোতাবেক ১৯২৩ ইং সনে প্রকাশিত এই মুসহাফ পুরো বিশ্বে লক্ষ লক্ষ কপি বিলি হয়েছে। পরবর্তীতে এই মুসহাফের মতনকে সামনে রেখে বিভিন্ন অনুবাদ ও তাফসীরও রচনা করা হয়েছে।

মিসর ও মিসরের বাইরে এই মুসহাফের অসংখ্য এডিশন ছাপা হয়েছে। এই মুসহাফ লেখা, প্রুফ সংশোধন করা এবং তা ছাপার দায়িত্বে ছিলেন ইলমে কেরাআতের বড় বড় বিশেষজ্ঞগণ, সে কালে যারা এ শাস্ত্রের বড় ইমাম হিসেবে গণ্য হতেন। মুসহাফটি লিখেছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে খালাফ আলহুসাইনী (১৩৫৭ হি. মোতাবেক ১৯৩৯ ইং)। তিনি সে সময়ে গোটা মিসরের ইলমে কেরাআতের সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। প্রভূত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই মুসহাফের পরিশিষ্টে التعريف بهذا المصحف الشريف এর শিরোনামে লেখা হয়েছে–

«واتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، عن علي بن أبي طالب، على حسب ما ورد في كتاب «ناظمة الزهر» للإمام الشاطبي، وشرحها لأبي عيد رضوان المخللاتي، وكتاب أبي القاسم عمر بن محمد ابن عبد الكافي، وكتاب «تحقيق البيان» للأستاذ الشيخ محمد المتولي، شيخ القراء بالديار المصرية سابقا، وآي القرآن على طريقتهم ٦٢٣٦»

এ মুসহাফে আয়াত গণনার ক্ষেত্রে কূফী গণনা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। যা আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব আসসুলামীর সূত্রে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রা. থেকে বর্ণিত। যেমনটি আছে শাতেবী রচিত 'নাযেমাতুয যুহর', আবু ঈদ মুখাল্লিলাতী রচিত শাতেবীর কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, আবুল কাসেম উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কাফী'র কিতাব এবং মিসরের শায়খুল কুররা উস্তায মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লীর কিতাব 'তাহকীকুল বয়ানে'। এ গণনা অনুসারে কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।[৪০]

---

[৪০] মুসহাফে মিসরী সম্পর্কে জানতে দেখা যেতে পারে–
ক. আলমুসহাফুল মুয়াসসার, আবদুল জলীল ঈসা, দারুল ফিকর ১৩৯৯ হি.= ১৯৭৯ ইং
খ. মাবাহিছু ফি উলূমিল কুরআন, সুবহী সালেহ, পৃষ্ঠা : ৯৯-১০০
গ. বুহুসুন ফি উলূমিল কুরআন, মুহাম্মদ নাবিল গানায়েম, দারুল হিদায়া ১৪১৩ হি. পৃষ্ঠা : ৬২
ঘ. আবহাসুন ফি উলূমিল কুরআন, গানেম কাদ্দুরী আল হামদ, পৃষ্ঠা : ২৩৩, দারে আম্মার, জর্ডান

২. আলকুরআনুল হাকীম, আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর

১৩৫৪ হি. আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর অত্যন্ত যত্নসহকারে একটি মুসহাফ লেখায় এবং শানদার মুদ্রণে তা প্রকাশ করে। এই মুসহাফটিও অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই মুসহাফের শুরুতে ১৯-৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট দশটি সূচি প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সূচি পারার। তৃতীয় সূচি তেলাওয়াতের বিন্যাস অনুসারে সূরার। চতুর্থ সূচিও সূরার, তবে তা সূরা নাযিল হওয়ার বিন্যাস অনুসারে। পঞ্চম সূচি হরফে হিজা বা বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে সূরার। ষষ্ঠ সূচি রুকু সম্পর্কে। এই সবগুলো সূচিতে বিস্তারিতভাবে আয়াত সংখ্যার আলোচনা আছে যে, কোন্ পারায় কত আয়াত, কোন্ সূরায় কত আয়াত, কোন্ রুকুতে কত আয়াত। আর ২১ পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে মোট আয়াত সংখ্যাও লেখা হয়েছে এভাবে- "কুরআনুল কারীমের আয়াত ৬২৩৬।"

৩. দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত মুসহাফ

১৩৭১ হি. মোতাবেক ১৯৫২ ইং দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ এবং জামে আযহারের শায়খ আবদুল মাজীদ সালীম রহ. এর তত্ত্বাবধানে আলী মুহাম্মদ আদদব্বা ও আবদুল ফাত্তাহ কাযী (১৩২৫-১৪০৩ হি.) সহ বড় বড় আলেমগণ মিসরী মুসহাফে নযরে ছানী করেন অতপর দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ থেকে তা ছাপা হয়। নযরে ছানী করা এই এডিশনেও আয়াত গণনার পূর্বোক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে এবং মোট আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে পূর্বোক্ত বক্তব্যই বহাল রাখা হয়েছে অর্থাৎ মুসহাফের শেষে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

৪. আলকুরআনুল কারীম, তেহরান

ইরান মুসহাফ ছাপার তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১২.০৭.১৩৭৫ হি. অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত মুসহাফের শেষে ১১৪ সূরার তালিকায় প্রতি সূরার আয়াত সংখ্যা, শব্দ সংখ্যা এবং হরফ সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তালিকার শুরুতে আলকুরআনের পরিসংখ্যান পরিচিতিও রয়েছে। তাতে লেখা আছে, (۶۲۳۶) آیات: قرآن

৫. দারুল ফাতওয়া আললুবনানিয়্যাহ'র অনুমতিক্রমে ছাপা মুসহাফ

বৈরুত লেবানন থেকে ১৩৮০ হি. মোতাবেক ১৯৬০ ইং তে ইলমে কেরাআতের সেকালের ইমাম আবদুল ফাত্তাহ কাযীর তত্ত্বাবধানে কারী খলীল হুসারী রহ. সহ একদল কারীর (ইলমে কেরাআতে পারদর্শী) প্রুফ সম্পাদনার পর যে মুসহাফ ছাপা হয়েছিল তার শেষেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে।

৬. দারুল কিতাব আললুবনানী এর ইংরেজি অনুবাদকৃত মুসহাফ

মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়া আযহারের অনুমতিক্রমে ১৮ মহররম ১৩৯৩ হি. মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ ইং এ অনুমতি প্রাপ্তির পর দারুল কিতাব আললুবনানী মুহাম্মদ মরমাডিউক পিকথালকৃত কুরআনুল কারীমের ইংরেজি অনুবাদ ছাপে। পিকথাল তার ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে যে মুসহাফটি সামনে রেখেছেন তা ১২৪৬ হিজরীতে আলহাজ্ব মুহাম্মদ শুকর যাদাহ লেখেন এবং তুর্কী সুলতান সুলতান মাহমুদের নির্দেশে তা ছাপা হয়।

ইংরেজি অনুবাদসহ এই মুসহাফের শেষে উর্দূভাষায় خصوصیات শিরোনাম দিয়ে তা-ই লেখা হয়েছে যা 'আলমুসহাফুল মিসরী'র শেষে লেখা হয়েছে।

৭. বঙ্গানুবাদ নূরানী কুরআন শরীফ

১৯৬০ ইং এর দিকে এমদাদিয়া লাইব্রেরি চকবাজার ঢাকা কুরআনুল কারীমের সাথে নোয়াখালী রায়পুর (বর্তমানে লক্ষীপুর) আলিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা নূরুর রহমান সাহেব কৃত কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ছাপে। এটি মূলত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কৃত আলকুরআনুল কারীমের উর্দূ অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। সে সময়ের বড় বড় আলেমগণ এই বাংলা তরজমা সম্পাদনা করেন। যাদের মধ্যে হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ রহ., মুফতী আবদুল মুঈয রহ. ও মাওলানা আবদুল মজীদ ঢাকুবী রহ. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই অনূদিত মুসহাফটির প্রথম এডিশনের কোন কপি আমি এখনও পাইনি। তবে এর পঞ্চম এডিশন আশরাফুল উলূম বড় কাটরা'র কুতুবখানায় পেয়েছি। এতে প্রকাশকাল লেখা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ইং। পল্লবী মসজিদুল আমান ও পল্লবী আফতাব উদ্দীনের মসজিদে চতুর্থ এডিশনের কপি পাওয়া গেছে। এতে প্রকাশকাল লেখা আছে ১৮ এপ্রিল ১৯৮১ ইং। এরপর জামিয়া মাহমুদিয়া বরিশালের কুতুবখানায় মওলবী সামীদুল হক এর তৃতীয় এডিশন পান। এতে প্রকাশকাল লেখা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইং।

কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদরাসায় এর দ্বিতীয় এডিশনের কপি পাওয়া গেছে। এতে প্রকাশকাল লেখা হয়েছে ১৯৭৩ ইং। কপিটির সন্ধান দিয়েছে আমাদের ছাত্র শুআইব (ইবনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম)

এই সব এডিশনে সূরা নাস শেষ হওয়ার পর ৯৬৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—

"পূর্ণ কোরআন শরীফে ৭ মঞ্জিল, ১১৪ সূরা আছে। এবং উহাতে ১৪ সেজদাহ (ওয়াজিব), ৫৫৮ রুকু, ৬২৩৬ আয়াত, ..."

এমদাদিয়া লাইব্রেরির এই অনুবাদসহ নূরানী কুরআন শরীফের অসংখ্য কপি বের হয়েছে। বর্তমানে যে এডিশন বের হয় তার ভূমিকায় আয়াত সংখ্যার উল্লেখ থাকে। ভূমিকার ৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—

"আয়াতের সংখ্যাগণনাও কূফী আলেমগণের মতানুসারে করা হইয়াছে যাহা তাহারা আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) হইতে এবং তিনি হযরত আলী রাযিয়াআল্লাহু আনহু হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। যেমন আবূ আমর দানী রচিত 'আল-বয়ান' ও ইমাম আবুল কাসেম শাতেবী (রঃ) রচিত 'নাযেমাতুয যাহর' গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মতানুসারে পূর্ণ কোরআন পাকে আয়াত সংখ্যা মোট ৬২৩৬।"

এবং ১১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—

"পূর্ণ কোরআন শরীফে ৭ মঞ্জিল, ১১৪ সূরা আছে। এবং উহাতে ১৪ সজদা (ওয়াজিব), ৫৫৮ রুকু, ৬২৩৬ আয়াত, ... আছে।"

শুধু এই মুসহাফের শুরুতেই নয় এমদাদিয়া লাইব্রেরি কর্তৃক ছাপা সারাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত 'নূরানী হাফেজী কুরআন শরীফে'র ভূমিকায়ও স্পষ্টভাবে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা করেছে। কুরআন লিপিকার মাওলানা গরীবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী ১৯৭৭ ইং সনে এই মুসহাফটি লেখেন। এই মুসহাফের বিভিন্ন এডিশনের ভূমিকায় লেখা হয়েছে—

"আয়াতের সংখ্যাগণনাও কূফী আলেমগণের মতানুসারে করা হইয়াছে যাহা তাহারা আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) হইতে এবং তিনি হযরত আলী রাযিয়াআল্লাহু আনহু হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। যেমন আবূ আমর দানী রচিত 'আল-বয়ান' ও ইমাম আবুল কাসেম শাতেবী (রঃ) রচিত 'নাযেমাতুয যাহর' গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মতানুসারে পূর্ণ কোরআন পাকে আয়াত সংখ্যা মোট ৬২৩৬।" (পৃষ্ঠা : ৬-৭)

ভূমিকার শেষে লেখা হয়েছে—

"পূর্ণ কোরআন শরীফে ৭ মঞ্জিল, ১১৪ সূরা আছে। এবং উহাতে ১৪ সজদা (ওয়াজিব), ৫৫৮ রুকু, ৬২৩৬ আয়াত,... আছে।" (পৃষ্ঠা : ১০)

এমদাদিয়া লাইব্রেরি চকবাজার ঢাকা'র এই মুসহাফের (নূরানী হাফেজী কুরআন শরীফ) অনেক এডিশনে আমি উপরোক্ত আয়াত সংখ্যার আলোচনা দেখেছি। কিছু এডিশন আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। সারাদেশের বিভিন্ন মসজিদে তালাশ করলে পাঠকও তা দেখতে পারবেন। তবে এই মুসহাফের কোন কোন এডিশনের ভূমিকায় মোট আয়াত সংখ্যার উল্লেখ নেই।

এমদাদিয়া লাইব্রেরি এ ছাড়া আরও অনেক মুসহাফ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে অনেক মুসহাফেরই শুরুতে কিংবা শেষে তারা মোট আয়াত সংখ্যা লিখেছেন ও লিখছেন। গত দুই-এক মাস আগে আমি তাদের প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র থেকে একটি মুসহাফ সংগ্রহ করেছি। যার শিরোনাম হল, 'নূরানী কুরআন শরীফ' (৩ নং লেমিনেটেড) এর শেষে সূরা নাসের পরে লেখা হয়েছে—

বর্ণিত আছে যে, পূর্ণ কোরআন শরীফে ৭ মঞ্জিল, ১১৪ সূরা আছে এবং উহাতে ১৪ সেজদাহ (ওয়াজেব), ৫৫৮ রুকু, ৬২৩৬ আয়াত ... আছে। (পৃষ্ঠা : ৯৬৬)

৮. মুসহাফু মুআসসাসাতি উলূমিল কুরআন

৮ জুমাদাল উখরা ১৩৯৮ হি. মোতাবেক মে ১৯৭৮ ইং তে সিরিয়ার প্রধান দারুল ইফতার পক্ষ থেকে দেওয়া অনুমতিক্রমে মুআসসাসাতু উলূমিল কুরআন যে মুসহাফ প্রকাশ করেছে তার শেষেও ৫২৬ পৃষ্ঠায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. আলকুরআনুল কারীম বিররসমিল উসমানী

দারুল কুরআনিল কারীম বৈরুত লেবানন থেকে ১৩৯৮ হিজরীতে এই শিরোনামে যে মুসহাফ ছেপেছিল তার শেষেও এ কথার উল্লেখ আছে।

১০. আলকুরআনুল কারীম বির রসমিল উছমানী দোহা, কাতার

কাতার সরকারের ধর্ম বিষয়ক প্রধান ব্যক্তিত্ব শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম আল আনসারীর তত্ত্বাবধানে ১৪০২ হি. মোতাবেক ১৯৮২ ইং এ প্রকাশিত। এতেও মুসহাফের শেষে একই কথা লেখা আছে।

১১. আলকুরআনুল কারীম বিরিওয়াতি ওরশ আনিল ইমাম নাফে'

ইমাম নাফে' মাদানী সাত কারীর এক কারী। তার শাগরেদ ওরশ এর রেওয়ায়েত অনুসারে এই মুসহাফ ছেপেছে। আলজাযায়েরের শহর কারারাতে লিপিকার মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ শরীফী এই মুসহাফটি লেখেন। ১৩৯৮ হিজরীর ২৬ রমযানুল মুবারক সন্ধ্যায় এটি লেখা শেষ হয়। পাঁচজন বড় বড় কারী আলেম এর প্রুফ সম্পাদনা, ছাপা ও প্রকাশের তত্ত্বাবধানের কাজ করেন। আলজাযায়েরের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে আশশারিকাতুল ওয়াতনিয়্যাহ লিননাশরি ওয়াত তাওযী' এটি ছাপার খেদমত আঞ্জাম দেন। এর ১৯৮১ ইং সনের এডিশন আমাদের কাছে আছে। পূর্বে বলা হয়েছে এই মুসহাফেও কূফী গণনা পদ্ধতি অনুসারে

আয়াত গণনা করা হয়েছে। মুসহাফের শেষে ب পৃষ্ঠায় এ কথা উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

১২. আসাহহুল মাসাহেফ ইদারাতুল কুরআন করাচি

খায়রুল মাদারেস মুলতান এর কেরাআত বিভাগের সাবেক প্রধান শায়খুল কুররা রহিম বখশ পানিপথি রহ. (১৪০২ হি. মোতাবেক ১৯৮২ ইং) এবং তার সহযোগীদের প্রযত্ন প্রুফ সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানের পর ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া 'আসাহহুল মাসাহিফ' শিরোনামে এই মুসহাফ ছাপে। এর শেষে সূচিপত্রের পর 'নুসখা পরিচিতি'তে লেখা হয়েছে–

إن أعداد آيات القرآن سبعة، المدني الأول، والمدني الأخير، والمكي، والبصري، والدمشقي، والحمصي، والكوفي، ولما كان العدد الكوفي معتبرا في قراءة الإمام عاصم الكوفي لاحفظاء، وعدد آيات القرآن فيه ٦٢٣٦، ووضعنا رقم ٥ عند الآية غير الكوفية، وهذا كله بحسب نصوص كتب هذا الفن كالناظمة للشاطبي، وسعادة الدارين للشيخ محمد بن خلف الحسيني وغيرهما.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় এই ইবারতের উর্দূ তরজমাও আছে। এর আগে رموز أوقاف قرآن مجيد (কুরআন মাজীদের ওয়াকফের চিহ্নবলী) শিরোনামের অধীনে লেখা হয়েছে–

اور کوفی قراءت کے مطابق جن کی روایت حفص اب مروج ہے کل ۶۲۳۶ آیات ہے۔

তো এই মুসহাফে তিন জায়গায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ লেখা হয়েছে।

১৩. মুসহাফুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ

সৌদি আরবের ইদারাতুল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ ০৩/০৪/১৪০৩ হিজরী এ প্রদত্ত অনুমতিক্রমে দারুল ইলম লিততিবায়াতি ওয়ান নাশরি জেদ্দাহ সৌদি আরব উপরোক্ত মুসহাফ প্রকাশ করে। এই মুসহাফের শেষে ৫২৫-৫২৬ পৃষ্ঠায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ স্পষ্টভাবে লেখা আছে।

১৪. আলকুরআনুল কারীম মাআ তাশরীহিল মুতাশাবিহাত

মাদরাসায়ে হিফজুল কুরআন আসলাম রোড এর কুরআনী কম্পিউটার উপাধিতে ভূষিত কারী আবদুল হালীম চিশতী'র তত্ত্বাবধানে ১৪০৩ হি. মোতাবেক ১৯৮৩ ইং এই মুসহাফটি ছাপা হয়। এর শেষে رموز أوقاف এর বর্ণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. আলকুরআনুল কারীম বির রসমিল উসমানী

দারুল কিতাবিল আরাবী বৈরুত লেবানন ১৪০৪ হি. মোতাবেক ১৯৮৪ ইং এই মুসহাফ ছাপে। এর كلمة التعريف এও এই সংখ্যা লেখা হয়েছে।

১৬. মুসহাফু দারুশ শুআহ জেদ্দাহ

জেদ্দার দারুশ শুআহ ১৪০৫ হি. মোতাবেক ১৯৮৫ ইং 'আলকুরআনুল কারীম বির রসমিল উসমানী' শিরোনামে যে মুসহাফ ছেপেছে তার كلمة التعريف এও (৫২৩ পৃষ্ঠায়) এই সংখ্যাই (৬২৩৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. মুসহাফুল মাদীনাতিন নববিয়্যাহ

খাদেমুল হারামাইনিশ শারিফাইন মালিক ফাহাদ ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসহাফ ছাপানোর ব্যাপক সমাদৃত প্রতিষ্ঠান মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ লিততিবাআতিল মুসহাফিশ শরীফ এর উদ্যোগে বড় বড় আলেম ও কেরাআত বিশেষজ্ঞদের প্রুফ সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে ১৪০৫ হিজরীতে 'মুসহাফুল মাদীনাতিন নববিয়্যাহ' ছাপার ধারা শুরু হয়। যার লক্ষ লক্ষ কপি প্রকাশিত হয়েছে। মুসহাফুল মদীনাতিন নববিয়্যাহ'র প্রত্যেক এডিশনে মুসহাফের শেষে নুসখার পরিচিতি সম্পর্কে সম্পাদনা কমিটির লম্বা বক্তব্য আছে। এ বক্তব্যে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রত্যেক এডিশনেই এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, আয়াত গণনা করার ক্ষেত্রে কুফী গণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং এ গণনা পদ্ধতিতে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

১৮. মুসহাফ 'ফি কিতাবিম মাকনূন' জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া,

ইন্দোনেশিয়া ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে (১৯৮৫ ইং) প্রকাশিত

১৯. আলকুরআনুল কারীম, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন

প্রকাশনার জগতে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই মুসহাফ প্রকাশিত হয়। এটি সিরিয়ার ইলমে কেরাআতের আলেমগণের শায়েখ ও মুরুব্বী শায়খ হুসাইন খাত্তাবের অনুমোদনের পর ছেপেছে। অনুমোদনের তারিখ ১০ রমযান ১৪০৬ হি. মোতাবেক ১৮ মে ১৯৮৬ ইং

২০. আলকুরআনুল কারীম ওয়া তরজমাতু মাআনিহি ইলাল্লুগাতিস সিনিয়্যাহ

চীনাভাষী মুসলমানদের জন্য মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদের পক্ষ থেকে ১৪০৭ হিজরীতে প্রকাশিত। এই তিনো মুসহাফেই প্রকাশকের পক্ষ থেকে আয়াত সংখ্যাটি স্পষ্টভাষায় লেখা আছে ৬২৩৬।

২১. আলকুরআনুল কারীম ওয়া তরজমাতু মাআনিহি ইলাল্লুগাতিল কাযাকিয়্যাহ

১৪১১ হিজরীতে মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ কাযাকী ভাষায় অনুবাদসহ এই মুসহাফটি ছাপে। এতেও (৭ পৃষ্ঠায়) ৬২৩৬ সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

২২. আলকুরআনুল কারীম ওয়া তরজমাতু মাআনিহি লি আহলি বুসিনাহ ও হিরসাক

মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ ১৪১২ হিজরীতে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ও হিরসাকের লোকদের জন্য তাদের ভাষায় তরজমাসহ এই মুসহাফ ছাপে। এতেও পূর্বোক্ত সংখ্যার (। পৃষ্ঠায়) উল্লেখ আছে।

২৩. আলকুরআনুল কারীম ওয়া তরজমাতু মাআনিহি ইলাল্লুগাতিস সোমালিয়া

১৪১২ হিজরীতে মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ সোমালিয়ার অধিবাসীদের জন্য সোমালিয়ার ভাষায় তরজমাসহ এই মুসহাফ ছাপে। এতেও (ب পৃষ্ঠায়) এই সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪. আলকুরআনুল কারীম বাইতুল কুরআন করাচি

২৯/০৮/১৯৯১ ইংরেজিতে মাহকামায়ে আওকাফে হুকুমাতে সিন্দ বাইতুল কুরআন উর্দূ বাজার করাচিকে কুরআন প্রকাশক হিসেবে রেজিষ্টার করে নেয়। তাদের প্রকাশিত মুসহাফের শেষে (৬১২ পৃষ্ঠায়) উক্ত সংখ্যার উল্লেখ আছে।

২৫. কুরআনে কারীম মাআ আসান তরজমা উর্দূ

হাফেজ নযর আহমদকৃত 'আসান উর্দূ তরজমা'র সাথে এই মুসহাফটি ছাপে মুসলিম একাডেমি মুহাম্মদ নগর লাহোর। ২৭ জুমাদাল উলা ১৪১২ হি. মোতাবেক ৩ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং মসজিদে নববীর সুফফায় এর কাজ শেষ হয়। ১০ রবিউস সানী ১৪০৮ হি. মোতাবেক ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ইং বাইতুল্লাহয় তিনি এর কাজ শুরু করেছিলেন। এর শেষে প্রদত্ত সূচিতে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সব সূরার আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরার শেষে সব সূরার আয়াত সংখ্যার যোগফল ৬২৩৬ স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে। দেখুন, ১২৯৬ পৃষ্ঠা।

২৬. আলকুরআনুল কারীম ওয়া তরজমাতু মাআনিহি ইলাল্লুগাতিল ইনদোনেসিয়া

প্রকাশকাল : ১৪১৩ হি. প্রকাশক : মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ

২৭. মুসহাফুল মামলাকাতিল উরদুনিয়্যাহ আলহাশেমিয়্যাহ

জর্ডানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৪১৪ হি. মোতাবেক ১৯৯৩ ইং যে মুসহাফ ছেপেছে উভয়ের শেষে এই সংখ্যার (৬২৩৬) উল্লেখ আছে।

২৮. সহীহ নূরানী হাফেজী কুরআন শরীফ

আশরাফিয়া লাইব্রেরি চৌমুহনী নোয়াখালী বাংলাদেশ ২০ মুহাররম ১৪১৫ হি. মোতাবেক ২৯ জুন ১৯৯৪ ইং সনে কতক হাফেজ, কারী ও আলেমের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে এই মুসহাফটি ছাপে। এই মুসহাফের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পরিচিতিতে'তে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ লেখা হয়েছে এবং এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ সংখ্যা কূফী গণনা সংখ্যা যার ভিত্তি হযরত আলী রা. এর গণনা। শাবান ১৪১৫ হি. মোতাবেক ১৯৯৫ ইং সনে এ মুসহাফের যে এডিশন বের হয়েছিল তাও আমাদের সামনে আছে। এর শুরুতেও একই কথা আছে।

এ মুসহাফের ভূমিকায় ৯ পৃষ্ঠায় 'কুরআন শরীফের পরিসংখ্যান পরিচিতি' শিরোনামের অধীনেও এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। ছয় নম্বরে লেখা হয়েছে, 'আয়াত : ৬২৩৬'।

২৯. এইচ এম সাঈদ কোম্পানী আদব মনযিল পাকিস্তান চক করাচি শাহ আবদুল কাদের দেহলভী রহ. কৃত বিশ্বখ্যাত তাফসীর 'মূযিহে কুরআন' মাওলানা আখলাক হুসাইন কাসেমী এর সম্পাদনা ও ব্যাখ্যাসহ ছাপে। 'প্রকাশকের কথায়' তারিখ দেওয়া হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং আর মুহাক্কিকের দস্ত খতে তারিখ লেখা হয়েছে ৪ শাবান ১৪০৮ হি. মোতাবেক ১৪ এপ্রিল ১৯৮৮ ইং। অনুবাদসহ এই মূল্যবান মুসহাফটির শেষে ৭৯৯ পৃষ্ঠা থেকে ৮০৩ পর্যন্ত 'পারা ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ সূরার সূচি' আছে। প্রত্যেক সূরার নামের পাশে সেই সূরার আয়াত সংখ্যা আছে এবং শেষে যোগফল ৬২৩৬ লেখা আছে।

৩০. আলকুরআনুল কারীম ওয়া তরজমাতু মাআনিহি ইলাল্লুগাতিল ইনজিলিযিয়্যাহ

মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ ১৪১৭ হিজরীতে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীকৃত কুরআনুল কারীমের ইংরেজি তরজমা সম্পাদনা করে মুসহাফের সঙ্গে তা প্রকাশ করে। এই মুসহাফের শেষে ৯৪২ পৃষ্ঠায় মোট সংখ্যা ৬২৩৬ই উল্লেখ আছে।

৩১. আলকুরআনুল কারীম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ তো অনেক আগ থেকেই ছাপছে। এর আঠারোতম এডিশন জুমাদাল উলা ১৪১৭ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১৯৯৬ ইং প্রকাশিত হয়। এই এডিশনের শুরুতে সূরার সূচিতে প্রত্যেক সূরার পাশে সেই সূরার আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূচির শেষে সব সূরার আয়াত সংখ্যার যোগফল ৬২৩৬ ও উল্লেখ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে,

'সর্বমোট আয়াত সংখ্যা : ৬২৩৬'। (পৃষ্ঠা কুড়ি) এর উনিশতম এডিশন ছেপেছে রমযান ১৪১৭ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১৯৯৭ ইং। এতেও এই সূচি ও মোট আয়াত সংখ্যার উল্লেখ আছে।[৪১]

---

[৪১] এই মুসহাফগুলোর কিছু তো আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কুতুবখানায় পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে বড় কাটারা, লালবাগ, ফরিদাবাদ, যাত্রাবাড়ী, মাদরাসাতুল মাদীনা, মাদরাসায়ে উলূমে দীনিয়া কাকরাইল মসজিদ, আরজাবাদ, মুজাহেদুল উলূম চট্টগ্রাম, পটিয়া, হাটহাজারী, মাহমুদিয়া বরিশাল ও নোয়াখালী ইসলামিয়ার কুতুবখানা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পাঠাগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর কিছু মুসহাফ পেয়েছি ব্যক্তিগত কুতুবখানা

এখানে নমুনাস্বরূপ শুধু বিংশ শতকে ছাপা হওয়া কিছু মুসহাফের কথা উল্লেখ করা হল। যার শুরুতে বা শেষে স্পষ্টভাবে মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং লেখা হয়েছে যে, কুফী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

এমনিতে তো- যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- গোটা ইসলামী বিশ্বেই অধিকাংশ মুসহাফে আয়াত সমাপ্তি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কুফী গণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ গণনা পদ্ধতি অনুসারেই প্রত্যেক সূরার শুরুতে আয়াত সংখ্যা লেখা হয়। এ গণনা পদ্ধতি অনুসারেই আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন দেওয়া ও গোল চিহ্নের মাঝখানে আয়াতের নম্বর লাগানো হয়। তাই যে কোন মুসহাফ থেকে সূরাসমূহের আয়াত সংখ্যার যোগফল বের করলে মোট সংখ্যা ৬২৩৬ই হবে। তবে নম্বর লাগানোর ক্ষেত্রে প্রকাশকের যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

এখানে আমরা নমুনাস্বরূপ যে সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করেছি তাতে শুধু এমন মুসহাফের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মুসহাফের লিপিকার বা প্রকাশক বা সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে মুসহাফের শুরুতে বা শেষে মোট আয়াত সংখ্যার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ যারা কুরআন তেলাওয়াত করেন তারা সাধারণত প্রত্যেক সূরার শুরুতে বা শেষে যে আয়াত সংখ্যা লেখা থাকে সেগুলো যোগ করে ১১৪ সূরার মোট আয়াত সংখ্যা বের করার চেষ্টা করেন না। সাধারণভাবে কুরআন তেলাওয়াতকারীদের মাঝে এ প্রচলন নেই। তাই যদি মুসহাফে বা অনুবাদসহ মুসহাফের শুরুতে বা শেষে মোট আয়াত সংখ্যার কথাও উল্লেখ করে দেওয়া হয় তাহলে বাস্তবতা সমর্থিত সংখ্যাটির ব্যাপারে মানুষের জানাশোনাটা ব্যাপক হয় এবং মানুষের মুখেও তার চর্চা হয়।

সম্মানিত পাঠক লক্ষ্য করেছেন, শুধু বিংশ শতকে গোটা বিশ্বব্যাপী ছাপা বিভিন্ন মুসহাফে কতবার এ সংখ্যাটি (৬২৩৬) উল্লেখিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সম্পর্কে দেওয়ানবাগীরা তাদের স্বীকারোক্তি অনুসারেই সর্বপ্রথম জানতে পারে ১৯৯৮ ইং (মোতাবেক ১৪১৮ হি.) এর পরে। এরপরও যদি তারা দাবি করে যে, তাদের সূফী সম্রাটই পৃথিবীর প্রথম মানব যে সঠিকভাবে মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছে তাহলে এর চেয়ে নির্জলা মিথ্যা আর কী হবে?

বিংশ শতকের কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

এখন আমি পাঠকের সামনে এই শতকে লিখিত কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম পেশ করছি। যা সরাসরি আয়াত সংখ্যা সম্পর্কেই লেখা হয়েছে অথবা উলূমুল কুরআন সম্পর্কে লেখা হয়েছে এবং তাতে আয়াত সংখ্যার আলোচনাও আছে। কিংবা তা লেখা হয়েছে অন্য প্রসঙ্গে কিন্তু তাতে আয়াত সংখ্যার আলোচনা এসেছে। এ সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধেও হয় সঠিক সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা সঠিক সংখ্যার পাশাপাশি ভুল সংখ্যার খণ্ডন করা হয়েছে।

এখানে এ কথাও বলে দেওয়া মুনাসিব মনে করছি, শুধু দেওয়ানবাগীদের মিথ্যাচার রদ করাই এই তালিকা উল্লেখ করার একমাত্র লক্ষ্য নয়। দেওয়ানবাগীর খণ্ডন তো শুধু এর দ্বারাই হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগেই যে সংখ্যার আলোচনা ছিল, কুফার তাবেয়ীগণ হযরত আলী রা. থেকে, যিনি শাহাদাতবরণ করেছিলেন ৪০ হিজরীতে, যে সংখ্যার কথা শুনেছিলেন দেওয়ানবাগী সাহেব এর চৌদ্দশত বছর পর ১৪১৮ হিজরীর পরে তা উল্লেখ করে কীভাবে সংস্কারক বনে যান?

এই তালিকা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য হল, যে তালেবে ইলমগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করতে চান তাদের জন্য যেন (প্রকাশকের নামসহ) কিছু কিতাবের নাম সংরক্ষিত থাকে, প্রয়োজনের সময় যেন তারা এগুলো পড়তে পারেন।

বিশেষ কোন বিন্যাস ছাড়াই এখানে তালিকাটি উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে প্রথমে বাংলা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হবে।

১. কুরআন প্রসঙ্গ

আলহাজ আল্লামা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ভূমিকা : শামসুল উলামা আলহাজ বেলায়েত হুসাইন, সাবেক অধ্যাপক কলকাতা আলিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রকাশক : মুহাম্মদ সফিউল্লাহ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান; প্রকাশকাল : যিলহজ্ব ১৩৮৯ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ ইং

(বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত চরিতাভিধানের ৪১৬ পৃষ্ঠার তথ্য অনুসারে এ গ্রন্থের একটি এডিশন ১৯৬২ ইং ছাপা হয়েছিল।)

এই বই থেকে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

থেকে। যেমন মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী দামাত বারাকাতুহুমের কুতুবখানা, মাশাআল্লাহ সেখানে যথেষ্ট দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে। আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোরের মুসহাফ মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের কাছ থেকে পেয়েছি। ভাই ইমরান ইবনে নূরুদ্দীন থেকে কিছু মুসহাফ পেয়েছি। নূরুল্লাহ মোমেনশাহী, মাওলানা নাজমুল হুদা, মাওলানা ফযলুল্লাহ, মুন্সী মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, হাসীবুর রহমান ও তার ভাই হাবীবুর রহমান, নোমান (কানাডা) সহ অনেক শাগরেদ এবং দোস্ত-আহবাব মুসহাফ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন। দুটি কিতাবের সন্ধান হযরত মাওলানা আহমদ মায়মুন ছাহেবের কাছে পেয়েছি। আরো অনেক মুসহাফ বিভিন্ন মসজিদের সংগ্রহ থেকে পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের নসীব করুন। আমীন।

২. আনওয়ারুত তানযীল
প্রথম খণ্ড, সূরা বাকারা, নবম শ্রেণির পাঠ্যভুক্ত
সংকলন ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বিএ (অনার্স) এমএ; পরিবেশনায় : আরাফাত পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশক : শরীফ, আরেফ ও আসিফ, প্রথম প্রকাশ : ২২ নভেম্বর ১৯৭৯ ইং, অষ্টম প্রকাশ : ২৮ নভেম্বর ১৯৯৬ ইং; সংযোজন ও পরিমার্জন : ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৯ ইং; পুনর্মুদ্রণ : ২০০১ ইং

এ গ্রন্থের ভূমিকায় 'কুরআন সংকলনের ইতিকথা' শিরোনামে লেখা হয়েছে—

"সমগ্র কুরআনে ১১৪ টি সূরা ও ৬২৩৬ আয়াত রয়েছে।" -আনওয়ারুত তানযীল, পৃষ্ঠ : ৩

৩. ছোটদের আনওয়ারুত তানযীল (অষ্টম শ্রেণির জন্য)
সংকলন ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, সহযোগিতায়: গোলাম সোবহান সিদ্দীকী, (মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন, মুমতাজুল ফুকাহা, মুমতাজুল উদাবা, সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ), অধ্যাপক হাবীবুর রহমান (মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন, এমএ, এম ফিল, স্কলার); পরিবেশনায়: আরাফাত পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা; পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ ইং; সংযোজন ও পুনর্মার্জন : নভেম্বর ১৯৯৭ ইং; পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৯ ইং

এ গ্রন্থে লেখা হয়েছে—

"সমগ্র কুরআন মজীদে ১১৪ টি সূরা, ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে।"—ছোটদের আনওয়ারুত তানযীল, পৃষ্ঠ : ৭

৪. ইকামতে নামায
সংকলন : আলহাজ জাফর আহমদ চৌধুরী, সভাপতি বাংলাদেশ কুরআন তাফসীর সংসদ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জিলহজ ১৪০০ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১৯৮০ ইং
অভিমত : আলহাজ মাওলানা সাইয়েদ মাছুম, মুফাসসিরে কুরআন ঢাকা ও সভাপতি ঢাকা সীরাতুন্নবী কমিটি ৪/১০/১৯৮০ ইং

জামিয়া মাহমুদিয়া বরিশালের ছাত্র পাঠাগার থেকে মওলবী সাঈদুল হক এ গ্রন্থের ফটোকপি সংগ্রহ করেছেন। এতে নামাজ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের ৮২টি আয়াত তরজমাসহ উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমিকার শেষ দিকে কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথমেই লেখা হয়েছে—

"কুরআন শরীফের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ টি।"

এরপর ৫৭-৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'এক নজরে কুরআন শরীফ' শিরোনামের অধীনে ১১৪ টি সূরার তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক সূরার নামের পাশে সেই সূরার মোট আয়াত সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. ফাযায়েলে কুরআন
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. (রচনাকাল : যিলহজ্ব ১৩৪৮ হি.) ১৩৮০ হিজরীতে জনাব কাযী খলিলুর রহমান সাহেব এর বাংলা তরজমা করেছিলেন যা কলকাতা থেকে ছেপেছিল। ঢাকায় সর্বপ্রথম সম্ভবত মওলানা আম্বর আলী সাহেব তরজমা করেছিলেন। এরপর মাওলানা মুহাম্মদ সাখাওয়াতুল্লাহ (মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন রিসার্চ স্কলার) এর তরজমা করেন। অনূদিত ফাযায়েলে আমালের তৃতীয় গ্রন্থ হল, ফাযায়েলে কুরআন। আমার সামনে সাখাওয়াতুল্লাহ সাহেব তরজমাকৃত ফাযায়েলে আমালের যে এডিশন আছে তা তাবলীগী কুতুবখানা ও তাবলীগী ফাউন্ডেশন জুমাদাল উখরা ১৪১৪ হি. মোতাবেক নভেম্বর ১৯৯৪ ইং ছেপেছিল।

ফাযায়েলে কুরআনে ৯ নং হাদীস إن منزلتك عند آخر آية تقرؤها এর অধীনে লেখা হয়েছে,

"কেরাত বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন শরীফে ছয় হাজার আয়াত আছে কিন্তু পরের সংখ্যাগুলোতে মতভেদ আছে। কয়েকটি মতামত বর্ণিত আছে ২০৪, ১৪, ১৯, ২৫, ৩৬।" -ফাযায়েলে কুরআন, পৃষ্ঠা : ৩২

দারুল কিতাব থেকে ছাপা ফাযায়েলে কুরআনে তরজমা করা হয়েছে এরূপ—

এখানে আয়াত গণনা করার পাঁচটি অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যা ৬২০৪ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬২৩৬। ৬২৩৬ এর বেশি কোন সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৬৬৬৬ এই সংখ্যার দিকে কোন ইশারাও করা হয়নি।

৬. কুরআন পরিচিতি
ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
পিএইচডি লন্ডন, এম এ (ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট) বিএ অনার্স (ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট) মুমতাজুল ফুকাহা (ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট) প্রফেসর : আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশক : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলা বাজার ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯২ ইং, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯৯ ইং

এ গ্রন্থের উভয় সংস্করণে তৃতীয় অধ্যায়ে 'সূরা, রুকূ ও আয়াতের সূচি' উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করার পর শেষে সব সূরার মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ লিখে দেওয়া হয়েছে।

৭. দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সূচি
জামিয়াতুল মালিক আবদুল আযীয জেদ্দা এবং বুয়েটের সাবেক প্রফেসর জনাব ড. আনওয়ার-উল-করিম অনেক আগে দৈনিক ইত্তেফাকে আলাদাভাবে সকল সূরার আয়াত সংখ্যা এবং মোট আয়াত

সংখ্যাসহ কুরআনুল কারীমের সূরাসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৯৭ ইং সনের কোন এক মাসে এটি ছাপা হয়েছিল। এরপর তিনি এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধও লেখেন। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধের উর্দু অনুবাদও হয়েছিল। প্রফেসর সাহেবের বন্ধু ডা. আমজাদ সাহেবের অনুরোধে করাচিতে অবস্থানরত এক বাংলাদেশি আলেম এটি উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম,

قرآن کریم کی آیات کی کل تعداد ۶۶۶۶ نہیں

(কুরআনুল কারীমের মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ নয়)

এ প্রবন্ধটি সফর ১৪২৪ হিজরীতে লেখা হয়েছিল। ড. আনওয়ার-উল-করিম সাহেবের একটি প্রবন্ধ থেকেই আমি ড. মুস্তাফিজুর রহমানের গ্রন্থ 'কুরআন পরিচিতি'র কথা জানতে পারি এবং শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর ফাযায়েলে কুরআনে যে আয়াত সংখ্যার আলোচনা আছে তাও তিনিই আমাকে মনে করিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। উভয় জাহানে তাকে আফিয়াত ও সালামতের নেআমত দান করুন। আমীন।

এই সবগুলো হাওয়ালাই বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের এবং সবগুলোই আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে দেওয়ানবাগীদের অসম্পূর্ণ ধারণা লাভের আগের। এর সাথে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন মুসহাফের হাওয়ালাও যোগ করুন। যার শুরুতে বা শেষে বাংলা ভাষায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ লেখা হয়েছে এবং ষাট বছর যাবৎ যার ধারা চলছে।

আরবী ও উর্দু কিছু গ্রন্থের হাওয়ালা

[মূল প্রবন্ধে এখানে ত্রিশটিরও অধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম লেখা হয়েছে। যার সবকটিতেই আয়াত সংখ্যার আলোচনা আছে এবং কোন কোনটিতে ৬৬৬৬ এই ভুল সংখ্যাটির বিস্তারিত খণ্ডন আছে। তালিকাটি পাঠক প্রবন্ধের ভিন্ন সংস্করণে পেয়ে যাবেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে তা ছাপা হল না।]

এ গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই ১৯৯৮ ইং এর আগের। ইলমে আদাদ বা আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে তাবেয়ীদের যুগ থেকে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুস্তিকার একটি বিস্তারিত তালিকা ২ নং অধ্যায়ে লেখা হয়েছে। এখানে সেগুলো পুনর্বার লেখার প্রয়োজন নেই। এখানে যে তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে এর একটি উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যে, এই শতকেও বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতে সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন লোক এত বেশি ছিলেন, যার কোন হিসাব নেই। তাই এখানে দেওয়ানবাগীদের অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে সংস্কারক বনে যাওয়ার শখ পূরণ করার প্রয়াস নিজেদের জন্য লাঞ্ছনা খরিদ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন আমি তাদের বক্তব্যের অন্যান্য বিষয়াবলি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করতে চাচ্ছি-

'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' গ্রন্থের শুধু এ অধ্যায়েই আপত্তিকর বিষয় অনেক আছে। প্রবন্ধ যেন লম্বা না হয়ে যায় তাই তাদের সব কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে না। সংক্ষেপে কিছু কথা বলা হবে :

৬৬৬৬ সংখ্যাটিকে কি ইংরেজ অথবা আলিয়া মাদ্রাসাওয়ালারা প্রসিদ্ধ করেছে?

দেওয়ানবাগীরা উপরোক্ত গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় এ দাবিও করেছেন যে, ৬৬৬৬ এই প্রসিদ্ধ ভুল সংখ্যাটি ইংরেজরা প্রসিদ্ধ করেছে এবং আলিয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে তারা এ কাজটি করেছে। তারা লিখেছে-

"আসলে পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা নিয়ে এই বিভ্রান্তির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অজ্ঞতা ও বিধর্মীদের চক্রান্ত। তারাই ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতে মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য পর্যায়ক্রমে ২৬ জন ইংরেজ প্রিন্সিপাল দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং এতে প্রশ্ন জাগে যে, বৃটিশরা কি মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা সৃষ্টি করেছে, নাকি তাদের স্বার্থের জন্য করেছে? কেননা, একথা চিরন্তন সত্য- ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতবর্ষে প্রায় ২ শত বছর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বৃটিশ সরকার। মুসলমানদের সাথে দুশমনি করা অমুসলিমদের জাতিগত অভ্যাস। পবিত্র কুরআন যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ ও নির্ভুল একখানা ধর্মগ্রন্থ, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্যই ঐ বিধর্মী সম্প্রদায় মাদ্রাসার মাধ্যমেই মুসলমানদের মধ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,৬৬৬টি বলে প্রচার করেছে। মুসলমানগণ সরল বিশ্বাসে তা মেনে নিয়ে ঐ ভুল সংখ্যাটি হৃদয়ে গেঁথে নেয় এবং প্রচার করতে থাকে যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,৬৬৬টি। এভাবে প্রচার করে একসময় হয়ত বিধর্মীরা চ্যালেঞ্জ করে বলতো যে, মুসলামনদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন পরিপূর্ণ গ্রন্থ নয়। কেননা মুসলমানরা বলে থাকে কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,৬৬৬ টি, অথচ এর আয়াত সংখ্যা ৬,২৩৬টি। যেহেতু ৪৩০টি আয়াত কুরআনে নেই, সেহেতু কুরআন পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ হতে পারেনা। (নাউজুবিল্লাহ)। আল্লাহর অপার দয়ায় বিধর্মীদের কাছ থেকে এমন একটা চ্যালেঞ্জ আসার আগেই মহান সংস্কারক মোহাম্মদী ইসলামের পুনর্জীবনদানকারী সূফী সম্রাট হযরত দেওয়ানবাগী (মাঃ আঃ) হুজুর কেবলাজানের নিকট বিষয়টি ধরা পড়েছে।"-'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার', পৃষ্ঠা : ১৩৩

পর্যালোচনা

মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষাদান গোটা ইসলামী বিশ্বে অনেক কাল আগে থেকেই চলছে। হিন্দুস্তানের মাদ্রাসার ইতিহাসও অনেক প্রাচীন। হিন্দুস্তানে ইংরেজদের অশুভ পদচারণার অনেক আগেই এখানে মাদ্রাসার প্রচলন ছিল। ইংরেজ আগমনের পরও অনেক মাদ্রাসা ছিল। ইংরেজরা অসংখ্য মাদ্রাসার ওয়াকফ সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেওয়ার পর প্রাচীন অনেক মাদ্রাসার বেহাল দশা হয়ে যায়। তৎকালীন উলামায়ে কেরাম নাযুক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ভিন্ন আঙ্গিকের মাদ্রাসার ধারা চালু করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহেরে উলূম সাহারানপুর এ ধারারই সূচনা প্রয়াস। এ দুই প্রতিষ্ঠানের অনুসরণে এ উপমহাদেশে অসংখ্য অগণিত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই 'ইংরেজরাই ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন করেছেন'- এ কথা বাস্তবতাবিরুদ্ধ।

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের আগ্রহেরও দখল ছিল। তাদের অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই অক্টোবর ১৭৮০ ইং মোতাবেক শাবান ১১৯৪ হি. কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫০ ইং থেকে ১৯৫০ ইং পর্যন্ত একশো বছরে একের পর এক ছাব্বিশজন প্রিন্সিপাল এতে ইংরেজ ছিলেন।[৪২] কিন্তু এ কথা একেবারেই ঠিক নয় যে, এই ভুল সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে আলিয়া মাদ্রাসার কোন দখল ছিল। এ কথাও ঠিক নয় যে, ইংরেজরা মাদ্রাসার মাধ্যমে এ সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ করেছে। দেওয়ানবাগীদের এই ধোঁকাবাজির হাকীকত বোঝার জন্য নিম্নোক্ত কথাগুলো লক্ষ্য করুন-

১. ইংরেজদের ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও মুসলিম নির্যাতনের ইতিহাস কে না জানে। কিন্তু সে কারণে এ বিষয়টি তো বৈধতা পেয়ে যায় না যে, নিজেকে সংস্কারক প্রমাণ করার জন্য ইংরেজদের উপর এমন কোন বিষয় চাপিয়ে দেওয়া হবে যার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ৫ নং অধ্যায়ে আমরা দেখেছি আবুল কাসেম হুযালী রহ. এর 'কিতাবুল কামেলে' ৬৬৬৬ এই ভুল সংখ্যাটির (বিস্তারিত 'রদ'সহ) আলোচনা আছে। আবুল কাসেম হুযালীর জন্ম ৪০৩ হি. মোতাবেক ১০১২ ইং আর ইন্তেকাল ৪৬৫ হি. মোতাবেক ১০৭৩ ইং। তাঁর আগে আবুল লাইছ সমরকান্দী রহ. এর 'বুস্তানুল আরেফীনে' এ সংখ্যাটি ভিত্তিহীন হওয়ার ইঙ্গিতসহ তা উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল লাইস সমরকন্দী রাহ. ইন্তেকাল করেন ৩৭৩ হি. মোতাবেক ৯৮৩ ইং সনে। তাই ইংরেজরা এই সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ করেছে- এ কথা বলা ঠিক নয়।

২. দ্বিতীয় কথা হল, ইংরেজদের মধ্যে যারা কুরআন ও কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনা করেছে বা অন্য বিষয়ে লিখিত গ্রন্থে প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছে আমাদের জানামতে তাদের কেউ ৬৬৬৬ সংখ্যাটির তরফদারি করেনি। বরং এই সংখ্যাটির উল্লেখই তারা করেনি। অনুসৃত ও স্বীকৃত গণনা পদ্ধতিগুলোর সংখ্যাই তারা শুধু উল্লেখ করেছে। হ্যাঁ, উক্ত সংখ্যাগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে তাদের কারো ভুলও হয়েছে এবং তাদের অনেকের উপস্থাপনে বিভিন্ন ত্রুটিও হয়েছে। কিন্তু ৬৬৬৬ সংখ্যার উল্লেখ তাদের লেখায় আমরা পাইনি। যদি তারাই এ সংখ্যাটি কোন গলদ মতলবে প্রসিদ্ধ করত তাহলে তো সবার আগে তারা নিজেদের লেখা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এই সংখ্যা উল্লেখ করত, এ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যার আলোচনাই করত না। অথচ বাস্তবতা হল তারা এ সংখ্যাটি একেবারেই উল্লেখ করছে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে কিছু অমুসলিম প্রাচ্যবিদের (ইংরেজ অথবা ইংরেজ নয়) হাওয়ালা উল্লেখ করছি-

১. জার্মান মুসতাশরিক (প্রাচ্যবিদ) Anton Spitaler (11 July 1910, Munchen- 03 Aug 2003, Traunreut) বলেন,

"Zusammenstellung der gesamtverszahlen Samtlicher amsar"

(বিভিন্ন ইসলামী শহরে অনুসৃত সংখ্যাগুলোর তালিকা)

Kufa	: 6236
Basra	: 6204 (6205)
Damaskus	: 6226
Hims	: 6232
Mekka	: 6219
Medina I	: 6217 (6210)
II	: 6210

[-Die Verszahlung des Koran, by : Anton Spitaler, page no : 28, published : 1935, Verlag der Bayerischen Akademie der wissenschaften, Munchen, Germany.]

২. জার্মান ভাষায় রচিত Geschichte des Qorans, Von Theodor Noldeke (1836-1930) এর তৃতীয় খণ্ড Die Geschichte des Qorantexts এ G. Bergstrasser (15 Apr. 1886 - 16 Aug. 1933) ও O. pretzl (20 Apr.1893 - 28 Oct. 1941) লেখেন,

"al-madani al-auwal mit 6217 Versen, al-madani al- akhir mit 6214 Versen, al-makki 6219, al-basri 6204 (5), al-kufi 6236, as sami 6226 (7), al-himsi 6232."

---

[৪২] تاریخ مدرسہ عالیہ, মাওলানা আবদুস সাত্তার, লেকচারার মাদ্রাসায়ে আলিয়া ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৫৯ ইং, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৬; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫১-১৫২

[-Geschichte des Qorans, Von Theodor Noldeke, Zweite Auflage (Second edition) 1938, Dritter Teil (3rd part) Die Geschichte des Qorantexts Von G. Bergstrasser und O. pretzl, Page no. 237 (Schriften, Uber Die Verszahlung), Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig, Germany.]

Wolfgang H. Behn কর্তৃক বইটির ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে। যা The History of the Quran নামে Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। আয়াত সংখ্যা বিষয়ক আলোচনাটি ইংরেজি অনুবাদের ৫৭৩ পৃষ্ঠায় "Writings on the Enumeration of Verses" শিরোনামের অধীনে রয়েছে। উল্লেখ্য, Noldeke তার বইয়ের ৩য় অংশের কাজ করতে পারেননি। পরবর্তীতে G. Bergstrasser এবং O. pretzl এ অংশের কাজ সম্পন্ন করেন।

৩. ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের L'ECOLE Nationale Des Langues Orientales এর প্রফেসর Regis Blachere (30 Jun 1900 - 07 Aug 1973) বলেন,

"Chaque sourate est divisee a son tour en aya ..... Cette division, fondee sur une particularite du style coranique, est demeuree longtemps tres flottante (ci-des-sus, p. 100). Dans notre Vulgate cairote, on en compte 6.236."

অর্থাৎ, প্রত্যেক সূরা কিছু আয়াতে ভাগ করা। ... কুরআনের এ ভাগ নিজস্ব style এ অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। আমরা আমাদের পাণ্ডুলিপিতে আয়াত সংখ্যা ৬,২৩৬ গুনে পাই।

[Introduction Au Coran, by Regis Blachere, Page no. 139-140, Published 1947, Librairie Orientale et Americaine, 198, Boulevard saint Germain, - paris, France.][৮৫]

৪. এ কমপ্লিট হিস্টোরি অফ দ্যা এরাবস,

A Complete History of The Arabs from the birth of Mohammed to the Reduction of Baghdad. by The Authors of the Universal History. Page no 312-313, Vol -1, Published- M.DCC. LXI (1761) London.

৫. এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়াস নলেজ,

Encyclopedia of Religious Knowledge, Edited by : Rev. J. Newton brown (1803, New London - 1868 America), Page no 726, Article : KORAN, published by : Joseph Steen & co. Philadelphia : Lippincott, Grabo & co. New York, (1851)

৬. এ প্রিলিমিনারি ডিসকোর্স

A Preliminary Discourse by George Sale (1697 England - 1736 London England), Page no. 41, Published : M. DCCC. XLIV (1844), London, Printed for Thomas Tegg, 73, Cheapside.

৭. দ্যা নিউ আমেরিকান সাইক্লোপেডিয়া

The New American Cyclopedia Edited by George Ripley (3 Oct 1802 USA - 4 July 1880 New York) and Charles A. Dana (8 Aug 1819 New Hampshire-17 Oct 1897 New York, Page no 206, , Article : Koran Vol -X, Published : M. DCCC. LX (1860) New York : D. Appleton And Company, London : 16 Little Britain.

৮. ইসলাম : ইটস হিস্টোরি, ক্যারাক্টার এন্ড রিলেশান টু ক্রিসটিয়ানিটি

ISIAM: it's History, Character, and Relation to Christianity. By John Muehleisen Arnold, D.D, 3rd edition, page no 85, Published: 1874, Longmans Green and co. London.

৯. এ কম্প্রিহেনসিভ কমেন্ট্রি অন দ্যা কোরান

A Comprehensive Commentary on The Quran, by The Rev. E. M. Wherry, M.A. (26 March 1843 pennsylvania- 5 Oct 1927 America) Page no 99, Vol -I, Published: 1896, Kegan Paul, trench, Trubner & co., Limited, London

১০. হিস্টোরি অব দ্যা এরাবস

History of the Arabs by: Philip K. Hitti (1886 Lebanon-1978 New Jersey, USA), page no: 126-127, 5th edition (1951), The Macmillan Company. New York.

১১. *Cook's handbook for egypt and the Sudan. By E. A. Wallis Budge (July 27, 1857 UK - Nov 23 1934 UK), page no: 331, T. Cook & son, London, 1906.*

১২. গাইড লাইনস ফর ডায়ালগ বিটুইন ক্রিসচিয়ানস এন্ড মুসলিমস

Guidelines for dialogue between Christians and Muslims, by : R. Marston Speight, page no : 47 © 1990 by The Missionary Society of St. Paul the apostle in the state of New York.

ইংরেজিতে অনূদিত এ বইটির মূল হল ফরাসি ভাষায় লিখিত *Orientations Pour un dialogue entre chretiens et Musulmans. By Maurice Borrmans © 1981 by les Editions du Cerf. Paris.*

স্মর্তব্য, এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কোন ইংরেজ লেখক বা অন্য কোন প্রাচ্যবিদের কলমেও ৬৬৬৬ এ ভুল সংখ্যাটি লেখা হয়েছে। এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে তো তা ভুলক্রমেই হয়েছে। একে তো ষড়যন্ত্র বলা চলে না। কারণ এ ক্ষেত্রে যদি কোন ষড়যন্ত্র থাকত তাহলে তাদের এত সংখ্যক লোক আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা

---

[৮৫] ফরাসী ভাষার এ বই থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের মর্মোদ্ধার করে দিয়েছেন আমাদের ছাত্র রাফিদ আমীনের শ্রদ্ধেয় পিতা লে. কর্নেল শাহজাদ পারভেজ, পরিচালক : প্রয়াস স্কুল, ঢাকা সেনানিবাস। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

করা সত্ত্বেও কেন তা লিখল না? তাদের বিশ্বকোষে কেন এর আলোচনা এল না?

এখানে এ বিষয়টিও মনে রাখা কর্তব্য, আমরা প্রাচ্যবিদদের এ সব বইয়ের হাওয়ালা এজন্য উল্লেখ করিনি যে, (আল্লাহ মাফ করুন) আমরা কোন মুসলিমকে এগুলো পড়ার পরামর্শ দেই। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর যে কোন ব্যাপারে তো আমাদের ইসলামী মনীষী ও মুসলিম উম্মাহর লেখকদের উপরই নির্ভর করতে হবে। অমুসলিমদের কাছ থেকে ইসলাম এবং ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রসমূহের ইতিহাস জানা ও শেখা স্পষ্ট মূর্খতা। কারণ এটি তো স্বতঃসিদ্ধ যে, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদদের কথায় (অন্ততপক্ষে কথার আঙ্গিক ও আন্দাজে) ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানো থাকে। অজান্তে অবচেতন মনে যা পাঠকের মনে/চিন্তা-চেতনায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। আমরা শুধু

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

(কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন কর। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। সূরা মায়েদা, আয়াত : ৮) এই কুরআনী মূলনীতির উপর আমল করার জন্য দেওয়ানবাগীদের এই মিথ্যাচারকে স্পষ্ট করেছি।

৩. তৃতীয় কথা হল, ইংরেজ প্রাচ্যবিদ বা পাশ্চাত্যের অমুসলিম কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যেসব মুসহাফ ছাপা হয়েছে (তরজমাসহ বা তরজমা ছাড়া) আমাদের জানা মতে তাতে তারা আয়াতের শেষে যে চিহ্ন লাগিয়েছে বা আয়াতে নম্বর লাগিয়েছে সেগুলোতেও ৬৬৬৬ সংখ্যাটি পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এমন হতে পারে যে, না জানার কারণে তাদের কারো কোন ভুল হয়ে গেছে। যেমন ফ্লুগেল (১২১৭ হি. মোতাবেক ১৮০২ ইং-১২৮৭ হি. মোতাবেক ১৮৭০ ইং) ১২৫০ হি. মোতাবেক ১৮৩৪ ইং সনে যে মুসহাফ ছেপেছিল তার মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৮।[৪৪] আর বিভিন্ন আয়াতে আয়াতের নম্বরও যথাস্থানে লাগানো হয়নি। তো এটি তো ভুল কিন্তু ছয় ছয়ের সংখ্যা সেখানেও নেই। এ ক্ষেত্রে লাইডেন থেকে প্রকাশিত 'দ্যা এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামে'র আলোচনা লক্ষণীয়–

"The English translation by R. Bell and A. J. Arberry follow the Flugel numbering ..... The German translation by R. Paret and the French by R. Balcher give both numberings. (Egyptian numbering and Flugel numbering)"

-The Encyclopedia of Islam, Page no : 411, Vol : v, © 1986 by E. J. Brill, Leiden, The Netherlands.

তো পাশ্চাত্যের এই লেখকরা যে মিসরী মুসহাফ অনুসারে আয়াতে নম্বর বসিয়েছে তা তো ঠিক ছিল। কারণ মিসরী মুসহাফে কূফী গণনা পদ্ধতি অনুসারে নম্বর বসানো হয়েছে। কিন্তু ফ্লুগেলের মুসহাফ অনুসারে নম্বর বসানোটা ঠিক হয়নি। তবে যাই হোক, ছয়-ছয়ের সংখ্যাটি তো সেখানেও নেই।

৪. চতুর্থ কথা হল, ইংরেজ গবেষকরাও এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছে যে, আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে যে পার্থক্য তা কতেক আয়াতের সূচনা শেষ নির্ধারণে ইখতিলাফ হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই পার্থক্য আয়াত কম-বেশি হওয়ার পার্থক্য নয়। তাই 'তোমাদের কুরআনে কিছু আয়াত কম আছে' এ কথা বলে 'কুরআন সংরক্ষিত' এই আকীদার ব্যাপারে তারা কীভাবে মুসলিমদের সন্দেহে ফেলবে! কারণ এ ক্ষেত্রে তো মুসলিমরা ইংরেজদের লেখা গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়েই তাদের কথার জবাব দিয়ে দেবে। ইংরেজদের অধিকাংশই ইসলাম ও মুসলিমের দুশমন। ধোঁকাবাজ ও ফেরেববাজ কিন্তু আহমক ও বেওকুফ নয় যে, এমন অসার আপত্তি করবে। এ তো দেওয়ানবাগী ও তাদের মতো লোকদের নির্বুদ্ধিতা যে, গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতাকে তারা কম-বেশির পার্থক্য মনে করে বসে আছে।

ছয় ছয়ের ভুল সংখ্যাটি যারা বলেন তাদের কাছে এ প্রশ্ন করা যে, বাকি চারশো ত্রিশ আয়াত কোথায়– এটি সে ক্ষেত্রেই ঠিক হবে যদি তারা (নাউযুবিল্লাহ) বর্তমান কুরআনকে অসম্পূর্ণ বলে। কিন্তু তারা তো কেউ এমন বলে না। না জেনে কেউ যদি এই ভুল সংখ্যাটির তরফদারি করে তো তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আয়াত গণনা করার পদ্ধতি তো তাওকীফী (রাসূলের শিক্ষানির্ভর বিষয়)। আপনি আমাদের বলুন, অনুসৃত ও স্বীকৃত কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারে গণনা করায় এই সংখ্যা বের হয়েছে? ব্যস, এই প্রশ্নের পরই কথা শেষে হয়ে যাবে। কারণ এ সংখ্যাটি তো একেবারেই ভিত্তিহীন। কোন মুতাওয়ারাছ গণনা পদ্ধতি তো দূরের কথা নব-উদ্ভাবিত কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেও এ সংখ্যা অনুযায়ী কুরআনুল কারীমে আয়াতের নম্বর লাগানো সম্ভব নয়। যেমনটি ৫ নং অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. পঞ্চম কথা হল, বাস্তবেই কি দেওয়ানবাগীরা 'আকীদায়ে হেফাজতে কুরআন' বা 'কুরআন

---

[৪৪] এই বইগুলোর হাওয়ালা বেরাদারে আযীয মওলবী সাঈদুল হক সংযুক্ত করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাকে মাহদী, উসমান ও অন্যান্যরা সহযোগিতা করেছে।

সংরক্ষিত' এই আকীদা সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করেন? বাস্তবেই তিনি কুরআনকে সংরক্ষিত মনে করেন? কুরআনুল কারীমে মারাত্মক রকম অর্থগত বিকৃতি তিনি করেছেন। তার গ্রন্থ 'আল্লাহ কোন পথে' এর মধ্যে জেনেবুঝে কুরআনুল কারীমের কত আয়াতের এবং কুরআনুল কারীমের কত পরিভাষার অর্থগত বিকৃতি তিনি করেছেন, জরুরিয়্যাতে দ্বীন ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক আকীদার মুতাওয়ারাছ ও ইজমায়ী মাফহুম তথা যুগ যুগ ধরে চলে আসা স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মর্ম বিকৃত করেছেন। এমনকি হাশর-নাশরের মত মৌলিক আকীদাকে হিন্দুদের পরজন্মের মত ভয়ানক কুফরী মতবাদের সমার্থক বানিয়ে নিয়েছেন। এরপর পুরো ইসলামকেই ইয়াযীদী ইসলাম নাম দিয়ে অস্বীকার করেছেন এবং নিজের উদ্ভাবিত ইসলামকে 'মুহাম্মদী ইসলাম' নাম দিয়েছেন। এই সব 'কারনামা' আঞ্জাম দেওয়ার পর এখন তিনি চিন্তায় পড়ে গেছেন যে, ৬৬৬৬ এই ভুল সংখ্যাটির কারণে 'আকীদায়ে হেফাজতে কুরআন' সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়?!

তারাই বলুক এই তামাশাকে কী নামে আখ্যায়িত করা যায়?

৬. ষষ্ঠ কথা হল, আপনারা তো গর্ব করছেন যে, 'বিধর্মীদের কাছ থেকে এমন একটি চ্যালেঞ্জ আসার আগেই আপনাদের হুজুর কেবলাজানের কাছে বিষয়টি ধরা পড়েছে এবং তিনি ভুলটি শুধরে দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা এর কী করবেন, আপনাদের সমমনা ও আপনাদের মতই আকীদা বিশ্বাস পোষণকারী (আকীদায়ে হুলুল ও আকীদায়ে তানাসুখের প্রবক্তা এবং আলেমদের 'ইয়াযীদী আলেম' উপাধিদাতা) জনাব আবদুর রাজ্জাক (সদরুদ্দীন চিশতীর ভক্ত) ১৯৯২ ইং সনে স্বরচিত গ্রন্থ 'লোকত্তর দর্শন ও পুরুষোত্তম নজরুল' গ্রন্থে এই চ্যালেঞ্জ করেই ফেলেছেন। আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা-ভাবনা শুরু করার কমপক্ষে ছয় বছর আগে তিনি তার উপরোক্ত গ্রন্থে এই জাহেলী সুর তুলেছেন,

"প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি তথ্য এখানে সরবরাহ করছি। ওসমানী মসহব কোরানের আয়াত সংখ্যা ছিল ৬৬৬৬ খানা। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য (যদিও শ্বাশত বা চিরন্তন সত্য নয়।) কিন্তু বর্তমানে আছে ৬২৩৬ খানা আয়াত। এর জন্য দেখুন এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত জনাব আশরাফ আলী থানভীর অনুবাদ (ফেন্সী-১২)। নিজের ঘরের কোরানখানাও একটু পরখ করে দেখে নিন। যদি তাই হয় তবে বাকি ৪৩০ খানা আয়াতের খবর কি? এজিদপন্থী আলেমরা এর ব্যাখ্যা দেয় না কেন? কেনই বা এত নীরব?"-লোকোত্তর দর্শন ও পুরুষোত্তম নজরুল[৪৫], পৃষ্ঠা : ৯০

তো এখন বলুন, দেওয়ানবাগীদের দাবির কী হাকীকত বাকি থাকল?

আবদুর রাজ্জাক সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, আপনি কোথেকে মুসহাফে উসমানী পাঠ করলেন? তা আপনি কোথায় দেখলেন? মুসহাফকে আপনি মসহব 'ব' দিয়ে কেন লিখেছেন? মুসহাফে উসমানীতে তো আয়াতের শেষে কোন চিহ্ন লাগানো হয়নি এবং আয়াতের নম্বরও লাগানো হয়নি। এ শাস্ত্রের ইমাম ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এবং ঐতিহাসিকদের কাছে এটি একটি স্বীকৃত ও সর্বসম্মত ঐতিহাসিক বাস্তবতা।[৪৬] কোন ইতিহাসগ্রন্থে অথবা কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আপনি এ কথা পেয়েছেন যে, মুসহাফে উসমানীতে আয়াত শেষে চিহ্ন বা নম্বর লাগানো হয়েছে এবং মুসহাফে উসমানীতে মোট আয়াত সংখ্যা ছিল ৬৬৬৬ টি?

অন্তত একটি নির্ভরযোগ্য হাওয়ালা অথবা একটি সনদসহ রেওয়ায়েত আমাদেরকে দেখান!

আর এ কথা তো আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, মুসহাফে উসমানীতে থাকা সেই অতিরিক্ত আয়াতগুলো কোনগুলো যা এখন কোন মুসহাফে নেই। এই প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে কারণ আপনি দাবী করেছেন যে মুসহাফে উসমানীতে চারশত ত্রিশ আয়াত বেশি ছিল যা এখনকার মুসহাফে নেই (নাউযুবিল্লাহ)। আপনি যাদেরকে 'এজিদী আলেম' বলছেন তারা কখনো এমন জাহেলী দাবী করেনি।

এটি বড় জাহেলী আচরণ যে, আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে একাধিক সংখ্যার কথা শুনলেই এ পার্থক্যকে আয়াত কমবেশি হওয়ার পার্থক্য মনে করা হয়। এরপর যে ভুল উপলব্ধি তার হয়েছিল তা ঠিক না করে উল্টো আলেমদের ভালো-মন্দ বলা শুরু হয়।

জনাব আবদুর রাজ্জাক সাহেবের কাছে শেষ প্রশ্ন হল, যে বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে সত্য তা শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য কেন নয়? পার্থক্যের কারনটা বলবেন কি? আপনি ৬৬৬৬ এই ভুল সংখ্যাটিকে ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলেছেন। এরপর মিথ্যার

---

[৪৫] মুহতারাম জনাব শামসুল আরেফীনের কাছ থেকে আমি এ বইয়ের কথা জানতে পারি। সে সময় বইটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না। ২০১০ ইং সনে বইটি দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। তখন এক তালেবে ইলম আমাকে বইটির একটি কপি দেয়। বইটি কুফরী কথাবার্তায় পূর্ণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন। বইয়ের রচয়িতা যদি বেঁচে থাকে তো আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন। আমীন।

[৪৬] অন্য অনেক উদ্ধৃতির পাশাপাশি এর জন্য দেখা যেতে পারে ফাতাওয়া আলমগীরী, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২৩

আশ্রয় নিয়ে এই সংখ্যাটি মুসহাফে উসমানীর দিকে মানসুব করে দিয়েছেন। এরপর 'কুরআন সংযোজন-বিয়োজন থেকে মুক্ত' এই সর্বজনস্বীকৃত অকাট্য আকীদার মাঝে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য তা উল্লেখ করেছেন। জেনে অথবা না জেনে এই বাতিল বিষয় নিয়ে গর্বও করেছেন! অথচ বাস্তবতা হল, আশা করি যা আপনি নিজেও জানেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আলকুরআনুল কারীম রেখে গিয়েছিলেন হুবহু সেভাবে মুসহাফে উসমানীতে সংকলিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সকল মুসহাফ পবিত্র কুরআন সেভাবেই সংরক্ষিত আছে যেভাবে তা মুসহাফে উসমানীতে সংকলিত হয়েছে। একটি বাক্য কেন একটি শব্দেরও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকি মুসহাফে উসমানীর লিপিশৈলীও এখনও হুবহু অনুসরণ করা হচ্ছে।

এই অকাট্য বাস্তবতা ও স্বতঃসিদ্ধ ইসলামী আকীদার বিরুদ্ধে অমূলক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য আমরা আপনার জন্য শুধু এ দুআই করতে পারি–

هداك الله إلى الصراط المستقيم

৭. সপ্তম কথা হল, 'মাদ্রাসার মাধ্যমে এই ভুল সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ করা হয়েছে' দেওয়ানবাগীদের এই দাবীও ঠিক না। এমন তো হতে পারে যে, মাদ্রাসার কোন শিক্ষক বা তালেবে ইলম কারো ভুল কথার উপর ভিত্তি করে না জেনে এই ভুল সংখ্যাটির কথা বলে ফেলেছেন কিংবা নিজের লেখায় উল্লেখ করে ফেলেছেন কিন্তু এ কথা কিছুতেই ঠিক নয় যে, মাদ্রাসায় এই ভুল সংখ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা দুটি প্রধানতম কওমী মাদ্রাসার হাওয়ালা উল্লেখ করেছি যারা শুধু সহীহ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ভুল সংখ্যার নামও নেননি। দারুল উলূম দেওবন্দের কেরাআত বিভাগের প্রধান কারী আবুল হাসান আযমী দামাত বারাকাতুহুম এবং মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরের সাবেক শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. এর হাওয়ালা পাঠক পড়ে এসেছেন এবং ৫ নং অধ্যায়ে অন্যান্য বড় বড় কওমী মাদরাসার আকাবিরদের হাওয়ালাও পড়েছেন। বাকি থাকল আলিয়া মাদরাসার কথা, তো খোদ দেওয়ানবাগী সাহেবও তো আলিয়া মাদ্রাসা পড়ুয়া। সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কারের 'সাতচল্লিশ' পৃষ্ঠায় আছে, দেওয়ানবাগী সাহেব তালশহর কারিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় (আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া) পড়ালেখা করেছেন। যদি তিনি 'কামেল তাফসীর' পর্যন্ত পড়ে থাকেন তাহলে তিনি জানবেন 'কামেল তাফসীরে' জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর 'আলইতকান ফি উলূমিল কুরআন' পাঠ্যসূচিভুক্ত। 'আলইতকানে'র ১৯ নং نوع-এ আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেখানে ৬৬৬৬ সংখ্যাটির উল্লেখ নেই। এমনিভাবে 'কলকাতা আলিয়া'র শিক্ষাসমাপনকারী ও 'ঢাকা আলিয়া'র 'হেড মাওলানা' হযরত মাওলানা আমীমুল ইহসান ছাহেব মুজাদ্দেদী বরকতী (১৩২৯-১৩৯৪ হি.) ইলমে তাফসীর সম্পর্কে 'আততানবীর ফি উসূলিত তাফসীর' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। ১৩৬৮ হিজরীর (মোতাবেক ১৯৮৯ ইং) ঈদুল আযহার রাতে তিনি এটি লেখা শেষ করেন। এ গ্রন্থে আয়াত সংখ্যার উল্লেখ আছে কিন্তু ৬৬৬৬ সংখ্যাটির উল্লেখ নেই। তবে সেখানে যা লেখা হয়েছে তা ভুল। সেখানে লেখা হয়েছে আয়াত সংখ্যা ৬৮১৬।[৮৭] এ সংখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হল, যদি পরিকল্পিত কোন স্কিমে ইংরেজরা আলিয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে ৬৬৬৬ সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ করতে চায় তাহলে কমপক্ষে আলিয়া মাদ্রাসার বিশেষ ব্যক্তির তো তা জানা থাকবে এবং তিনি তার বিপরীত কিছুই লিখবেন না।

এ অধ্যায়ে আমরা আলিয়া মাদ্রাসার আরও দুটি গ্রন্থের হাওয়ালা উল্লেখ করেছি। এক. 'আনওয়ারুত তানযীল'। দুই. 'ছোটদের আনওয়ারুত তানযীল'। এই উভয় গ্রন্থে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ অর্থাৎ সহীহ সংখ্যা লেখা হয়েছে। এখানে আমরা আরেকটি হাওয়ালা যোগ করছি। দাখিল ৯ম শ্রেণির জন্য রচিত 'ইযাহুল কোরআনে'র ৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'সমগ্র কোরআনে ৬২৩৬টি আয়াত রহিয়াছে।'

–ইযাহুল কোরআন, অনুবাদ ও রচনা : মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ উল্যাহ, আশরাফিয়া লাইব্রেরি চৌমুহনী, নোয়াখালী: পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ : ১৯৯৩ ইং; পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৬ ইং

তাই আলিয়া মাদ্রাসাওয়ালারাই এই ভুল সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ করেছে এই অপবাদ শুধু ঐতিহাসিক ভুলই নয়, বড় জুলুমও। এই নিমকহারামি থেকে বেঁচে থাকাই দেওয়ানবাগী সাহেবের জন্য মুনাসিব ছিল। এরপরও যদি তিনি মানতে না চান তাহলে তিনি দেখান যে, ইংরেজদের শাসনামলে কোন আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে এমন গ্রন্থ ছিল যাতে ৬৬৬৬ সংখ্যাটির উল্লেখ আছে বা এর সমর্থনে কোন বক্তব্য আছে।

এক হল, কথায় বা লেখায় কারো ভুল হয়ে যাওয়া, আরেক হল, জেনেবুঝে ধোঁকাবাজি করার

---

[৮৭] 'আততানবীর' উর্দূ শরাহ 'আততাকরীর'সহ, প্রকাশক: ইসলামিয়া লাইব্রেরি। আন্দর কেল্লা চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা : ১০ এ কিতাবের ফটোকপি সংগ্রহ করা হয়েছে ডেমরা দারুন নাজাত আলিয়া মাদরাসার লাইব্রেরি থেকে।

জন্য একটি ভুল ও গলদ বিষয়ের প্রচার করা। দু'টি কিছুতেই এক বিষয় নয়। সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ভুল কার না হয়? আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক কেন যে কোন মানুষের যে কোন সময় ভুল হতে পারে। মাওলানা মুমতাজুদ্দীন আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৪ ইং) কলকাতা আলিয়া ও ঢাকা আলিয়ার শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'কুরআন পরিচয়' নামে একটি বই লিখেছেন। এর [illegible] -এ তারিখ লেখা হয়েছে ১২ রবীউল আওয়াল ১৩৮৭ হি. মোতাবেক ২১/৬/১৯৬৭ ইং। এ গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ লেখা হয়েছে এবং ৪২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে–

"আয়াতের মতভেদ : ৫১৬ টি আয়াতে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকের মতে এসব পূর্ণ আয়াত। আবার কিছুসংখ্যক কারী এগুলোকে পূর্ব বা পরবর্তী আয়াতের অংশ মনে করেন।"[৫৮]

কোন সন্দেহ নেই মাওলানা মুমতাজুদ্দীন সাহেব থেকে এখানে 'তাসামুহ' (অনিচ্ছাকৃত ভুল) হয়ে গেছে। তাঁর উল্লেখকৃত উভয় সংখ্যাই বাস্তবতাবিরোধী। কিন্তু তিনি পরে আয়াত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করে দিয়েছেন তাতে এই ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা তো থাকে না যে, কেউ একে আয়াত কম-বেশি হওয়ার মতভেদ বানিয়ে ফেলবে। দেওয়ানবাগীরা যে অপবাদ আরোপ করেছিল তাতে তো এ কথাই ছিল যে, এই সংখ্যাটি (৬৬৬৬) উল্লেখ করার পেছনে উদ্দেশ্য হল পরবর্তীতে কুরআনুল কারীমে কিছু আয়াত কম আছে–এ কথা বলে 'হেফাজতে কুরআনে'র (কুরআন সংরক্ষিত আছে এ) ব্যাপারে মানুষের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করা। যদি বিষয়টি এমনই হত তাহলে মাওলানা মুমতাজুদ্দীন রহ. সেই নোটটি লিখতেন না।

মোট কথা, দেওয়ানবাগীদের দাবি যে, এই ভুল সংখ্যাটি প্রচার করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের দুরভিসন্ধি ছিল এবং মাদ্রাসার মাধ্যমে ইংরেজরা তা করেছে এই উভয় দাবিই বাস্তবতাবিরোধী এবং নিছক অপবাদ। এটিকে বাহানা বানিয়ে সংস্কারক বনার ফযীলত হাসিল করার শখ জেগেছিল। কিন্তু তা পূরণ হল না।

৮. অষ্টম ও শেষ কথা হল, নিজেকে অথবা নিজের গুরুকে 'সংস্কারক' প্রমাণ করার জন্য বাস্তবতা গোপন করা এবং বিভিন্ন মিথ্যাচার করা কি কোন জায়েয কর্ম অথবা একজন সংস্কারের শানোপযোগী কোন কাজ?

ইন্টারনেটে তারা এ কথাও লিখেছে যে, সরকার দেওয়ানবাগী সাহেবের কথা মেনে নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আলকুরআনুল কারীমের অনুবাদে সঠিক সংখ্যা লিখিয়েছেন। মিথ্যাচারের পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে তারিখও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৭ ইং এ প্রকাশিত আলকুরআনুল কারীমের অনুবাদে এ সংখ্যা লেখা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল, ১৯৯৬ ইং সনে প্রকাশিত এডিশনেই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সূরার তালিকা ও মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ লেখা হয়েছিল। যদি এমন হত যে, ১৯৯৭ ইং সনেই এটি উল্লেখ করা হয়েছে তবুও তা দেওয়ানবাগী সাহেবের পরামর্শক্রমে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় কারণ ১৯৯৭ ইং পর্যন্ত তিনি নিজেই এ বিষয়টি জানতেন না। এ বিষয়টি তো তিনি জানতে পারেন ১৯৯৮ ইং এর পরে। দেখুন, 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার' খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩২ এবং পৃষ্ঠা উনপঞ্চাশ, সঙ্গে বইটির প্রকাশকাল দেখে নিন : ডিসেম্বর ২০০৫ ইং

আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন। তার অনিষ্ট থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমীন।

অধ্যায়-৭

কোন কোন প্রকাশকের বে-খেয়ালির কারণে নতুন সংখ্যার উদ্ভব

ছাপার যন্ত্র আবিষ্কারের আগে কিতাব পড়তে হত পাণ্ডুলিপি থেকে। সব লিপিকারের লেখা লিপিভ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এক স্তরের হত না। তবে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হল, সবযুগেই নির্ভরযোগ্য ও সুদক্ষ লিপিকার ছিল এবং মৌলিক ও বুনিয়াদী গ্রন্থসমূহের নির্ভরযোগ্য নুসখাও (পাণ্ডুলিপি/কপি) আলহামদু লিল্লাহ ছিল। 'মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়' এ কারণে কোথাও কোন ভুল হয়ে থাকলে তা ধরে দেওয়ার মত আহলে ইলমও সব যুগে ছিল। কিছু ভুল তো এমন, সতর্ক পাঠক যা নিজেই ধরতে পারেন।

যখন ছাপার যুগ এল এবং পাণ্ডুলিপি থেকে পঠন-পাঠনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেল তখন কেউ কেউ ভেবেছিলেন প্রকাশনার সুবিধার কারণে আমরা লিপিভ্রমের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাব। অথচ পাণ্ডুলিপির মুহাক্কিক (এডিটর) ও প্রকাশক যদি আমানতদার ও দক্ষ না হয় তাহলে পাণ্ডুলিপির লিপিভ্রমের সাথে মুদ্রণপ্রমাদ যোগ হয়ে আরও মাথাব্যথার কারণ হয়।

তাই যে কোনো গ্রন্থের ভালো ছাপা তালাশ করা খুব জরুরি। এরপর সঠিক পাঠ উদ্ধার করার জন্য বুদ্ধিমত্তা, সতর্কতা, সুস্থ রুচিবোধ ও তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধের কোন বিকল্প নেই। তাই মুহাক্কিক আহলে ইলমগণ সবসময় পাঠ বিকৃতির কবলে পড়া বা অন্য কেউ পাঠ বিকৃতির কবলে পড়ে যে ভুল পাঠ উদ্ধৃত করে দিয়েছে তার কবলে পড়া থেকে সতর্ক থাকার তাগিদ করে থাকেন।

---

[৫৮] আমার সামনে গ্রন্থটির দ্বিতীয় এডিশন আছে। এটি ২০০২ ইং সনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে আমরা অনেক বেশি এই বিড়ম্বনার শিকার হয়েছি। কুরআন সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লিখিত (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত) বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্রবন্ধ এবং এই উপমহাদেশে ছাপা হওয়া বিভিন্ন মুসহাফের শুরুতে বা শেষে প্রকাশকদের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত পরিসংখ্যান পরিচিতিতে (কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে) একদিকে যেমন অজ্ঞতা ও ধারণাজাত কথাবার্তা ছেয়ে আছে তেমনি লেখা ও মুদ্রণপ্রমাদেরও সীমা নেই। তাই এখানে পাঠকদের সতর্ক থাকা খুবই জরুরি। সমস্যায় পড়লে ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা না করে নির্ভরযোগ্য আহলে ফনের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। নতুবা কিছু না বলে নীরবতা অবলম্বন করা ফরজ। কুরআন সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে গিয়েই যদি আমরা وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না)– এই কুরআনী নির্দেশ মান্য না করি তাহলে আর কখন আমরা তা মানব?

৬২৩৭ কোত্থেকে এল?

ইসলামী একাডেমি (বর্তমানে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন') এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত আলকুরআনুল কারীমের অনুবাদ প্রথমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় এতে যেসব সম্পাদনা হয়েছে তিন খণ্ডের এডিশনে তা ছিল না এবং এখন আয়াত সংখ্যার উল্লেখসহ সূরার যে সূচি আছে তাও আগে ছিল না। তিন খণ্ডের এই এডিশনে প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে আয়াত সংখ্যা লেখা হয়েছে তাতে একাধিক জায়গায় ভুল হয়ে গেছে। যদিও সূরার মাঝে আয়াতে যে নাম্বার লাগানো হয়েছে তা ঠিক ছিল। শুধু ত্রিশ পারায় ৯৮ নং সূরা 'সূরা বাইয়িনাহ'তে এমন হয়েছে যে, শুরুতে মোট আয়াত সংখ্যা ৮ লেখা হয়েছে, যা সহীহ, এবং প্রত্যেক আয়াতের শুরুতে আরবী অক্ষরে যে নাম্বার লাগানো হয়েছে তাও ঠিক আছে। শেষ আয়াতে ৮ (٨) নাম্বার লাগানো হয়েছে। কিন্তু বাংলায় আট নং আয়াতকে দুই অংশে ভাগ করে দ্বিতীয় অংশ:

'رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ'

এর শুরুতে (৯) নাম্বার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি তাদের ভুল। কোন গণনায়ই এ অংশটি স্বতন্ত্র আয়াত নয়। বরং 'جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا' এই আয়াতের অংশ।[৪১]

মোটকথা প্রকাশনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বে-খেয়ালির কারণে একটি অপেক্ষাকৃত বড় আয়াত দুই অংশে ভাগ হয়ে তাতে একটি নম্বর বেড়ে গেছে। এখন কেউ যদি এই অনূদিত মুসহাফের প্রত্যেক সূরার শেষের নম্বর নোট করে একত্রিত করে যোগ করে তাহলে যোগফল বের হবে ৬২৩৭। তখন সে এ কথাই বলবে যে, ইসলামী একাডেমি থেকে প্রকাশিত কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭। কথা ঠিক, কিন্তু এটি বাস একটি মুদ্রণপ্রমাদ, এতটুকুই। এমন নয় যে, কোন স্বীকৃত গণনা পদ্ধতি অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭ হয়।

কিন্তু এর কী করা যাবে, নোয়াখালীর ডাক্তার ফজলুল হক খানের এই ভুল সংখ্যাটিই পছন্দ হয়ে গেছে। উনি বলেন যে, এটি তার গাণিতিক হিসাব মোতাবেক হয়েছে। তাই হোক বা না হোক, এ সংখ্যাই সহীহ। তার বোঝা উচিত ছিল, যে গাণিতিক হিসাবের ভিত্তি হল এক ভুল সংখ্যা, সেই হিসাব এবং সেই হিসাবকে দলিল বানানো উভয়ই নিঃসন্দেহে ভুল। শুধু তা-ই নয়, স্রেফ ধারণার ভিত্তিতে তিনি এই দাবিও করেছেন যে, সব দলের মত এটিই। তিনি লিখেছেন–

"তবে সর্বদলীয়মতে কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭ টি। যা সাবেক ইসলামী একাডেমির (ঢাকা) প্রকাশিত কুরআনে উল্লেখ আছে।"– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর তাত্ত্বিক ও গাণিতিক ব্যাখ্যা, ডা. ফজলুল হক খান, প্রথম মুদ্রণ : মে, ২০০৭ ইং, খানম হাউজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

এ ধরনের বক্তব্য তার আরেক বই 'আলকুরআনে একত্ববাদের নিদর্শনাবলী'তেও রয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'তবে সর্বদলীয় মতে কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭টি এবং এ সংখ্যাটি গ্রহণযোগ্য। এ সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে গাণিতিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যাবে।' ('আলকুরআনে একত্ববাদের নিদর্শনাবলী', পৃষ্ঠা : ৬৩, আজমাইন পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১১)

চিন্তা করুন, কোন শরয়ী দলিল বা যুক্তিগত দলিল (আকলী দলিল) ছাড়া মনগড়া এক হিসাবের পদ্ধতিকে ভিত্তি বানিয়ে তারপর তার ভিত্তিতে সহীহ সংখ্যাকে ভুল আর ভুল সংখ্যাকে সহীহ বলে

---

[৪১] 'আল বায়ান ফি আদ্দি আয়িল কুরআন', পৃষ্ঠা : ২৮২, 'হুসনুল মানান ফি ফজলিল আদদান', পৃষ্ঠা : ১৫৩, 'আলমুহাররির ফি আদ্দি আয়িল কিতাবিল আযীয', পৃষ্ঠা : ১৯১।
এটি ভিন্ন কথা যে, বসরী গণনায় সূরা বাইয়িনাহর মোট আয়াত সংখ্যা ৯। তা এভাবে যে, কুফী গণনায় সূরা বাইয়িনাহর পঞ্চম আয়াত 'وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ; وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ; وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ' কে বসরী গণনায় দুই আয়াত ধরা হয়েছে। 'مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ' -এ এসে তারা ৫ নাম্বার এবং 'وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ' তে এসে ৬ নাম্বার ধরেছেন। কিন্তু বসরী গণনায় এই সূরার মোট আয়াত ৯ হওয়ার কারণে এটি মনে করা ভুল হবে যে, তাহলে মনে হয় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭। কারণ এভাবে দুই গণনা পদ্ধতি মিলিয়ে ফেলা জায়েয নয়। উল্লেখ্য, বসরী গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০৪।

দিয়েছেন। এ ধরনের দলিলের মাধ্যমে তাওহীদ প্রমাণ করা নিরেট অজ্ঞতা এবং একটি নিশ্চিত ও হক বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য বাতিল যুক্তি দাঁড় করানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার বুঝে আসে না, অন্য শাস্ত্রে নাক গলাতে মানুষের এত ভালো লাগে কেন? চিকিৎসাশাস্ত্র কি এত উৎকর্ষে পৌঁছে গেছে যে, ডা. ফজলুল হক খান সাহেবের চিকিৎসাশাস্ত্রে কাজ করার কোন প্রয়োজন বাকি থাকেনি? আমাদের সমাজে এমন লোকের অভাব নেই যাদের কাছে নেক নিয়ত ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতা নেই। কিন্তু শুধু নেক নিয়তকেই তারা কাজে নেমে পড়ার জন্য এবং সে কাজ সহীহ-সঠিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। এরা ইসলামের 'মূর্খ বন্ধু' পর্যায়ের লোক। ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া কোন কিছুকে, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বা যুক্তির বিচারে যা দলিল নয়, কোন বিষয় হক ও সত্য হওয়ার দলিল বানানো হলে ধোঁকাবাজ ও ফেরেববাজ লোকেরা এ পথ অবলম্বন করে যে কোন গলদ বিষয় বা গলদ আকীদাকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবে। তাই দলিল প্রদানের এ ধরনের পন্থা পরিহারযোগ্য। এখন তো তিনি এমন একটি বিষয়ের (তাওহীদ) সমর্থনে দলিল পেশ করার এই ভুল পন্থা অবলম্বন করেছেন যা একটি ধ্রুব বাস্তবতা। কিন্তু তার দেখাদেখি কেউ একটি বাতিল বিষয় প্রমাণ করার জন্য এ ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

ফজলুল হক খান সাহেবকে প্রশ্ন করা দরকার, 'সর্বদলীয়' বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন? রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ফের্কা বা বিভিন্ন খেয়ালের লোক? তো আয়াত সংখ্যার বিষয় তো কোন রাজনৈতিক দলের বিষয় নয় এবং কোন ফের্কা বা মাযহাবের লোকের সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই। এটি একটি খালেস দ্বীনী বিষয় এবং গোটা উম্মতের বিষয়। এর সম্পর্ক ইলমে কেরাআতের ইমামদের সাথে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের ফায়সালাই চূড়ান্ত কথা। ইলমে কেরাআতের ইমামদের কাছে আয়াত গণনা করার মুতাওয়ারাছ (যুগ যুগ ধরে চলে আসা) বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেগুলোর নির্ভরযোগ্য সনদ ও সূত্র আছে এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা থেকে গৃহীত। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গণনা পদ্ধতিগুলোর কোন গণনা পদ্ধতি অনুসারেই গণনা সংখ্যা ৬২৩৭ হয় না।

আশ্চর্য কথা হল, যে সংখ্যাটির উদ্ভবই হয়েছে সেদিনকার ইসলামি একাডেমির প্রকাশনার দায়িত্বে নিযুক্তদের বে-খেয়ালির কারণে এবং যে ভুল তারা পরবর্তীতে নিজেরাই সংশোধন করে নিয়েছেন। আলকুরআনুল কারীমের অনুবাদে সূরা বাইয়িনাহ'র মোট আয়াত সংখ্যা ৮-ই লেখা হয়েছে। শেষ আয়াতে ৮ নম্বরই লাগানো হয়েছে এবং শুরুতে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ ই লেখা হয়েছে। তো যে ভুল থেকে খোদ ভুলকারীই সরে এসেছেন ফজলুল হক খান সেই ভুলকে 'সর্বদলীয়' মত বলছেন! সর্বদল দূরের কথা একদলেরই কোন হাওয়ালা পেশ করুন। বরং শুধু একটি নির্ভরযোগ্য হাওয়ালাই পেশ করুন। তাওহীদের কথা বলতে গিয়ে লাগামহীন কথাবার্তা বলেছেন! মিথ্যাচার করেছেন! এটা তো তাওহীদের উপর জুলুম হল।

এরপর এ বেচারার বর্ণনাভঙ্গি থেকে মনে হয় যে, তিনি মনে করেছেন, ইসলামী একাডেমি থেকে প্রকাশিত মুসহাফে একটি আয়াত বেশি ছিল যা অন্যান্য মুসহাফে নেই। (নাউযুবিল্লাহ) বাস্তবেই যদি তিনি এমনটি মনে করে থাকেন তাহলে তো আগে তার নিজেরই চিকিৎসা প্রয়োজন। আর গাণিতিক হিসাবের যে কথা তিনি বলেছেন তার নমুনা তার গ্রন্থ থেকে দেখুন–

"বিশ্লেষণ :

১। প্রথমেই ধরা যাক পুরো কুরআন রচিত হয়েছে ১১৪ টি সূরায়। এই ১১৪ সংখ্যাটি ১৯ এর গুণিতক। ১১৪= ১৯×৬, আর ১৯ মানেই= ১ (এক)। এটা তাওহীদের প্রতীক।

২। কুরআনে সর্বমোট রুকু সংখ্যা ৪৫০টি। ৪৫০ সংখ্যাটি ১০ এর গুণিতক। ৪৫০ = ১০×৪৫। আর ১০ মানে = ১ (এক)। এটা তাওহীদের প্রতীক।"- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর তাত্ত্বিক ও গাণিতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা : ১১০

নমুনাস্বরূপ তার এই দু'টি দলিলই দেখুন এবং নিজেই বিবেচনা করুন। এই বেওকুফি আর তামাশা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার ভাষা আমার নেই। আমি শুধু আরজ করছি যে, তার ধারণাকৃত দ্বিতীয় দলিলের ভিত্তি তিনি রেখেছেন রুকুর মোট সংখ্যার উপর। অথচ রুকুর যে চিহ্ন মুসহাফের কিনারায় লেখা দেখা যায় তা সাহাবীযুগের অনেক পরে লেখা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রকমের সহজতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন আঙ্গিকে রুকু ভাগ করা হয়েছে। যেমন, বুখারার মাশায়েখগণ ভেবেছেন তারাবীহ'র প্রত্যেক রাকাতে যতটুকু পড়লে সাতাশ রমযানে কুরআন খতম হয়ে যায় ততটুকু অংশে রুকুর চিহ্ন লাগানো হবে। সাতাশ রাতের তারাবীহের মোট রাকাত সংখ্যা ৫৪০। তাই তারা কুরআন মাজীদকে ৫৪০ অংশ ধরে প্রত্যেক অংশে রুকুর চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মোট রুকু ৫৪০ টি।[৫০] অন্যান্য কতক বুযুর্গ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে

---

[৫০] এক যামানায় বুখারা ও তার আশপাশে এ ধরনের চিহ্নওয়ালা মুসহাফ প্রচলিত ছিল। দেখুন, আল মাবসূত, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ফাতাওয়া আলমগীরী (তারাবীহ অধ্যায়)

রুকুর চিহ্ন নির্ধারণ করেছেন ৫৫৮টি। আমাদের এই উপমহাদেশে সাধারণত এ পদ্ধতি অনুসারেই রুকুর আলামত লাগানো হয়। তাই আমাদের এখানকার মুসহাফে আপনি দেখতে পাবেন মোট রুকু সংখ্যা ৫৫৮টি।

কেউ কেউ এ দৃষ্টিকোণ থেকে রুকুর চিহ্ন লাগিয়েছেন যে, একজন তালেবে ইলম প্রতিদিন এক রুকু করে পড়লে দু'বছরে তার হিফজ শেষ হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রুকু প্রায় ছয়শো'র অধিক । ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে ছাপানো কিছু মুসহাফে এ হিসেবেই রুকুর চিহ্ন লাগানো হয়েছে।

তো রুকুর ব্যাপারটি পরবর্তীতে নির্ধারিত একটি বিষয় এবং সম্পূর্ণই ব্যবস্থাপনাগত একটি বিষয়। তাহলে বলুন এ সংখ্যাটিকে হিসাবের ভিত্তি ধরে কোন বিষয়ে দলিল পেশ করা কীভাবে ঠিক হতে পারে।

এরপর ৪৫০ রুকুর কথা কোত্থেকে এল? ফজলুল হক খান সাহেব কি স্বপ্নে এমন কোন মুসহাফ পেয়েছেন যাতে ৪৫০ রুকু আছে? নিজের পক্ষ থেকে কোন সংখ্যা আবিষ্কার করে যদি হিসাব সঠিক বলে প্রমাণ করতে হয় তাহলে আর তা দলিল হয় কী করে? যার ভিত্তিই হল হাওয়াই বিষয় তা দলিল হিসেবে কেন পেশ করা হবে? তাও আবার তাওহীদের মত স্বতঃসিদ্ধ একটি বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য?

এটি ছিল ৬২৩৭ সংখ্যার হাকীকত। এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন পড়েছিল শুধু এ কারণে যে, ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া একটি ভুলকে ডা. ফজলুল হক খান সাহেব একটি গাণিতিক বাস্তবতা বানিয়ে সেটিকেই সঠিক বানানোর অপপ্রয়াস করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দান করুন। আমীন।

৬২৩৮ এর হাকীকত কী?

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে আমি উর্দূ অনুবাদসহ একটি মুসহাফ দেখেছিলাম। যাতে সূরার সূচিতে প্রত্যেক সূরার মোট আয়াত সংখ্যা লেখা হয়েছে এবং শেষে সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৮ লেখা হয়েছে। এখন তালাশ করে ঐ নুসখাটি পাইনি। তবে কেউ যদি তাজ কোম্পানি লিমিটেড করাচি থেকে প্রকাশিত মুসহাফের প্রত্যেক সূরার শুরুতে লেখা আয়াত সংখ্যা এবং সূরার শেষে লেখা নম্বর একত্রিত করে যোগ করে তাহলে যোগফল দাঁড়াবে ৬২৩৮। এমনিভাবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত কিছু মুসহাফের আয়াত সংখ্যাও আমরা গুনে দেখেছি যে, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৮ হয়। যাদের বিষয়টির হাকীকত জানা নেই তারা আবার এ সংখ্যাকেও (৬২৩৮) অনুসৃত কোন গণনা পদ্ধতির মোট আয়াত সংখ্যা না ভেবে বসেন কিংবা ফজলুল হক খানের মত অন্য কেউ এ কথা না বলে বসে যে, এ সংখ্যাটিই আসল সংখ্যা কেননা তা অমুক গাণিতিক হিসাবের মোতাবেক– তাই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়াও জরুরি মনে হচ্ছে।

বিষয় হল, এই মুসহাফগুলোতে সূরাসমূহের মোট আয়াত সংখ্যার উল্লেখ এবং আয়াতের শেষে নম্বর লাগানো হয়েছে কূফী গণনা পদ্ধতি অনুসারে। এই উপমহাদেশের মুসহাফ লিপিকারদের মাঝে এ প্রচলন ছিল যে, যে সব জায়গায় অন্য কোন অনুসৃত গণনা পদ্ধতি অনুসারে চিহ্ন হওয়া উচিত সেখানে তারা ভিন্ন গণনা পদ্ধতির দিকে ইশারা করার জন্য পাঁচ সংখ্যাটি (৫) লিখতেন। কিন্তু তাতে নম্বর লিখতেন না।

এখন এ মুসহাফগুলোতে লিপিকারের বে-খেয়ালির কারণে সূরা নিসার এক জায়গায় এবং আনআমের এক জায়গায় (৫) চিহ্নের বদলে (○) চিহ্ন লেখা হয়েছে এবং সেখানে নম্বরও লেখা হয়েছে।

কূফী গণনা অনুসারে সূরা নিসার মোট আয়াত সংখ্যা ১৭৬ টি। এ সূরার ১৭৩ নং আয়াত হল,

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

তাজ কোম্পানি করাচির ও অন্য দু'-একটি প্রকাশনার মুসহাফে এ আয়াতের فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا তে এসে (১৭৩) এবং وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا তে এসে (১৭৪) নম্বর দেওয়া হয়েছে। এভাবে সূরার মোট আয়াত সংখ্যা হয়ে গেছে ১৭৭। فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا এ এসে আয়াতে নম্বর লাগানো– এটি শামী গণনা হিসাবে ঠিক আছে। কিন্তু পুরো সূরা বরং পুরো মুসহাফে নম্বর লাগানো হয়েছে কূফী গণনা অনুসারে, আর এখানে এসে হঠাৎ করে শামী গণনা অনুসারে নম্বর লেখা? ব্যস, এটি লিপিকারের অসর্তকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কূফী গণনা অনুসারে সূরা আনআমের মোট আয়াত সংখ্যা ১৬৫। এর ৭৩ নং আয়াত হল,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

তাজ কোম্পানি করাচি ও অন্য দু'-একটি প্রকাশনার মুসহাফে এ আয়াতের মাঝখানে وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ এ

এসে (৭৩) এবং وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ এ এসে (৭৪) নম্বর লেখা হয়েছে। এভাবে সূরার মোট আয়াত সংখ্যা হয়ে গেছে ১৬৬।

অন্যান্য গণনা পদ্ধতি যেমন বসরী ও শামী গণনায় كُنْ فَيَكُوْنُ এ নম্বর লেখা হয় কিন্তু কুফী গণনা অনুসারে এখানে নম্বর হবে না। উল্লেখ, বসরী ও শামী গণনায় এ সূরায় মোট আয়াত সংখ্যা ১৬৬। তো এই দুই সূরার দুই নম্বর বেশি লেখায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ এর বদলে ৬২৩৮ হয়ে গেছে।

এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল, লিপিকার বা প্রকাশকের বে-খেয়ালির কারণে উদ্ভূত এ সংখ্যাকে কেউ যেন একটি 'গণনা পদ্ধতি' না বানিয়ে ফেলে। এরপর আয়াত সংখ্যার সূচি উল্লেখ করতে গিয়ে এটিকেই একটি স্বীকৃত গণনা সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ না করে।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এর তরজমাসহ মুসহাফ

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীকৃত কুরআনুল কারীমের ইংরেজি তরজমা বেশ প্রসিদ্ধ। তবে এর নির্ভরযোগ্য এডিশন বলা উচিত মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ এর সম্পাদনার পর প্রকাশিত এডিশনকে। আয়াত সংখ্যার আলোচনা এবং আয়াতের নম্বর বসানোর বিষয়টি এতে নিখুঁতভাবে করা হয়েছে। এই এডিশনের শেষে আরবীতে যে পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে তাতে মোট আয়াত সংখ্যা যে ৬২৩৬ তা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর তরজমাসহ ছাপা মুসহাফের আরও কিছু এডিশনে দেখা গেছে গণনা করলে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৯।

এর কারণ হল, পুরো মুসহাফে কুফী গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও সূরা মায়েদার তিন জায়গায় ভিন্ন গণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কুফী গণনায় সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত হল,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

কিন্তু আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ এ (১) এবং يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ এ (২) নম্বর লিখেছেন।

এখানে তিনি এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে হাফেজ উসমান কর্তৃক লিখিত মুসহাফের অনুসরণে তিনি এমনটি করেছেন। হাফেজ উসমান কর্তৃক লিখিত মুসহাফ লেখার আঙ্গিকগত দিক থেকে ভালো। কিন্তু আয়াত সমাপ্তির জায়গায় চিহ্ন লাগানোর ক্ষেত্রে এতে কিছু ভুল হয়ে গেছে। তেমনি উসমানী লিপিশৈলীর (যা কুরআনুল কারীমের বিশেষ লিপিশৈলী) অনুসরণের ক্ষেত্রে এতে কিছু কমতি হয়েছে।

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ এ মাদানী গণনা, বসরী গণনা প্রভৃতি অনুসারে আয়াতের নম্বর হবে কিন্তু কুফী গণনা অনুসারে এখানে নম্বর হবে না।

এমনিভাবে কুফী গণনায় সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াত শেষ হয়েছে قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ -এর مُّبِيْنٌ -এ এসে। কিন্তু এ মুসহাফে এখানে যেমন আয়াতের নাম্বার বসানো হয়েছে তেমনি আয়াতের মাঝখানে وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ এর মধ্যেও স্বতন্ত্র নম্বর বসানো হয়েছে। অথচ কুফী গণনায় এই অংশকে স্বতন্ত্র আয়াত ধরা হয়নি। অন্যান্য গণনা পদ্ধতি অনুসারে এখানে নম্বর হবে।

এমনিভাবে কুফী গণনা অনুসারে সূরা মায়েদার ২৩ নং আয়াত শেষ হয়েছে وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এ এসে। কিন্তু এই মুসহাফে এখানে যেমন নম্বর বসানো হয়েছে আয়াতের মাঝখানে فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ এ এসেও স্বতন্ত্র নম্বর লাগানো হয়েছে। অথচ এখানে শুধু বসরী গণনা অনুসারে আয়াতের চিহ্ন বসতে পারে, কুফী ও অন্যান্য গণনা অনুসারে এখানে আয়াতের চিহ্ন বসবে না।

এই তিন জায়গায় কুফী গণনা পদ্ধতির সাথে অন্য গণনা পদ্ধতি মিলিয়ে ফেলায় সূরা মায়েদার মোট আয়াত সংখ্যা ১২৩ হয়ে গেছে। অথচ কুফী গণনা অনুসারে এই সূরার মোট আয়াত ১২০। তবে বসরী গণনা অনুসারে আয়াতের মোট সংখ্যা ১২৩।

তো এই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা ১২৩ হয়ে যাওয়ার কারণে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনূদিত মুসহাফে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২৩৯। একাধিক গণনা পদ্ধতি মিলিয়ে ফেলায় এমন হয়েছে। নতুবা কুফী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ই। একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণকে স্বতন্ত্র গণনা পদ্ধতি বানানো ভুল। এটি তো সংশোধন করা কাম্য, একে দলিল বানানো কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসহাফ প্রকাশকদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কুরআনুল কারীমের পরিসংখ্যান পরিচিতি

অনেক প্রকাশক মুসহাফের শুরুতে বা শেষে কুরআন মজীদের বিভিন্ন পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন। এ ধরনের তথ্যের ব্যাপারে মনে হয় মানুষের আগ্রহ খুব বেশি তাই এ ধরনের তথ্য উল্লেখ করা

প্রকাশকরা জরুরি মনে করেন। কিন্তু এ তথ্যসমূহ তাহকীক করা কিংবা এগুলো বাস্তবসম্মত কি না তা যাচাই করে লেখার প্রয়োজন বাহ্যত তারা অনুভব করেন না। তাই দেখা যায় এ ধরনের বিষয়গুলো সাধারণত হাওয়ালা ছাড়া লেখা হয়। হাওয়ালা উল্লেখ করা না হোক, অন্তত বিষয়গুলো যাচাই করে তো লেখা যায়। কিন্তু তাও করা হয় না। না উৎসগ্রন্থের উল্লেখ, না কোন নির্ভরযোগ্য উৎস খুলে দেখার চেষ্টা। ব্যস, কোথাও কিছু দেখল তো সেটাই লিখে দিল। উনি কোত্থেকে লিখলেন? যা দেখে তিনি লিখেছেন তা ঠিক তো? সেখানে কোন মুদ্রণপ্রমাদ ছিল না তো? আর আমি যা লিখছি তা কি যথার্থই পাঠকের সামনে যাচ্ছে নাকি আমার লেখাও মুদ্রণপ্রমাদের শিকার হচ্ছে?

মোটকথা আমানতদারি ও যিম্মাদারির অনুভূতি এবং সঠিক ও সুষ্ঠু বিষয় প্রদানের প্রয়াস এ তথ্যগুলোতে দেখা যায় না। এ কথা ঠিক যে এ তথ্যগুলো কুরআন নয় কিন্তু কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় তো অবশ্যই। তাই এগুলোর ক্ষেত্রে যিম্মাদারির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

এ ধরনের তথ্যাবলীর মাঝে অনেক সময় এমন স্পষ্ট অনেক ভুলও থাকে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি থাকলেই যা ধরা পড়ার কথা। তবু সেগুলো ঠিক করা হয় না।

যেমন ঢাকার অনেক পুরনো একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপা একটি মুসহাফের শেষের পৃষ্ঠায় কুরআন মাজীদের আয়াত, শব্দ, হরফ এবং যের-যবর-পেশ ও অন্যান্য হরকতের একটি ছক দেওয়া হয়েছে। সেই ছকের একটি ছোট অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—

১. কূফী দশক : ৪২৩
২. বসরী দশক : ৬২৩
৩. কূফী পঞ্চক : ৮৪৭
৪. বসরী পঞ্চক : ১২৭৬
৫. বসরী আয়াত : ৬২১৬
৬. শামী আয়াত : ৬২৫
৭. মক্কী আয়াত : ৬২৬২
৮. মাদানী আয়াত : ৬২১৪
৯. কূফী আয়াত : ৬২৩৬
১০. আয়াত : ৬৬৬৬

পর্যালোচনা

প্রথম কথা হল, এই পরিভাষাগুলো দিয়ে কী বোঝায় তা স্পষ্ট না করে শুধু সংখ্যা লিখে দেওয়ার কি বিশেষ কোন ফায়েদা আছে? উচিত ছিল প্রথমে এই পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা করা এরপর তাহকীক করে সংখ্যাগুলো লেখা।

আয়াতের শেষে যে গোল চিহ্ন প্রদান করা হয় আগের যামানায় তার মাঝে আয়াত নম্বর লেখার প্রচলন ছিল না। এর বদলে তখন 'তা'শীর' ও 'তাখমীসে'র প্রচলন ছিল। তা'শীর অর্থ হল, প্রতি দশ আয়াতের পর কোন চিহ্ন প্রদান করা আর তাখমীসের অর্থ হল, প্রতি পাঁচ আয়াতের পর কোন চিহ্ন দেওয়া। দশের চিহ্নগুলোর সমষ্টিকে 'আ'শার' বলা হয়। বাংলায় দশক । আর পাঁচের চিহ্নগুলোর সমষ্টিকে 'আখমাস' বলা হয়। বাংলায় পঞ্চক।

এখন যেহেতু প্রত্যেক আয়াতের পরে সরাসরি নম্বরই লেখা হয় তাই আ'শার ও আখমাস লেখার প্রচলন বাকি থাকেনি। কিন্তু যখন এগুলি লেখার প্রচলন ছিল তখন কোন কোন মুসহাফ-লিপিকার কখনো নিজের লেখা মুসহাফের শেষে তথ্যদানের উদ্দেশ্যে এটিও লিখে দিতেন যে, এ মুসহাফে কোন্ গণনা অনুসারে কত আ'শার হয় আর কত আখমাস হয়। এখন মুসহাফ প্রকাশকরা আ'শার ও আখমাসের চিহ্ন তো মুসহাফে লেখেন না কিন্তু তাদের কেউ কেউ তারপরও মুসহাফের শেষে আ'শার ও আখমাসের মোট সংখ্যা উল্লেখ করে দেন।

উল্লেখ করতে সমস্যা কী? কিন্তু উল্লেখকৃত তথ্য তো সঠিক হতে হবে। আপনিই যখন লিখলেন যে, কূফী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ তাহলে এই সংখ্যাটিতে 'দশ' হবে কতগুলো? চারশো তেইশ না ছয়শো তেইশ। এমনিভাবে এ সংখ্যাটিতে 'পাঁচ' হবে ৮৪৭ নাকি ১২৪৭। আপনার কথা অনুসারেই বসরী গণনা মোতাবেক মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৬ (সঠিক কথা হল, বসরী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০৪) তো এতে ৬২৩ টি 'দশ' হবে নাকি ৬২১টি। এমনিভাবে এতে 'পাঁচ' ১২৭৬ হবে নাকি ১২৪৩টি। আর সঠিক বসরী আয়াতে মোট সংখ্যা (৬২০৪) অনুসারে বসরী আ'শার হবে ৬২০টি, আর আখমাস হবে ১২৪০টি দ্বিতীয় কথা হল, 'কূফী আয়াত', 'বসরী আয়াত' ... এ ধরনের শিরোনাম যদিও হিন্দুস্তানী লেখক ও প্রকাশকরা লেখেন কিন্তু এই অস্পষ্ট শিরোনামের কারণে কারো কারো ভুল বোঝারও আশঙ্কা আছে। তাই এর চেয়ে ভালো শিরোনাম হল, 'কূফী গণনা', 'বসরী গণনা' ...।

তৃতীয় কথা হল, বসরী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২০৪ এর বদলে ৬২১৬ লেখা এবং শামী গণনার মোট আয়াত ৬২২৬ এর বদলে ৬২৫০ লেখা তাহকীকের খেলাফ (যদিও ঐ মুসহাফে শুধু ৬২৫ লেখা!!)

এমনিভাবে মক্কী গণনার মোট সংখ্যা ৬২১৯ এর বদলে ৬২১২ লেখা তাহকীকের খেলাফ (যদিও ঐ মুসহাফে শুধু ১২৬২ লেখা!!)

মাদানী গণনার মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৪ লেখা হয়েছে। এটি ঠিক, কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার ছিল যে, এটি দ্বিতীয় মাদানী গণনা অনুসারে। মাদানী আওয়ালের গণনা অনুসারে মোট সংখ্যা ৬২১৭।

প্রতিটি আরবী বর্ণমালার সংখ্যা

কোন কোন প্রকাশক কুরআনুল কারীমের আরবী বর্ণমালার (ا) থেকে (ي) পর্যন্ত কোন হরফ কতবার এসেছে এটি উল্লেখ করাও মুনাসিব মনে করেন। এ উপমহাদেশের মুসহাফ প্রকাশকদের মধ্যে থেকে যে প্রকাশকই এ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন সাধারণত আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. এর 'বুস্তানুল আরেফীনে'র হাওয়ালাতেই তারা এ সূচি উল্লেখ করেন, কিন্তু তারা পাশাপাশি এ কথাও বলেন যে, এ সংখ্যাগুলো আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর মতানুসারে। অথচ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. এক এক হরফ করে যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন তা (নির্দিষ্ট কোন নাম উল্লেখ না করে) কতক কারীর হাওয়ালায় উল্লেখ করেছেন, আবদুল আযীযের হাওয়ালায় নয়। আবদুল আযীযের হাওয়ালা তিনি দিয়েছেন শব্দ ও সর্বমোট হরফ সংখ্যা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে।

'বুস্তানুল আরেফীনে'র বেশ কিছু ছাপা এডিশন ও পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। সবগুলো দেখেই আমি লিখছি। যদি কারও কাছে 'বুস্তানুল আরেফীনে'র নির্ভরযোগ্য কোন নুসখা থাকে, যাতে এই সংখ্যাগুলো আবদুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ'র হাওয়ালায় লেখা হয়েছে তাহলে আমাকে জানালে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

আরেকটি বিষয় হল, হরফ সংখ্যা গণনা করার আগে গণনা করার পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণ করা জরুরি। যেমন–

১. তাশদীদযুক্ত হরফকে দুই হরফ ধরা হবে না এক হরফ
২. যে হরফ শুধু লেখায় আসে পড়ায় আসে না তা গণনা হবে নাকি হবে না
৩. যে হরফ শুধু পড়ায় আসে লেখায় আসে না তা গণনা হবে কি না
৪. لا কে এক হরফ ধরা হবে নাকি দুই হরফ
৫. কোন্ কেরাআত অনুসারে হরফ গণনা করা হচ্ছে তা স্পষ্ট করতে হবে। কারণ কখনো এক কেরাআতে يعلمون থাকে। আর সেটিই অন্য কেরাআতে تعلمون থাকে। প্রথম কেরাআত অনুসারে এ শব্দটির প্রথম হরফ হবে (ي), এ ক্ষেত্রে (ي) এর সংখ্যা বেশি হবে। দ্বিতীয় সুরতে প্রথম হরফ হবে (ت), এ ক্ষেত্রে (ت) এর সংখ্যা বেশি হবে। তাই কোন্ কেরাআত অনুসারে হরফ গণনা করা হচ্ছে তাও স্পষ্ট করা জরুরি।

তো প্রথম কাজ হল, গণনা পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়ত এটি মুনাসিব হবে না যে, 'বুস্তানুল আরেফীনে'র কোন নুসখা থেকে বা আগে ছাপা হয়েছে এমন কোন মুসহাফের শেষে প্রদত্ত তালিকা দেখে হরফ সংখ্যা উল্লেখ করে দেওয়া হল। কারণ, হতে পারে লিপিকারের ভুল হয়েছে বা মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে কিংবা হয়তো যে ব্যক্তি গণনা করেছে তার ভুল হয়েছে। কুরআন মাজীদ তো আলহামদু লিল্লাহ সংরক্ষিত। আমাদের গণনায় ভুল হতে পারে এবং গণনা পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু কুরআন যেভাবে আল্লাহ নাযিল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীনা মুবারকে সংরক্ষণ করে দিয়েছিলেন, কুরআন ঠিক সেভাবেই এখনো সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। তো সতর্কতার দাবি হল, হিফজে কুরআন ও ইলমে কেরাআতে পারদর্শী একদল লোক (যারা হিসাবেও পাকা হবে) এই গণনার কাজ করবে। সতর্কতার সাথে বার বার গণনা করবে। ইসলামী বিশ্বের ইলমে কেরাআতে পারদর্শী অন্যান্য ইমামগণ যদি এই পরিসংখ্যানের কাজ করে থাকেন তাহলে তাদের গণনা ফলের সাথে নিজেদের গণনাফল মিলিয়ে দেখবে এরপর আরো চিন্তা-ভাবনা করে সতর্ক ও স্পষ্ট বাক্যে তা লিখবে। বার বার প্রুফ দেখবে এবং ছাপার সময় নমুনা দেখবে। এ সব কিছুর পর তা প্রকাশ করা হবে।

এখন আমরা এই সতর্কতার প্রতি কোন খেয়ালই করি না বরং এমন স্পষ্ট ভুল করে বসি যে, ভুল ধরার জন্য বেশি চিন্তা-ফিকির ও হিসাব-কিতাবেরও প্রয়োজন পড়ে না। উদাহরণত যদি সংখ্যা-সংক্রান্ত তথ্যাবলীর ছকে আমরা সর্বমোট হরফ সংখ্যা লিখি ৩, ২১, ২৫০ আর (ا) থেকে (ي) পর্যন্ত প্রত্যেক হরফের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার যোগফল দাঁড়ায় অন্য কিছু তাহলে কি তা আপত্তিকর এবং কারো কারো কাছে হাস্যকর হবে না? যদি আপনি এই ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চান (যা কিছুতেই ঠিক নয়) যে, আমরা তো প্রত্যেক হরফের সংখ্যা আবদুল আযীযের মতানুসারে লিখেছি তাহলে প্রশ্ন জাগবে যে, সর্বমোট হরফ সংখ্যাও তাহলে তার মতানুসারেই লিখতেন!

শেষ কথা হল, যদি আমরা গণনার হক আদায় করতে না পারি এবং সতর্কতার সাথে এ কাজ না করতে পারি তাহলে আমাদের এ কাজে নামার দরকার কী ছিল? আখের এটি কি ফরজ-ওয়াজিব কোন কাজ ছিল। কুরআন তো সংরক্ষিতই আছে। কারো শখ হলে সে নিজেই গুনে দেখুক। আমাদের যদি শখ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য হল, উসূল মোতাবেক কাজ করা এবং সতর্কতার পরিচয় দেওয়া যেন আমাদের কাজ সুষ্ঠু-সুচারু হয় এবং বাস্তবতাবিরোধী না হয়।

হরফ সংখ্যা সম্পর্কে যা বলা হল, শব্দ সংখ্যা সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। হরকত, সাকিন, তাশদীদ এবং মদের চিহ্ন সম্পর্কে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য।

কুরআনের পরিসংখ্যান বিষয়ক পুস্তিকা ও প্রবন্ধাবলী

আজকাল 'কুরআনী মালুমাত' শিরোনামে বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখার ধারা চালু হয়েছে। কিন্তু এগুলোতে যে তথ্য প্রদান করা হয় সেগুলো সঠিক কি না তা যথাযথ যাচাই করা হয় না। এটি খুবই আফসোসের কথা। এমনকি 'কুরআন বিশ্বকোষ' বের করা হয়, সেখানেও তথ্য উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সীমাহীন অসতর্কতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষ 'বিশ্বকোষ' নামটাকেই 'সনদ' মনে করে।

আমার সামনে এখন 'কুরআনী মালুমাত' নামে দুটি পুস্তিকা আছে।

১. মাওলানা আবদুল মা'বুদ কাসেমী কর্তৃক সংকলিত
২. মাওলানা হাফেয নযীর আহমদ কর্তৃক সংকলিত

এ উভয় পুস্তিকার বেশ কিছু বিষয় সংশোধন করা আবশ্যক। বিশেষত আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে উভয় পুস্তিকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা খুবই আপত্তিকর। মাওলানা আবদুল মা'বুদ কাসেমী সাহেবের পুস্তিকাটির ৫০-৫৪ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যার একটি ছক আছে। কিন্তু তিনি সেখানে সর্বমোট আয়াত সংখ্যা যোগ করে বের করেননি। আমার শাগরেদ এনামুল হাসান যোগ করার পর যোগফল বের হয়েছে ৬২৩৫। হওয়ার কথা ছিল ৬২৩৬। আসলে ছকে সূরা হূদের আয়াত সংখ্যা লেখা হয়েছে ১২২, কিন্তু কূফী গণনা অনুসারে সূরা হূদে আয়াত সংখ্যা ১২৩। ব্যস, এ কারণে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ না হয়ে ৬২৩৫ হয়ে গেছে। এই বিস্তারিত ছক প্রদানের পরও ১২১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬!!

জনাব! নিজের প্রদানকৃত ছক থেকেই একটু যোগ করে দেখতেন যে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ হয়, না অন্য কিছু।

আর মাওলানা নযীর আহমদ সাহেবের পুস্তিকায় তো হাজার হাজার এর সেই কাল্পনিক বণ্টনছকও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, আবদুস সামাদ সারেমের পেশকৃত পরিসংখ্যানের পর্যালোচনায় যার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রবন্ধের ঐ অধ্যায়টি অবশ্য বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে না। মাসিক আল কাউসারের ধারাবাহিক কোন সংখ্যায় তা প্রকাশ করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

তবে কিছুদিন আগে কুরআনের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য নিয়ে বাংলায় নাঈম আবু বকর সাহেবের একটি পুস্তিকা বের হয়েছে। এর ১০৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'কুরআনের সর্বমোট আয়াত ৬২৩৬'। আর ৫৭-৬১ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যার একটি বিস্তারিত ছকও إحصائيات القرآن الكريم.com এর হাওয়ালায় উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে শেষে যোগফল উল্লেখ করেননি। এ ধরনের পুস্তিকার প্রথাগত পথ থেকে সরে এসে সঠিক সংখ্যা লেখার জন্য তাকে মোবারকবাদ!

جزاه الله خيرا في الدارين، وبارك في علمه وعمله

অধ্যায়-৮

মুসহাফ প্রকাশকদের খেদমতে অনুরোধ

এ উপমহাদেশে একসময় মুসহাফ ছাপানোর ব্যবস্থা ছিল না। কুরআনের কপি সংগ্রহ করতে মানুষের বেগ পেতে হত। কতক প্রকাশক হিম্মত ও মোজাহাদা করে মুসহাফ ছাপানোর কাজ শুরু করেন। আগের যে প্রকাশকগণ এ কাজ শুরু করেছিলেন এবং যারা এ কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে আপন শান মোতাবেক জাযা দান করুন। তাদের এ খেদমতকে উম্মতের জন্য উপকারী একটি খেদমত হিসেবে কবুল করুন, তাদের ও তাদের বংশধরদের জন্য এ খেদমতকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

এ খেদমতটিকে সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যে প্রকাশকগণ যারপরনাই চেষ্টা করেছেন আমাদের কৃতজ্ঞতা পাবার তারা অধিক হকদার। এমন প্রকাশক সংখ্যায় কম কিন্তু আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি।

আমি সকল মুসহাফ প্রকাশকদের মর্যাদার কথা স্বীকার করি এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আদবের সাথে বিনীতভাবে তাদের খেদমতে কিছু অনুরোধ পেশ করতে চাচ্ছি। এর মাঝে যেগুলো আগে থেকেই হয়ে আসছে সেগুলো আরও সুষ্ঠু-সুন্দর ও সুচারুরূপে করার অনুরোধ। আর যেগুলো করা হচ্ছে না সেগুলোর উপর আমল শুরু করার দরখাস্ত করছি।

অনুরোধগুলো এই–

১. প্রুফ সংশোধন, প্রেসে ছাপানো এবং বাঁধাই এ প্রত্যেকটি স্তর নিখুঁত ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া।

২. অন্তত মামুলি কাগজে মুসহাফ না ছাপা। এর জন্য শুধু হিম্মত আর নিয়তই যথেষ্ট। এমন করলে হাদিয়া বৃদ্ধির কারণে বিক্রয়ে ঘাটতি পড়বে এমন নয় বরং ক্রেতা আরও বাড়বে এবং কাটতিও বেশি হবে।

৩. ছাপার সকল জিনিসপত্র উন্নত থেকে উন্নততর হওয়া।

৪. সেলাই ও বাঁধাই মজবুত হওয়া। তেলাওয়াত করা ও সংরক্ষণ করে রাখার জন্য যেন মুনাসিব হয়।

৫. যদি আগের কোন মুসহাফ থেকে ফটোকপি করে ছাপানো হয় তাহলে সেই মুসহাফটির ব্যাপারে স্পষ্ট তথ্য প্রদান করা।

৬. যদি হাতে লিখে ছাপানো হয় তাহলে লিপিকারের নাম এবং তার পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রদান করা।

৭. সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে কেউ থাকলে স্পষ্টভাবে কাজের বিবৃতি দিয়ে তাদের নাম উল্লেখ করা। অস্পষ্টভাবে কারও নাম না দেওয়া এবং যতখানি তত্ত্বাবধানের কাজ তিনি করেছেন তার বেশি দাবি না করা।

৮. ভূমিকা ও পরিশিষ্ট যদি কোন আলেম, কারী, হাফেয বা বিজ্ঞজন দিয়ে লেখানো হয় তাহলে তার নাম ও তারিখসহ দস্তখত উল্লেখ করা।

৯. ভূমিকা ও পরিশিষ্টে উল্লেখকৃত তথ্য যথাযথ তাহকীক করে উল্লেখ করা। একাধিক মুহাক্কিক আলেমদের মাধ্যমে তা সম্পাদনা করানো। নুসখা পরিচিতি, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, কুরআনের পরিসংখ্যান, কুরআন খতমের দুআ– মোটকথা যা কিছু লেখা হোক তাহকীক করে লেখা। ধারণার ভিত্তিতে কোন কিছু না লেখা।

১০. আয়াতে নম্বর বসানো, সূরার শুরুতে প্রদত্ত তথ্য, ওয়াকফের চিহ্নাবলী এবং অন্যান্য চিহ্ন– এগুলো বসাবার সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য ও দলীলযোগ্য মুসহাফের সাথে মিলিয়ে দেখা এবং এ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত তথ্যের সাথেও মিলিয়ে দেখা।

১১. ফাযায়েলে কুরআন বা কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের ফযীলত এবং কুরআন তেলাওয়াতের আদব এ দুই আলোচনা আরও নিখুঁত হওয়া কাম্য। আর মুসহাফের শুরুতে বা শেষে তাবিজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সূরার 'খাসিয়াত' ও নকশা উল্লেখ করা মুনাসিব নয়। এগুলোকে মুসহাফে শামিল করা ঠিক নয়।

১২. ছাপার সন-তারিখ, ছাপার সংখ্যা, 'প্রকাশকের কথা'র শেষে হিজরী ও ঈসায়ী উভয় সন-তারিখ উল্লেখ করা।

১৩. আমাদের বদ আমালের কারণে সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এদিকে কোন দৃষ্টি নেই। তাই সব প্রকাশকরা মিলে দেশের বড় বড় মাদ্রাসাগুলোর সহায়তায় যদি একটি মুসহাফ প্রকাশের তত্ত্বাবধান কমিটি তৈরি করে তাহলে ভালো হয়। এই কমিটিতে ইলমে কেরাআতে পারদর্শী আলেম ও হাফেজগণ থাকবেন। স্বীকৃত কোন কমিটির পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান, নযরে ছানী (শব্দে শব্দে অক্ষরে অক্ষরে দেখা) ছাড়া কোন মুসহাফ ছাপা হবে না– এ ধরনের কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম বানানো গেলে খুব ভালো হয়।

১৪. শেষ কথা হল, মুসহাফের শুরুতে বা শেষে সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যে এমন কোন কথা লেখা কিছুতেই সঙ্গত নয় যা খোদ আমার প্রকাশিত মুসহাফই ভুল প্রতিপন্ন করে। যেমন লিখে দেওয়া হল যে, মোট রুকুর সংখ্যা ৫৪০ এবং স্পষ্টও করা হল না যে, এটি কার বা কাদের পদ্ধতি অনুসারে। আর সেই মুসহাফে গুনে দেখা গেল মোট রুকু ৫৫৮টি। অথবা লিখে দেওয়া হল, সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৩৩৬ মতান্তরে ৬৬৬৬। অথচ সেই মুসহাফ থেকে আয়াত গণনা করে দেখা গেল না প্রথম সংখ্যাটি সঠিক হয়, না দ্বিতীয় সংখ্যাটি!!

(ঢাকা থেকে প্রকাশিত যে মুসহাফগুলোতে ৬৩৩৬ লেখা আছে তা সম্ভবত মুদ্রণজনিত ভুল। সম্ভবত তারা ৬২৩৬ লিখতে চেয়েছিলেন।)

মোটকথা এমন কোন কথা লেখা, যা একদিকে বাস্তবতাবিরোধীও আবার আমার মুসহাফে থাকা

বাস্তব বিষয়াবলীরও বিপরীত- এটা আমার জন্য লজ্জাস্কর। এমনিভাবে আমি যদি কোন স্ববিরোধী কথা লিখে দেই, আমার প্রকাশিত অনূদিত মুসহাফের এক জায়গায় ৬৬৬৬ আর আরেক জায়গায় ৬২৩৬ লিখি কিংবা আমার প্রকাশিত এক মুসহাফে এক সংখ্যা আরেক মুসহাফে অন্য আরেক সংখ্যা লিখি- এ ধরনের কাজের দ্বারা প্রকাশকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

এ কয়েকটি কথা প্রকাশকদের খেদমতে আদবের সাথে পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা আমার গোস্তাখি মাফ করুন এবং তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন। আমীন।

كلمة الشكر والإهداء

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومنه ترجى السانحات، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

আয় আল্লাহ! আজকের এই সন্ধ্যায় আমি যে নেআমতের মাঝে আছি এবং আপনার যে কোন মাখলুক যে নেআমতের মাঝে আছে তার সবই একমাত্র আপনার তরফ থেকে দেওয়া দান। আপনার শরীক কেউ নেই। তাই সকল প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্য। সকল কৃতজ্ঞতা আপনার জন্য।

আমার অন্যান্য তাহকীকী কাজের মত এ প্রবন্ধেও কাছের-দূরের, দেশ ও দেশের বাইরের অনেক দোস্ত-আহবাব, সাথী-শাগরেদ, উস্তায ও মুরব্বীর সহযোগিতা আছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে যে যেই সহযোগিতাই করেছেন সবার কথা আল্লাহ তাআলা জানেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে আপন শান মোতাবেক জাযা দান করুন। বাকি বিস্তারিতভাবে সবার শুকরিয়া জ্ঞাপন-তো ইনশাআল্লাহ অন্য এক সময় তা আদায় করার ইচ্ছা আছে। তবে সবার জন্যই আমি দুআ করছি। কখনো নাম ধরে বিস্তারিতভাবে, কখনো নাম না বলে। প্রায় পনেরো বছর যাবৎ এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। এ দীর্ঘ সময়ে কত মানুষ সহযোগিতা করেছে। হতে পারে কারো কারো নামও আমি ভুলে গেছি। আমার রব সর্বজ্ঞাত। لا يضل ربي ولا ينسى আল্লাহ তাআলা সবাইকে আপন শান মোতাবেক জাযা দান করুন। আমীন।

আয় আল্লাহ! শুধু আপনার ফযল ও করমে এ কাজটিকে কবুল করে নিন। যা একমাত্র আপনার তাওফীকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আমার ভুল ত্রুটি আপনি ক্ষমা করে দিন। এতে কোন ভুল থেকে গেলে তা সংশোধন করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

আয় আল্লাহ! আপনার ফযল ও করমে এ কাজের যে সওয়াব আপনি প্রদান করবেন তা আমার পিতা-মাতা, বড় ভাইজান, আমার আহলিয়া মুহতারামা, মুহাতারাম আসাতিযায়ে কেরাম, আমার সহযোগীগণ, বিশেষভাবে এ প্রবন্ধের অনুবাদক মওলবী হুজ্জাতুল্লাহ এবং এই লেখার প্রেরণাদাতা আমার মুহসিন মুরুব্বী জনাব প্রফেসর ড. আনওয়ারুল কারীম সাহেব ও তার পরিবার পরিজনের আমলনামায় দিয়ে দিন। আয় আল্লাহ! সবার আমলনামায় এর পরিপূর্ণ সওয়াব দিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনার অনুগ্রহ সীমাহীন। আপনার রহমত ও করুণা অসীম। ●

هذا، وصلى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
দারুত তাসনীফ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
০৩.০৫.১৪৩৭ হিজরী
১৩.০২.২০১৬ ইংরেজি
শনিবার রাত

তাফসীরে মাজেদী : স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

প্রাক কথন

উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় রচিত 'তাফসীরে মাজেদী' পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও চর্চার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ভারতীয় উপমহাদেশের নন্দিত আলিম, সম্পাদক ও বুদ্ধিজীবি মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ. (১৮৯২-১৯৭৭) এ কালজয়ী তাফসীরের লেখক। উর্দু ও ইংরেজী ভাষা একে অপরের তরজমা নয়। দু'টি স্বতন্ত্রভাবে লিখিত। সূরার শানে নুযুল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভূগোল ও তুলনামূলক আলোচনায় তাফসীরটি কর্তৃত্বব্যঞ্জক ও প্রামাণিক। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের শব্দক্রম, পদবিন্যাস, বাক্যগঠন ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব নিয়ে তিনি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনা করেন তাতে তাঁর লেখনি-শক্তির মুনশিয়ানার পরিচয় বিধৃত হয়। প্রাঞ্জল ভাষা, যুৎসই অনুবাদ, ঝরঝরে বর্ণনাভঙ্গি, প্রতি আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শেষে খণ্ড-পৃষ্ঠাসহ প্রাচীন তাফসীরের উদ্ধৃতি 'তাফসীরে মাজেদী'-কে আর দশটি তাফসীর থেকে আলাদা করেছে। ঈমানী চেতনার উন্মেষ, জীবনাচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ, জীবনসমৃদ্ধকারী বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাইবেলের বিভিন্ন বর্ণনার অসঙ্গতির গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণের কারণে 'তাফসীরে মাজেদী' বিদগ্ধমহলে বেশ জনপ্রিয়। এ পর্যন্ত ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় লিখিত সব তাফসীরের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে এটি অতুলনীয় ও গ্রহণযোগ্য তাফসীর।

জীবন ও কর্মসাধনা

তাফসীরের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য তাফসীরকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। তাই তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ. ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাবাংকি জেলার দরিয়াবাদে ১৮৯২ সালের ১৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে ক্যানিং কলেজ হতে দর্শনশাস্ত্রে বিএ (অনার্স) ডিগ্রী লাভ করেন। দর্শনে মাস্টার্স ডিগ্রী নেয়ার জন্য তিনি সেন্ট স্টিফেন কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পড়া-লেখা সমাপ্ত করতে পারেননি। Psychology of Leadership নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে ১৯১৩ সালে। উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৫০। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ নিম্নে উদ্ধৃত হল–

১. ফালসাফায়ে ইজতিমা[1]
২. ফালসাফায়ে জাযবাত
৩. মুরদু কি মাসীহাঈ (যিকরে রাসূল)
৪. মাযামীনে আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী
৫. মুহাম্মদ আলী যাতী ডায়েরী
৬. তাফসীরুল কুরআন (ইংরেজী)[2]
৭. তাফসীরুল কুরআন (উর্দু)
৮. ওয়াফিয়াতে মাজেদী
৯. বাশারিয়াতে আম্বিয়া কুরআন মজীদ মে
১০. হাকিমুল উম্মত: নকুশ ওয়া তা'আসসুরাত
১১. আপবিতী
১২. সীরাতুন্নবী (সা.) কুরআন কি রওশনি মে
১৩. হাইওয়ানাতে কুরআনী
১৪. মাবাদিয়ে ফালসাফা ২খণ্ড
১৫. তাসাউফে ইসলাম
১৬. আকবরনামা
১৭. সফরে হিজায
১৮. ফি মা ফি মালফুযাতে মাওলানা রুমি।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ.'সাচ' ও 'সিদক-ই-জাদীদ' নামে ২টি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী রাহ. উক্ত সাপ্তাহিক দু'টির সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁর সাথে সাংবাদিকতা করেন। উর্দু ভাষায় সীরাত বিশ্বকোষ নামে পরিচিত কালজয়ী গ্রন্থ ৮ খণ্ডের 'সীরাতুন্নবী' রচনার সময় আল্লামা শিবলি নুমানী রাহ.-এর সাথে গবেষণাকর্মে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। খিলাফত আন্দোলন, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, আজমগড়ের শিবলি একাডেমি ও রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী ও ধীশক্তির অধিকারী। মাত্র ৯ বছর বয়সে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অমৃতসর' পত্রিকায়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর ও আকবর এলাহাবাদীর সাথে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্টতা। ১৯৭৭ সালের ৬ জানুয়ারী এ বিদগ্ধ মুফাসসির ইন্তেকাল করেন।

---

১. দরিয়াবাদী রাহ. রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে এই বইটিকে নিজের রচনাবলী থেকে বাদ দিয়েছিলেন। একারণে এর উল্লেখ না করাই মুনাসিব ছিল। তিনি লিখেছেন–

اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس کتاب اور اس دور کے دوسرے کفریات سے

'এই কিতাব ও এ যুগের অন্যান্য কুফরী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।' –কুল্লিয়াতে মাজেদী খ. ২ পৃ. ২১৩ –আবদুল মালেক

২. হযরত দরিয়াবাদী রাহ.-এর বড় আফসোস ছিল যে, তিনি গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার দেখতে পারেননি। অথচ তিনি প্রচণ্ডভাবে এর প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। দ্র. কুল্লিয়াতে মাজেদী খ.২ পৃ.২৩১– আবদুল মালেক

চিন্তাধারা

দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব ছিল তাঁর প্রিয়তম বিষয়। অধিকহারে প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে তাঁর মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে সংশয়বাদিতা তৈরি হয় এবং তিনি প্রায় ৯ বছর ধর্ম-কর্ম হতে দূরে অবস্থান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এ পথ থেকে ফিরে এসে পূর্ণমাত্রায় ধর্মচর্চা ও অনুশীলনে ব্রতী হন। দক্ষতার সাথে আরবী শিখে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআনের তাফসীর অধ্যয়ন ও তাফসীর লিখনে বছরের পর বছর অতিবাহিত করেন। এর পেছনে হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহ. ও আকবর এলাহাবাদীর বিশেষ ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। সুন্নতি দাড়ি, সালেহীনের পোশাক ও ইসলামী জীবনাচারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল ছিলেন।

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর সাথে সম্পর্ক

হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর সাথে সম্পর্ক মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ.-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হযরত মাদানী রাহ.-এর হাতে বাইয়াত হয়ে এবং হযরত থানভীর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করে তিনি আধ্যাত্মিকতার সাধনায় ব্রতী হন। হযরত থানভী রাহ.-এর সাথে সবসময় পত্র যোগাযোগ রাখতেন এবং পরামর্শ নিতেন। সময় ও সুযোগ পেলে থানাভবনের খানকায়ে এমদাদিয়ায় গিয়ে হযরত থানভী রাহ.-এর সান্নিধ্য লাভ করতেন। হযরত থানভী রাহ.-এর স্নেহধন্য এ মনীষী 'তাফসীরে মাজেদী'-এর বহু জায়গায় কুরআনের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন 'মুর্শিদ থানভী নে ফরমায়া'। উর্দূ ভাষায় লিখিত 'হাকিমুল উম্মত: নকুশ ওয়া তাআ'সসুরাত' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে হযরত থানভী রাহ.-এর প্রতি তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় প্রতিভাত হয়।

স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য

উর্দূ ভাষায় রচিত বহুল আলোচিত ও সমালোচিত শীর্ষস্থানীয় তাফসীরের মধ্যে 'তাফসীরে মাজেদী' অন্যতম।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ. প্রথমে ৪খণ্ডে ইংরেজী ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীর রচনা করেন এবং পরবর্তীতে উর্দূ ভাষায় লেখা সম্পন্ন করেন। দু'টিরই নাম 'তাফসীরে মাজেদী'। 'তাফসীরে মাজেদী' লেখার সময় মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ. কেবল আরবী ভাষায় লিখিত প্রাচীন তাফসীরের উপর নির্ভর করেননি; বরং তাওরাত, বাইবেলসহ সমসাময়িক ও আধুনিক তাফসীর এমনকি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের রচিত গ্রন্থাবলির সহায়তা নিতেও দ্বিধা করেননি। ফলে কুরআনে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের সত্যতা ও যথার্থতার নানা দিকে আলোকপাত সহজ হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনের ইবারতে সাহিত্য, ভাষাশৈলী, অলংকার, সুষমার যে ব্যতিক্রম তা অনুবাদে যথার্থভাবে রক্ষিত হয়েছে। যেসব আয়াতে প্রাচ্যবিদগণ (Orientalists) বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন তার জবাব দিতে তিনি দ্বিধা করেননি।

'তাফসীরে মাজেদী' রচনায় মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ. হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর 'বায়ানুল কুরআন'-এর উপর অনেকটা নির্ভর করেন। তাঁর কাছে 'বায়ানুল কুরআন' সব তাফসীরের সেরা তাফসীর বিবেচিত হলেও কিছু কিছু অনুবাদের ক্ষেত্রে এথেকে সরে আসেন। ঐ সকল জায়গায় তিনি হযরত থানভী রাহ.-এর সাথে পত্রযোগে পরামর্শ করেছিলেন। তাঁর কিতাব হাকীমুল উম্মত : নকূশ ওয়া তাআসসুরাতে এ ধরণের বেশ কয়টি চিঠি রয়েছে।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিশেষত আদ, ছামুদ, লূত, বনি ইসরাঈল, কওমে সালেহ, কওমে মাদায়েন ইত্যাদির পরিচয়, যুগ পরম্পরা, ভৌগোলিক অবস্থান ও নবীদের দাওয়াতী কার্যক্রম সবিস্তারে তুলে ধরেন তাঁর তাফসীরে।

দরিয়াবাদীর তাফসীরের আরেকটি আলোকিত দিক হচ্ছে ইহুদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদের নানা অভিযোগের খণ্ডন। তারা মনে করে, কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি তাওরাত ও বাইবেল থেকে সংগৃহীত। মাওলানা দরিয়াবাদী এসব অভিযোগের চূড়ান্ত জবাব দিতে কুণ্ঠিত হননি। যেসব ঘটনাপ্রবাহের বিবরণী বাইবেল, তাওরাত ও কুরআনে উল্লিখিত আছে সেখানে ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সত্য তুলে ধরেন। ইহুদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতবর্গ সাধারণত অভিযোগ করে থাকে যে, মুসলিম মেয়ের সাথে অমুসলিম ছেলের বিয়ের ব্যাপারে ইসলাম গোঁড়া ও অসহিষ্ণু। মাওলানা দরিয়াবাদী তাওরাত ও বাইবেলের সংশ্লিষ্ট আয়াতের উদ্ধৃতিসহকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, অপরাপর আসমানী ধর্মেও ঈমানদার ও কাফিরদের মধ্যে বিয়ের বন্ধনেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। একই পদ্ধতিতে তিনি বিয়ে, তালাক ও খ্রিস্টান বিশ্বে পারিবারিক বন্ধনের বিশ্লেষণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন স্বার্থকতার সাথে।

মানব অভিজ্ঞতা ও সমাজ বিবর্তনের আলোকে নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও আইনের শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে এ তাফসীরে পরিশ্রুত গবেষণা ফুটে উঠেছে। ইসলামের অনুশাসন ও বিধিনিষেধ পরিশীলিত ও সুবিন্যস্ত সমাজ কাঠামো তৈরীতে কী ভূমিকা রাখে লেখক সত্য দুনিয়ার কাছে

তা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

আরো একটি ব্যাপার বিস্ময়ের উদ্রেক করে যে, জীবনী পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মাওলানা দরিয়াবাদী মাদরাসায় পড়েননি এবং কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রীও তাঁর নেই। কিন্তু আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ও পারঙ্গমতা অনেককে হার মানায়। তাফসীর করতে গিয়ে তিনি বহু জায়গায় নাহভী-সারফী তারকিব, শব্দ ও পরিভাষার বিশ্লেষণ করে চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। লক্ষ্ণৌস্থ দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষা পরিচালক ও মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী রাহ. 'তাফসীরে মাজেদী'-এর ১ম খণ্ডে প্রদত্ত অভিমতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য– "এ তাফসীর মানুষকে মুফাসসির বানায়। কেউ যদি একটি মাত্র গ্রন্থে প্রাচীন ভাষ্যকারদের বর্ণনা কিভাবে ও কোন শব্দে লেখা আছে জানতে চায়, 'তাফসীরে মাজেদী' তার জন্য যথেষ্ট। গবেষকদের সর্বশেষ মূল্যায়ন ও গবেষণার পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত এ তাফসীরে পাওয়া যাবে।"

ইংরেজী তাফসীরের ভূমিকায় মুসলিম বিশ্বের অন্যতম স্কলার আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. লিখেন,

"The Holy Qur'an is, after all, the Word of God, perfect and faultless, while no man can make a claim to finality or impeccability. Every product of human mind is likely to contain some deficiency, yet, for all that, 'Abdul Majid Daryabadi has acquitted himself of this onerous task in laudable manner. Throughout his life he preoccupied himself with the study of the Holy Qur'an and wrote an exegesis in Urdu in addition to the English one. His translation and commentary is, to my mind, unique and most dependable among all the translations and commentaries of the Qur'an so far attempted in English language."May Allah accept his praiseworthy endeavor and shower His choicest blessings on him."-- ***Abul Hasan Ali Nadwi*** (Lucknow, 1981)

"পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার কালাম, পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল। কোন মানুষ নিজের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গতা ও নিষ্কলুষতা দাবী করতে পারে না। মানব মনের হৃদয় কন্দর থেকে উৎসারিত যে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ঘাটতি থাকা বিচিত্র নয়। এতদসত্ত্বেও মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী এ দুরূহ ও ক্লেশকর কাজটি করেছেন প্রশংসনীয় পন্থায়। তিনি সারা জীবন কুরআন চর্চা ও গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন এবং ইংরেজীর পাশাপাশি উর্দূ ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রণয়ন করেন। এ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় যত তাফসীর প্রণিত হয়েছে আমার বিবেচনায় তাঁর অনুবাদ ও তাফসীর অতুলনীয় ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তাঁর এ প্রশংসনীয় কর্মটিকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন এবং তাঁর প্রতি খাস রহমত বর্ষণ করুন, আমীন।"

মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত 'তাফসীরে মাজেদী শরীফ' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ সালে প্রকাশ করে। ●

নোট : জনাব ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসাইন সাহেব-এর নিবন্ধের বিষয়বস্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে সময় স্বল্পতার কারণে তিনি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তাফসীরে মাজেদীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী কৃত ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিৎ যার উল্লেখ বর্তমান নিবন্ধে রয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, দরিয়াবাদী রাহ. মাদরাসা পড়ুয়া না হলেও এর অর্থ এই না যে, তাঁর অবগতি অনুবাদ-ভিত্তিক ছিল যেমনটা আজকাল কিছু কিছু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের অবস্থা যে, দু'চারটি তরজমা পড়েই নিজেকে একান্ত দ্বীনী বিষয়ে শুধু রচনাই নয়, সিদ্ধান্ত দানকারী রচনার যোগ্য মনে করতে থাকে। মাওলানা দরিয়াবাদী রাহ.-এর অবস্থা এমন ছিল না। বরং আরবী উলূমের সাথে তাঁর যথেষ্ট জানাশোনা ছিল এবং দীনের মৌলিক বিষয়াদির তালিম তিনি সরাসরি অর্জন করেছিলেন। যেমনটা বর্তমান নিবন্ধেও ইশারা করা হয়েছে। এরপরও হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী রাহ. পরিষ্কার লিখেছেন–

"عربی عالم نہ ہونے کی وجہ سے اور ارباب کمال اور ارباب علوم نبوت سے راسخ صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے عقیدے میں پختگی نہ آسکی"

خیال رہے: یہاں نفس صحبت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ راسخ صحبت کی نفی کی گئی

হযরত বিন্নুরী রাহ. তাঁর সম্পর্কে উপরের মূল্যায়ন কেন করেছেন তা বোঝার জন্য পাঠ করা উচিৎ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ.-এর প্রবন্ধ : مدیر صدق کی قادیانیت نوازی। (দ্র. তোহফায়ে কাদিয়ানিয়াত খ. ৩, পৃ. ২৮০-৩১১)

তাফসীরে মাজেদীর নানা বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এতে কিছু ত্রুটিও রয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম 'মাসিক আলবালাগ' রমাযানুল মুবারক ১৩৮৮ হি. সংখ্যায় 'তাফসীরে মাজেদী' শিরোনামে করেছেন। পর্যালোচনা-প্রবন্ধটি এখন তাঁর কিতাব 'تبصرے'-তে মুদ্রিত রয়েছে। (দ্র. পৃ. ১৭৭-১৮৫)

–আবদুল মালেক

একটি সাক্ষাৎকার

আমাদের নেছাবে তা'লীমে কোরআনুল কারীম

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম (আদীব হুযুর) অতি অসুস্থতার মধ্যেও মাসিক আলকাউসারের কুরআনুল কারীম সংখ্যার জন্য এ মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন। শুধু সাক্ষাৎকারই দেননি, নিজ কলমে তা আদ্যোপান্ত সম্পাদনাও করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে পূর্ণ সিহহত ও আফিয়াতের সাথে হায়াতে তাইয়্যেবা তবীলাহ নসীব করুন।
সাক্ষাৎকারটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে কুরআনের শিক্ষা ও উপলব্ধি বিস্তারের এক গভীর ঈমানী আকুতি। বিশেষত তালিবানে ইলমের সম্পর্ক কুরআনের সাথে কীভাবে সহজ ও সুদৃঢ় হয়– এ বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ চিন্তা ও উদ্যোগের বিষয়টি এতে উঠে এসেছে।
আশা করি চিন্তাশীল পাঠক এখানে চিন্তা ও কর্মের খোরাক পাবেন। নেসাবে তা'লীম সংক্রান্ত তাঁর যে চিন্তা ও মূল্যায়ন এখানে এসেছে এতে কারো ভিন্ন মত ও ভিন্ন চিন্তাও থাকতে পারে। কারণ নেসাবের বিষয়টি অনেকটাই তাজরেবা ও ইজতিহাদনির্ভর। তাই এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট আরজ, তারা নিজেদের অভিমতের ব্যাপারে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর সকল চিন্তাশীল কর্মী পুরুষের চিন্তা ও কর্মকে কবুল করুন এবং তাদের চিন্তা ও কর্মকে উম্মাহর জন্য কল্যাণকর ও কল্যাণপ্রসূ করুন। আমীন।
সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন **মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ও মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ।**

যাকারিয়া আব্দুল্লাহ : আসসালামু আলাইকুম

আদীব হুযুর : ওয়া'লাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, জ্বি, আসুন, কেমন আছেন?

যাকারিয়া : আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন। হুযুর কেমন আছেন?

আদীব : আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখেন সেটাই ভালো। এমনিতে আজ অসুস্থতাটা অনেক বেশী। দুঃখিত, শুয়ে শুয়ে কথা বলতে হচ্ছে। শুনলাম, মাওলানা শরীফ মুহম্মদ এখনো পথে আছেন? হয়ত যানজটে আটকা পড়েছেন।

যাকারিয়া : আশা করি, কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন।

আদীব : ভাই, সবসময় তো সুযোগ হয় না, এই সুযোগে একটা কথা বলতে চাই। খুবই কমসংখ্যক মানুষ 'কেমন আছেন' বলে কুশল জিজ্ঞাসা করে। ৯৯ ভাগ মানুষ, এমনকি আমার ছাত্ররাও জিজ্ঞাসা করে, 'হুযুরের শরীরটা কেমন আছে।' দু'একজনকে বলি, ভাই, শুধু শরীরটাই তো আমি নই; শরীর ও মন এবং দেহ ও আত্মা দু'টো মিলেই আমি, সুতরাং এমনভাবে জিজ্ঞাসা করো যাতে শরীর-মন ও দেহ-আত্মা উভয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হয়ে যায়। আপনার কুশলজিজ্ঞাসা শুনে মনটা সতেজ হয়ে উঠেছে। যদি ওভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, আরো অসুস্থ বোধ করতাম। জাযাকাল্লাহু খায়রান।

যাকারিয়া : অনেক আগে একবার হুযুরের মুখে এ বিষয়ে শুনেছিলাম, হয়ত সেকারণেই আমার মধ্যে সেটা এসে গেছে।

আদীব : আসলে এমনিতেই আপনি রুচিবান মানুষ। তো আসুন, যে উদ্দেশ্যে আসা সেটা শুরু করি।

যাকারিয়া : জ্বি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য হুযুর আমাকে এবং ভাই শরীফ মুহম্মদকে নির্বাচন করেছেন শুনে খুব খুশী হয়েছি। আমাদের জন্য তো এটা বড় সৌভাগ্যের কথা।

আদীব : আবার তো কথা ছড়িয়ে যাচ্ছে, নিন, শুরু করুন।

যাকারিয়া : জ্বি, কোরআনুল কারীমের উপর আলকাউছারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। সেজন্য হুযুরের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি। তো প্রথমেই কোরআন মজীদ সম্পর্কে হুযুরের অনুভব অনুভূতি জানতে চাই।

আদীব : কোন হুযুরের? আপনি কি তৃতীয় কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন?

যাকারিয়া : মানে আপনার।

আদীব : তাহলে সেভাবেই বলুন না! আমার ছাত্ররাও এভাবে কথা বলে; আমার অস্বস্তি লাগে। আচ্ছা, ছাহাবা কেরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতেন? সরাসরি সম্বোধন। আরবরা এখনো আচরণে উচ্চারণে খুবই

সাবলীল। 'হুজুর কেবলা'জাতীয় কথা আসলে আজমিদের স্বভাব।

যাকারিয়্যা : জ্বি, কোরআন মজীদ সম্পর্কে আপনার অনুভব অনুভূতি জানতে চাই।

আদীব : দেখুন, এ প্রশ্ন এভাবে অন্য যে কোন কিতাব সম্পর্কে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে নিজের অনুভব অনুভূতি ব্যক্তও করা যায়। কিন্তু আল্লাহর কালাম সম্পর্কে এটা চলে না। হাঁ, জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আল্লাহর কালাম সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভব অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত? তো এসম্পর্কে আল্লাহর কালাম নিজেই আমাদের হেদায়াত দিয়েছে –

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

কোরআনের তেলাওয়াত মুমিনের দিলে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করবে, তার দিলের ঈমান বাড়িয়ে দেবে, ঈমান আরো তাজা করবে, আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবে।

যাকারিয়্যা : আরেকটি আয়াত মনে পড়ছে–

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩

আদীব : জ্বি, প্রেক্ষাপট যাই হোক সাধারণ অর্থ তো এটাই। আল্লাহর কালাম শুনে মুমিন তো সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, আর জারজার হয়ে কাঁদবে। দেখুন আল্লাহ বলছেন–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

কোরআন তো এমন যে, মুমিনের হৃদয়কে তা বিগলিত করে, হক ও সত্যকে তার সামনে তুলে ধরে, আর আল্লাহর সমীপে আত্মনিবেদনে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তো কোরআন সম্পর্কে এই তো হওয়া উচিত পুরো উম্মতে মুসলিমাহ্র অনুভব অনুভূতি: অন্তত যারা আহলে ইলম এবং আমরা যারা তালিবানে ইলম।

যাকারিয়্যা : এই মানদণ্ডে বিচার করলে আমরা কী দেখতে পাই?

আদীব : উত্তর তো পরিষ্কার। তবে আমি বলি কী! হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মেহনত মুজাহাদা করি, যাতে কোরআনের সঙ্গে এই 'হৃদয় বিগলিত করা' সম্পর্ক আরো সজীব হয়, আরো গভীর ও দৃঢ় হয় তাহলে পুরো সমাজে, পুরো পরিবেশে এর প্রভাব পড়বে ইনশাআল্লাহ।

যাকারিয়্যা : তো হুযূরের কাছে জানতে চাচ্ছি, এই যে হৃদয় বিগলিত করা অনুভব অনুভূতি, কোরআনের সঙ্গে এ সম্পর্কটা আমাদের কীভাবে হতে পারে?

আদীব : দেখুন, যদি উর্দূতে বলি তাহলে বলবো, 'দরদে দিল কে সাথ তিলাওয়াত করনা', তো এই যে দরদ-ব্যথার সঙ্গে তেলাওয়াত, এটা আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু হয়েছে। কেমন ছিলো আমাদের নবীজীর তেলাওয়াত?! সম্ভবত مرجل শব্দটি হাদীছ শরীফে এসেছে। ডেগের ফুটন্ত পানি যেমন টগবগ করতো তেমন একটা আওয়ায তাঁর দিল থেকে বের হতো, না! এটা তো আল্লাহর নবী নিজে বর্ণনা করেননি যে, আমার দিল থেকে এরকম আওয়ায বের হয়, বরং ছাহাবা কেরাম বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো, ছাহাবা ঐ আওয়াযটা শুনতে পেতেন। হায়, কেমন ছিলো সেই আওয়ায! আর তা শুনতে পেয়ে ছাহাবা কেরামেরই বা দিলের হালাত কেমন হতো!![১]

তো এটা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে যুগ যুগ ধরে উম্মতের মধ্যে ছিলো, যত দুর্বল মাত্রায় হোক, এখনো তা আছে।

যাকারিয়্যা : কিতাবের পাতায় আহলে দিল মানুষদের যে হালাত পাওয়া যায় তা তো রীতিমত বিস্ময়কর।

আদীব : শুধু কিতাবের পাতায় কেন, পটিয়ায় আমাদের উস্তাদ, মরহূম কাদীম ছাহেব হুযূর ফজরের নামায পড়াতেন। বিশ্বাস করো আমার ভাই, তিনি যেমন কাঁদছেন, তেমনি কাঁদছে পুরো জামাত, মনে হতো দিলটা বুঝি গলেই যাবে! কেন জানি আমার মনে পড়ে যেতো সেই হাদীছ!! কখনো তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছি, টগবগ কোন আওয়ায শুনিনি, তবে মনে হতো, মানুষটা কি বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে!! ঐ এক তেলাওয়াতের আছরে সারাটা দিন নিজেকে কেমন পবিত্র মনে হতো।

যাকারিয়্যা : এমন হৃদয় বিগলিত করা তেলাওয়াত শোনার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে, আলহামদু লিল্লাহ।

---

১ হাদীসটির আরবী পাঠ এই–

عن مُطَرِّف بن عبد الله، عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي صدره أزيز كأزيز المِرْجَل من البكاء.

–মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬৩১২, ১৬৩২৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৯০৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৭৫৩

আদীব : বললাম যে, যত দুর্বল মাত্রায় হোক এখনো তা আছে, থাকবে। এই দেখুন, মনে পড়ে গেলো। তিন সপ্তাহ আগের কথা। জুমার দিন হযরতপুর ছিলাম, আমি এবং উম্মে মুহম্মদ। এক তালিবে ইলম মসজিদে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করছিলো। পর্দার আড়াল থেকে শুনছিলাম। মাশাআল্লাহ! দিলের ভেতর যাকে বলে মউজ, এসে গিয়েছিলো। উম্মে মুহম্মদকে বললাম, দেখো, এই তালিবে ইলম, তার আওয়ায বলছে, বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করছে। ইচ্ছে হচ্ছিলো কাছে গিয়ে বলি, জাযাকাল্লাহু খায়রান।

যাকারিয়া : আলহামদু লিল্লাহ! জাযাহুল্লাহু খায়রান, ওয়া ইয়্যাকা।

আদীব : ওয়া ইয়্যাকা ইয়া যাকারিয়া। তো ভাই, এরকম তেলাওয়াতের ফেযা ও পরিবেশ কায়েম করেন, ঘরে, পরিবারে, সমাজে, বিশেষ করে আমাদের তালিবানে ইলমের মধ্যে। দেখুন, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ এটা কিন্তু নবুয়তি কাজ, আমাদের মাদরাসাগুলোতে তেলাওয়াতে কোরআনের সেই নূরানি ফেযাটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

যাকারিয়া : তো এজন্য আমাদের কী করণীয়?

আদীব : ভালো কথা, দেখুন, এজন্য প্রথমেই দরকার ফাহ্‌মে কোরআন। শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একটু আধটু তরজমা বুঝতে পারা, আর ফাহ্‌মে কোরআন কিন্তু এক জিনিস নয়। আল্লাহ আমাকে সম্বোধন করে কী বলছেন, তা বুঝতে পারা এবং হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করতে পারা। এই অনুভব নিয়ে যখন তেলাওয়াত হবে গলার আওয়ায থেকে দরদ ব্যথা ঝরে ঝরে পড়বে। তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের দিল গলে যাবে। এটা ফাহ্‌ম ছাড়া সাধারণত হয় না।

যাকারিয়া : আপনি অনেক গভীরে চলে গিয়েছেন। আমি আমার মত করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি।

আদীব : তো যারা ফাহ্‌মে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে এমন মানুষ কম হলেও থাকে, তাদের তেলাওয়াত শুনলে দিল গলে। আমার মনে হয় এরকম তেলাওয়াত শোনা উচিত।

একটা হলো, আয়াত পড়লাম। চিন্তা করে, লোগাত খুলে অর্থ বের করে তরজমাটা বুঝলাম। আরেকটা হলো, আয়াত তেলাওয়াত করলাম, আর তার ভাব ও মর্ম অন্তরকে স্পর্শ করলো। দিলের মধ্যে একটা ঢেউ, মউজ, তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। দিলের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় এটা হয়, কিছু না কিছু হয়। এটাই হলো ফাহ্‌ম, ফাহ্‌মে কোরআন। বাংলায় বলতে পারেন, উপলব্ধি।

যাকারিয়া : তো এখানে অনিবার্যভাবেই নেছাবে তালীমের কথা চলে আসে। আমাদের বর্তমান নেছাবে কুরআনুল কারীম বিষয়ে যা কিছু আছে তার মাধ্যমে ফাহ্‌মে কুরআন কীভাবে অর্জিত হতে পারে– এ বিষয়ে একটু শুনতে চাচ্ছি।

আদীব : এবার আপনি আসল জায়গায় চলে এসেছেন। এ কথা সত্য যে, শুরু থেকে একজন তালিবে ইলমের সরাসরি কুরআনে কারীমের সাথে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এবং পর্যায়ক্রমে এ সম্পর্কের মধ্যে বিস্তৃতি ও গভীরতা আসতে পারে এ বিষয়ে আমাদের নেসাবে তালীমে উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অথবা উলূম ও ফুনূন হাসিল করার পূর্বে সরাসরি মাআনীয়ে কুরআনের তালীম দেয়া হোক– এটা হয়ত মুনাসিবও মনে করা হয়নি। ঘটনা যাই হোক, বাস্তবতা এই যে, আমাদের তালিবুল ইলমদের মাআনীয়ে কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতে বিলম্ব হয়ে যায়। ফলে অনেকের কিন্তু তরজমাই বোঝা হয় না, ফাহ্‌ম তো পরে, আল্লাহর কালামের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং দিলের জাযব ও তাআল্লুক তো আরো পরের কথা।

যাকারিয়া : আগেও তো এই নেছাবই ছিলো। কিন্তু কোরআনের সঙ্গে ঐ অন্তরঙ্গ সম্পর্কটা তো তৈরী হতো। এখন কেন হয় না? আসলে সমস্যাটা কোথায়?

আদীব : খুশী হলাম। জরুরি প্রসঙ্গ এনেছেন। শরীফ মুহম্মদ এসে গেলে ভালো হতো।

দেখুন, আগে যে হতো, সাধারণ-ভাবে সেটা কী পরিমাণে হতো? দ্বিতীয়ত সেটা যতটা না নেছাবে তালীম দ্বারা হতো তার চেয়ে বেশি হতো ব্যক্তির ছোহবত দ্বারা। কিন্তু ফাহ্‌মে কোরআনের সেই ধারাটি অব্যাহত না থাকার কারণে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে সেই তেলাওয়াতটা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার, আমি কিন্তু এখন শুধু তেলাওয়াত সম্পর্কে কথা বলছি। তালীম বা তাযকিয়া সম্পর্কে বলছি না। প্রতিটির নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে কোরআনের সঙ্গে হৃদয়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরী হওয়ার পিছনে। আমি শুধু বলছি يَتْلُوا عَلَيْهِمْ এটার বিরাট সম্পর্ক রয়েছে উম্মাহর জীবনে। এমন তেলাওয়াত যার সঙ্গে রয়েছে ফাহ্‌মের সম্পর্ক, বোধ ও উপলব্ধির সম্পর্ক, যা দিলের মধ্যে মউজ পয়দা করে।

যাকারিয়া : তাহলে আমাদের নেছাবে তালীমের প্রকৃতিটা কেমন হওয়া উচিত যাতে ফাহ্‌মে

কোরআনের মালাকা বা স্বভাবযোগ্যতা হাছিল হয়?

আদীব : মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর প্রশ্ন! দেখুন, আমাদের জীবন বলেন, শিক্ষাজীবন বলেন, প্রথমে কোরআন, তারপরে সুন্নাহ এদু'টোই হবে কেন্দ্রবিন্দু। তো নেছাবে তালীম এমন হওয়া দরকার, যাতে শুরু থেকেই তালিবে ইলমের জীবনে কোরআন ও সুন্নাহর জীবন্ত উপস্থিতি এবং প্রাণবন্ত ভূমিকা থাকে। তালিবে ইলম যেন প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করতে পারে, কেন আমি পড়ছি? আমার শিক্ষাজীবনের উদ্দেশ্য কী? দেখুন, আলিফ-বা, অর্থাৎ কোরআনের হরফপরিচয় দিয়ে একটি শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এটা খুবই বরকতপূর্ণ বিষয়, এমনকি বাংলা বর্ণমালারও আগে এটা করা হয় আমাদের মক্তবে, কিন্তু তারপরই যেন আমরা খেই হারিয়ে ফেলি। হিফযখানায় গিয়ে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্কটা হারিয়ে যায়।

যাকারিয়া : হুযুর, আমি কিন্তু অবাক হলাম। হিফয মানে তো আগাগোড়া কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক!!

আদীব : অবাক হতেই পারেন, আমি বাধা দেবো না। আসল কথা হলো মক্তবে নাযেরার স্তরটা তো হলো মজবুরি। তাছাড়া, তাতে মেধার উপর, চিন্তার উপর ততটা চাপ পড়ে না। কিন্তু হিফযখানায় এসে এই চাপটা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যায়। এছাড়া পালিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা, এর আর কী কারণ থাকতে পারে? হয়ত আছে, তবে এটাই বড় কারন। একটি শিশুর বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ।

যাকারিয়া : হিফযখানায় হিফয করা ছাড়া আর কী করণীয় থাকতে পারে?

আদীব : সেটাই তো বলছি মেরে ভাই! এই পদ্ধতিটা স্বাভাবিক নয়, ফিতরি নয়; এভাবে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না, অন্তরঙ্গতা হয় না, বরং অবচেতনভাবেই একটা عدم أنس এবং একটা ওয়াহশাত তৈরী হয়ে যায়। যাক সে প্রসঙ্গ, যদি কখনো সুযোগ হয়, এবিষয়ে আরো কথা বলা যাবে। তো ঠিক আছে, মেনে নিলাম, মক্তব, হিফযখানা পর্যন্ত কোরআনের সঙ্গে কিছু না কিছু সম্পর্ক ছিলো। কিতাবখানায় এসে কী হলো? উর্দূ-ফার্সি-ফিকাহ; কিতাবের নাম যদি বলি, উর্দূ কি পহেলী, ফারসি কি পহেলী, কারীমা, পান্দে নামা, তালীমুল ইসলাম, বেহেশতি যেওর শুরু হয়ে গেলো! أين القرآن কোরআন কোথায় গেলো? সুন্নাহ কোথায় গেলো? শিক্ষাজীবন থেকে হঠাৎ করেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো।

যাকারিয়া : আমার যদ্দুর মনে হয়, কিতাবখানায় এসে অনেক তালিবে ইলমের হিফযটাও দুর্বল হয়ে যায়।

আদীব : ঠিক বলেছেন। তিক্ত হলেও এটাই বাস্তব। এজন্য নেছাবে তালীম সম্পর্কে আমাদের চিন্তাপদ্ধতিটার পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিলো। যেমন কোরআন শরীফের হরফপরিচয় দিয়ে শুরু হয়েছিলো তালিবে ইলমের শিক্ষাজীবনটা, তো কোরআনের সঙ্গে সেই সম্পর্কটা পর্যায়ক্রমে, ধারাবাহিকভাবে, স্তরে স্তরে গভীর থেকে গভীর হওয়া দরকার ছিলো।

যাকারিয়া : এখান থেকেই কি আপনার চিন্তায় মাদানী নেছাবের বিষয়টি এসেছে?

আদীব : এটা একটা বড় কারণ, তবে সর্বপ্রধান কারণ নয়।

যাকারিয়া : মাদানী নেছাবে কোরআনে কারীমের অবস্থান ও ভূমিকা কী, এসম্পর্কে যদি কিছু বলতেন!

আদীব : আসলে আমাদের কথা ছিলো কোরআন ও সুন্নাহ। তো মাদানী নেছাবে আমরা চেষ্টা করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালিবে ইলমের শিক্ষাজীবনে এবং তার কর্মজীবনে কোরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক, যেটাকে বলে 'অটুট বন্ধন', সেটা যেন তৈরী হয়ে যায়।

যাকারিয়া : তালিবে ইলম তো শুরুতে কিছুই বোঝে না, হিফযখানার ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলছেন, বরং একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে আরবী ভাষাটা শিখতে হয়। তারপরেই না আসে ফাহমে কোরআনের বিষয়। তো শুরু থেকেই কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে শুরু হয়, কীভাবে তা অগ্রসর হয়?

আদীব : দেখুন, মাদানী নেছাব ... ওয়া'লাইকুমুস-সালাম, এই যে শরীফ, এসে গেছো। আমি তোমার খুব ইনতিযার করছিলাম। যানজটে পড়েছিলে বুঝি!

শরীফ : আসলে যানজট ছিলো না, অলসতার কারণে বের হতেই দেরী হয়ে গিয়েছিলো।

আদীব : তুমি তো দেখি ভালো মানুষ! যানজটের মত একটা তৈয়ার অজুহাত থাকতে দোষটা কিনা নিজের উপর নিয়ে নিচ্ছো! নাহ, তুমি আর চালাক হতে পারলে না! তবে তোমার সরলতাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা ...।

যাকারিয়া : মাদানী নেছাব সম্পর্কে কথা হচ্ছিলো।

আদীব : হাঁ, কি যেন বলছিলাম! তো শরীফ, তোমার সহকর্মী প্রশ্ন করেছেন মাদানী নেছাবে তালিবে ইলমের সঙ্গে কোরআনের সম্পর্কটা তৈরী হয় কিভাবে? সে তো অর্থ বোঝে না! তো সুন্দর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এক মা তার সন্তানকে, প্রথমে ছেলেকে, তারপর মেয়েকে

আলিফ-বা পড়িয়েছে, নায়েরা পড়িয়েছে। এরপর তো স্বাভাবিক নিয়মেই হিফযের মারহালা, হয় ঘরে না হয় হিফযখানায়। কিন্তু আল্লাহর শোকর, মা ছেলের সামনে 'আততরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ' (এসো আরবী শিখি) রাখলেন। প্রথমেই রয়েছে একটি চিত্র। ছেলেটি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলো, আম্মু, আমি বুঝতে পেরেছি। আরবী শিখলে কোরআন বুঝতে পারবো। আম্মু, কতদিন লাগবে আরবী শিখতে?! বুদ্ধিমতী মা বাচ্চাকে বুঝিয়ে বললেন, দু'তিন দিন পরেই তো তুমি একটু একটু করে বুঝতে শুরু করবে। তারপর ছেলে নিজেই মাকে বলে, আম্মু এই যে ذلك কোরআন শরীফে আছে না, ذلك الكتاب

আল্লাহর কী শান! তিনবছর পর মেয়েটির সঙ্গেও ঘটলো একই ঘটনা!

তো এভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয়, হতে থাকে। মাত্রা ও পরিমাণ অবশ্য নির্ভর করে তালিবে ইলমের দিল, উস্তাদের দরদ এবং মা-বাবার ব্যাকুলতার উপর।

যাকারিয়্যা : বিষয়টি আমি অনুভব করতে পারছি, কিন্তু প্রশ্ন হলো, হিফযের কী হবে?

শরীফ : হিফযের জন্য তো শিশু বয়সটাই সবচে' উপযোগী বলে শুনে এসেছি।

আদীব : ঠিক আছে, একসময় আমাদের চিন্তার সীমানা এতটুকু ছিলো। সে হিসাবে আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু চিন্তার দুয়ারটা বন্ধ হয়ে যাবে কেন? উন্নত থেকে উন্নততর কিছু কি বের হয়ে আসতে পারে না?

যাকারিয়্যা : দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে তো সারা বিশ্বেই এটা হচ্ছে।

আদীব : আমাদের ক্ষেত্রে কেন সেটা হচ্ছে না?! যাক পরে যদি সুযোগ হয়, ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আরো কথা হবে।

শরীফ : তো আমরা আগের কথায় ফিরে আসি।

আদীব : দেখো শরীফ, আমার একটা কথা। আমি আজনবি কেউ নই। তোমাদেরই পরিবারের একজন। যা বলার, বলছি সবার কল্যাণচিন্তা থেকে। আমাদের সামনে কিন্তু অস্তিত্বের সংকট। যোগ্যতা ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষা করার কোন উপায় নেই। দরদী মানুষের কথাগুলো দরদের সঙ্গেই বিবেচনা করো।

শরীফ : হুযূর, আলহামদু লিল্লাহ, যদ্দুর জানি। সুন্দর একটা পরিবর্তন আসছে। আপনার দরদ, আপনার বার্তা সবার হৃদয়কে স্পর্শ করছে।

আদীব : যাক কথা হচ্ছিলো মাদানী নেছাবে কোরআনের সঙ্গে তালিবে ইলমের সম্পর্ক প্রসঙ্গে। তো বলছিলাম। পুরো হিফযখানার দুই তিন চার বছর কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয় না, হওয়ার ব্যবস্থাই তো নেই। কিতাবখানায়ও শুরুর দু'তিন বছর একই অবস্থা। পক্ষান্তরে মাদানী নেছাবে প্রথম বর্ষ থেকেই, বরং প্রথম দিন থেকেই একটু একটু করে বুঝ-পরিচয় শুরু হয়ে যায়। তো 'আততরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ' যদি ঠিকমত পড়া হয় এবং পড়ানো হয় তাহলে তালিবে ইলমের মধ্যে একবছরেরও কম সময়ে এই পরিমাণ ইসতি'দাদ ও যোগ্যতা হয়ে যায় যে, কোরআনের অনেক আয়াত সে বুঝতে পারে। এখানে আমি আগের কথাটি আবার বলবো, শুধু তরজমা বোঝা নয়, আল্লাহর কালামের বাণী ও মর্ম তার মত করে হৃদয়ঙ্গম করা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা।

শরীফ : আমরা যখন পড়েছি, এখন তো আরো উন্নত হয়েছে। কিছু কিছু মনে আছে, যখন একটা দু'টো আয়াত বুঝতাম, কী আনন্দ হতো!

আদীব : আগেও বলেছি, এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে উস্তাদ কতটা দরদী, তালিবে ইলম কতটা নিবেদিত, মা-বাবা কী পরিমাণ ব্যাকুল তার উপর। কিন্তু আফসোস! কত রকম অবস্থা যে দেখতে পাই!

যাকারিয়্যা : এটা নিয়ে আফসোস করে কষ্ট পাওয়া ঠিক নয়। দু'রকম অবস্থা সবসময়ই তো ছিলো।

আদীব : যাক, বলছিলাম, কোরআন ফাহ্‌মির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরীর মেহনতটা আমরা 'আততরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ' থেকেই শুরু করেছি। দেখো, তৃতীয় খণ্ডের শেষে একটা অধ্যায় হলো কোরআনের নির্বাচিত আয়াত। তালিবে ইলমের ইসতি'দাদ যেন বেষ্টন করতে পারে এবং বিষয়বস্তুও যেন তার সাধ্যের সঙ্গে খাপ খায়, সেটা লক্ষ্য রেখে আমরা কিছু আয়াত ইনতিখাব করেছি। তারপর রয়েছে একই ভাবে হাদীছের ইনতিখাব ও নির্বাচন।

তো এসো আরবী শিখিতে যে নমুনাটা এসেছে সেটা অনুসরণ করেই আমরা শেষ পর্যন্ত, বরং বলা ভালো, শেষের আগ পর্যন্ত যেতে চাই।

যাকারিয়্যা : এ চিন্তাটা কি পূর্ববর্তী কারো কাছ থেকে পেয়েছেন, না সর্বোতভাবে আল্লাহপ্রদত্ত?

আদীব : আল্লাহপ্রদত্ত তো সর্বাবস্থায়ই। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ, বিশেষ করে হযরত মাদানী রহ, হযরত থানবী রহ, এবং আরো অনেকের দিলের আওয়ায ছিলো এটা যে, নেছাবে তালীমে শুরু থেকে কোরআনকে কেন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু

কেন জানি তাদের দিলের আওয়ায কাউকে জাগাতে পারেনি। কারো পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ আসেনি। দু'একজন যাও বা কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন, দুঃখের বিষয়, তাতে চিন্তার গভীরতা ছিলো না।

যাকারিয়া : চিন্তার গভীরতা বলতে হুযূর কী বোঝাতে চাচ্ছেন যদি খোলাছা করে বলতেন।

আদীব : আসলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শুয়ে শুয়েও কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

যাকারিয়া : শুরুতে যে অবস্থা ছিলো, আমার তো আশঙ্কা হচ্ছিলো, হয়ত খালি হাতেই ফিরে যাবো। এখন তো আলহামদু লিল্লাহ আপনাকে অনেক সতেজ মনে হচ্ছে।

আদীব : আলহামদু লিল্লাহ, এটা কোরআনের বরকত। তারপরো শরীরের বাস্তবতা কি অস্বীকার করা যায়?!

শরীফ : মাওলানা যাকারিয়া ভাইয়ের প্রশ্ন ছিলো গভীর চিন্তার বিষয়টা...

আদীব : শরীফ হলো পেশাদার সাংবাদিক, তার দরকার সাক্ষাৎকার, মানুষটা গেলো কি থাকলো...!

শরীফ : হুযূর, আমি আর কী বলবো, দিলের অবস্থা তো আল্লাহ জানেন।

আদীব : আরে ভাই, একটু সজীবতা আনতে চাচ্ছি নিজের মধ্যে। তো চিন্তার গভীরতার কথা যে বললাম, আমার নিজের জীবনে এর একটা অভিজ্ঞতা আছে। আমি তখন নূরিয়ার শিক্ষক। একটা নেছাবি মজলিস হলো। আমি প্রস্তাব রাখলাম, ফাহমে কোরআন, বা কোরআন বোঝার চেষ্টাটা শুরু থেকেই হওয়া উচিত। সবার খুব পছন্দ হলো এবং ..এবং মুহূর্তের মধ্যে সমাধানও হয়ে গেলো! 'হেদায়াতুন্নাহুতে সূরা ইউসুফটা দিয়ে দাও। কাফিয়াতে সূরা কাহাফটা দিয়ে দাও। আর শরহে জামিতে তো তরজামায়ে কোরআন (আওয়াল তা আখের) আছেই।

তো মূল বিষয়ে তারা একমত, কিন্তু চিন্তার গভীরতা, সেটা ছিলো না। দেখুন সূরা ইউসুফে কত কঠিন শব্দ আছে, কঠিন তারকীব আছে, কত নাযুক বিষয়বস্তু আছে; এসব চিন্তা না করে এই বয়স ও স্তরের তালিবে ইলমকে যদি সূরা ইউসুফ দিতে যাই তাহলে এটা তো তার জন্য আলাদা একটা মাসআলা হয়ে যাবে, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং দিলের মুহব্বতের পরিবর্তে।

পক্ষান্তরে বয়স, চিন্তার স্তর, ভাষাগত যোগ্যতা, এসব বিষয় সামনে রেখে সমগ্র কোরআন থেকে আয়াতের ইনতিখাব করে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া, সাবলীলভাবে, স্বচ্ছন্দ গতিতে, এটা হলো মাদানী নেছাবের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্য। না হলে কিন্তু লাভের পরিবর্তে ক্ষতির আশঙ্কা। ফাহমে কোরআনের মেহনতটা যদি তালিবে ইলমের জন্য বোঝা হয়ে যায় তাহলে ...

তো ফাহমে কোরআনের ক্ষেত্রে মাদানী নেছাবের মূল বক্তব্য হলো ইনতিখাব, সহজ সহজ আয়াতের ইনতিখাব, বয়স, চিন্তা, ভাষাজ্ঞান, এসবের উপযোগী ইনতিখাব।

শরীফ : হুযূর একটা কথা বলেছেন, 'শেষের আগ পর্যন্ত', কথাটার একটু ব্যাখ্যা!

আদীব : জাযাকাল্লাহ, বিষয়টা তুমি লক্ষ্য করেছো। আমি বলতে চেয়েছি, মাদানী নেছাবে আমরা সুচিন্তিত ইনতিখাবের মাধ্যমে পুরো কোরআনের সঙ্গে ফাহমের সম্পর্ক পয়দা করতে চাই। তারপর তাফসীরুল কোরআনের উপর একবছরের একটা নেছাব হবে, যেটাকে বলা যায়, তাফসীরের মাদখাল বা প্রবেশস্তর। জালালাইন কিন্তু আসলে তাফসীর নয়, তাফসীরের মাদখাল, বাকি মাদখাল হওয়ার প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে কি না সেটা আলাদা বিষয়। তো 'আততরীক ইলা তাফসীরিল কুরআনিল কারীম'কে আমরা তাফসীরের মাদখালরূপে তৈরী করার চেষ্টা করেছি। মেশকাত যেমন দাওরাতুল হাদীছের ভিত্তি বা মাদখাল। তো 'আততরীক ইলা তাফসীরিল কুরআনিল কারীম' এর পর তাফসীরের একটা পূর্ণাঙ্গ নেছাব হবে। এভাবে তাফসীর ও হাদীছ উভয়ের উপর তালীম সমাপ্ত করার পরই শুধু আলিম হওয়ার সনদ দেয়া হবে।

শরীফ : তাফসীরের যে বর্ষ, সেটার জন্য কোন্ কিতাব আপনি উপযোগী মনে করেন।

আদীব : দেখো, এখানে একটা মৌলিক বিষয়। নেছাবের জন্য কিতাব তৈরীর প্রয়োজনটা কেউ অনুভব করে না। বাছাই করে কোন একটা কিতাব নেছাবের মধ্যে এনে বসিয়ে দেয়া হয়। তাতে কাঙ্ক্ষিত সুফল আসে না। মখমলের উপর চটের তালি হোক, বা চটের উপর মখমলের তালি, কোনটাই কিন্তু উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। আপনার সামনে যে নেছাবে তালীম আছে, তালিবে ইলমের যে বয়স ও ইসতি'দাদ আছে, সেটাকে সামনে রেখে তার উপর নেছাবের কিতাব তৈয়ার হওয়া দরকার।

তাফসীরের উচ্চস্তরের যে নেছাবের কথা বললাম, সেখানেও একই কথা। বড়দের এবং পূর্ববর্তীদের কিতাব থেকে ভরপুর ফায়দা হাছিল করো, ইলমি

ফায়দা এবং রুহানি ফায়দা, তারপর ঐগুলোর সারনির্যাস থেকে নেছাবের প্রয়োজনীয় কিতাব তৈরী করো। তুমি ঘাস খেয়ে দুধ দাও, তালিবে ইলমের সামনে ঘাস রেখে দিয়ো না। ঘাস খুব মূল্যবান, তাছাড়া দুধ আসবে না। কিন্তু সেটা আমি তালিবে ইলমের সামনে দিতে চাই না। ঘাস চিবিয়ে ওরা দুধ পাবে না। শুরু থেকে শেষ পুরো নেছাব সম্পর্কে আমার এই কথা।

শরীফ : তাহলে তো অনেক কঠিন কাজ। কে করবে এ কাজ, কবেই বা হবে?!

আদীব : নেছাবের কাজ সহজ কিছু, এটা তুমি কোথায় পেলে! দেখো, আমি নিজে যদি কিছু করতে চাই, পারবো না, সে যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু বড়রা যা রেখে গেছেন তা থেকে ফায়দা হাছিল করে নেছাবের উপযোগী কিতাব তৈরী করার যোগ্যতাটা তো থাকতে হবে। এটাই মাদানী নেছাবের মূল চিন্তা। এর উপরই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কাজ চলছে এবং এখনো অনেক দূর পথ বাকি।

যাকারিয়্যা : আল্লাহ্ আপনাকে ভরপুর আজর দান করুন। ফাহ্মে কোরআনের ক্ষেত্রে ইনতিখাবের যে চিন্তা, সত্যি তা অত্যন্ত মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী। 'আততরীক ইলা তাফসীরিল কুরআনিল কারীম' চারখণ্ডের ইনতিখাব তো এখন আমাদের সামনে আছে। তো ইনতিখাবের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলুন, যা আপনি তাতে অনুসরণ করছেন।

আদীব : পদ্ধতি তো কিতাব দেখেই আন্দায করা যায়। যে আয়াতগুলো আনা হয়েছে, অনিবার্যভাবেই কিছু শব্দ, কিছু তারকীব তালিবে ইলমের জানার বাইরে থাকবে। তো সেগুলোর প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম দু'খণ্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো সহজ থেকে সহজ আয়াত, যেগুলো বুঝতে কোন কষ্ট হবে না, এমনকি শুধু কিতাবটাই তার জন্য শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট হবে। এ দু'টো খণ্ড যদি ঠিকমত পড়া হয় এবং পড়ানো হয় তাহলে পাঁচপারা পরিমাণ আয়াত সে বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

শরীফ : কিতাবে তো তরজমা দেয়া আছে। অর্থাৎ তরজমা ছাড়া বুঝতে পারছে না।

আদীব : বিষয়টি তা নয়। তরজমা ছাড়াই, শুধু তেলাওয়াত থেকেই অর্থ ও মর্ম সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তরজমা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো কাউমের কাছে পরিবেশনের জন্য তার সামনে পথনির্দেশ রাখা।

শরীফ : তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

আদীব : তৃতীয় খণ্ডে প্রথম পনের পারা এবং চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পনের পারা থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন আয়াতগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ তালিবে ইলমের ইসতি'দাদও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। চারখণ্ডে মিলিয়ে কোরআনের অর্ধেকেরও বেশী তালিবে ইলমের আয়ত্বে এসে যায় এবং আসানির সঙ্গে। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে ফাহ্মে কোরআনের পথে তালিবে ইলম যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, হৃদয়ের টানে, উদ্দীপনার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। ফাহ্মে কোরআন যেন তার জন্য কঠিন বিষয় এবং বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের উপর লেখা রয়েছে 'প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা', তো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে যখন সম্পাদনা হবে তখন এর উপকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

শরীফ : তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

আদীব : بيان الإعراب ও بيان اللغة আরবীতে এসেছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তরজমা পর্যালোচনা। বস্তুত এটা কোরআনের তরজমার ক্ষেত্রে তালিবে ইলমের মধ্যে চিন্তার মৌলিকত্ব, সৃজনশীলতা, সমালোচনামনস্কতা তৈরীতে অত্যন্ত সহায়ক।

শরীফ : সত্যি এটি অভিনব একটি বিষয়, যা এর আগে কোথাও আমাদের নযরে আসেনি।

আদীব : আমিও এ ধারণার উপর ছিলাম। তাই কাজটা শুরু করতে কিছুটা দ্বিধা ছিলো। হঠাৎ একদিন নযরে পড়লো, বয়ানুল কোরআনের হাশিয়ায় হাকীমুল উম্মত থানবী রহ, কিছু কিছু নোট দিয়েছেন তাঁর নিজের তরজমা সম্পর্কে। যেমন, এ তরজমাটা তিনি কেন করেছেন? এ শব্দটা কেন ব্যবহার করেছেন, ইত্যাদি। দিলটা এমন খুশী হলো যে, বড়রা যা চিন্তা করেছেন সেটা আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরেও দান করেছেন। কিন্তু তখনো আরো বড় বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর তরজমার শুরুতে হঠাৎ একদিন দেখি, একটি শিরোনাম হলো, 'তরজমাসংক্রান্ত এ কাগজটি হযরত শায়খুল হিন্দের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে।' সামান্য একটি পৃষ্ঠা, বোঝা যায়, একটি কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু ওয়াফাতের কারণে আর অগ্রসর হতে পারেননি। সেখানে তিনি শুধু নিজের তরজমা সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য তরজমা সম্পর্কেও তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন, এতে তরজমাপর্যালোচনার পুরো বিষয়টি আমার সামনে পরিষ্কার-ভাবে ফুটে উঠেছে। আমি যেন কাজের

পুরো মানচিত্রটি পেয়ে গেলাম। নিয়ত আছে, আল্লাহ্ যদি তাওফীক দান করেন, হয়রত শায়খুল হিন্দ রহ. এর পথনির্দেশ অনুসরণ করে এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ একটি কাজ করার।

যাকারিয়া : সমগ্র কোরআনের তরজমা কিন্তু আসেনি।

আদীব : জ্বি, আমাদের পরিকল্পনা আছে সামনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড লেখার। তাতে মুকাম্মাল তরজমায়ে কোরআন থাকবে এবং তরজমাপর্যালোচনা থাকবে। সেটাকে আমি বলতে চাই 'ইলমি তরজমা'। এতে একজন তালিবে ইলম তরজমাতুল কোরআনের শাস্ত্রীয় প্রশিক্ষণ লাভ করবে, যেখানে তারকীব ও ব্যাকরণের পূর্ণ অনুসরণ থাকবে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে টীকায় ভাব তরজমারও নমুনা থাকবে।

যাকারিয়া : তরজমাতুল কোরআন সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন। বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত প্রচুর তরজমা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সাধারণভাবে আপনার মতামত কী?

আদীব : দেখুন কিছু তরজমা আছে এমন মানুষের যাদের জন্য তরজমা করাটা রীতিমত অপরাধ। আরবীভাষা সম্পর্কে তাদের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও নেই। ইংরেজি তরজমা সামনে রেখে বাংলায় নিজের মত করে লিখেছেন। কিছু তরজমা আছে আহলে ইলমের। তো যথেষ্ট সীমাবদ্ধতাসত্ত্বেও সেগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। আসলে এখনো পূর্ণাঙ্গ দায়দায়িত্বপূর্ণ তরজমা হয়নি। বাংলাভাষী আলিমসমাজের উপর কোরআনের এটা একটা করয রয়ে গেছে, যা এখনো আদায় করা হয়নি এবং আমি মনে করি, এটা একক প্রচেষ্টার কাজও নয়, সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাজ।

যাকারিয়া : 'আততরীক ইলা তাফসীরিল কুরআনিল কারীম' এর যে তরজমা, সেটা কি সাধারণ শিক্ষিত সমাজের জন্য উপযোগী হবে?

আদীব : কীভাবে হতে পারে? দেখো, তুমি যখন নেছাবে তালীমের প্রয়োজনে তরজমার চিন্তা করবে তখন সেটার চরিত্র ও প্রকৃতি হবে আলাদা। সেটাকেই যদি আম মানুষের সামনে তুলে দাও, কাজ হবে না। আবার আম মানুষের জন্য 'আমফাহম' যে তরজমা সেটা যদি নেছাবে তালীমের ক্ষেত্রে নিয়ে আসো তাহলে তরজমার যে ইলমিয়াত, শব্দানুগ ও ব্যাকরণানুগ হওয়ার যে বিষয়টি তালিবে ইলমকে আমরা বোঝাতে চাই তা হাছিল হবে না।

যাকারিয়া : সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যারা তরজমার সাহায্যে কোরআনের শিক্ষা অর্জন করতে চায় তাতে কী ধরণের তরজমা প্রয়োজন এবং তা কীভাবে অর্জিত হতে পারে?

আদীব : নেছাবে তালীমের প্রয়োজনে যে তরজমা সেটা তো হলো ইলমি তরজমা। আম মানুষ তাতে ওয়াহশাত অনুভব করতে পারে। তাদের জন্য আসলে দু' ধরনের তরজমা উপকারী। একটা হলো শব্দে শব্দে তরজমা। উর্দূতে এটার মোটামুটি সুন্দর নমুনা এসেছে। বাংলায়ও চলনসই একটা তরজমা দেখা যায়। তবে সবচে' বেশী প্রয়োজন হলো একটি আদবি তরজমার। এটা খুবই জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। তরজমায় আয়াতের হুবহু অনুসরণ করা হবে না, আবার বক্তব্যের যেটা মূলপ্রাণ তা থেকে দূরে সরা যাবে না। কোরআন যা বলতে চায় বলে আমরা বুঝতে পারছি সেটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।

যাকারিয়া : আমার প্রশ্ন হলো, এ কাজটা কীভাবে হতে পারে?

আদীব : এটা আসলে একক প্রচেষ্টার কাজ না এবং কোন তেজারতি মাকতাবারও কাজ না। নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন কোন ইলমি ইদারাকেই এ কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। তিন থেকে পাঁচজনের একটি মজলিস হবে, যারা এ কাজটা করবে তাদের তিনটি যোগ্যতা থাকতে হবে। এজন্য পাঁচবছর এমনকি দশবছরও সময় লাগতে পারে, যাদের দিনরাতের কাজ হবে শুধু তরজমাতুল কোরআন। অন্যান্য শোগলের ফাঁকে ফাঁকে কাজটা হয়ে যাবে, এটা সম্ভব না। কোন ইলমি ইদারাকে ঐ মজলিসের যাবতীয় দায়দায়িত্ব – আমি বুঝে শুনেই বলছি – যাবতীয় দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তারপর ঐ ইদারার পক্ষ হতে তরজমাটি প্রকাশ করতে হবে যে, এটি আলিমসমাজের প্রতিনিধিত্ব-কারী তরজমা। আমরা দায়দায়িত্ব নিচ্ছি যে, মানবীয় সাধ্যের ভিতরে এটি একটি নির্ভরযোগ্য তরজমা।

যাকারিয়া : এরূপ তরজমার জন্য তিনটি যোগ্যতার কথা বলছিলেন।

আদীব : হাঁ, প্রথমত আরবী-ভাষার সর্বোচ্চ যোগ্যতা, দ্বিতীয়ত বাংলাভাষার সর্বোচ্চ যোগ্যতা, তৃতীয়ত এবং এটা খুবই জরুরি বিষয়, উসলূবে কোরআনের সঙ্গে পূর্ণ মুনাসাবাত। আমরা প্রথম শর্তদু'টি তো মোটামুটি বুঝি, কিন্তু তৃতীয় শর্তের বিষয়টি আমাদের ধারণায়ও থাকে না। উসলূবুল কোরআনের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় ছাড়া তরজমাতুল কোরআনের কাজ আঞ্জাম দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

যাকারিয়া : উসলূবুল কোরআনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, এ বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলুন, এটা কীভাবে অর্জিত হতে পারে।

আদীব : দেখুন, কোরআনের নিজস্ব আন্দাযে বায়ান আছে, নিজস্ব বর্ণনাশৈলী আছে, নিজস্ব বালাগাত ও অলঙ্কার সৌন্দর্য আছে। কখনো বলা হলো আদেশ বা নিষেধবাক্য, কিন্তু উদ্দেশ্য আদেশ বা নিষেধ নয়, অন্য কিছু। কখনো বলা হলো প্রশ্নবাক্য, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রশ্ন নয়, অন্য কিছু, নিছক আরবীভাষাজ্ঞান দ্বারা এগুলো বোঝা যায় না। ছাহাবা কেরাম এগুলো হৃদয়ঙ্গম করেছেন নববী ছোহবত থেকে, শুধু আরবী ভাষাজ্ঞান দ্বারা নয়। সুনির্দিষ্ট উদাহরণ এখন মনে আসছে না, কোন কোন আয়াত সম্পর্কে ছাহাবী বলছেন, তোমরা এ আয়াতের অর্থ মনে করো এ রকম, অথচ কোরআন আমাদের সামনে নাযিল হয়েছে, আমরা তো এর অর্থ বুঝি এই। বোঝা গেলো, শুধু আরবীভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়। আরেকটি বিষয় হলো আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট, এটা অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তো এগুলোর সঙ্গে পরিচয়কে এককথায় বলা যায় উসলূবুল কোরআনের সঙ্গে পরিচয়।

যাকারিয়া : আমার প্রশ্নের আরেকটা অংশ ছিলো, এটা কীভাবে অর্জিত হয়?

আদীব : হাঁ, আপনি বেশ সতর্ক মানুষ। কথা ছুটে গেলে সুন্দর করে ধরিয়ে দিতে পারেন। তো এ ক্ষেত্রে ছোহবত-এর কোন বিকল্প নেই। একজন সুবিজ্ঞ জ্ঞানী ও অন্তর্জ্ঞানী আলিমের নিবিড় তত্ত্বাবধানে 'উলূমুল কুরআন'-এর উপর বিস্তৃত অধ্যয়ন করতে হবে। সান্নিধ্য ও অধ্যয়ন, বা ছোহবত ও মুতাআলা, এ দুয়ের সম্মিলিত নির্যাস আপনার মধ্যে উসলূবুল কোরআনের সঙ্গে পরিচয়ের গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করবে। আর ভাব ও মর্ম অনুধাবন করে নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে। তেলাওয়াতের এ সুদীর্ঘ ধারা থেকে উসলূবুল কোরআনের যাওক ও সালীকা অর্জিত হয়। তাছাড়া এখানে আমি অন্তর্জগতের বিষয়ও বলতে চেয়েছি। কিন্তু ছোট মানুষ বলে অত বড় শব্দ উচ্চারণ করিনি। বস্তুত কোরআনের যে নূরানিয়াত সেটা যদি অন্তরে উদ্ভাসিত না হয় তাহলে কোরআন যে আসমানি হেদায়াতের কিতাব, তরজামায় সেই আসমানি হেদায়াতের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত একজন প্রাচ্যবিদ যে তরজমা করেন সেটা কিন্তু কোরআনের আসমানি হেদায়াতের প্রতিনিধিত্ব করে না।

তো বেশী না, সারা দেশ থেকে এরকম যোগ্যতাসম্পন্ন তিনজন মানুষ একত্র করে একটি মজলিস করেন এবং তাদেরকে তরজমার দায়িত্ব দেন।

শরীফ : এরকম মানুষ পাওয়া কি সহজ হবে?

আদীব : সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজটি করতে হলে এর বিকল্প নেই।

যাকারিয়া : এমন তো হতে পারে, একজন আরবী বিশেষজ্ঞ এবং একজন বাংলাবিশেষজ্ঞ-এর সমন্বয়ে মজলিসটা করা হলো?

আদীব : তো দেখুন, আমার সেই কথাটাই সত্য হলো। তৃতীয় শর্তটা আপনার চিন্তায় নেই। যাক, তাহলে এ পর্যন্ত যেমন কাজ হয়েছে তেমনই আরেকটা কাজ হবে, কিন্তু আসল কাজ যেটা, শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়া, সেটা হবে না।

যাকারিয়া : এটা তো হলো তরজমাপ্রসঙ্গ, এছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে কোরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য আর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

আদীব : এ ক্ষেত্রে 'পদক্ষেপ' শব্দটা শোভন নয়, 'উদ্যোগ' হতে পারে। এধরণের ভুল আমারও হয়। তো দেখুন, আগে বিভিন্ন মসজিদে তাফসীরের মাহফিল হতো, এখন হয় কি না জানি না। সম্ভবত ঢাকার মরহূম মাওলানা মুফতি দ্বীন মুহম্মদ খান ছাহেব এধারাটি শুরু করেছিলেন। তাঁর তাফসীরের ধুম ছিলো ঢাকা শহরে। মানুষের জীবনকে কোরআনমুখী করার ক্ষেত্রে তাফসীর মাহফিলগুলোর অবদান ছিলো। তবে সুনির্দিষ্ট কোন রূপরেখা না থাকা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান না থাকার কারণে প্রত্যাশিত সুফল আসেনি। যে যার মত করে তাফসীরের নামে কিছু ওয়াজ ও কিসসা কাহানী বলেছেন। এরকম এক তাফসীরের মাহফিলে একবার শুনেছিলাম, পৃথিবীটা এক গরুর শিঙ-এর উপর আছে। মাঝে মধ্যে এক শিঙ থেকে আরেক শিঙ-এ নেয়ার সময় ভূমিকম্প হয়। যাক, এখন তো সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে, বা কমে গেছে। তো তাফসীরের কাজটা আবার ব্যাপক পরিসরে শুরু করার উদ্যোগ নেয়া দরকার।

যাকারিয়া : সুনির্দিষ্ট রূপরেখা, প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কথা বলেছিলেন!

আদীব : দেশের শীর্ষস্থানীয় কোন আলিমের তত্ত্বাবধানে মারকাযে তাফসীর নামে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। তারা প্রশিক্ষণ দেবেন এবং সনদ ও নিয়োগদান করবেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হবে তাফসীর আয়োজনের একক অভিভাবক প্রতিষ্ঠান। এই মারকাযের সনদপ্রাপ্তরা ছাড়া কেউ তাফসীর মাহফিল করবে না, করলে সেটা অনুমোদিত বলে গণ্য হবে না।

যাকারিয়া : প্রশিক্ষণের পদ্ধতি কী হতে পারে?

আদীব : প্রথম কথা প্রত্যেক মুফাসসিরের জন্য বাধ্যতামূলক হবে বিশুদ্ধ ভাষায় তাফসীর করা। দ্বিতীয়ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান করা যে, কী কী বিষয় আলোচনা করবেন, কী পরিমাণে করবেন, এবং কী কী আলোচনা পরিহার করবেন। তাছাড়া

তরজমাসহ সংক্ষিপ্ত একটি তাফসীর প্রকাশ করা দরকার। যে তরজমাগুলো আছে, আপতত তা থেকে কোন একটি নির্বাচন করা যেতে পারে সাধারণ কিছু সম্পাদনাসহ। ঐ মুখতাছার হাশিয়ার পরিধিতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

যাকারিয়্যা : হাশিয়ার ধরন কেমন হতে পারে?

আদীব : যে বিষয়গুলোর সঙ্গে সমাজের এবং জীবনের সম্পর্ক কম সেগুলোর আলোচনা হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে যে বিষয়গুলোর সঙ্গে আখলাকিয়্যাতের সম্পর্ক, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্ক সেগুলোর উপর অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা হবে। এভাবে তাফসীর সংক্ষিপ্ত হবে, আবার কার্যকর হবে।

শরীফ : ফাওয়ায়েদে উছমানীর মত?

আদীব : সেটা তো অবশ্যই সামনে থাকবে, হযরত তাক্বী উছমানীর তাফসীর আছে। আরো আছে। সবগুলোকে সামনে রাখো। ইসতিফাদা করো এবং সারনির্যাস তৈরী করো। লক্ষ্য রাখতে হবে তাফসীরের দরসটা যেন দীর্ঘ না হয়ে যায়, দু'বছর, তিনবছর, আগে যেমন হতো। মোটামুটি ছয়মাসের মধ্যে তাফসীর যেন সমাপ্ত হতে পারে। এই হাশিয়াটা কিতাব আকারে ছাপা হলে সাধারণ মানুষের মুতালাআয়ও আসতে পারে। মারকাযে তাফসীর ইচ্ছে করলে তাদের তত্ত্বাবধানে ঘরে ঘরে সুলভে এই তাফসীর পৌঁছে দিতে পারে। এটা কঠিন কিছু না, যদি দৃঢ় ইচ্ছা থাকে।

যাকারিয়্যা : সাধারণ শিক্ষিত সমাজে আরবীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কী মত, যাতে মানুষ কোরআনের সাধারণ অর্থটা সহজে বুঝে নিতে পারে।

আদীব : এটা ভালো চিন্তা। কোরআনের ন্যূনতম অর্থটা বোঝার জন্য যে পরিমাণ আরবীর যোগ্যতা দরকার সেটাকে সামনে রেখে একটা আরবী শিক্ষার কিতাব হওয়া দরকার, যার উপর শহরের বিভিন্ন স্থানে দরস হবে। এটাও মারকাযে তাফসীরের তত্ত্বাবধানে হতে পারে, বরং হওয়া উচিত। আপনাদের হয়ত জানা নেই, অনেক আগে ঢাকার চকবাজারে আমি এটা শুরু করেছিলাম আমার ভাই হাসান মেছবাহকে দিয়ে। প্রতিটি দরসের জন্য আমি সহজ সংক্ষিপ্ত একটা কাগজ তৈরী করে দিতাম। কাজটা ভালোই হচ্ছিলো, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, বন্ধ হয়ে গেলো।

শরীফ : কাগজগুলো কি সংরক্ষণে আছে?

আদীব : কণ্ঠস্বরে মনে হয়, আমার দুর্বলতাটা তোমার জানা আছে। দুঃখিত সংরক্ষণে নেই। তবে কাজটা সত্যিকার অর্থে শুরু করতে চাইলে আমি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই আরবীভাষা শেখা, আর আমাদের দরসের আরবীভাষা শেখা একজিনিস না। এটা কঠিন কিছু না। আর আমার ধারণা আগের তুলনায় আগ্রহী মানুষ এখন যথেষ্ট।

যাকারিয়্যা : এটা তো ঘরে মেয়েদের জন্যও হতে পারে। তাদের যদি কোরআন শেখাতে চাই।

আদীব : অথবা বলুন, 'তারা যদি কোরআন শিখতে চায়'। আমার কষ্টের জায়গাটায় হাত রেখেছেন আপনি। মেয়েদের প্রসঙ্গ এলেই আপনারা সহজ শিক্ষসুলভ একটা নেছাবের চাহিদা অনুভব করেন কেন?

যাকারিয়্যা : এটা আসলে আমাদের মজবুরি, বা গাফলত, সেই সঙ্গে তাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

আদীব : সেটা বলেন, আমরা তাদের...

শরীফ : খুব বেশী সময় ও সুযোগ দিতে পারি না।

আদীব : কিন্তু কেন দিতে পারেন না? দুনিয়ার লোকেরা দিতে পারলে আপনারা দিতে পারেন না কেন? এ দায় কার?

যাকারিয়্যা : নারীশিক্ষার জন্য দুনিয়ার লোকদেরকে অবশ্য অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে।

আদীব : মূল্য দিতে হচ্ছে কি শিক্ষার কারণে? ওরা প্রথমেই যদি ইসলামের পর্দাব্যবস্থাটা মেনে নিতো। মেয়েদের শিক্ষা আলাদা, ছেলেদের শিক্ষা আলাদা। পূর্ণ পর্দার সঙ্গে তাহলে তো অন্তত আশিভাগ খারাবি থেকে বেঁচে যেতো।

আরেকটা কথা, মূল্য কি শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই দিতে হচ্ছে? ছেলেরা কি সব ফিরেশতা হয়ে বসে আছে?

শরীফ : তা অবশ্য ঠিক। অবক্ষয় তো সর্বত্রই এসেছে।

আদীব : তাহলে মূল্যটা দিচ্ছি আমরা শিক্ষার নয়, 'সহশিক্ষার', ধর্মহীন শিক্ষার, ধর্মবিদ্বেষী শিক্ষার। তার সঙ্গে আবার কত উপসর্গ যুক্ত হয়েছে!

যাকারিয়্যা : তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মেয়েদের জন্য ছেলেদের মতই আলাদা ...।

আদীব : দেখুন আমার মনে হয়, মূল প্রসঙ্গ থেকে আমরা সরে যাচ্ছি। এ আলোচনা অন্য কোন সুযোগের জন্য নাহয় তুলে রাখুন।

শরীফ : হুযূর, আমার মনে হয়, আমরা মূল প্রসঙ্গেই আছি, যদি প্রশ্নটা এভাবে করি, মেয়েদের কোরআনশিক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, আমাদের মজবুরি এবং মেয়েদের সীমাবদ্ধতা এসব দিক সামনে রেখে?

আদীব : তুমি দেখি, ইনুর সঙ্গে যা করেছো, আমার সঙ্গেও তাই শুরু করেছো! ছেলেদের জন্য যা ব্যবস্থা করেছো, মেয়েদের জন্য তার সমান্তরালে অন্তত একটা মাদরাসা করো, শরীয়তের সমস্ত দাবী রক্ষা করে। তারপর যারা সীমাবদ্ধতার কারণে আসতে পারবে না তাদের জন্য সহজ সংক্ষিপ্ত আলাদা নেছাবের চিন্তা

করা যায়। কিন্তু মেয়েদের প্রসঙ্গ এলেই আপনারা এমন মানসিকতা প্রকাশ করেন যে, কষ্ট হয়; অবিচার মনে হয়। দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, শিক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের থেকে পিছিয়ে নেই। আমাদের দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুযোগ দিয়ে দেখুন। যাক, এ বিষয়ে এখন আর কোন কথা নয়, মূল প্রসঙ্গে আসুন।

শরীফ : এ প্রসঙ্গে একটা শেষ প্রশ্ন। মেয়েদের একটা পূর্ণাঙ্গ মাদরাসার কথা বলেছিলেন!

আদীব : নিয়ত তো এখনো আছে। আল্লাহর রহমতে ধীরে ধীরে অগ্রসরও হচ্ছি, কিন্তু জাতির যে প্রয়োজন, আমাদের গতি তার চেয়ে অনেক ধীর। যা অনেক বছর আগেই হওয়ার কথা, আমরা এখনো নিয়ত করছি। কী করা যাবে? সত্যি কথা বলতে কী, ছেলেদের মাদরাসা, তাদের নেছাবে তা'লীম, নেযামে তা'লীম কোন কিছুই তো সঠিক স্তরে উঠে আসেনি।

যাকারিয়্যা : এটা বাস্তব সত্য যে, কোরআনের পূর্ণাঙ্গ একটি নেছাবে তা'লীম, এটা মাদরাসাতুল মাদীনাহর অনন্য এক বৈশিষ্ট্য। তো তাফসীরের সর্বোচ্চ স্তরের নেছাবে তা'লীম সম্পর্কে আপনার কী পরিকল্পনা, যদি বলতেন!

আদীব : আসলে কল্পনা, আর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলে সময় ব্যয় করা আমার কাছে ভালো লাগে না। যা করার নীরবেই করে যাওয়া ভালো। এ পর্যন্ত যেমন নীরবে কাজ হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় আগে নমুনা সামনে আসুক, তখন সবাই দেখতে পাবে, ভালো হলে গ্রহণ করবে। এই করবো, সেই করবো, এগুলো আমার একদম নাপছন্দ। মাফ করুন, ভাই।

যাকারিয়্যা : 'আততরীক ইলা তাফসীরিল কুরআনিল কারীম' লিখতে গিয়ে তাফসীরবিষয়ে আপনার নিশ্চয় বিস্তৃত মুতালাআ হয়েছে।

আদীব : মুতালাআ কিছুটা তো হয়েছে, সেটাকে 'বিস্তৃত' বলা যাবে, মনে হয় না।

যাকারিয়্যা : তো পুরো তাফসীরি কুতুবখানা সম্পর্কে আপনার সংক্ষিপ্ত একটা মতামত বলুন।

আদীব : এটা কেমন কথা! শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে বিপুল জ্ঞানসম্ভার গড়ে তুলেছেন উম্মাহর বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের বিশাল সব ব্যক্তি, সেসম্পর্কে মন্তব্য করবো আমি! মাত্র দু'দিন সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে! নাহ্!!

যাকারিয়্যা : 'আততরীক ইলা তাফসীরিল কুরআনিল কারীম' এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন!

আদীব : আসলে এর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য নেই। আমাদের পূর্ববর্তী তাফসীর-গুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য এখানে একত্র করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত তাফসীরে মোটামুটি পাঁচটি বিষয় আলোচনায় আসে। প্রথমত শব্দার্থ ও ব্যাকরণ, দ্বিতীয়ত অলঙ্কার ও বালাগাত, তৃতীয়ত ক্বিরাতের বিভিন্নতা, চতুর্থত ঘটনা ও শানে নুযূল, পঞ্চমত ইশকাল ও জওয়াব। এর পর হলো মূল বিষয়, তথা আয়াতের বক্তব্য ও মাফহূম। তাফসীরে সমস্ত বিষয় একসঙ্গে মিশে আছে। এটা কোরআনের মূল আবেদনকে যথেষ্ট ব্যাহত করে। তো আমি তাফসীরি বিষয়গুলো আলাদা এবং মাফহূম ও বক্তব্যকে আলাদা করে এনেছি। এটা আর কোন তাফসীরে করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তৃতীয়ত আল্লাহর কালাম, কোরআনের আসল বৈশিষ্ট্য হলো এর হৃদয়গ্রাহিতা, বা جاذبية মানুষের অন্তর-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করার শক্তি। তো এ শক্তিটি যে তাফসীর যত বেশী ধারণ করবে সেটা হবে কালামুল্লাহ-এর তত নিকবর্তী তাফসীর। আলহামদু লিল্লাহ, এদিক থেকে আমার মনে হয় 'আততরীক ইলা তাফসীরিল কুরআনিল কারীম' মোটামুটি সফল।

চতুর্থত কোরআনের কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে তারকীবগত জটিলতা, বা তাকদীম-তাখীরগত কারণে অর্থ-উদ্ধার ও মর্ম অনুধাবন তালিবে ইলমের জন্য কঠিন। আল্লাহর শোকর আলোচ্য তাফসীরে সেগুলো সহজ ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

এই আয়াতটির তাফসীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

পঞ্চমত বিভিন্ন স্থানে আয়াতের অন্তর্নিহিত সত্যটি সুস্পষ্টভাবে তুলে আনা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ এর তুলনামূলক তাফসীর দেখা যেতে পারে।

সবচে' বড় কথা, অন্যান্য তাফসীর কোন নেছাবি প্রয়োজনকে সামনে রেখে এবং কোন বয়স ও স্তরের তালিবানে ইলমের জন্য লেখা হয়নি, আলোচ্য তাফসীরের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে। সুতরাং এটা থেকে ইসতিফাদা করা অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ।

যাকারিয়্যা : আপনি বলেছেন, আলোচ্য তাফসীরে আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী মাত্র পঁচিশভাগ কাজ হয়েছে ৭৫ভাগ কাজ এখনো বাকি। এ বিষয়টি খোলাসা করুন।

আদীব : দেখুন না আল্লাহ্ সামনে কী করেন!

যাকারিয়্যা : কোরআনি খিদমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো হিফয। এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব চিন্তা রয়েছে বলে শুনেছি।

আদীব : জ্বি, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে, তবে এখানে শুধু মূল বিষয়টি বলবো। শিশুবয়স হিফযের জন্য সবচে' উপযোগী, এই একটি ধারণার উপর মকতব-হিফয-কিতাবখানা, এই পদ্ধতিটা চলে আসছে। কিন্তু না বুঝে হিফয করা কত কঠিন এবং বুঝে হিফয করা কত সহজ, এটা ভেবে দেখা হচ্ছে না। আমি জরীপ করে দেখেছি, শতকরা আশিভাগ ক্ষেত্রে তিনবছর লাগে হিফয করতে, সঙ্গে আবার যুক্ত হয় নানা উপসর্গ, যা আমরা সবাই জানি। তাত্ত্বিকভাবে আমার বিশ্বাস ছিলো; মক্তব থেকে যদি কিতাবখানায় চলে আসে এবং কোরআন বোঝার পর হিফয শুরু করে (মাদানী নেছাবের চতুর্থ বর্ষ শেষে) তাহলে কল্পনাতীত অল্প সময়ে হিফয হয়ে যাবে। সময়ের বিপুল সাশ্রয় হবে। কারো তিনমাস, কারো ছয়মাস, কারো নয় মাস। এর বেশী সময় লাগার কথা নয়। পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও এর বাস্তবতা দেখতে পেয়েছি।

যাকারিয়্যা : এটা তো অসাধারণ বিষয়! কীভাবে তা সম্ভব হলো?

আদীব : আসলে কোরআনের বরকত তো ছিলোই, এখানে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফাহমে কোরআনের বরকত। এতে মুখস্থ করতে হয় না, হয়ে যায়। আয়াতের ফাহমই পুরো আয়াতকে মুখে এনে দেয়।

শরীফ : এতে তো অনেক সময় বেঁচে যাবে!

আদীব : ভেবে দেখো, এই যে গতির যুগ, প্রতিযোগিতার যুগ, শুধু হিফযের জন্য যদি তিন বছর লেগে যায়, এর চেয়ে মর্মান্তিক বিষয় আর কী আছে?!

শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, অভিজ্ঞতারও আলোকে আমার বিশ্বাস, না বুঝে হিফয করার চেয়ে বুঝে হিফয করা অনেক অনেক সহজ, তদুপরি আখলাক ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রেও অনেক কল্যাণকর। তিনমাস/ছয়মাস/ নয়মাস, এর বেশী তো ইনশাআল্লাহ কিছুতেই লাগতে পারে না।

যাকারিয়্যা : হিফয করার আলাদা কোন পদ্ধতি নিশ্চয় আছে?

আদীব : স্বাভাবিক। আপনাদের সেটা বলছি, তবে এখন ছাপার অক্ষরে না আসাই ভালো।

যাকারিয়্যা : তো নতুন পদ্ধতির হিফযখানাটি কবে শুরু হচ্ছে?

আদীব : ইনশাল্লাহ আগামী বছর হযরতপুরে শুরু করার নিয়ত আছে। অভিভাবকদেরও অনুরোধ করবো, যারা সন্তানকে মাদরাসাতুল মাদীনায় পড়াতে চান তারা মক্তব থেকেই যেন এখানে নিয়ে আসেন। ইনশাআল্লাহ অনেক কল্যাণকর হবে। তবে ভাই যাকারিয়্যা, ভাই শরীফ!

যাকারিয়্যা, শরীফ : জ্বি হুযূর!

আদীব : হিফয বলুন, কিতাব বলুন, কামিয়াবির আসল রায হচ্ছে পরিপূর্ণ আস্থা ও আত্মনিবেদন, তালিবে ইলমের এবং অভিভাবকের। এ পর্যন্ত যে যা কিছু অর্জন করেছে, এর মাধ্যমেই অর্জন করেছে এবং যে যা কিছু হারিয়েছে, এর অভাবেই হারিয়েছে। দুনিয়ার শিক্ষা, আর দ্বীনের শিক্ষা কিন্তু এক নয়। দিলের একটা যখম আজ তোমাদের সামনে প্রকাশ করি, আমার দীর্ঘ শিক্ষকজীবনে এই আস্থা ও আত্মনিবেদন আমি কমই পেয়েছি।

শরীফ : আরেকটু বিশদ করে..

আদীব : থাক, এপর্যন্তই থাক।

যাকারিয়্যা : হিফয সম্পর্কে যা শুনলাম তা সত্যি অসাধারণ। তবে প্রথা থেকে বের হয়ে আসা কঠিন।

আদীব : কথাটা সত্য। আসলে কথার চেয়ে কাজের মূল্য অনেক বেশী। এজন্যই তো বলি, আপনি একটা নমুনা কায়েম করেন, আপনাকে আর বয়ান করে বোঝাতে হবে না।

যাকারিয়্যা : এটা অবশ্য ঠিক। মাদানি নেছাবের নমুনা যদি না হতো, কথা দিয়ে বোঝানো কঠিন হতো।

আদীব : আমি কিন্তু কাজের জগতের মানুষ ছিলাম, আপনারা আমাকে কথার জগতে নিয়ে আসছেন; আমিও ভুলটা করছি। জানি তো না, আর কত দিন সময় আছে। যাক, আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

যাকারিয়্যা : জ্বি, সাধ্যের ভিতরে অবশ্যই আমরা রক্ষা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আদীব : আমার অসুস্থতার সময় আল্লাহর বহু বান্দা-বান্দী আমার জন্য অনেকভাবে দু'আ করেছেন। আলকাউছারের মাধ্যমে আমি সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আল্লাহ সবাইকে আমার পক্ষ হতে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

শরীফ : হিফয সম্পর্কে আরেকটা প্রশ্ন ছিলো।

আদীব : ভাই শরীফ, থাক, অনেক হয়েছে। অসুস্থ বোধ করছি। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

শরীফ : হুযূরকে অনেক অনেক জাযাকাল্লাহ।

যাকারিয়্যা : এমন কঠিন অসুস্থতার মধ্যেও সময় দেয়ার জন্য।

আদীব : ওয়া ইয়্যাকুম। ●

কোরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক
কিছু দিক কিছু দৃষ্টান্ত

মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন

পৃথিবীতে কোরআনে কারীম হলো আল্লাহ তাআলার এমন মহানেয়ামত, আসমান-যমীন ও এদুয়ের মধ্যবর্তী কোনো সৃষ্টি যার তুল্য হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আপন করুণা ও সীমাহীন দয়াবশত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে এ নেয়ামত দান করেছেন। ফলে আল্লাহর কালামের মতো মহাদৌলতকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র যবানে তেলাওয়াত করতে পারছি। তা দেখে দেখে নয়নযুগল শীতল করছি। কোমলভাবে স্পর্শ করে তার পরশ গ্রহণ করছি। ভক্তি ও ভালোবাসায় এবং গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধায় তাকে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছি। এই পবিত্র কোরআন নাযিলের মাধ্যমে তিনি আমাদের তাওফীক দান করেছেন কোরআনের আলোয় আলোকিত হওয়ার, কোরআনের ভাব ও পয়গাম হৃদয়ে ধারণ করার এবং কোরআনের আদর্শে জীবন গড়ার। অতএব এ নেয়ামতের যতই শুকরিয়া আদায় করি না কেন, তা হবে নিতান্তই নগণ্য।

এই মহানেয়ামতের প্রকৃত শুকরিয়া হলো কোরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। সাধ্যানুযায়ী বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা। কোরআনের অর্থ ও মর্মে চিন্তা-ভাবনা করা। কোরআনের আবেদন হৃদয়ে ধারণ করে নিজেকে আলোকিত ও আলোড়িত করা। সর্বোপরি কোরআনের হকসমূহ আদায় করা।

একজন মুমিনের ওপর কোরআনের অনেক হক রয়েছে। সে হকসমূহ জানা এবং যথাসম্ভব তা আদায়ে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেকের জন্য জরুরি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কোরআনের বিশেষ কয়েকটি হক উল্লেখ করা হলো।

১. কোরআনের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা এবং কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য খোদাপ্রদত্ত হওয়ার ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

২. মনে-প্রাণে কোরআনকে ভালোবাসা এবং তার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও আদব বজায় রাখা।

৩. দিনে-রাতে যখনই সুযোগ হয়, গভীর ভালোবাসা ও ভক্তি সহকারে বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা।

৪. কোরআনের পয়গামকে নিজের মাঝে ধারণ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার বিধি-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করা।

৫. সঠিক পদ্ধতিতে সাধ্যানুযায়ী কোরআনের মাঝে 'তাদাব্বুর' ও 'তাফাক্কুর' করা অর্থাৎ গভীর ধ্যানমগ্নতার সাথে কোরআন পাঠ করা এবং উপদেশ গ্রহণের জন্য তার ভাব ও পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। বিশেষভাবে কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা, উপমা ও নসীহতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করে করে কোরআনের আলো আহরণ করা এবং নিজের ঈমান-আমলের উন্নতি সাধন করা।

৬. নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অধীনদেরকে কোরআন শেখানো এবং কোরআনের আদর্শ অনুযায়ী তাদের জীবন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা-ফিকির করা।

৭. কোরআনের ঐশী পয়গাম, তার হেদায়াতবার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং কোরআন আমাদের জন্য যে মহান শিক্ষা নিয়ে এসেছে, তার প্রচার-প্রসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

কোরআনের এ সকল দাবি ও হকগুলো আদায় করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য জরুরি। কিন্তু এমন ক'জন আছেন যারা যথারীতি এ সকল হক আদায় করে থাকেন? অন্যান্য হকের কথা বাদ দিলেও ক'জন পাওয়া যাবে, যারা নিয়মিত শুধু কোরআন তেলাওয়াত করেন? আফসোসের বিষয় হলো, অসংখ্য মুসলমান কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতটুকুও করতে জানে না। এমনকি দ্বীনের প্রচার-প্রসারে রত অনেক দাঈ ব্যক্তিও এ ব্যাপারে অসচেতন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনে কারীমের ব্যাপারে সকল প্রকারের উদাসীনতা ও গাফলত থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এখন জানার বিষয়, কীভাবে কোরআনের সাথে আমাদের গভীর ও মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠবে, হৃদয়ে তার প্রকৃত ভালোবাসা পয়দা হবে এবং কোরআনের হকসমূহ আদায়ে মন উজ্জীবিত হবে? তো, এর সহজ ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি হলো, কোরআনের

সাথে সালাফে সালেহীন বিশেষভাবে সাহাবায়ে কেরামের যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল, তা জানা এবং কোরআনের সাথে সে ধরনের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

কোরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক কেমন ছিল? কোরআনের ভালোবাসা তাঁদের হৃদয়ের গভীরে কেমন প্রোথিত ছিল? দিনে-রাতে কোরআনের পঠনপাঠনে এবং 'তাফাক্কুর' ও 'তাদাব্বুরে' তাঁরা কী পরিমাণ নিমগ্ন থাকতেন? কোরআনের আলোয় তাঁরা নিজেদের জীবনকে কীভাবে আলোকিত করতেন? কীভাবে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতেন কোরআনের একেকটি হুকুম? আল্লাহর পাক কালাম কোরআনের সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কী পরিমাণ ত্যাগ তাঁরা স্বীকার করেছেন? এবং কী পরিমাণ আত্মত্যাগের নযরানা পেশ করেছেন কোরআনের তালীম, তাদরীস ও তাবলীগের জন্য? একজন নিষ্ঠাবান কোরআনপ্রেমিকের জন্য এসব প্রশ্নের উত্তর জানা অত্যন্ত জরুরি এবং কোরআনের হকসমূহ আদায় করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার জন্য এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া খুবই কার্যকরী ও উপকারী।

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. বলেন, এক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের অধ্যয়ন উপকারী ও ফলপ্রসূ হবে :

এক. সহীহ হাদীসের সংকলন থেকে কোরআনের ফযীলত-সংক্রান্ত হাদীসগুলো গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করা।

দুই. সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, ফুকাহায়ে কেরাম, ওলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী থেকে সেই অংশগুলো পাঠ করা, যেখানে কোরআনের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, তার সাথে গভীর সম্পর্ক এবং কোরআনের তেলাওয়াত ও তাফাক্কুরের ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। -দস্তূরে হায়াত, ২২৮-২২৯, মুতালাআয়ে কোরআন কে উসূল ও মাবাদী, ১৭০-১৭৫

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তবে প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে এবং গুরুত্বের বিচারে কেবল সাহাবায়ে কেরামের কিছু ঘটনা বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং ঘটনাগুলো পাঠকদের সহজার্থে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা লেখক ও পাঠক সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত

কোরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক হলো অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করা। কোনো কোনো দিক থেকে যিকরুল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হলো তেলাওয়াত। যারা কোরআনে কারীমের তেলাওয়াতে মশগুল থাকে, তাদের প্রশংসায় ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ۝ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

'যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে- তারা এমন ব্যবসার প্রত্যাশা রাখে যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নয়, যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পুরোপুরি দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।' -সূরা ফাতির (৩৫) : ২৯-৩০

সূরা আলে ইমরানে আহলে কিতাবের একটি দলের প্রশংসায় ইরশাদ হয়েছে-

'কিতাবীদের মধ্যে একটি দল আছে, যারা সঠিক পথের ওপর অধিষ্ঠিত, যারা রাতের প্রহরগুলোতে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা সেজদাবনত থাকে।' -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১১৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদীসে কোরআন তেলাওয়াতের সীমাহীন গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং কোরআন তেলাওয়াতে উদাসীন ব্যক্তিদের নিন্দা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস তো সকলেরই জানা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পাঠ করল, সে একটি নেকি লাভ করল। আর এক নেকি দশ নেকির সমতুল্য। (বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য নবীজী বলেন)- আমি এ কথা বলছি না যে, الم একটি হরফ। বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ, م একটি হরফ। (এভাবে الم পাঠকারী অন্তত ত্রিশটি নেকি লাভ করবে।) -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩১৩৫; সুনানে দারেমী, হাদীস ৩৩১১

অন্য হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেবল দুই ব্যক্তি ঈর্ষার উপযুক্ত (অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে ঈর্ষা করা যেতে পারে)। এক. ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা

কোরআনে কারীমের নেয়ামত দান করেছেন, আর সে দিন-রাত তা নিয়েই নিমগ্ন থাকে। দুই. ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে দিন-রাত আল্লাহর পথে তা খরচ করতে থাকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৫

সাহাবায়ে কেরাম রা. তো সবসময় কোরআনী হেদায়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রতিটি আমলের সওয়াব ও ফযীলত অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। সুতরাং এসব সওয়াব ও ফযীলতের কথা শোনার পর তাঁদের অবস্থা কেমন হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই তো কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী এবং জীবনের বড় একটা অংশ তাঁরা এতেই ব্যয় করতেন। দিনের আলোয় তেলাওয়াত করতেন পরম আগ্রহে, আর রাতের প্রহরগুলোতে গভীর নির্জনতায় অনুভব করতেন আরো বেশি আকর্ষণ। ঘরে ও মসজিদে সফরে ও আপন ভূমিতে অবস্থানকালে-সব জায়গায় ও সর্বাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হতেন। কখনো একাকী, কখনো জামাতবদ্ধ হয়ে, কখনো মুখস্থ, কখনো দেখে দেখে। এভাবে কোরআনের মাঝেই তাঁরা হারিয়ে যেতেন। তার মাঝেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতেন।

কোনো কোনো সাহাবী কোরআনের আকর্ষণে এতটা মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে কোরআন খতম করার সর্বনিম্ন সময় বেঁধে দিতে হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর ঘটনা তো খুবই প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অত্যধিক পরিমাণে তাঁর তেলাওয়াতের সংবাদ পৌঁছল। তিনি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোরআন খতম করার ব্যাপারে তোমার অভ্যাস কী (অর্থাৎ কত দিনে তুমি কোরআন খতম করো)?

আবদুল্লাহ : প্রতি রাতে একবার খতম করি।

নবীজি : (এমন করো না।) তুমি বরং মাসে একবার খতম করো।

আবদুল্লাহ : আমার পক্ষে তো এর চেয়েও বেশি পড়া সম্ভব।

নবীজি : তাহলে কমপক্ষে সাত দিনে এক খতম কর। এর চেয়ে কমে নয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৫২-৫০৫৪

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পীড়াপীড়ি ও আবদারের কারণে অবশেষে তিন দিনে এক খতম করার অনুমতি দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯২৮

একবার এক জিহাদের সফরে সাহাবায়ে কেরাম রা. পথে বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেললেন। কাফেলায় কিছু আশআরী সাহাবীও ছিলেন। রাতে তাঁরা আপন তাঁবুতে কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন। পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, রাতের তেলাওয়াত শুনে আমি আশআরী ভাইদের আওয়াজ চিনতে পেরেছি। দিনের বেলা তাঁদের তাঁবু কোথায়, তা না জানলেও রাতে তাঁদের তেলাওয়াতের মধুর আওয়াজ শুনে তা জানতে পারি। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪২৩২

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন। আরবের তপ্ত মরুভূমিতে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত-শ্রান্ত মুসাফির-কাফেলা রাত যাপনের জন্য তাঁবু ফেলেছিল। বিশ্রামের জন্য তাঁদের দেহ-মন কেমন প্রত্যাশী ছিল! কিন্তু আল্লাহর কালামের আকর্ষণ যে এর চেয়ে বেশি ছিল! তাই তো তাঁরা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েননি। বরং কোরআন -সরোবরে অবগাহনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন অনাবিল শান্তি ও প্রশান্তি। সুবহানাল্লাহ! সফরের কষ্টকর অবস্থায় -তাও আবার রাতের বেলা- কোরআনের সাথে যাদের এতটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল, আপন বাড়িতে থাকাবস্থায় আরো কত গভীরই না ছিল এ সম্পর্ক!

দেখে দেখে কোরআন তেলাওয়াত করা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত ওসমান রা. বলতেন, তোমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তোমরা কখনো কালামুল্লাহ তেলাওয়াত করে পরিতৃপ্ত হবে না (অর্থাৎ যতই পড়বে মনে হবে আরেকটু পড়ি)। আমি চাই না, দেখে দেখে কোরআন তেলাওয়াত করা ছাড়া আমার জীবনের একটি দিনও অতিবাহিত হোক। -আযযুহদ, আহমদ পৃ. ১৫৯

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, ওমর রা. যখন বাইরে থেকে ঘরে আসতেন, তখন কোরআন নিয়ে বসে যেতেন এবং দেখে দেখে তেলাওয়াত করতেন। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮২; ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ১০৯

হযরত যির ইবনে হুবায়শ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, প্রতিদিন কোরআন শরীফে নজর বুলাও। (কেননা এটাও

সওয়াব ও বরকতের কাজ)। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮২; ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ১০৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৮৬৪৬

কোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের জন্য কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে তার পাবন্দি করা

কোরআনে কারীমের সাথে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ের সম্পর্ক কত গভীর ও নিবিড় ছিল, তা এ থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁরা প্রাত্যহিক তেলাওয়াতের জন্য কোরআনের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিতেন এবং তার পূর্ণ পাবন্দি করতেন। অনেক সাহাবী এ বিষয়ে এত গুরুত্ব দিতেন যে, কখনো অপারগতার কারণে তেলাওয়াত ছুটে গেলে পরে তা পূরণ করে নিতেন। খায়ছামা রাহ. বলেন, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন দেখে দেখে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলে বললেন, রাতে নিয়মিত যে অংশ নামাযে পড়ে থাকি, সেটাই এখন কোরআন দেখে পড়ে নিচ্ছি। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩৫৭

উম্মে মুসা রাহ. বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. কোরআন তেলাওয়াতের ওযীফা রাতের শুরু ভাগে আদায় করতেন। আর হযরত হোসাইন রাযি. আদায় করতেন শেষভাগে। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩৫৭

প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইবরাহীম নাখাঈ রাহ. বলেন, কোনো কারণে একদিন কোরআন তেলাওয়াতের ওযীফা ছুটে গেলে পরদিন তা পূরণ করে নেয়াই ছিল সালাফের রীতি। উদ্যম থাকলে দিনের বেলাই পড়তেন। নতুবা রাতে তা আদায় করতেন। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩৫৯

সাহাবায়ে কেরামের এই উত্তম আদর্শের অনুসরণের তাগিদ দিয়ে মুফাক্কিরে ইসলাম আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. বলেন, প্রাত্যহিক তেলাওয়াতের জন্য কোরআনের নির্দিষ্ট একটি অংশ ওযীফা হিসেবে নির্ধারণ করে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। যথাসাধ্য সে নির্দিষ্ট অংশ পাবন্দির সাথে তেলাওয়াত করবে এবং কোনো অসুস্থতা বা মারাত্মক ওজর ছাড়া তা যেন ছুটে না যায়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবে। –মুতালাআয়ে কুরআন কে উসূল ওয়া মাবাদী, পৃ. ২২৭

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোরআনের তেলাওয়াতে তারতীল ও অন্যান্য আদব রক্ষা করা

কোরআনে কারীম সাধারণ কোনো কিতাব বা মামুলি কোনো কালাম নয়। এ তো রাজাধিরাজ, মহান স্রষ্টা, আহকামুল হাকেমীন, রাব্বুল আলামীনের মহাপবিত্র মুবারক কালাম। মহান প্রভুর মহান বার্তা। যা তাঁরই ইলম থেকে অবতীর্ণ। কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা– فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ

'জেনে রাখো, কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আল্লাহরই ইলম থেকে।' –সূরা হুদ (১১) : ১৪

তাই এ মহান কালাম যেভাবে মর্জি সেভাবেই পড়া যাবে না। বরং এ থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার সাথে প্রয়োজন– ভক্তি ও ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা ও আদবের প্রতি খেয়াল রেখে তেলাওয়াত করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো, কোনো প্রকার তাড়াহুড়া না করে তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করা। কোরআনেই এর আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

'আর কোরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে।' –সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত ছিল এ নির্দেশের বাস্তব রূপ। হযরত উম্মে সালামা রা. কারো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর তেলাওয়াতে প্রতিটি হরফ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৬৫২৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯২৩

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আরেকটি আদব হলো, তাদাব্বুর ও তাফাক্কুরের সাথে (অর্থাৎ গভীর ধ্যানমগ্নতার সাথে এবং যথাসম্ভব কোরআনের শব্দ ও বাক্যে, অর্থ ও মর্মে চিন্তা-ফিকির করে) তেলাওয়াত করা। কোরআন থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়ার জন্য এও জরুরি। খোদ কোরআনেই এর গুরুত্ব বিবৃত হয়েছে এবং আল্লাহর যে বান্দাগণ বুঝে বুঝে এবং উপদেশ গ্রহণের জন্য চিন্তা-ফিকির করে করে তেলাওয়াত করে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'(এ) এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকেরা এর আয়াতগুলোর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।' –সূরা ছদ (৩৮) : ২৯

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যে তারতীল রক্ষা করার নির্দেশ এসেছে, তার অন্যতম ফায়েদা হলো, এর দ্বারা তাফাক্কুর ও তাদাব্বুরের সুযোগ পাওয়া যায়। হৃদয়ে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়। ফলে তেলাওয়াতের প্রতি আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। -ফাওয়ায়েদে ওসমানী ২/১২২১

সাহাবায়ে কেরামের তেলাওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা তারতীল ও তাদাব্বুর এবং সচিন্ত ও ধীরস্থির তেলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এবং অন্যদেরকেও এর প্রতি তাগিদ করতেন।

হযরত আলকামা রাহ.-এর ঘটনা। একবার তিনি ইবনে মাসউদ রা.-কে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছিলেন। আলকামা রাহ.-এর আওয়াজ ছিল সুমধুর। কিন্তু তিনি কিছুটা দ্রুত পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে মাসউদ রা. বললেন, বৎস! ধীরস্থিরভাবে তারতীলের সাথে পড়। এটাই যে কোরআনের ভূষণ। -মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৩১

হযরত ইবনে আবী মুলাইকা রাহ. বলেন, মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার এক সফরে আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে ছিলাম। দিনভর আমরা পথ চলতাম। আর রাতে কোথাও তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করতাম। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. মাঝ রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং খুব ধীরে ধীরে, থেমে থেমে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এক একটি শব্দ স্পষ্ট ও পৃথক পৃথক শোনা যেত। আর নামাযে তিনি ডুকরে ডুকরে কাঁদতেন। এমনকি তাঁর হেঁচকির আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যেত। -মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৩১

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বলল, আমি এক রাকাতেই ('আওসাতে) মুফাসসালে'র সব সূরা পড়ে নিই। ইবনে মাসউদ রা. তখন বললেন, এর অর্থ হলো, তুমি কবিতার মতো গড়গড় করে শুধু পড়ে যাও! মনে রেখো, অনেক মানুষ কোরআন তেলাওয়াত করে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালির নিচেও যায় না। অথচ কোরআন তেলাওয়াত তখনই (পরিপূর্ণ) উপকারী হয়, যখন তা কলবে গিয়ে বসে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২২

হযরত আবু যামরাহ রাহ. একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বললেন, আমি খুব দ্রুত কোরআন পড়তে পারি। তিনদিনেই খতম করে ফেলি। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, গড়গড় করে দ্রুত কোরআন খতম করা অপেক্ষা সারা রাতে তারতীল ও তাদাব্বুরের সাথে শুধু সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা আমার কাছে অধিক উত্তম মনে হয়। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩২৬; আততিবয়ান, নববী পৃ. ১০৮; ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ১২৫-১২৬

সংশ্লিষ্ট কিতাবাদিতে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ও বর্ণনা রয়েছে। যার দ্বারা বুঝে আসে, নিছক তেলাওয়াত যথেষ্ট নয়। বরং তেলাওয়াত হতে হবে তারতীলের সাথে। প্রতিটি শব্দ ও বাক্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে করে। পাশাপাশি যথাসম্ভব তাদাব্বুরের প্রতিও লক্ষ রাখা উচিত।

এখানে ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি সংক্ষিপ্ত, তবে গভীর মর্মসমৃদ্ধ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উল্লেখ করা খুবই জরুরি। তিনি বলেন, কবিতা আবৃত্তির মতো দ্রুত কালামে পাক পড়ো না এবং বিরতিহীনভাবে গড়গড় করে কোরআন তেলাওয়াত করো না; বরং এমনভাবে তেলাওয়াত কর, যেন অন্তর শিহরিত ও হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে। কোরআনের গভীর মর্ম, উচ্চাঙ্গের শিক্ষা এবং এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে, চিন্তা করে করে পড়বে। সাবধান! শুধু এ ভাবনা যেন মাথায় না থাকে যে, এ সূরা। (এ পৃষ্ঠা বা পারা) কখন শেষ হবে! -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৮৮২৫; আখলাকু হামালাতিল কোরআন, আজুররী, পৃ. ১৯, মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৩২

নিভৃত রাতে নামাযে কোরআন তেলাওয়াত

কোরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে তাঁদের প্রশংসা করেছেন, যারা রাতের বেলা নিভৃতে তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। সূরা আলে ইমরানের ১১৩ নং আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

(তরজমা) 'কিতাবীদের মধ্যে একটি দল আছে, যারা সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ যারা ইসলাম কবুল করেছেন) যারা রাতের প্রহরগুলোতে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তাঁরা সেজদাবনত থাকে।' -সূরা আল ইমরান (৩) : ১১৩

এর দ্বারা বোঝা যায়, রাতে কোরআন তেলাওয়াত করা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়।

তেমনি নামাযে কোরআন তেলাওয়াত করাও অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ একটি ইবাদত। কেননা এ ক্ষেত্রে বড় বড় দু'টি ইবাদতের সম্মিলন ঘটে: ১.

নামায, ২. তেলাওয়াতে কোরআন। ইমাম নববী রহ. বলেন, নামাযের তেলাওয়াত হলো সর্বোত্তম তেলাওয়াত। -আততিবয়ান, নববী পৃ. ১৭৮

সাহাবায়ে কেরাম নামাযের বাইরে যেমন তেলাওয়াত করতেন, নামাযের ভেতরেও তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন, বরং হাফেয ইবনে হাজার রাহ. বলেন- وغالب تلاوتهم في الصلاة

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের বেশিরভাগ তেলাওয়াত নামাযের মধ্যেই হতো। -নাতায়েজুল আফকার ৩/১৬৭

'কোরআন শরীফের সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক' শিরোনামের অধীনে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তা হলো, সাহাবায়ে কেরাম রাতের বেলা নিভৃতে, নামাযে তেলাওয়াতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। ফলে একই সাথে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একাধিক ইবাদতের সম্মিলন ঘটত- ১. নামায, ২. কিয়ামুল লাইল, ৩. তেলাওয়াতে কোরআন। আর এভাবেই তাঁরা অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত লাভে ধন্য হতেন। আসলে সাহাবায়ে কেরামের এ আমল ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণেরই একটি নমুনা। এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ তো সকলেরই জানা।

নিম্নে এ-সংক্রান্ত সাহাবায়ে কেরামের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রা.-কে শহীদ করার জন্য কিছু দুর্ভাগা পাপী লোক যখন তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ল, তখন খলীফা-পত্নী নায়েলা বিনতে ফারাফেছা রাহ. তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তাঁর মতো একজন পুণ্যবান ও পবিত্র মানুষকে হত্যা করতে এসেছ? অথচ তিনি তো এক রাকাতেই সারা রাত কাটিয়ে দিতেন এবং তাতে পুরো কোরআন খতম করতেন। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩৫১-৩৫২; মুসান্নাফে, ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩৭১০; নাতায়েজুল আফকার ৩/১৬১

মিসরের বিশিষ্ট তাবেঈ আবুল খায়ের মারছাদ ইবনে আবদুল্লাহ রহ. বলেন, তিনি ওকবা ইবনে আমের রা.-কে বলতে শুনেছেন, কোরআন শিক্ষা করার পর কোনো রাত এমন কাটেনি যে, আমার রাতের তেলাওয়াত ছুটে গেছে। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩৫৭

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি রাতে ঘুমাতেন না। সালাত ও তেলাওয়াতের মাঝেই সারারাত কাটিয়ে দিতেন। অনেক সময় এক রাতেই পুরো কোরআন খতম করতেন। তাঁকে শূলিতে চড়িয়ে যখন হত্যা করা হয়, শূলির দিকে তাকিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আফসোস করে বলেন, আপনি নামায-রোযার ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। পিতামাতার খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। অথচ আপনার মতো একজন পুণ্যবান ও পবিত্র মানুষের সাথে আজ এমন ঘৃণ্য ও বর্বর আচরণ করা হলো! আল্লাহর কসম, আমি আশা রাখি, আজকের পর আর কোনো দিন আপনাকে কোনো ধরনের কষ্ট পেতে হবে না। -মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ৪৮

এখানে কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। ফাযায়েলে কোরআন, ফাযায়েলে কিয়ামুল লাইল এবং সালাফের জীবনী গ্রন্থসমূহে এ ধরনের অসংখ্য ঈমানোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এ পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের কিছু বাণী উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে তাঁরা নিভৃত রাতে কোরআন তেলাওয়াতের ওপর জোর দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাগিদ করেছেন যে, এ সময় কোরআন তেলাওয়াত করার দ্বারা যে আত্মিক ফায়েদা ও প্রশান্তি লাভ হয়, আল্লাহ তাআলার যে সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জিত হয়- আমরা যেন নিজেদেরকে তা থেকে বঞ্চিত না করি! বিশেষ করে কোরআনের মতো মহা নেয়ামত যারা পেয়েছে এ সময় তাদের গাফেল থাকা কিছুতেই উচিত নয়।

হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রাহ. বলেন, সালাফের যুগে পাবন্দির সাথে রাতের বেলা কোরআন তেলাওয়াত করার প্রতি লোকদের খুব উদ্বুদ্ধ করা হতো, যদিও পরিমাণে তা অল্প হোক না কেন। -আততিবয়ান, পৃ. ৮৩

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কোরআন-বাহকের উচিত, রাতের বেলা ইবাদত ও তেলাওয়াতে মশগুল থাকা, যদিও অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে এবং দিনের বেলা রোযা রাখা, যদিও অন্যরা পানাহারে ব্যস্ত থাকে। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮৯; আখলাকু হামালাতিল কোরআন, আজুররী ৫০, হাদীস ৩০; তাফসীরে কুরতুবী ১/৩৮

কোরআন খতমের সময়-সীমা এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা

কোরআন খতমের মেয়াদের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে

কেরামের আমল বিভিন্ন রকমের ছিল। কোনো সাহাবী দুই মাসে, কেউবা প্রতি মাসে একবার কোরআন খতম করতেন। কেউ কেউ তো তিন বা চার দিনেই এক খতম তেলাওয়াত করতেন। এছাড়া আরো বিভিন্ন সময়-সীমার কথা সংশ্লিষ্ট কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। তবে সাধারণত প্রতি সাত দিনে কোরআন খতম করাই ছিল অধিকাংশ সাহাবীর আমল। –নাতায়েজুল আফকার ১/১৪৪-১৪৬; আততিবয়ান ৭৫-৭৭; ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ১৩২-১৩৬; আলইতকান ফি উলুমিল কোরআন ১/৩০৩

কোরআন খতমের সময়সীমার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাঁদের আদর্শ জীবনে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হচ্ছে, কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি তাঁদের বিপুল আগ্রহ ও অতুলনীয় উদ্দীপনা। প্রতি সাত দিনে একবার খতম করার অর্থ হচ্ছে, প্রতি মাসে চার বার এবং সারা বছরে পঞ্চাশ কিংবা এর চেয়ে বেশি বার পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করা।

প্রিয় পাঠক! এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের আমল। নিশ্চয় তাঁদের জীবন ও আদর্শে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোরআন খতমের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম আরো যেসব বিষয় লক্ষ রাখতেন

প্রখ্যাত তাবেঈ আমর ইবনে মুররা রাহ. বলেন, সালাফের নিকট পছন্দনীয় ছিল রাতের শুরুভাগে কিংবা দিনের শুরুভাগে কোরআন খতম করা।

–আততিবয়ান, পৃ. ৮১; ইবনে আবু দাউদের সূত্রে, নাতায়েজুল আফকার ৩/১৬৭

হযরত ইবরাহীম তাইমী রাহ. থেকেও এ ধরনের বর্ণনা আছে। সেখানে এর কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সালাফের যুগে এ রেওয়ায়েত প্রসিদ্ধ ছিল– যে ব্যক্তি দিনের শুরুভাগে কোরআন খতম করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা কোরআন খতম করে, সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮৬; আরো দেখুন: সুনানে দারেমী, হাদীস ৩৫২৬; আততিবয়ান, নববী : পৃ. ৮২; নাতায়েজুল আফকার ৩/১৬৭-১৬৯

তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদাহ রাহ. বলেন, (নামাযে কোরআন খতমের ক্ষেত্রে) সালাফের পছন্দনীয় পদ্ধতি ছিল, রাতে খতম করলে মাগরিবের পর দুই রাকাতে, আর দিনে খতম করলে ফজরের আগে দুই রাকাতে শেষ করা। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮৬; আযযুহদ, ইবনুল মুবারক, হাদীস ৭৬০

কোরআন খতমের মজলিস একটি বরকতপূর্ণ মজলিস এবং বিভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক তা আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তি ও দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮৫-২৮৬; মুসান্নাফে, ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩০৬৬৩; মুজামে কাবীর, তাবারানী ১৮/২৫৯, হাদীস ৬৪৭; সুনানে দারেমী, হাদীস ৩৪৮৪-৩৪৮৫; আততিবয়ান, নববী পৃ. ১৮২-১৮৩; নাতায়েজুল আফকার ৩/১৭৪, ১৭৬-১৭৭

তাই সাহাবায়ে কেরাম কোরআন খতমের সময় দোয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। পরিবার-পরিজনকেও তাতে শরিক করতেন। তা ছাড়া কেউ কোরআন খতম করলে তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর সাথে দোয়ায় শরিক হতেন।

ইবরাহীম তাইমী রাহ. থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি কোরআন খতম করে, তখন তাঁর দোয়া কবুল হয়। ইবরাহীম তাইমী রাহ. বলেন, এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর অভ্যাস ছিল, কোরআন খতম হলে পরিবার-পরিজন সকলকে একত্র করে দোয়া করতেন। আর তাঁরা সাথে সাথে আমীন আমীন বলতেন। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮৬

কাতাদা রাহ. আনাস রা. থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি কোরআন খতম কালে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে দোয়া করতেন। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮৬; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩০৬৬১; আততিবয়ান, ১৮২ ইবনে আবু দাউদের সূত্রে বিশিষ্ট তাবেঈ মুজাহিদ রহ. বলেন, কোরআন খতমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া সালাফের সাধারণ রীতি ছিল। তাঁরা বলতেন, এটা আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার সময়। –আততিবয়ান, পৃ. ১৮৩; নাতায়েজুল আফকার ৩/১৭৭

কোরআন হেফয করার গুরুত্ব ও কয়েকজন হাফেয সাহাবীর নাম

কোরআন হলো আল্লাহ তাআলার আখেরি কালাম এবং শেষ অবতীর্ণ আসমানী কিতাব। আল্লাহ

তাআলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার মুক্তি ও হেদায়াতের জন্য এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাব পূর্বের সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর মৌলিক বিষয়াবলি নিজের মাঝে ধারণকারী। এ পবিত্র কিতাবই মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ পয়গাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের হেদায়াত ও মুক্তি এ কিতাব মানার ওপরই নির্ভরশীল। তাই অন্যান্য আসমানী কিতাবের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য একেবারেই ভিন্ন। এসব কারণে আল্লাহ তাআলা নিজেই কোরআনে কারীমের হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সব ধরনের সংযোজন-বিয়োজন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে তাকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ করেছেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'নিশ্চয় আমিই অবতীর্ণ করেছি যিক্র (কোরআন) এবং আমিই এর হেফাযতকারী।' –সূরা হিজর (১৫) : ৯

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'নিশ্চয়ই তা (কোরআন) অতি সম্মানিত এক কিতাব। যাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়– না তার সামনে থেকে, না পেছন থেকে। (তা) প্রজ্ঞাবান, সমস্ত প্রশংসার অধিকারীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' –সূরা হা-মীম আসসাজদা (৪০) : ৪১-৪২

প্রথম আয়াতের তাফসীরে শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. লেখেন–

'কোরআনের হেফাযত ও সংরক্ষণ সম্পর্কে এ বিরাট খোদায়ী ওয়াদা এত স্পষ্টভাবে ও বিস্ময়কররূপে পূর্ণ হয়েছে যে, তা দেখে বড় বড় কট্টর ও উদ্ধত বিরুদ্ধাচারীরও মাথা হেট হয়ে গেছে। অমুসলিম ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেন,

আমাদের জানামতে সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি গ্রন্থও নেই, যা কোরআনের মতো বারো শতাব্দী যাবৎ সব রকমের বিকৃতি থেকে অক্ষত রয়েছে।

বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয়, প্রতি যুগে অসংখ্য আলেম –যাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন– কোরআনের অর্থ ও মর্ম এবং অসীম জ্ঞানভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করেছেন। লিপিকারগণ লেখনশৈলীকে, কারীগণ উচ্চারণ পদ্ধতিকে, হাফেযগণ শব্দ ও বাক্যকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটি যের-যবরেরও পরিবর্তন হয়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা যুগও দেখানো যাবে না, যখন কোরআনের হাজারো-লাখো হাফেয বিদ্যমান ছিল না। লক্ষ করুন! আট-দশ বছরের একটি হিন্দুস্তানী শিশুকে নিজের মাতৃভাষার ছোট একটি পুস্তিকা মুখস্থ করানো কত কঠিন! অথচ সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতে ভরপুর ভিন্ন ভাষার বিশাল বড় একটি গ্রন্থ (কোরআন) কীভাবে সে ধারাবাহিকভাবে মুখস্থ শুনিয়ে দিচ্ছে।'

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা নিজেই যেহেতু কোরআনে কারীমের সব ধরনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, আর 'সুন্নাতুল্লাহ' তথা আল্লাহর নীতি হচ্ছে– إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন নিজেই তার সকল আসবাব তথা উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। এ ঐশী নীতি অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা কোরআনের হেফাযত ও সংরক্ষণের অসংখ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো, কোরআন হেফয করা। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের অন্তরে কোরআন কারীম হেফয করার প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও জযবা দান করেছেন। তাই কোরআন শুধু লিখিতরূপেই সংকলিত না হয়ে বুকের ভেতরেও যেন সংরক্ষিত থাকে- এ ব্যাপারে তারা সদা যত্নবান থেকেছেন। ফলে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত, কল্যাণের কাজে সদা অগ্রগামী, কোরআনের সর্বপ্রথম সম্বোধন লাভের মহাসৌভাগ্য ললাটে ধারণকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অগণিত সাহাবী পুরো কোরআন কারীম হেফয করে ফেলেছিলেন, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কোরআন হেফয করার এই সীমাহীন আগ্রহ ও জযবার একটি কারণ তো হলো কোরআনের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসার সেই মহান নেয়ামত, যা আল্লাহ তাআলা তাঁদের দান করেছিলেন (যার কিছু নমুনা পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে)। সেই সাথে কোরআনের তেলাওয়াত, হেফয এবং কোরআনের শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও ফযীলত-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসেরও এ ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। হাদীসের কিতাব এবং অন্য গ্রন্থাদিতে প্রচুর পরিমাণে সে সকল বর্ণনা রয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ দু'একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

ওসমান রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি তো অনেক প্রসিদ্ধ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

হযরত ওসমান রা. থেকে এ হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু আবদুর রহমান আসসুলামী রাহ. ছিলেন অনেক বড় কারী এবং কোরআন শিক্ষাদানকারী। ওসমান রা.-এর যুগ থেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুগ পর্যন্ত তিনি এ মহান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটিই আমাকে (এত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত) এখানে বসিয়ে রেখেছে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. লেখেন, ওসমান রা.-এর খেলাফতের সূচনা থেকে হাজ্জাজের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত সময়কাল হলো ৭১ বছর ৯ মাস। -ফাতহুল বারী ৮/৬৯৪-৬৯৫

সহীহ বুখারী শরীফের অপর একটি বর্ণনায় আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন হেফয করেছে, ফলে সে কোরআন (সুন্দর ও সাবলীলভাবে) তেলাওয়াত করে, সে সম্মানিত ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি আটকে আটকে কষ্ট করে করে কোরআন তেলাওয়াত করে, সে দু'টি সওয়াব লাভ করবে। (একটিতেলাওয়াতের সওয়াব, অপরটি কষ্ট করার সওয়াব)। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪৯৩৭, মাআরেফুল হাদীস ৫/৮৫-৮৬। এ হাদীসের কোনো কোনো সূত্রে حافظ له-এর জায়গায় ماهر به বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৯৮

বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে কোরআন তেলাওয়াত ও তা মুখস্থ করার গুরুত্ব ও ফযীলত এবং কোরআনধারকদের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে উম্মতকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নিচের ঘটনাটিতে এর আরো একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন :

ওহুদ যুদ্ধে যখন শহীদদের দাফন করা হচ্ছিল এবং প্রতিটি কবরে দু'জন করে শহীদকে রাখা হচ্ছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামেলীনে কোরআনদের (বুকে কোরআন ধারণকারীদের) এভাবে মর্যাদা দেন যে, শহীদদের মাঝে যার বেশি পরিমাণে কোরআন জানা ছিল, কবরে তাকে আগে রেখেছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৪৩, ১৩৪৫

এ ধরনের অনেক হাদীস এবং অন্যান্য আরো কারণ রয়েছে, যার ফলে সাহাবায়ে কেরাম রা. কোরআনের অন্যান্য হকসমূহ আদায় করার পাশাপাশি কোরআন হেফয করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী পূর্ণ কোরআন শরীফ হেফয করেছিলেন। আর পূর্ণ কোরআন হেফয না করলেও তার বড় একটা অংশ হেফয করেছেন, এমন সাহাবীদের সংখ্যা তো প্রথমোক্ত সাহাবাদের তুলনায় অনেক বেশি হবে।

বরকত লাভের আশায় নিম্নে হাফেয সাহাবায়ে কেরামের অতি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত একটি নামের তালিকা দেয়া হলো। যা বিভিন্ন হাদীস, রেওয়ায়াত এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও বক্তব্যের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। (আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আমাদের সন্তানদেরও 'হাফেযে কোরআনদের বরকতময় জামাতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.
২. হযরত সালেম মাওলা হুযায়ফা রা.
৩. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.
৪. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.
৫. হযরত যায়েদ বিন ছাবেত রা.
৬. হযরত আবু যায়েদ রা.
৭. হযরত আবুদ দারদা রা.
৮. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.
৯. হযরত ওমর রা.
১০. হযরত ওসমান রা.
১১. হযরত আলী রা.
১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.
১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.
১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.
১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.
১৬. হযরত হুযায়ফা রা.
১৭. হযরত আবু হুরায়রা রা.
১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব রা.
১৯. হযরত তামীম ইবনে আউস দারী রা.
২০. হযরত ওকবা ইবনে আমের রা.
২১. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত রা.
২২. হযরত আবু হালীমা মুআজ রা.
২৩. হযরত মুজাম্মে বিন জারিয়া রা.
২৪. হযরত ফাযালা বিন ওবায়দ রা.
২৫. হযরত মাসলামা বিন মাখলাদ রা.
২৬. হযরত আবু মুসা আশআরী রা.
২৭. হযরত আমর ইবনুল আস রা.
২৮. হযরত সা'দ বিন ওবাদা রা.
২৯. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা.

৩০. হযরত সাঈদ বিন ওবায়দ রা.
৩১. হযরত কায়স বিন আবী সাসা রা.
৩২. হযরত সাদ ইবনুল মুনযির রা.
৩৩. হযরত তালহা রা.
৩৪. হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা.
৩৫. হযরত আয়েশা রা.
৩৬. হযরত হাফসা রা.
৩৭. হযরত উম্মে সালামা রা.
৩৮. হযরত উম্মে ওয়ারাকা রা.
৩৯. হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.
৪০. হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা রা.। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৯৯, ৫০০৩, ৫০০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৬৪; ফাতহুল বারী ৮/৬৬৮-৬৭০; গায়াতুন নিহায়াহ ২/৩০৩, ৩৫৮

বস্তুত উল্লেখিত সংখ্যা হাফেয সাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত সংখ্যার খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ। এটি একেবারেই স্পষ্ট বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কী বিপুল পরিমাণ হাফেয ছিলেন, তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ হলো নবীযুগে বীরে মাউনার প্রসিদ্ধ ঘটনায় শাহাদাতবরণকারী কারী (কোরআনের হাফেয আলেম) সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। তেমনি আবু বকর রা.-এর খেলাফতের প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবীদের মধ্যে ৭০ জন হাফেয ছিলেন। –দেখুন: সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৯০, ৪০৯৬; ফাতহুল বারী ৮/৬৬৪, ৬৬৯-৬৭০

সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াল, হৃদয়বিদারক এ দুই ঘটনাতেই শহীদ সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল ১৪০ জন। আর এ দুটো তো হলো নবী যুগ এবং সিদ্দীকী যুগের ঘটনা। অথচ সাহাবায়ে কেরামের যুগ আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। এসব বিষয় সামনে রাখা হলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কী বিপুল সংখ্যক হাফেয ছিলেন, তা কিছুটা অনুমান করা যায়। والله أعلم

'তাদাব্বুর'সহ কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা এবং কোরআন পড়ে শিহরিত-আলোড়িত হওয়া

কোরআন মাজীদ হলো আল্লাহ তাআলার মহান কালাম। মুজিযাপূর্ণ ঐশী বাণী। যার ই'জায তথা অলৌকিকত্বের রয়েছে বহু দিক। একটি বিশেষ দিক হলো, তার মাঝে রয়েছে অতুলনীয় আকর্ষণ। যা পাঠকের আত্মাকে আকর্ষিত ও হৃদয়কে সম্মোহিত করে। তবে শর্ত হচ্ছে, তেলাওয়াত হতে হবে জীবন্ত ও উপলব্ধিপূর্ণ। জাগ্রত হৃদয় নিয়ে ও সজীব আত্মা থেকে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'আর যখন তাদের সামনে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁরা আপন রবেরই ওপর নির্ভর করে।' –সূরা আনফাল (৮) : ২

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

'আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী তথা এমন কিতাব, যার আয়াতগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, যার বিভিন্ন বিষয় পুনরাবৃত্ত, তা শ্রবণ করে যারা, তাদের রবকে ভয় করে তাদের লোম দাঁড়িয়ে যায় (ভীত-সন্ত্রস্ত হয়)। এরপর তাদের দেহ-মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।' –সূরা যুমার (৩৯) : ২৩

এক জায়গায় মুমিন বান্দাদের উৎসাহিত করা হয়েছে, তারা যেন কোরআন ও এর তেলাওয়াত দ্বারা নিজেদের মন ও হৃদয়কে আন্দোলিত ও শিহরিত করে। কারণ, এমন সুমহান গ্রন্থ তেলাওয়াত করেও প্রভাবিত ও শিহরিত না হওয়া হৃদয়ের কাঠিন্যের আলামত। ইরশাদ হয়েছে–

'ঈমানদারদের জন্য কি এখনো সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণ ও তার অবতীর্ণ করা সত্যের সামনে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? এবং তারা ওদের মতো হবে না, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে। এরপর ওদের ওপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলো। ফলে ওদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল।' –সূরা হাদীদ (৫৭) : ১৬

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে যে, আল্লাহর পবিত্র কালামের তাদাব্বুরপূর্ণ তেলাওয়াতের বিষয়ে তাঁরা কতটা যত্নবান ছিলেন। কোরআনের জীবন্ত তেলাওয়াতের মাধ্যমে হৃদয়কে সজীব ও আত্মাকে আলোকিত করার জন্য তাঁরা কেমন ব্যাকুল ছিলেন। তাই তো মুখের উচ্চারণ ও হৃদয়ের স্পন্দনে শিহরণ জেগে উঠত দেহ-মনে। আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় এবং মুহাব্বত ও ভালোবাসায় কম্পিত হতে থাকত হৃদয়। তাঁরা বিনয়, সম্মান ও আবেগ নিয়ে তারতীল ও চিন্তাভাবনার সাথে তেলাওয়াত করে যেতেন। আর ধীরে ধীরে তাঁদের হৃদয় উত্তপ্ত হয়ে উঠত, আর চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত।

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ জীবনে রয়েছে

এ-সংক্রান্ত অনেক ঘটনা। পাঠকদের সামনে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মাত্র ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এ থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর রাযি. ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। কোরআন তেলাওয়াতের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারতেন না। অজান্তেই চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ত। (মক্কায় থাকাবস্থায়) তিনি ঘরের আঙ্গিনায় নামাযের জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। নামাযে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তেলাওয়াত করতেন, মুশরিক মহিলারা এবং ছোট ছোট বাচ্চারা তাঁকে দেখার জন্য ভিড় জমাত এবং আবু বকর রা.-এর অশ্রুসিক্ত-আবেগপূর্ণ নামায ও তেলাওয়াত দেখে খুবই অবাক হতো। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৯২; মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৩

আবু রাফে রাহ. বলেন, একদিন ওমর রা.-এর পেছনে ফজরের নামায পড়ছিলাম। আমি ছিলাম সর্বশেষ কাতারে। ওমর রা. সেদিন সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন- قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

'আমি তো নিজের অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।' (সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৬) তখন এমনভাবে কান্নায় ভেঙে পড়লেন যে, শেষ কাতার থেকেও আমি তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩০৮; মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪২

হাসান বসরী রাহ. থেকে বর্ণিত, ওমর রা. রাতের বেলা তেলাওয়াতের সময় কখনো কখনো এত বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যেতেন। তখন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁকে ঘরে অবস্থান করতে হতো। ফলে লোকজন অসুস্থ মনে করে তাঁকে দেখতে আসত। -মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪২; হিশাম ইবনুল হুসাইন থেকেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। দেখুন: শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, ২/৩৬২

হযরত হাসান বসরী রাহ. বর্ণনা করেন, ওমর রা. একবার সূরা তূর-এর এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন- إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

'নিশ্চয় আপনার রবের আযাব সংঘটিত হবেই, তার কোনো প্রতিরোধকারী নেই।' -সূরা তূর (৫২) : ৭-৮

পড়ামাত্রই তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং কয়েক দিন যাবৎ ঘরেই পড়ে রইলেন। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩০৭

হযরত নাফে রাহ. বলেন, ইবনে ওমর রা. যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন-

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

'ঈমানদারদের জন্য কি এখনো সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর অবতীর্ণ করা সত্যের সামনে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? -সূরা হাদীদ (৫৭) : ১৬

তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন এবং বলে উঠতেন, بلى يا رب بلى! অবশ্যই হে প্রভু, অবশ্যই। -মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৩

ইবনে আবী মুলাইকা রহ. বলেন, একদিন হযরত ইবনে ওমর রা. সূরা وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ তেলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি এ আয়াতে পৌঁছালেন-

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'যেদিন সমস্ত মানুষ (হিসাব দেয়ার জন্য) বিশ্বজগতের রবের সামনে দাঁড়াবে।' -সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ৬ তখন তিনি হেঁচকি দিয়ে কাঁদা শুরু করলেন। ফলে আর সামনে বাড়তে পারলেন না। -মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৩

ইবনে আবী মুলাইকা রহ. বলেন, একবার ইবনে আব্বাস রাযি. এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

'মৃত্যুযাতনা নিশ্চিতরূপে আসবে। এ তা-ই, যা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছিলে।' -সূরা কাফ (৫০) : ১৯

তখন থেমে থেমে তিনি আয়াতটি তেলাওয়াত করতে লাগলেন, আর হেঁচকি দিয়ে কাঁদতে থাকলেন। -হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩২৭

ভাব-বিহ্বলতায় তন্ময় হয়ে একই আয়াত বারবার পড়তে থাকা

কোরআন মাজীদের ঐশী প্রভাবের একটি প্রকাশক্ষেত্র হলো, কোরআন তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াত করতে করতে অন্য ভুবনে হারিয়ে যায়। ফলে সে একই আয়াত বারবার পড়তে থাকে। সময়ের স্রোত কোন দিক দিয়ে বয়ে যায়, সে তাও অনুভব করতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তেলাওয়াতেও এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। -দেখুন- সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১০১০; সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৩৫০; ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩১৪; আততিবয়ান, নববী পৃ ১০৩

আর সাহাবায়ে কেরাম রা.-ও নবীজীর এ আদর্শের অনুসরণ করেছেন।

আবুল দুহা রাহ. বর্ণনা করেন, একবার হযরত তামিমে দারি রা. মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তেলাওয়াত করতে করতে সূরা জাছিয়ার এ আয়াতে পৌঁছালেন-

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

'যারা অসৎকর্ম করেছে ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদেরকে তাদের সমান করে দেব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, (ফলে) তাদের ও ওদের জীবন ও মৃত্যু হবে একই রকম? ওরা যে ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ।' –সূরা জাছিয়া (৪৫) : ২১

তখন তাঁর মাঝে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলো। সকাল পর্যন্ত বারবার তিনি এ আয়াতই তেলাওয়াত করতে থাকলেন, আর কাঁদতে থাকলেন। (এক বর্ণনায় এসেছে, সেই সাথে রুকু-সেজদাও করছিলেন)। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩১৪-৩১৫; মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৯; নাতায়েজুল আফকার ৩/১৯১-১৯২

হামযা রাহ. ছিলেন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর খাদেম। তিনি বলেন, একদিন আসমা রা. কোনো এক কাজে আমাকে বাজারে পাঠালেন। তিনি তখন সূরা তূর তেলাওয়াত করছিলেন এবং

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

'আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন।' –সূরা তূর (৫২) : ২৭ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। হামযা রাহ. বলেন, আমি বাজার থেকে ফিরে আসার পরও দেখি, তিনি এখনও সে আয়াতটিই পড়ছেন। –মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৯; ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩১৬; নাতায়েজুল আফকার ৩/১৯৩

কোরআন মাজীদে 'তাদাব্বুর' এবং তার দ্বারা আন্দোলিত ও আলোড়িত হওয়ার আরেকটি দিক

পবিত্র কোরআনে কারীমে বিভিন্ন ধরনের আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলার রহমত ও করুণা সংক্রান্ত আয়াত রয়েছে। আবার আযাব ও শাস্তি-সংক্রান্ত আয়াতও রয়েছে। তাতে জান্নাতের আলোচনা রয়েছে, জাহান্নামের অবস্থাও বিবৃত হয়েছে। মুমিন ও পুণ্যবান বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে কাফের ও মুনাফিকদের অবস্থাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে আলকোরআনে।

তাই কোরআনের সুচিন্তিত ও জাগ্রত তেলাওয়াতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার কারণে পাঠকারী ব্যক্তির মুখের উচ্চারণ ও মনের অবস্থায়ও পার্থক্য ঘটবে। জাহান্নামের আযাব-সংক্রান্ত আয়াত তেলাওয়াতের সময় হৃদয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। নিজের গুনাহের জন্য তাওবা ও ইস্তেগফার করবে। আর আল্লাহ তাআলার দয়া ও দান-সংক্রান্ত আয়াত পাঠকালে দেহ ও আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হবে এবং জান্নাতের নেয়ামতরাজি লাভের দোয়া করবে। তেমনি মুমিন ও মুত্তাকি বান্দাদের গুণাবলি পাঠকালে সেসব গুণাবলি অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। আর কাফের ও মুনাফিকদের অবস্থা পাঠকালে সেসব অবস্থা থেকে বিরত থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প করবে। মোটকথা, কোরআনের সুচিন্তিত তেলাওয়াতের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতের চাহিদা ও আবেদন অনুযায়ী নিজেকে আলোড়িত ও স্পন্দিত করে তুলবে। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন– وحركوا به القلوب

অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে হৃদয়কে আলোড়িত ও স্পন্দিত করে তুলবে।

কোরআনে কারীম তেলাওয়াতের সময় এভাবে আলোড়িত হওয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ এবং একটি সুন্নত। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন, অনেক সময় আমি নবীজির পেছনে সারারাত নামায পড়তাম। তিনি নামাযের মধ্যে সূরা বাকারা, আলে ইমরান এবং নিসাসহ লম্বা লম্বা সূরা তেলাওয়াত করতেন। শাস্তি ও ভীতি-সংক্রান্ত আয়াত পাঠকালে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইতেন। আর সুসংবাদ-সংক্রান্ত আয়াত পাঠকালে তা লাভের জন্য দোয়া করতেন। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩১৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৪৬০৯; ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর পৃ. ১২৪; নাতায়েজুল আফকার ৩/১৫৫

হাদীসের কিতাবাদিতে এ-সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনা আছে।

সাহাবায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে অনুসরণ করেছেন। নিচের ঘটনাগুলো থেকে তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

হযরত মুসা ইবনে আনাস রাহ. আপন পিতা আনাস রা.-এর অভ্যাস বর্ণনা করেন, কোরআন তেলাওয়াতের সময় দোযখ-সংক্রান্ত কোনো আয়াত পাঠ করলে তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহর কাছে দোযখ থেকে পানাহ চাইতেন। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩১৩

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসেম রাহ. বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, সূরা কিয়ামাহ তেলাওয়াত করার সময় যখন কোনো ব্যক্তি–

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

'তিনি (আল্লাহ) কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?' (সূরা কিয়ামাহ (৭৫) : ৪০) পড়বে, তখন উত্তরে বলবে, بلى (অবশ্যই! হে আমার

প্রতিপালক! আপনি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম।) তেমনি সূরা মুরসালাতের فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

'অতএব এর (কোরআনের) পর আর কোন কথার প্রতি তাঁরা ঈমান আনবে!' (সূরা মুরসালাত (৭৭) : ৫০) পাঠকালে বলবে, آمنت بالله وما أنزل (আমি আল্লাহ ও তাঁর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি)। সূরায়ে তীনের শেষ আয়াত– أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

'আল্লাহ কি সকল বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?' (সূরা তীন (৯৫) : ৮) পাঠকালে বলবে, بلى (অবশ্যই হে প্রতিপালক, অবশ্যই!) –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩২০-৩২১

একটি মারফু হাদীসেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। –দেখুন: সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৮৭; জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৩৪৭। وقال النووي : إسناده ضعيف আততিবয়ান, নববী পৃ. ১৩৮

প্রবন্ধের এ অংশ 'সাওয়ানেহে আবদুল কাদের রায়পুরী রহ.' নামক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে শেষ করছি। এ উদ্ধৃতির শেষে সেই দোয়া বিবৃত হয়েছে, যা প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ের ধ্বনি।

'(হযরত রায়পুরী রাহ. আপন শায়খ হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী রাহ.-এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন)– আমি হযরতকে নির্জন রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ তেলাওয়াত করতে দেখেছি। যখন আযাবের আয়াত আসত তখন কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতেন। আর যখন রহমতের আয়াত আসত, তখন খুশিতে উল্লাসিত হয়ে যেতেন। কখনো কোরআনের ঐশী আকর্ষণে আশ্চর্য নীরবতা ছেয়ে যেত তাঁর ওপর।

(খোদ রায়পুরী রাহ.-এর অবস্থা একজন নির্ভরযোগ্য খাদেম এভাবে বর্ণনা করেন যে,) হযরত সুস্থ থাকা অবস্থায় রমযান মাসে আসরের পর নির্জনে বসে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। সেখানকার একজন অধিবাসী বলেন, কোরআন তেলাওয়াত অবস্থায় একদিন আমি হযরতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন হযরতের হালত ও কাইফিয়াত দেখে নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে এ দোয়া বেরিয়ে গেল– হে আল্লাহ! এভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার পরম সৌভাগ্য আপনি আমাদেরকেও দান করুন। –সাওয়ানেহে মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রায়পুরী রাহ., আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. পৃ. ৩৭-৩৮, ৬১

কোরআনের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ এবং জীবনে কোরআনী বিধি-বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন

'কোরআনের সাথে সম্পর্ক-এ ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের অত্যন্ত উজ্জ্বল দিক হলো, কোরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্য এবং আপন জীবনে কোরআনী আদর্শ ও বিধানাবলির পূর্ণ বাস্তবায়ন।

পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানব-জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। জীবনের প্রতিটি অঙ্গন ও প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য এতে রয়েছে পথনির্দেশনা ও সুস্পষ্ট বিধিবিধান। তাই সাহাবায়ে কেরাম কোরআনকে জীবন-বিধান হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। নিজেদের জীবনে ধারণ করেছিলেন কোরআনের আদর্শ। তাঁদের নিকট কোরআন নিছক এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না, যাকে গিলাফে জড়িয়ে রেখে দেয়া হবে এবং শুধু তার স্পর্শ গ্রহণ করে বরকত নেয়া হবে কিংবা কালেভদ্রে কখনো শুধু তেলাওয়াত করেই ক্ষান্ত থাকা হবে; বরং সাহাবায়ে কেরাম কোরআনকে –পবিত্র ঐশী গ্রন্থ হওয়ার পাশাপাশি– শাহী ফরমান মনে করতেন, যা মহান আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন। এ ফরমানের অনুসরণ করা, এর বিধানাবলি জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং এতে বর্ণিত উপদেশ থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়া-এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার মূল উদ্দেশ্য।

কোরআনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, কোরআন অনুযায়ী আমল করার কী অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করতেন, তা তাঁদের বক্তব্য দ্বারাই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নিম্নে তাদের কিছু বাণী ও বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

১. আবু কিনানা রাহ. বলেন, একবার হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বহু সংখ্যক হাফেযে কোরআনকে একত্র করলেন এবং তাদের সামনে কোরআনে কারীমের বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য তুলে ধরে বললেন– কোরআন তোমাদের জন্য আখেরাতের সওয়াব ও শান্তি লাভের মাধ্যমও হতে পারে কিংবা বিপদ ও শাস্তির কারণও হতে পারে। তাই (কোরআনকে যদি রহমত ও করুণা লাভের মাধ্যম বানাতে চাও, তাহলে) এর পূর্ণ অনুসরণ কর। এমন যেন না হয় যে, কোরআন তোমাদের অনুগামী হয়ে থাকল। (অর্থাৎ কোরআনকে নিজেদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলে, তার বিধান লঙ্ঘন করলে কিংবা অসৎ উদ্দেশ্যে কোরআনকে ব্যবহার করলে)। মনে রেখো, যে ব্যক্তি কোরআনের পূর্ণ অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কোরআনকে তার অনুগামী বানাবে, তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –আখলাকু হামালাতিল কোরআন, আজুররী, ২০, হাদীস ৩; সুনানে দারেমী, হাদীস

৩৩৩১: হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৩২৩, হাদীস ৮৫৭

২. প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, কোনো কোনো বিশিষ্ট সাহাবীও পূর্ণ কোরআনের হাফেয ছিলেন না, বরং তার সামান্য অংশই তাঁদের মুখস্থ ছিল। তবে সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোরআনের পূর্ণ অনুসরণ এবং সে অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য তাদের নসীব হয়েছিল। কিন্তু এ উম্মতের পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থা এই হবে যে, তাদের জন্য কোরআন (তেলাওয়াত ও হেফয করা তো) সহজ হবে এবং শিশু ও অনারব লোকেরাও তা মুখস্থ করে ফেলবে। কিন্তু কোরআন অনুযায়ী আমল করা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। –আখলাকু হামালাতিল কোরআন, ৪৯, হাদীস ২৬; তাফসীরে কুরতুবি ১/৬৯ আবু বকর আনবারীর সূত্রে

৩. বশীর ইবনে আবু আমর খাওলানী রাহ. বর্ণনা করেন, ওয়ালীদ ইবনে কায়েস হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.কে বলতে শুনেছেন, এই উম্মতের কিছু লোক কোরআন পড়বে, কিন্তু কোরআন তাদের হলকের নিচে নামবে না। (অর্থাৎ কোরআন অনুযায়ী আমলের সৌভাগ্য তাদের হবে না)। তিনি আরো বলেন, কোরআন পাঠকারীরা তিন প্রকারে বিভক্ত হবে: ১. মুনাফিক, ২. ফাসিক ৩. মুমিন।

বশীর ইবনে আবু আমর বলেন, আমি ওয়ালীদকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ তিন প্রকারের ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেন, মুনাফিক হলো, যারা বাহ্যিকভাবে কোরআন পড়লেও প্রকৃতপক্ষে তার (বিধি-বিধানকে) অস্বীকারকারী হবে। (বর্তমানে ইসলামের দাবিদার বাতিলপন্থীদের এবং কোরআনের বিকৃতি সাধনকারীদের অবস্থা এমনই)। আর ফাসিক হলো, যারা কোরআন দ্বারা সম্পদ অর্জন করবে এবং দুনিয়া কামাবে। আর মুমিন হলো, যারা (শুধু কোরআন তেলাওয়াতই করবে না, বরং) কোরআন অনুযায়ী আমলও করবে। –আখলাকু হামালাতিল কোরআন পৃ. ৫১-৫২

৪. আবু কিলাবা রাহ. বর্ণনা করেন, একবার কুফার জনৈক অধিবাসী আবুদ দারদা রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, কুফায় অবস্থানকারী আপনার দ্বীনি ভাইয়েরা আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং আপনার নিকট থেকে কিছু নসীহত শুনতে চেয়েছে। আবুদ দারদা রাযি. তখন বললেন, আমার পক্ষ থেকেও তাদের প্রতি সালাম জানিয়ে বলো, তারা যেন গুরুত্ব সহকারে কোরআনের অনুসরণ করে এবং কোরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করে। নিশ্চয় কোরআন তাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাবে এবং জুলুম ও অন্যায় থেকে দূরে রাখবে। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু ওবায়দ ১/২৫৭; সুনানে দারেমী, হাদীস ৩৩২৩

৫. হিব্বান ইবনে আবদুল্লাহ সাদুসি রাহ. বলেন, একবার জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আলবাজালী বসরায় আগমন করেন। যাওয়ার সময় আমরা 'হিসনুল মাকাতিব' নামক স্থান পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসি। বিদায় বেলায় আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী! আমাদের কিছু নসীহত করুন! (তিনি তখন আমাদেরকে দীর্ঘ নসীহত করলেন এবং দিক-নির্দেশনামূলক অনেক কথার সাথে এও বললেন) কোরআনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। কোরআনের সাথে আত্মার সম্পর্ক গড়ে তোল। কোরআন হলো দিনের বেলার পথপ্রদর্শক এবং অন্ধকার রাতের আলো। তাই দুঃখ ও দারিদ্র্য যে অবস্থাতেই থাক না কেন, কোরআনের অনুসরণ কর। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু ওবায়দ ১/২৬২

৬. আমের ইবনে মাতার রাহ. বলেন, একদিন হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. আমাকে বললেন, কোরআনের নির্দেশিত পথ বাদ দিয়ে মানুষেরা যখন মন মতো একেক জন একেক পথে চলবে, তখন তুমি কী করবে? কার সঙ্গ গ্রহণ করবে? উত্তরে বললাম, আমি মৃত্যু পর্যন্ত কোরআনের সঙ্গ গ্রহণ করব। কোরআনকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকব। তখন হোযায়ফা রাযি. বললেন, তোমার এমনই করা উচিত। তোমার এমনই করা উচিত। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু ওবায়দ ১/৩০৩

৭. আবু হাশেম বর্ণনা করেন, হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. বলেছেন, তোমাদের কোরআন তেলাওয়াত তখনই (পরিপূর্ণরূপে) গ্রহণযোগ্য হবে, যখন কোরআন তোমাদেরকে (অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে) বিরত রাখবে। যদি এমন না হয়, তবে (যেন) তোমরা কোরআন তেলাওয়াতই করনি। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু ওবায়দ ১/৩০৫

অর্থাৎ কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত সওয়াবের কাজ। তবে কোরআনের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কোরআন যে সব বিষয় নিষেধ করেছে, তা থেকে যদি বিরত না থাকা হয় তাহলে তেলাওয়াতের সার্থকতা কোথায়?

কোরআনের সাথে এ আচরণই ছিল সাহাবায়ে কেরামের। তাঁরা নিশ্চিত জানতেন, আত্মার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য কোরআনের হেদায়েতের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, কোরআন

নিজেই নিজের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছে–

قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

'হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে– উপদেশ, অন্তর-ব্যাধির প্রতিকার এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত (অর্থাৎ এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ কিতাব এসেছে)। আপনি বলুন, আল্লাহর ফজলে ও তাঁর মেহেরবানিতে (এসেছে)। অতএব এতেই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তা তাদের সঞ্চিত বস্তু থেকে উত্তম।' –সূরা ইউনুস (১০) : ৫৭-৫৮

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনদের গুণ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

'ঈমানদারদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের কথা এ-ই হয় যে, আমরা শুনলাম ও মানা করলাম।' –সূরা নূর (২৪) : ৫১

অর্থাৎ একজন প্রকৃত মুসলমানের গুণ হলো, যখন কোনো ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ডাক আসে, তখন সে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে سمعا وطاعة ('শ্রুত আদেশ শিরোধার্য') বলে সাথে সাথে সেই ডাকে সাড়া দিতে এবং হুকুম মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এতেই রয়েছে তার মঙ্গল, কল্যাণ ও প্রকৃত সাফল্য। –ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ৪৭৬ উপরোল্লিখিত আয়াত সংশ্লিষ্ট তাফসীরী হাশিয়া

কোরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের কেমন সম্পর্ক ছিল, বিশেষত কোরআনের অনুসরণ ও তার হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ কী ছিল– এককথায় আমরা যদি তা প্রকাশ করতে চাই, তাহলে বলতে হবে, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন سمعنا واطعنا, (নির্দেশ শুনেছি ও শিরোধার্য করে নিয়েছি)– এ আয়াতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। নিম্নে তাঁদের আদর্শ জীবন থেকে এমন কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উল্লেখ করা হলো, যার প্রতিটিতেই শোনা যায় (سمعا وطاعة) এর সেই মধুর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি!

সূরা আলে ইমরানের আয়াত এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল করার জযবা

সূরা আলে ইমরানের একটি বিখ্যাত আয়াত–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলো, যার তরজমা হচ্ছে– তোমরা কখনো (পরম) পুণ্য হাসিল করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯২) তখন সাহাবায়ে কেরাম বেছে বেছে নিজেদের প্রিয় জিনিসগুলো দান করার জন্য নবীজির দরবারে পেশ করতে লাগলেন।

হযরত আনাস রা. বলেন, মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহা রা. ছিলেন সবচেয়ে সম্পদশালী। মসজিদে নববীর পাশেই 'বাইরাহা' নামে তাঁর একটি বাগান ছিল। মাঝে মাঝে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বাগানে গিয়ে কূপের মিষ্টি পানি পান করতেন। এ বাগানটি ছিল খুবই মূল্যবান এবং আবু তালহা রা.-এর অতি প্রিয়। উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নবীজির কাছে এসে বললেন, আমার সম্পদের মধ্যে 'বাইরাহা' আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাই এটিকেই আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, বাগানটি অনেক মূল্যবান। তাই আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে, তোমার আত্মীয়দের মাঝেই তা বণ্টন করে দাও। আবু তালহা রা. তখন সে বাগানটি তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২৪৩৮; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/১০৮

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর একজন রোমান বাঁদি ছিল। বিভিন্ন কারণে তিনি সে বাঁদিটিকে খুব পছন্দ করতেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দেন। –কাশফুল আসতার আন যাওয়ায়েদিল বাযযার, হাদীস ২৯১৪; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/১০৯

হযরত আবুদ দাহদাহ রা.-এর অতি মূল্যবান বাগান সদকা করে দেয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত নাযিল হলো–

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তমরূপে ঋণ দেবে? এর তিনি তাঁর জন্য তা কয়েক গুণ করে দেবেন এবং সে লাভ করবে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান।' –সূরা হাদীদ (৫৭) : ১১

তখন আবুদ দাহদাহ রা. নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা কি চান, আমরা তাঁকে করয দিই! নবীজি বললেন, হ্যাঁ, আবুদ দাহদাহ। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাত বাড়িয়ে দিন।

নবীজি হাত বাড়ালে তিনি বললেন, আমি আমার বাগান আল্লাহকে করয দিলাম (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলাম)। সে বাগানে ছয়শ খেজুরের গাছ ছিল। –সুনানে সাঈদ ইবনে মনসুর, হাদীস ৪১৭; মুজামে কাবীর, তাবারানী, ২২/৩০১; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ২০৩৩, তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২/৪১৬, ১৩/৪১৫

সুবহানাল্লাহ! কোরআন অনুসরণের কী চমৎকার ঘটনা! কী অনুপম দৃষ্টান্ত! একটি আয়াতের ওপর আমল করার জন্য ছয়শ গাছবিশিষ্ট বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান!

কোরআনের পর্দা-বিধান পালনে নারী সাহাবীদের অতুলনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা

কোরআনের বিধান পালন এবং নিজ জীবনে তা বাস্তবায়নের প্রতি আনসারী মহিলাদের ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। তাঁদের এ গুণের কথা উল্লেখ করে হযরত আয়েশা রা. বলেন, কোরআনে অবতীর্ণ বিধানসমূহের ওপর আমলের ক্ষেত্রে আনসারী মহিলাদের মতো এত বেশি আগ্রহী আমি আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহ তাআলা পর্দা বিষয়ে এ আয়াত নাযিল করলে– وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

'আর তারা (নারীরা) যেন নিজেদের ওড়না আপন বক্ষদেশের ওপর ফেলে রাখে।' –সূরা নূর (২৪) : ৩১

আনসারী সাহাবীগণ ঘরে গিয়ে নিজ নিজ স্ত্রী, কন্যা, বোন ও নিকটাত্মীয়দেরকে সেই বিধানের কথা জানালেন। তখন তাঁরা (নতুন ও সুপ্রশস্ত ওড়নার ব্যবস্থা হওয়ার অপেক্ষা না করে) নিজেদের কাছে থাকা (মোটা) চাদরগুলোকেই ফেড়ে ওড়না বানিয়ে নিলেন এবং সেগুলো দ্বারা শরীর আবৃত করে নিলেন। –তাফসীরে ইবনে কাছীর: ১০/২১৯; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম: ৮/২৫৭৫, হাদীস ১৪৪০৬

পুরুষ সাহাবীদের মতো নারী সাহাবীগণও কোরআনের বিধান পালনের প্রতি কী পরিমাণ যত্নবান ও আগ্রহী ছিলেন, এ ঘটনাটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সূরা হুজুরাতের আয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের বিস্ময়কর অবস্থা

সূরায়ে হুজুরাতের শুরুতেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

'হে ঈমানদারগণ! নিজেদের আওয়াজ নবীজির আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তাঁর সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বলো না, যেরূপ তোমরা পরস্পরের সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বল; যাতে তোমাদের আমল তোমাদের অজান্তে নিষ্ফল না হয়ে যায়।' –সূরা হুজুরাত (৪৯) : ২

এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরামের যে অবস্থা হয়েছিল তা বিস্ময়কর! হযরত আবু বকর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! খোদার কসম, একজন অপরজনের সাথে যেভাবে চুপিসারে কথা বলে, এখন থেকে আমি আপনার সাথে সেভাবে কথা বলব। –তাফসীরে ইবনে কাছীর: ১৩/১৩৯ মুসনাদে বাযযারের সূত্রে

হযরত ওমর রা. রাসূলের সাথে এত নিম্নস্বরে কথা বলা শুরু করলেন যে, অনেক সময় (বুঝতে না পারার কারণে) পুনরায় জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৪৫

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ছাবেত বিন কায়স বিন শাম্মাস রা.-এর ঘটনাটি ছিল বড় বিস্ময়কর ও উপদেশপূর্ণ। তাঁর ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে কোরআনের বিধানের প্রতি কী পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। কোরআনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করে জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাই কি না-এ ভয়ে তাঁরা থাকতেন ভীত-সন্ত্রস্ত!!

স্বভাবগতভাবেই হযরত ছাবেত বিন কায়স রা.-এর আওয়াজ ছিল একটু উঁচু। তাই কথা বলার সময় অজান্তেই তাঁর আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। সূরা হুজুরাতের এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। (এমনকি ভীতির কারণে নবীজির দরবারে পর্যন্ত যাওয়া ছেড়ে দিলেন!) কয়েক দিন তাঁকে না দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে বললেন, ছাবেত অসুস্থ নাকি? তাকে দেখছি না যে কয়েক দিন। সে সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাবো।

তিনি তখন ছাবেত রা.-এর ঘরে গিয়ে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ছাবেত রা. বললেন, আমার অবস্থা তো খুবই খারাপ। আমি তো রাসূলুল্লাহর সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলতাম। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন (এরপর তিনি ওপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।) তাই আমার সব আমল বরবাদ হয়ে গেছে! আমি তো জাহান্নামী হয়ে গেছি!!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব অবস্থা জেনে সেই সাহাবীকে আবার ছাবেত রা.-এর কাছে এই বলে পাঠালেন, না, তুমি তো বরং

জান্নাতী। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৪৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৭-১৮৮

সূরা নূরের আয়াত ও সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রা.-এর আনুগত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত

হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি অপবাদের ঘটনা প্রচারে না জেনে কিছু সরলমনা মুসলমানও জড়িয়ে পড়েছিল। মিসতাহ ইবনুল আছাছাহ তাদের একজন। (তিনি মুহাজির ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী। এ ঘটনায় তাঁর পদস্খলন ঘটে। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি এ থেকে তওবা করেছেন।)

মিসতাহ রা. ছিলেন আবু বকর রা.-এর আত্মীয়। তিনি গরিব ছিলেন। তাই আবু বকর রাযি. বিভিন্ন সময় তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। আয়েশা রা.-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় স্বভাবতই আবু বকর রাযি. খুবই কষ্ট পান এবং কসম করে বসেন, ভবিষ্যতে কখনো মিসতাহকে সাহায্য করবেন না। তখন সূরা নূরের এ আয়াত নাযিল হয়–

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এ মর্মে কসম না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবীদেরকে ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে দান-খয়রাত করবে না; বরং তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ্ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' –সূরা নূর (২৪) : ২২

আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যখন আয়াতটি শুনলেন, যার শেষে বলা হয়েছে– أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

'তোমরা কি চাও না, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন?' তখন সাথে সাথে বলে উঠলেন–

بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا.

(অবশ্যই! অবশ্যই! আপনার কসম হে প্রতিপালক! আমরা অবশ্যই কামনা করি, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দেন!)

আর আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও দয়া লাভের আশায় কষ্টদানকারী মানুষটিকে সাথে সাথে ক্ষমা করে দিলেন। পুনরায় আর্থিক সাহায্য চালু করে দিয়ে সবসময় তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে দিলেন। رضي الله عنه وأرضاه (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।)

কোরআনের হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনুপম দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে! হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকেও অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

কোরআন মাজীদে মদের ব্যাপারে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে সূরা মায়েদার এ আয়াতগুলো–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, পূজার বস্তু ও জুয়ার তীর– (সবই) অপবিত্র, শয়তানের কাজ। অতএব এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান এ-ই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা কি (তা থেকে) বিরত হবে?' –সূরা মায়িদা (৫) : ৯০-৯১

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে মদ হারাম হওয়ার ঘোষণা করে মদ থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে। আরবে তখন মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুগ যুগ ধরে মদ তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম এ বিধানের প্রতি আনুগত্যের যে বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, ইতিহাসে এর কোনো নজির পাওয়া যাবে না।

ওপরের আয়াতগুলোর শেষে বলা হয়েছে– فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (তোমরা কি মদপান থেকে বিরত হবে?) হযরত ওমর রা. আয়াতটি শোনামাত্রই বলে উঠলেন, انتهينا انتهينا হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা বিরত হলাম। আমরা বিরত হলাম। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৩৭৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭০

হযরত আনাস রা. এক মজলিসে মদ পান করাচ্ছিলেন। হযরত আবু তালহা রা., আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা., উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর মতো বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এরই মধ্যে তাঁদের কাছে মদ হারাম হওয়ার সংবাদ পৌঁছাল। সংবাদ পৌঁছামাত্রই সবাই মদপান বন্ধ করে আনাস রা.-কে পাত্রে অবশিষ্ট মদ ফেলে দিতে বললেন। (কোনো কোনো বর্ণনায়) মদের পাত্রগুলোকেও ভেঙে ফেলার কথা বর্ণিত হয়েছে। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৩৩৭৬; সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৬৪; তাফসীরে তাবারী ১০/৫৭৮, হাদীস ১২৫২৭

হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, এক মজলিসে

কিছু সাহাবী মদের পেয়ালায় ঠোঁট লাগিয়েছেন, ঠিক এমন সময় তাদের কাছে মদ হারাম হওয়ার সংবাদ পৌঁছাল। সাথে সাথে তাঁরা মদের পেয়ালা দূরে নিক্ষেপ করলেন, আর فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ-এর জবাবে বলে উঠলেন, انتهينا ربنا (অর্থাৎ আমরা বিরত হয়ে গেছি হে আমাদের প্রতিপালক।) –তাফসীরে তাবারী, ১০/৫৭২, হাদীস ১২৫২৩; তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৫/৩৪৫

বস্তুত অবনত মস্তকে কোরআনের হুকুম মেনে নেয়ার এমন অসংখ্য ঘটনায় পূর্ণ সাহাবায়ে কেরামের জীবন। নমুনাস্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের এমন বিস্ময়কর অবস্থা ও অনুপম ঘটনাবলির কারণেই তাঁদের কোরআনী যিন্দেগীর চিত্রায়ন করতে গিয়ে হাসান বসরী রাহ. বলেছেন–

إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار

অর্থাৎ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা (সাহাবায়ে কেরাম) কোরআনকে খোদায়ী ফরমান ও ইলাহী পয়গাম মনে করতেন। এজন্য রাতের বেলা তাঁরা কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং এর গভীর মর্ম নিয়ে ভাবতেন। আর দিনের বেলা (কোরআনের বিধি-বিধান) নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। –আততিবয়ান, নববী, পৃ. ৭২

যদি কোনো অনুগত গোলামের কাছে তার মনিব পত্রযোগে কোনো ফরমান পাঠায়, তাহলে সে ফরমানের সাথে গোলামের আচরণ কেমন হবে! উত্তর স্পষ্ট। এ গোলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে পত্র পড়বে। তাতে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ নিয়ে ভাববে এবং তা বাস্তবায়নে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবে। হযরত হাসান বসরী রাহ. বলেন, কোরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের আচরণ এমনই ছিল। যার সামান্য কিছু ঝলক আমরা আগের পৃষ্ঠাগুলোতে দেখেছি।

কোরআন মাজীদের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক, আত্মিক ভালোবাসা এবং কোরআনী আহকামের পূর্ণ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ফলে সাহাবায়ে কেরাম রা. দুনিয়াতেই সেই প্রশান্তি, সৌভাগ্য ও সফলতা লাভ করেছিলেন; হাদীস শরীফে যার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– আল্লাহ তাআলা এ পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে অনেককে সম্মানিত করবেন, আর অনেককে করবেন অপদস্থ। –সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৮১৭

হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'কোরআন মাজীদ বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ঐশী ফরমান এবং অঙ্গীকারপত্র। কোরআনের আনুগত্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। আর কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ। অতএব আল্লাহ তাআলার ফায়সালা হলো, যে জাতি কোরআনকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে তার অনুসরণ করবে এবং কালামুল্লাহ হিসেবে তার যেসব হক রয়েছে সেসব হক আদায় করবে এবং কোরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখবে– আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে মর্যাদাবান করবেন। এর বিপরীতে যে জাতি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের বাহ্যিক উন্নতি আকাশছোঁয়া হলেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অপদস্থ করবেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের দীর্ঘ ইতিহাস এ হাদীসের সত্যতার জ্বলন্ত সাক্ষী।' –মাআরেফুল হাদীস ৫/৮২

কোরআন মাজীদ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের কিছু বাণী, কিছু অনুভব-অনুভূতি

সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন সেই পুণ্যময় জামাত, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতপূর্ণ সোহবত এবং দ্বীনের সাহায্য ও নুসরতের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন। পবিত্রাত্মা ও ফেরেশতা-সিফাতের অধিকারী এ মানুষগুলোর সামনেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনের সর্বপ্রথম সম্বোধন লাভের মহাসৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁরাই।

কোরআনের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা, কোরআনের তেলাওয়াত ও তাদাব্বুর, কোরআন পড়ে পুলকিত ও শিহরিত হওয়া, কোরআন হেফয করা, সর্বোপরি কোরআনের অনুসরণ-অনুকরণ এবং তার বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ও আদর্শ কেমন ছিল– বিভিন্ন ঘটনার আলোকে তার অতি সংক্ষিপ্ত কিছু নমুনা ও চিত্র ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রবন্ধের এ পর্যায়ে কোরআন মাজীদ সম্পর্কে তাঁদের কিছু মূল্যবান বাণী ও বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে কোরআনের ব্যাপারে তাঁদের অনুভব-অনুভূতি, ভালোবাসা ও হৃদয়ের আকুতি কেমন ছিল– তা যেমন বোঝা যাবে, পাশাপাশি কোরআনের সঠিক মূল্য, অপরিসীম গুরুত্ব, কোরআনের বাহকগণের মর্যাদা, তাদের আখলাক ও গুণাবলী কেমন হওয়া চাই, মানুষের উপর কোরআনের হক ও দাবি কী কী, সে দাবি পূরণকারীদের ব্যাপারে ঐশী সুসংবাদ এবং এ ব্যাপারে অবহেলাকারীদের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়গুলোও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কোরআন আল্লাহর মহানেয়ামত এবং উপকারী জ্ঞানের ভাণ্ডার

আবু ইসহাক রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, কোরআন হচ্ছে (আল্লাহ তাআলার সেই মহানেয়ামত, যার) প্রতিটি আয়াত আসমান ও যমীনের সব কিছু থেকে অধিক মূল্যবান ও উত্তম। –ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ১৬২; ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৪২

মুররা ইবনে শারাহীল রাহ. বলেন, ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, তোমরা যদি উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করতে চাও, তাহলে কোরআন মাজীদে তা সন্ধান কর। কারণ, তা পূর্বাপর সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৭৬, মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৭৪, ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ১৬২ তাবারানীর সূত্রে

কোরআন মাজীদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং কল্যাণ ও বরকত

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, সে ঘরে কল্যাণ ও বরকতের বারিধারা নেমে আসে। প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ আসে। সেখানে ফেরেশতা আগমন করে, আর শয়তান পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় না, সে ঘর তার বসবাসকারীদের জন্য সঙ্কীর্ণ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ সেখান থেকে বরকত চলে যায় এবং সেখানে ফেরেশতাদের পরিবর্তে শয়তান উপস্থিত হয়। –আযযুহদ, ইবনুল মুবারক, হাদীস ৭৩৯

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নিঃসন্দেহে কোরআন হলো مأدبة الله তথা আল্লাহ তাআলার দস্তরখান। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে মানুষের কল্যাণ ও সফলতার সমস্ত উপকরণ একত্র করে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন কোনো ব্যক্তি দস্তরখানে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে লোকজনকে তা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়)। যে ব্যক্তি এ খোদায়ী দস্তরখানে অংশগ্রহণ করবে (এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হবে) সে অবশ্যই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। –আযযুহদ, ইবনুল মোবারক, হাদীস ৭৩৬; মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ ১৭৪

কোরআন থেকে মূল্যবান আর কিছু নেই

ইসমাঈল ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেছেন, কোরআনের হাফেয এবং তা সুন্দরভাবে তেলাওয়াতকারী যদি সম্পদ ইত্যাদি পার্থিব নেয়ামত লাভকারী কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভাবে যে, তাকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে তা অধিক উত্তম, তাহলে সে মূলত আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদাবান বস্তুর অবমাননা করল। আর আল্লাহ তাআলার কাছে অপদস্থ ও তুচ্ছ বস্তুকে মূল্যবান মনে করল। –আযযুহদ, ইবনুল মুবারক পৃ. ২৭৫, হাদীস ৭৯৯; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, ৪/১৭৭, হাদীস ২৩৫২

কোরআনের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও ফযীলত এবং তার পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্বন্ধে মূল্যবান, জ্ঞানগর্ভ একটি বাণী

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফেতনা অনাগত। আর কিতাবুল্লাহ হচ্ছে তার (অকল্যাণ) থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। এতে রয়েছে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলি ও ভবিষ্যতে ঘটমান বিষয়ের আগাম বার্তা। (অর্থাৎ আমল ও আখলাকের ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতে যে ফলাফল প্রকাশ পাবে, সে সম্পর্কে আগাম বার্তা কোরআনে দিয়ে দেয়া হয়েছে)।

তোমাদের মাঝে বিবাদমান বিষয়গুলোতে (এবং সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ে) কোরআনই ফয়সালাকারী। এতে অযাচিত কোনো বিষয় নেই। যে অহঙ্কারী ব্যক্তি কোরআন ছেড়ে দেবে, এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, আল্লাহ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর যে কোরআন ছাড়া অন্য কোথাও হেদায়াত অনুসন্ধান করবে, সে শুধু গোমরাহিই লাভ করবে।

কোরআন হলো حبل الله المتين অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার সুদৃঢ় মাধ্যম, মজবুত উপদেশবার্তা, সরল পথের সন্ধানদাতা। কোরআনই (সেই অমোঘ সত্য) যার (অনুসরণ করার) দ্বারা চিন্তা-চেতনা বক্রতা থেকে মুক্তি পায়। কেউ এর বিকৃতি-সাধন করতে পারবে না। (কারণ, আল্লাহ তাআলাই এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন) এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা এর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কখনো পরিতৃপ্ত হবে না। (অর্থাৎ কোরআনের সকল জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছি, কখনো এমন অনুভূতি তাদের মাঝে সৃষ্টি হবে না)। অধিক ব্যবহারের দ্বারাও এটি পুরাতন হবে না। (বরং যতই তেলাওয়াত করা হবে, ততই স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হবে)। আর কোরআনের রহস্য (গভীর মর্ম ও তত্ত্ব) কখনো শেষ হবে না।

এ হচ্ছে সেই মহান কিতাব, যা শ্রবণে জিনেরা বলে উঠেছিল, 'আমরা কোরআন শুনে এসেছি। যা বড় বিস্ময়কর কালাম, কল্যাণের পথপ্রদর্শক। তাই এর ওপর আমরা ঈমান এনেছি।'

যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী কথা বলবে, সে সত্য

বলবে। যে কোরআন অনুযায়ী আমল করবে, সওয়াবের অধিকারী হবে। যে কোরআন অনুযায়ী ফয়সালা করবে, সে ন্যায় ও ইনসাফের ফয়সালা করবে। আর যে কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, সে সীরাতে মুস্তাকীম ও সত্য-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে।[১]

কোরআন সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কিছু মূল্যবান বাণী

কোরআনের ভালোবাসা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ নাখাঈ রাহ. বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের অবস্থা যাচাই করতে চায় (যে, তার হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা আছে তাহলে সে যেন কোরআনের ব্যাপারে চিন্তা করে। যদি সে কোরআনকে ভালোবাসে, তাহলে (এটা এ কথারই প্রমাণ যে) সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেও ভালোবাসে। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৪২

কোরআন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মীরাছ

আ'মাশ রা. বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে কিছু লোক কোরআন পড়ছিল। পাশ দিয়ে এক বেদুঈন যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করল, এরা কী করছে? তিনি বললেন, এরা নিজেদের মধ্যে নবীজির মীরাছ বণ্টন করছে। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৪১

কোরআনে কারীমে রয়েছে আল্লাহর পছন্দনীয় আদব-আখলাকের বিবরণ

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহ. আপন পিতা ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুরব্বী ও দীক্ষা দানকারী ব্যক্তিই চায়- তার দেয়া শিক্ষা, আদব ও আখলাকের যেন অনুসরণ করা হয়। আর আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় আদব-আখলাকের বর্ণনাকারী হলো কোরআনে কারীম। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৪১; সুনানে দারেমী, ২/৪৩৩, হাদীস ৩৩২৪

কোরআনে রয়েছে বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়াবলির বর্ণনা

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন, কোরআনে সাত ধরনের বিষয় রয়েছে। এতে (অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে) নিষেধকারী আয়াত যেমন আছে (সৎ ও কল্যাণকর কাজের) আদেশদানকারী আয়াতও রয়েছে। হালাল বস্তুসমূহেরও আলোচনা রয়েছে, হারাম জিনিসসমূহেরও উল্লেখ আছে। এতে 'মুহকাম' (তথা সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত অর্থবোধক) আয়াতও আছে। (কোরআনের অধিকাংশ আয়াতই এ শ্রেণির- (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) আর কিছু 'মুতাশাবিহ' (যার অর্থ বিদিত বা সুনির্ধারিত নয়) আয়াতও রয়েছে। এছাড়াও এতে রয়েছে অনেক উপকারী দৃষ্টান্ত (নসীহত, পূর্ববর্তী জাতিবর্গের ঘটনা ও বৃত্তান্ত)।

মানুষের ওপর ফরয হলো, কোরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল জানা, আর হারামকে হারাম মানা। কোরআনের আদেশসমূহ মেনে চলা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং এতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত (নসীহত ও ঘটনা ইত্যাদি) থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।

বাকি রইল 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহ- তো নিজের (আকীদা ও) আমলের ভিত্তি রাখবে 'মুহকাম' আয়াতসমূহের ওপর। আর 'মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহের (সত্যতার ব্যাপারে) ঈমান রাখবে। এ কথার স্বীকৃতি দেবে যে-

آمنا به كل من عند ربنا.

অর্থাৎ আমরা (মুহকাম আয়াতসমূহের মতো) মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের ওপরও ঈমান এনেছি। (কারণ), সবই তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। -তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী, ১/৬৭; ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ৫৫-৫৬ তাবারীর সূত্রে

কোরআনের প্রকৃত অলঙ্করণ হচ্ছে তা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা

আবু ওয়ায়েল রাহ. বর্ণনা করেন, একদিন সোনা জড়ানো একটি কোরআন নিয়ে এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন বললেন, হক আদায় করে কোরআন তেলাওয়াত করাই হচ্ছে তার প্রকৃত অলঙ্করণ। -ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ২/২৩৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩০৮৬২

কোরআনী আহ্বান يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا -এর দাবি

একদিন ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে এক ব্যক্তি

---

[১]. ফাযায়েলে কোরআন, ইবনে কাছীর ১৬-১৮।

قال العبد الضعيف كاتب هذه الحروف -عفا الله عنه-: رُوي هذا الحديث بطوله من طريق علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم، رواه أحمد و الترمذي وغيرهما، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الإمام ابن كثير -ذلك الحافظ الناقد المجهبذ- رحمه الله فيه: والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه، بل كذبه بعضهم من جهة رأيه و اعتقاده، أما أنه يتعمد الكذب في الحديث: فلا. والله أعلم

و قصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح

এসে আরয করল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি তখন বললেন, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার আহ্বান يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শুনলে তাতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে। (কারণ, এ ক্ষেত্রে দুই বিষয়ের একটি অবশ্যই হবে) হয় আল্লাহ তাআলা কোনো ভালো কাজের আদেশ করে থাকবেন। নতুবা কোনো মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে থাকবেন। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৫৯

কোরআন-বাহকের আখলাক ও চরিত্রে এবং কথা ও কর্মে স্বাতন্ত্র্য থাকা চাই

মুসাইয়িব ইবনে রাফে রাহ. বলেন, ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, কোরআন-বাহকের (আপন কথা ও কর্মে, আচরণ ও উচ্চারণে এবং আখলাক ও চরিত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া চাই। কারণ, তাকে তো কোরআনের মতো মহাদৌলত দান করা হয়েছে। তাই তার উচিত) রাতে অন্য লোকেরা ঘুমিয়ে থাকলেও নিজে ইবাদত ও তেলাওয়াতে মশগুল থাকা। দিনে সবাই যখন পানাহার করে, তখন রোযা রাখা। অন্যরা তাকওয়া ও পরহেজগারির প্রতি লক্ষ না রাখলেও এ ব্যাপারে সবসময় যত্নবান থাকা। দাম্ভিক ব্যক্তি দম্ভ দেখালেও বিনয় অবলম্বন করা। অন্যরা খেল-তামাশা, অতিরিক্ত আনন্দ-ফুর্তি ও বেহুদা কাজে লিপ্ত থাকলেও তার উচিত, এসব থেকে বিরত থেকে খোদাভীতি, অল্প কথন ও রোনাজারির গুণে গুণান্বিত হওয়া। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৮৯; আখলাকু হামালাতিল কোরআন: পৃ. ৫০, হাদীস ৩০; তাফসীরে কুরতুবী ১/৩৮

কোরআনের বাহকগণের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের আরো কিছু বাণী

হযরত ওমর ফারুক রা. একবার কারীদের (কোরআনের হাফেয ও আলেমদের) সম্বোধন করে বললেন, হে কারী সম্প্রদায়! আপন দৃষ্টি উঁচু এবং শির বুলন্দ কর। (কারণ, কোরআনের আলোয় সত্য-সরল পথ ও হেদায়াতের) রাস্তা তোমাদের সামনে স্পষ্ট। অতএব তোমরা নেকি ও কল্যাণকর কাজে অন্যদের চেয়ে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর। আর (ভিক্ষার হাত পেতে) অন্যের ওপর বোঝা হয়ো না। –শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস ১২১৬-১২১৭; আততিবয়ান, পৃ: ৭১

হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. কারীদের লক্ষ করে বলেন, হে কারী সম্প্রদায়! সরল পথে অটল-অবিচল থাকো। নিঃসন্দেহে তোমরা অন্যদের থেকে আগে বেড়ে গেছো। তবে এ কথাও মনে রেখো, তোমরা যদি (সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে) এদিক-সেদিক চলতে থাক, তাহলে এ পথভ্রষ্টতাও হবে বড় ভয়াবহ। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭২৮২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩৫৯৪৭

আবুয যাহের রাহ. বলেন, এক ব্যক্তি আপন ছেলেকে সাথে নিয়ে আবুদ দারদা রা.-এর নিকট এসে বলল, আমার ছেলে কোরআন হেফয করেছে। হযরত আবুদ দারদা রাযি. বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর দয়া করুন। তোমাকে ক্ষমা করে দিন। (মনে রেখো বাবা!) কোরআনের প্রকৃত হাফেয তো সে-ই, যে কোরআনের পূর্ণ অনুসরণ করে। কোরআনের আদর্শ জীবনে বাস্তবায়ন করে। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/৩০৪; ফাতহুল বারী ৮/৬৬৮-৬৬৯

উদ্দেশ্য হলো, শুধু মৌখিকভাবে কোরআনের শব্দ মুখস্থ করা যথেষ্ট নয়; বরং সেই সাথে কোরআনের আদর্শ নিজের মাঝে ধারণ করতে হবে এবং কোরআনের বিধি-বিধান জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুবা তা উল্টো শাস্তির কারণ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

কোরআন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম

ফারওয়া ইবনে নাওফিল আশজায়ী রাহ. বলেন, আমি হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রা.-এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন উপদেশ দিয়ে তিনি আমাকে বললেন, নিজ সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা কর। আর মনে রেখো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো তাঁরই কালামে পাক। –ফাযায়েলে কোরআন, আবু উবায়দ ১/২৬১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩০৭২২

'রাসেখ' (তথা বিশুদ্ধ ও মজবুত) ইলম ছাড়া শুধু ধারণার ভিত্তিতে কোরআনের তাফসীর করা গুরুতর অপরাধ

আবু মা'মার আবদুল্লাহ বিন সাখবারা রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর রা. ইরশাদ করেছেন, 'আমি যদি (বিশুদ্ধ ও মজবুত) ইলম ছাড়া কেবল ব্যক্তিগত মত ও ধারণার ভিত্তিতে কোরআন সম্পর্কে কোনো কথা বলি, তবে না আসমানের নিচে আমার কোনো ঠাঁই হবে, আর না যমীনের ওপর আমি কোনো আশ্রয় পাব!' –তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১৬

এক বর্ণনামতে, আবু বকর রা.-কে وَفَاكِهَةً وَأَبًّا আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি এ কথা বলেন। –ফাযায়েলে কোরআন,

আবু উবায়দ ২/২১১

এটা তো একেবারে স্পষ্ট কথা যে, হযরত আবু বকর রাযি.-এর তুলনায় কিতাবুল্লাহর অর্থ ও মর্ম অধিক আর কে জানবে! এখানে মূলত তিনি এ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, সঠিক ও গভীর জ্ঞান ছাড়া কেবল ব্যক্তিগত মত ও ধারণার ভিত্তিতে কোরআনের ব্যাখ্যাকারী এত বড় অপরাধী যে, আসমান ও যমীনের কোথাও তার ঠাঁই না হওয়া উচিত।

* * *

সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অতি মূল্যবান ও উপকারী বাণী ও বক্তব্যের আলোচনা সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর কথা দিয়েই শেষ করছি। যদিও অধমের মন তো এটাই চাচ্ছে যে, এ বরকতময় ধারা চলতে থাকুক! কিন্তু একটি প্রবন্ধে এর চেয়ে বেশি উল্লেখের সুযোগ কোথায়! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সব বাণী এবং সাহাবীদের উপদেশসমৃদ্ধ ঘটনাবলি থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক কেমন ছিল– এ বিষয়ে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে তাঁদেরই বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থা এবং বাণী ও বক্তব্যের আলোকে এর কিছু নমুনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ের আরো বহু দিক এমন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনার সুযোগ হয়নি। তা থেকে কয়েকটির শুধু শিরোনাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. কোরআনের লিখন ও সংকলন এবং এর হেফাযত ও সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরামের বিপুল মেহনত-মুজাহাদা ও আজিমুশ্শান অবদান।

২. কোরআনের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং কোরআন স্পর্শ করার জন্য তাহারাত ও পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব: সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ ও কর্মপন্থার আলোকে।

৩. কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শেখার জন্য সাহাবায়ে কেরামের চেষ্টা ও মেহনত।

৪.কোরআনের তেলাওয়াত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ, মেহনত ও অবদান।

৫. কোরআন বোঝা : এর জন্য সাহাবায়ে কেরামের চেষ্টা ও সাধনা এবং অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থা।

৬. কোরআন মাজীদের তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অঙ্গনে তাঁদের বিপুল চেষ্টা ও অবিস্মরণীয় খেদমত।

৭. কোরআনের শিক্ষা, কোরআনের আদর্শ এবং কোরআনের বার্তা ও বিধান ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে কোরআনের রঙে রঙিন করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের সীমাহীন মেহনত ও প্রচেষ্টা এবং সুমহান ত্যাগ ও কুরবানী।

উল্লিখিত শিরোনামসমূহ এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা, তাঁদের বাণী ও বক্তব্য অধ্যয়ন করা ঈমানী জীবন গড়া এবং কোরআনের সাথে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ও উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। (আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফীকদাতা।)

প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবালের গভীর মর্মসমৃদ্ধ একটি পঙক্তি এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য, পংক্তিটিতে তার প্রতি গভীর ইঙ্গিত রয়েছে এবং এ পার্থক্যের কারণে তাঁদের সফলতা ও আমাদের ব্যর্থতার বিষয়টিও তাতে চিত্রিত হয়েছে। তিনি বলেন–

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر

কোরআনের বাণী ধারণ করে হয়েছেন তাঁরা সম্মানিত

ছেড়েছ তোমরা কোরআনের পথ হয়ে গেছ তাই লাঞ্ছিত

কোরআনের হক যথাযথভাবে আদায় করার বিনিময় ও পুরস্কার এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণাম ও শাস্তি বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস আগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের সমাপ্তিতে পুনরায় তা উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের মাধ্যমে অনেক সম্প্রদায়কে সমুন্নত করবেন, আর অনেককে করবেন লাঞ্ছিত।

আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবানিতে আমাদেরকে প্রথমোক্ত দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ●

[লেখাটি উর্দূ থেকে অনুবাদ করেছেন মারকাযুদ দাওয়াহ-এর দাওয়াহ বিভাগের তালিবুল ইলম শাহাদাত সাকিব। এছাড়াও লেখাটির প্রকাশনা-প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করেছেন দাওয়াহ বিভাগের আরেক তালিবুল ইলম ইলিয়াস খান। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে আপন শান অনুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন।]

লাহুল আসমাউল হুস্‌না

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

সূরায়ে হাশরের শেষের আয়াতগুলোতে মহামহিম আল্লাহ তাঁর কিছু সিফাত বর্ণনা করেছেন। আয়াতগুলো অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। যুগে যুগে অসংখ্য মুমিন এ আয়াতগুলোর মধুর ব্যঞ্জনায় মোহিত হয়েছেন এবং অর্থ না বুঝলেও দিনের পর দিন পরম আনন্দের সাথে তা পাঠ করে গেছেন। আর যারা অনুধাবন করেছেন এই জ্যোতির্ময় বাক্যমালার ভাব ও মর্ম – কে আছে তাদের আনন্দ পরিমাপ করে? তাঁরা তো পেয়েছেন তাঁদের রবের পরিচয়।
এখানে তিন আয়াতে তিনটি পর্বে অসাধারণ ভাবগম্ভীর বর্ণনায় পবিত্র সিফাতগুলো বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পর্ব–

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

দ্বিতীয় পর্ব–

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আর তৃতীয় পর্ব–

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

প্রতিটি পর্বের শুরু বাক্যটি হচ্ছে هُوَ اللَّهُ (তিনিই আল্লাহ) এরপর তার বিভিন্ন সিফাতের বর্ণনা। একটু চিন্তা করলেই প্রতিটি পর্বে উল্লেখিত সিফাতগুলোর পরস্পর সাযুজ্য স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা একেকটি পর্ব করে মহান রাব্বুল আলামীনের সিফাতগুলো বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

প্রথম পর্ব

পবিত্র নামসমূহের ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পর্বের সূচনা-বাক্যটি হচ্ছে– هُوَ اللَّهُ অর্থাৎ 'তিনিই আল্লাহ'।
'আল্লাহ' নামটি তাঁর ঐ সুমহান নাম, যা সকল 'আসমায়ে হুসনার' মূল। অন্যান্য নাম ও গুণাবলীর বর্ণনায় কুরআন-সুন্নাহয় এ নামটিকেই মূল ধরা হয়েছে এবং এ নামের দ্বারাই তাঁর মহিমান্বিত সত্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই, সুতরাং সেগুলোর দ্বারা তোমরা তাঁকে ডাক। –সূরা আরাফ (৭) : ১৮০
'আল্লাহ' নামটি পরোক্ষভাবে অন্য সকল আসমায়ে হুসনার ভাব ও মর্ম ধারণ করে। কারণ, তা ইলাহ বা মাবুদ অর্থের ধারক। আর মাবুদ তো তিনিই যিনি পূর্ণতা ও প্রতাপ এবং মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের সকল গুণে গুণান্বিত। সৃষ্টির মাঝে যত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, যত শক্তি ও সৌন্দর্যের উল্লাস সবই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর করুণার দান।

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; এবং বিধানও তাঁরই আর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। –সূরা কাসাস (২৮) : ৭০
তাঁকেই আমরা 'আল্লাহ' বলে ডাকি। তিনিই একমাত্র ইলাহ। কুরআনের ভাষায়–

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

তিনিই ঐ সত্তা, যিনি মাবুদ আসমানে। মাবুদ যমীনে। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। –সূরা যুখরুফ (৪৩) : ৮৪

তিনি আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ্

মহামহিম আল্লাহর এক সিফাত, তিনি 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ'। 'আলগাইব' হচ্ছে অপ্রকাশ্য, 'আলশাহাদাহ' প্রকাশ্য। অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। তিনিই তো স্রষ্টা সকল কিছুর এবং তাঁরই ইচ্ছায় সবকিছুর স্থিতি ও লয়, হ্রাস ও বৃদ্ধি। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রতি মুহূর্তে তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বেষ্টনীতে আবদ্ধ।
উল্লেখ্য, সৃষ্টিজগত যে 'গাইব' ও 'শাহাদাহ' (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য)– এই দুই ভাগে বিভক্ত তা মাখলুকের জ্ঞান ও অবগতির বিচারে। মাখলুকের কাছে কিছু বিষয় প্রকাশ্য, কিছু অপ্রকাশ্য। কারণ, এক. মাখলুকের জ্ঞান ও অবগতি মূলত ইন্দ্রিয় ও উপকরণ নির্ভর। সুতরাং যা কিছু ইন্দ্রিয় ও উপকরণের সীমানার বাইরে তা তার কাছে অপ্রকাশ্য। আর তাই 'স্থান' ও 'কাল' মানবীয় জ্ঞানে এক বড় ব্যাপার। সকল স্থান ও সকল কাল মানুষের কাছে 'উপস্থিত' নয়। মানুষের ইন্দ্রিয় ও উপকরণের আওতাভুক্ত নয়, ফলে এর সব কিছু তার কাছে 'প্রকাশ্য' নয়। তদ্রূপ মাখলুকের জ্ঞান ও অবগতি শর্তযুক্ত। অবগতির শর্তসমূহ পূরণ হওয়া ছাড়া এবং প্রতিবন্ধকগুলো দূর হওয়া ছাড়া মাখলুকের পক্ষে অবগতি সম্ভব নয়।
এরপর প্রকাশ্য জগতের ক্ষেত্রেও মাখলুকের জ্ঞান ও অবগতি অনেক ক্ষেত্রেই নিখুঁত ও নিশ্ছিদ্র নয়; নিশ্চিত

ও সন্দেহাতীত নয় এবং নির্ভেজাল ও অনিমিশ্র নয়। সত্যের সাথে মিথ্যার, বাস্তবের সাথে কল্পনার এবং জ্ঞানের সাথে অনুমানের মিশ্রণ মানব-জ্ঞানের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাই মানবের জ্ঞানের বিচারে জীবন ও জগত দুই ভাগে বিভক্ত: গাইব ও শাহাদাহ: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ। শুধু তাঁর কাছেই সব কিছু সর্বাবস্থায় প্রকাশিত।

এই অন্তহীন, শর্তহীন, বাধা-বন্ধনহীন, উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষিতাহীন, নিখুঁত ও নিশ্ছিদ্র জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। তিনিই একমাত্র মাবুদ, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

তোমাদের ইলাহ তো একমাত্র আল্লাহ। যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। –সূরা ত্ব হা (২০) : ৯৮

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ। তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য (সব কিছু) এবং জানেন তোমরা যা অর্জন কর তা। –সূরা আনআম (৬) : ৩

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

কাফিররা বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না। বল, আসবে, শপথ আমার রবের, যিনি আলিমুল গাইব, তা তোমাদের কাছে আসবেই। আকাশমণ্ডলী ও ভূমিতে তাঁর অগোচরে নয় কণা পরিমাণ কিছু। আর নেই এর চেয়েও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছু, যা না- আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। –সূরা সাবা (৩৪) : ৩

সুস্পষ্ট কিতাব অর্থ লওহে মাহফুয যা আল্লাহ তাআলার ইলমের এক প্রকাশক্ষেত্র। জগৎ-মহাজগতের সৃষ্টি, প্রাণের উন্মেষ, মানবের আগমন, তার ভূত-ভবিষ্যত, সৃষ্টির লয়-ক্ষয় এবং সংসারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কিছু এতে সংরক্ষিত। وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ এবং আসমান-যমীনে এমন কোনো গুপ্ত বিষয় নেই যা না আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। –সূরা নামল (২৭) : ৭৫

এ মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাঁর বিস্তৃত জ্ঞানের এক উজ্জ্বল প্রকাশ। তাই 'এ কিতাবে আছে' কথাটির অর্থ, আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে অবগত। শুধু অবগতই নন তিনি তা এ গ্রন্থে প্রকাশও করেছেন। আমরা এর উপর ঈমান রাখি।

বান্দার প্রতি এই পবিত্র নামের দাবি

মহামহিম আল্লাহর এই সিফাতী নামের দাবি, তাঁর সংবাদ ও সাক্ষ্যকে সর্বান্তকরণে সত্য বলে বিশ্বাস করা। সৃষ্টির সকল কিছু যাঁর সামনে উদ্ভাসিত তাঁর সাক্ষ্যই তো শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। তাই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই সাক্ষী মেনেছেন, কুরআনে যার বিবরণ রয়েছে। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আছে– قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ বল, শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য কার? বল, আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মাঝে। –সূরা আনআম (৬) : ১৯

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তিনি তা অবগত। যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে আর আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। –সূরা আনকাবূত (২৯) : ৫২

মহামহিম আল্লাহর এই সিফাতের আরো দাবি, আল্লাহর বিধানকে শিরোধার্য করা। আল্লাহ তাআলাই যেহেতু সর্বজ্ঞানী এবং তিনিই মানবের স্রষ্টা তাই তার যোগ্যতা-দুর্বলতা, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত, আর সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণা প্রশ্নাতীত, কাজেই তাঁর নির্দেশিত পথেই রয়েছে বান্দার মুক্তি ও সাফল্য। আপন সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও দুর্বল বিবেচনার পরিবর্তে বান্দার কর্তব্য, আল্লাহর বিধানে সমর্পিত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানকে আপন অক্ষম যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা পরখ করার অসুস্থ মানসিকতা ত্যাগ করে আপন চিন্তা ও মস্তিষ্ককে আল্লাহর বিধান দ্বারা পরখ করা। অতপর সে অনুযায়ী নিজের জীবন ও কর্মকে পুনর্বিন্যস্ত করা–

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

বল, এ তো তিনি অবতীর্ণ করেছেন যিনি জানেন আসমানসমূহের ও যমীনের সকল গুপ্ত রহস্য। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। –সূরা ফুরকান (২৫) : ৬

মহামহিম আল্লাহর এই সিফাতের আরো দাবি, এই বিশ্বাস রাখা যে, বান্দার সকল কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তিনি তো বান্দাকে হুঁশিয়ারও করেছেন, তার কোনো কথা, কাজ, সংকল্প তাঁর অগোচরে নয়–

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

তিনিই তো, যিনি রাতে তোমাদের কব্জ করেন এবং জানেন যা কিছু দিনের বেলায় করেছ। এরপর দিনে তোমাদের জাগ্রত করে তোলেন, যাতে পূর্ণ হয় নির্ধারিত মেয়াদ। এরপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তোমাদের জানাবেন যা তোমরা করছিলে। –সূরা আনআম (৬) : ৬০

কাফিরদের এক প্রশ্ন ছিল, মানবদেহের অস্থি-মজ্জা মাটিতে মিশে যাওয়ার পর কীভাবে মানুষ পুনরায় জীবিত হবে। কুরআন এর জবাব দিয়েছে যে, আল্লাহ

তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে অবগত। মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও মানবদেহের প্রতিটি অণু আল্লাহর জ্ঞান-দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত; কিছুই তাঁর জ্ঞান থেকে অন্তর্হিত হয় না এবং কিছুই তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বাইরে যেতে পারে না। তাঁর আদেশমাত্র পুনরায় তারা জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.

আমার জানা আছে মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে এবং আমার কাছে আছে এক কিতাব, (যাতে সব কিছু) সুরক্ষিত। –সূরা ক্বফ (৫০) : ৪

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.

বল, ঐ (মাটিতে মিশে যাওয়া অস্থি)গুলোকে তিনিই পুনর্জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সেগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তো সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। –সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ৭৯

দ্বিতীয় সিফত : আর রহমান, আর রহীম

তিনি 'রহমান', 'রহীম'। এ দুই মহান নামের মূল হচ্ছে الرحمة যার অর্থ করুণা। আর রাহমান অর্থ দয়া ও করুণায় যাঁর কোনো নযীর নেই। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু যাঁর দয়ার ছাপ বহন করছে।

আরবী ভাষায় فَعْلان ওজন (শব্দের কাঠামো)টি মুবালাগা বা সর্বোচ্চতা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَلآن অর্থ, কানায় কানায় ভর্তি। غَضْبَان অর্থ প্রচণ্ড রাগান্বিত, عَطْشَان অর্থ, প্রচণ্ড পিপাসিত। তো رَحْمن অর্থ পরম করুণাময়।

ঊর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতে যত হাসি, আনন্দ, শান্তি ও কল্যাণ সবই তাঁর 'রহমাহ' (দয়া) গুণের প্রভাব। একমাত্র তিনিই কল্যাণ দান করেন এবং তিনিই অকল্যাণ থেকে মুক্তি দান করেন।

বাংলা ভাষার এক কবির উপলব্ধি–

'কার করুণায় পৃথিবীতে এত ফসল ও ফুল হাসে/ বর্ষার মেঘে নদ-নদী-স্রোতে কার কৃপা নেমে আসে। /কার শক্তিতে জ্ঞান পায় এত, পায় মান-সম্মান/ এ জীবন পেল কোথা হতে তার পেল না আজিও জ্ঞান।'

আর তাঁরই করুণার ছায়া সৃষ্টিজগতে প্রতিবিম্বিত। তিনি করুণা দিয়েছেন বলেই মানুষ একে অপরকে ভালবাসে, দয়া করে। অবলা প্রাণীও আপন শাবককে ভালবাসে, লালন পালন করে।

তবে এ হচ্ছে তাঁর করুণার একটি ধারা, যার মাধ্যমে সৃষ্টির ইহ-জাগতিক নানা প্রয়োজন পূরণ হয়। করুণার এই ধারায় গোটা সৃষ্টিজগত প্লাবিত। এমনকি কাফির-মুশরিকও তা থেকে বঞ্চিত নয়।

'আশিটা বছর কেটে গেল আমি ডাকিনি তোমায় কভু/ আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু!'

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا.

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার জ্ঞান ও করুণা তো সর্ববস্তু ব্যাপী। –সূরা গাফির (৪০) : ৭

এ আয়াতে জ্ঞান ও করুণার সংযোগটি লক্ষ করুন। যাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী তাঁর করুণাই তো হতে পারে সর্বপ্লাবী।

মহান আল্লাহর রহমতের দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে, সুপথ নির্দেশ। মানবজাতির হেদায়েতের জন্য তিনি পাঠিয়েছেন নবী-রাসূল, নাযিল করেছেন কিতাব ও সহীফা। ইরশাদ হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

এবং আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ। –সূরা নাহল (১৬) : ৮৯

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি শুধু বিশ্বজগতের জন্য রহমত রূপে।

তো এই কিতাব ও সুন্নাহ, দ্বীন ও শরীয়ত হচ্ছে নূর ও আলো, যা রাব্বুল আলামীনের পরম করুণার প্রকাশ। অতপর তা তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য এবং চির শান্তির মঞ্জিলে পৌঁছার সরল পথ। সুতরাং বান্দা দ্বীন ও শরীয়তের যত আনুগত্য করবে ততই সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে এবং তার বিশেষ রহমতের নিকটবর্তী হবে।

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

এই কিতাব, আমি নাযিল করেছি, (যা) কল্যাণময়। সুতরাং এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর। হয়তো তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।–সূরা আনআম (৬) : ১৫৫

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ-ভাজন হতে পার। –সূরা নূর (২৪) : ৫৬

রহমতের এই ধারায় শুধু তাঁর মুমিন বান্দাগণই সিক্ত। ঈমান, আমল, তাকওয়া– এই রহমতেরই এক একটি অনুষঙ্গ। নেক আমলের তাওফীক, সিরাতে মুস্তাকীমে অটল থাকার সৌভাগ্য তাঁর ঐ বিশেষ রহমত, যা শুধু তাঁর অনুগত বান্দাদেরই প্রাপ্য।

এরপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদের এমন দয়া ও করুণা করবেন এবং এত ক্ষমা ও মাগফিরাতে অভিষিক্ত করবেন, যার কোনো তুলনা নেই। হাদীস শরীফের ইরশাদ–

إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আল্লাহর আছে একশতটি রহমত। এর মধ্যে একটি রহমত তিনি অবতীর্ণ করেছেন জিন-ইনসান, পশু (পাখী) ও কীটপতঙ্গের মাঝে। এরই কারণে তারা

একে অপরকে ভালবাসে এবং একে অপরের প্রতি দয়া করে। এরই কারণে বন্য প্রাণী তার সন্তানকে ভালবাসে। আর নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ রেখে দিয়েছেন। এর দ্বারা কিয়ামতের দিন তিনি তার বান্দাদের দয়া করবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৫২; সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১০৪

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ......

আর আমার রহমত তো প্রত্যেক বস্তুকে পরিব্যাপ্ত। অনন্তর তা আমি লিখে দিব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে; যাকাত দিবে এবং একমাত্র যারা আমার সকল আয়াতে বিশ্বাস করবে। যারা অনুসরণ করবে বার্তাবাহক উম্মী নবীর। -সূরা আরাফ (৭) : ১৫৬-১৫৭

এই দুই সিফাত থেকে বান্দার গ্রহণীয়

আল্লাহ তাআলার পবিত্র গুণাবলী বান্দাকে জানানোর এক উদ্দেশ্য, বান্দা নিজেও যেন ঐ সকল গুণ অর্জন করে- বান্দা ও মাখলূক হিসেবে যেভাবে ও যে মাত্রায় তা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব ও তার জন্য উপযোগী। এখানে আল্লাহ তাআলার দুটি সিফাতের উল্লেখ হয়েছে। আর তা হচ্ছে, 'ইলম' ও 'রাহমাহ'- জ্ঞান ও দয়া। তাই বান্দারও কর্তব্য নিজ সাধ্যের ভিতর এই দুটি গুণ অর্জন করা এবং আপন প্রভুর রঙ্গে রঙ্গীন হওয়া।

ইলমের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে আল কুরআন। কুরআনের সাথে যার সম্পর্ক যত বেশি হবে সে তত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। বিখ্যাত সাহাবী হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রা. বলেন-

তোমরা কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার যত নৈকট্য অর্জন করতে পারবে অন্য কিছুর মাধ্যমে তা পরবে না। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৩০৭২২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেছেন-

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর 'দস্তরখান' (যার দিকে তিনি তাঁর বান্দাদের আহ্বান করেছেন) সুতরাং তোমরা এখান থেকে (শিক্ষা) গ্রহণ কর। -মুজামে কাবীর, তাবারানী, হাদীস ৮৬৪২

কুরআন মাজীদে রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয়। তেমনি চারপাশের সৃষ্টিজগতে ছড়িয়ে আছে তাঁর কুদরতের নিদর্শন। কুরআনী নূর বক্ষে ধারণ করে মানুষ যখন নিজেকে ও চারপাশের প্রকৃতিকে দেখে তখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয় আল্লাহ তাআলার অসীম ইলম ও কুদরতের নিদর্শনরাজি। তখন এই মানুষটি আল্লাহর পরিচয় লাভ করে এবং তাঁকে ভয় করে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই শুধু তাঁকে ভয় করে। -সূরা ফাতির (৩৫) : ২৮

আর আল্লাহকে যারা ভয় করে তারাই তো হেদায়েতের পথ অন্বেষণ করে এবং আল্লাহর তাওফীকে হেদায়েতের পথে চলে।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। -সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ১৭

তো হেদায়েতের ইলম হচ্ছে অতি কাম্য ও অর্জনীয় ইলম, যা দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণের চাবিকাঠি। এই ইলমের মাধ্যমেই বান্দা তার রবের পরিচয় লাভ করে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করে।

আল্লাহ তাআলার দ্বিতীয় গুণ রহমাহ- দয়া। মহান আল্লাহ দয়াশীল আর দয়াশীলদের তিনি ভালবাসেন। হাদীস শরীফের ইরশাদ-

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

তোমরা যমীনওয়ালাদের প্রতি রহম কর, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি রহম করবেন। -সুনানে তিরমিযী, হাদীস ১৯২৪

সুতরাং বান্দার কর্তব্য, সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হওয়া। অন্নহীনকে অন্ন দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করা, বিপদগ্রস্তের সহায়তা করা। আর কোনো প্রাণীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট না দেওয়া। তদ্রূপ আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর পথে ডাকা, কাফির-মুশরিকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, ঈমানদারদের সিরাতে মুস্তাকীমের উপর থাকতে সাহায্য করা। শিরক-বিদআত ও সকল প্রকারের গুনাহ ও গোমরাহী সম্পর্কে সতর্ক করা। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ইলমে দ্বীন বিতরণ করা। এই যে হেদায়েত- এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ রহমত। কবি বলেন-

ومابك من تقى فيها وخير + فتلك مواهب الرب الجليل
وليس لها ولا منها ولكن + من الرحمة فاشكر للدليل

তোমার মাঝে যা কিছু খাইর ও তাকওয়া/ এ সবই মহান প্রভুর দান/ এ তোমার নিজস্ব নয়, তোমা থেকে উৎসারিতও নয়, এতে/ কারিশমা রহমতের। অতএব কৃতজ্ঞ হও তার প্রতি যে তোমায় পথ দেখায়।

দ্বিতীয় পর্ব

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

পবিত্র নামসমূহের ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'আলমালিক' অর্থ অধিপতি। গোটা বিশ্বজগৎ তাঁর অধীন, তাঁর আজ্ঞাবহ। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র তাঁর ফরমানের অধীন। নদী-সাগর, বন-বনানী তাঁর বিধানের অনুগত। সমগ্র সৃষ্টিজগতে তাঁরই সৃষ্টি বিধান কার্যকর।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আকাশমণ্ডলী ও ভূমির সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৯

সূরা যুমারে বলা হয়েছে–

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

তিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমিকে যথার্থ সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রিকে পেঁচিয়ে দেন দিবসের উপর এবং দিবসকে পেঁচিয়ে দেন রাত্রির উপর। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মানুগত। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে থাকবে। জেনে রেখো, তিনিই পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল। তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে। এরপর (আরো শোনো,) ঐ ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তার জোড়া। আর অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের জন্য আট নর ও মাদা চতুষ্পদ জন্তু। তোমাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে পর্যায়ক্রমে, ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পরওয়ারদেগার। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর। কোনো মাবুদ নেই তিনি ছাড়া, তাহলে কীভাবে তোমরা ফিরে যাচ্ছ (অন্য কারো উপাসনার দিকে?!) –সূরা যুমার (৩৯) : ৫-৬

তাঁর কোনো শরীক নেই

সূরা কাসাসে তিনি বলেন–

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আর তোমার রব সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং নির্বাচন করেন (যাকে বা যে বিধান তিনি ইচ্ছা করেন)। তাদের তো নেই নির্বাচনের অধিকার। আল্লাহ পবিত্র এবং ওদের শিরক হতে অতি উচ্চে। তোমার রব জানেন যা তাদের অন্তর গোপনে লালন করে আর যা তারা প্রকাশ করে। তিনিই আল্লাহ, কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। প্রশংসা একমাত্র তাঁর ইহলোকে ও পরলোকে এবং বিধান (ও) একমাত্র তাঁর। আর তাঁরই সমীপে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতকে নিরবচ্ছিন্ন করে দেন কিয়ামত পর্যন্ত, তবে কে সে ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, যে তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারে? তবু তোমরা শুনছো না?

বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর দিবসকে নিরবচ্ছিন্ন করে দেন কিয়ামত পর্যন্ত, তবে কোন সে ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, যে তোমাদেরকে রাত এনে দিতে পারে, যে রাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তবু তোমরা দেখছো না?

তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিবস-রজনী, যেন তোমরা রাত্রিকালে বিশ্রাম কর আর (দিবাভাগে) তাঁর দান (রিযক) অন্বেষণ কর। আর যেন তোমরা (উভয় নেয়ামতের) শোকর গোযারি কর। –সূরা কাসাস (২৮) : ৬৮-৭৩

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশে ঘটে। জগতের ছোট-বড় সব কিছু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। মানবের মাঝে তাঁর বিধান ও ফয়সালা তিন প্রকারের : এক. তাকদীর বা ভাগ্যের বিধান। দুই. আহকাম ও করণীয়-বর্জনীয়ের বিধান আর তিন. জাযাউল আমাল বা কর্মের প্রতিদান সংক্রান্ত বিধান। মানুষের জীবন-মৃত্যু, রুজি-রোযগার, সুস্থতা-অসুস্থতা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, হেদায়েত-গোমরাহী সব কিছুতে আল্লাহর ফয়সালাই কার্যকর।

তদ্রূপ করণীয়-বর্জনীয়ের বিধান দেওয়ার মালিকও একমাত্র আল্লাহ।

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। প্রশংসা তাঁরই দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। –সূরা কাসাস (২৮) : ৭০

আর এ উদ্দেশ্যেই তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন এবং চেতনা-বিশ্বাস, রীতি-নীতি, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নীতি ও বিধান দান করেছেন।

তেমনিভাবে ভালো ও মন্দ কর্মের প্রতিদানমূলক বিধানের মালিকও একমাত্র আল্লাহ। দুনিয়া ও আখিরাতে কার কী প্রাপ্য তা তিনিই ফয়সালা করেন। দুনিয়া ও আখিরাতে ভালো ও মন্দের প্রতিদানে তাঁর ফায়সালাই চূড়ান্ত।

সুতরাং তিনিই অধিপতি।

দ্বিতীয় গুণ : اَلْقُدُّوْسُ তিনি পবিত্র ও মহিমান্বিত।

এই মহিমা ও পবিত্রতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক. তিনি সকল গুণে গুণান্বিত। গুণ ও বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতা পরিপন্থী যা কিছু আছে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। যেমন :

তিনি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। অজ্ঞতা, অনবগতি, বিস্মৃতি ইত্যাদি থেকে তিনি পবিত্র।

তিনি পূর্ণ ক্ষমতা ও সক্ষমতার অধিকারী। অক্ষমতা,

ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি থেকে তিনি পবিত্র।
তিনি চিরঞ্জীবী, সৃষ্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে। লয়, ক্ষয়, জরা; নিদ্রা, তন্দ্রা, মৃত্যু ইত্যাদি সব কিছু থেকে তিনি চির পবিত্র।
তিনি ন্যায়বিচারক, অমুখাপেক্ষী। জুলুম, অবিচার, পক্ষপাত থেকে এবং সর্ব প্রকারের মুখাপেক্ষিতা থেকে তিনি পবিত্র।
তিনি দয়াময়, প্রজ্ঞাময়, তাঁর কোনো কর্ম, কোনো বিধান দয়া ও প্রজ্ঞাশূন্য নয়। অর্থহীন, তাৎপর্যহীন কাজ থেকে তিনি চিরপবিত্র। মোটকথা, তাঁর ছিফাত ও গুণাবলীর পরিপন্থী সব কিছু থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর পবিত্রতার দিকগুলো বিশদভাবে তখনই উপলব্ধি করা যাবে যখন তার ছিফাত ও গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জিত হবে।
দুই. তিনি মাখলুকের সাদৃশ্য ও সমশ্রেণিতা থেকে পবিত্র। তাঁর কোনো শরীক নেই, সহযোগী নেই। তিনি এক, একক। তাঁর স্ত্রী নেই, সন্তান নেই। তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর মতো কেউ নেই। তাঁর সমকক্ষ নেই, প্রতিপক্ষ নেই, তাঁর মুকাবেলা করার, তাঁর ফয়সালা রদ করার কেউ নেই।
তাঁর গুণাবলী মাখলুকের গুণাবলী থেকে আলাদা। তাঁর গুণ পূর্ণ, নিজস্ব, শাশ্বত ও সবধরনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে মাখলুকের গুণ, ক্ষীণ, ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধতাযুক্ত ও আল্লাহপ্রদত্ত।
তৃতীয় গুণ: তিনি 'সালাম'।
এ শব্দটি মুক্তি ও পবিত্রতার মর্ম ধারণ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র নাম 'সালাম'। অর্থাৎ তিনি সকল দোষ ও দুর্বলতা এবং ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। অতপর তিনিই মুক্তি ও নিরাপত্তা দানকারী। আর আখিরাতে জান্নাতীগণ তাঁর তরফ থেকে শুনবেন 'সালাম-বাণী'।
سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
সালাম, পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে সম্ভাষণ। –সূরা ইয়া-সীন (৩৬) : ৫৮
এ দুটো পবিত্র নামের মর্ম কাছাকাছি। সুতরাং এ দু'টো নাম যখন পাশাপাশি আসছে তখন ভাব ও মর্মে আরো তাকীদ ও ভিন্ন মাত্রা যোগ হচ্ছে। তাছাড়া 'সালাম' শব্দের ভাব ও মর্মে আলাদা কিছু দিকও রয়েছে, যার মধ্যে দুটো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে–
এক. মুক্তি ও নিরাপত্তা দানকারী।
দুই. জান্নাতীগণকে সালাম-বাণী দানকারী।
আর প্রথম অর্থ (তিনি সকল দোষ ও দুর্বলতা এবং ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র) অনুসারে القدوس ও السلام -এর মাঝে পার্থক্য অনেকটা তা-ই যা আল্লাহ তাআলার আরেক নাম سُبُّوحٌ ও قُدُّوسٌ -এর মাঝে পার্থক্য। আল্লামা হালীমী রাহ. تسبيح ও تقديس -এর মাঝে এভাবে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন–
والتقديس مضمن في صريح التسبيح، والتسبيح مضمن في صريح التقديس، لأن نفي المذام إثبات للمدائح كقولنا : لا شريك له ولا شبيه، إثبات أنه واحد أحد، ... وإثبات المدائح له نفي للمذام عنه كقولنا : إنه عالم نفي للجهل عنه وكقولنا : إنه قادر نفي للعجز عنه، إلا أن قولنا : هو كذا ظاهره التقديس، وقولنا ليس بكذا ظاهره التسبيح، ...وقد جمع الله تبارك وتعالى بين التقديس والتسبيح في سورة الإخلاص فقوله عز اسمه : قل هو الله أحد، الله الصمد فهذا تقديس، ثم قال : لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا تسبيح، والأمران معا راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفي الشريك والشبيه عنه.
অর্থাৎ, 'তাসবীহের' মাঝে 'তাকদীস' নিহিত থাকে আর 'তাকদীসে'র মাঝে 'তাসবীহ'। কারণ দোষত্রুটি থেকে পবিত্রতার ঘোষণা (যা 'তাসবীহ') পরোক্ষভাবে গুণান্বিত হওয়ারই ঘোষণা (যা তাকদীস)। তেমনি গুণ বর্ণনা পরোক্ষভাবে পবিত্রতারই ঘোষণা। যেমন আমরা যখন বলি, তাঁর কোনো শরীক ও সমকক্ষ নেই তখন পরোক্ষভাবে একথাও বলা হয় যে, তিনি এক, একক। তেমনি যখন বলি, তিনি জ্ঞানী, তিনি শক্তিমান তখন একথাও বলা হয়ে যায় যে, তিনি অজ্ঞ নন। অক্ষম নন। তবে ইজাবী জুমলায় বললে বাহ্যত তা হয় তাকদীস আর সালবী জুমলায় বললে বাহ্যত তাসবীহ। সূরাতুল ইখলাসে আল্লাহ তাআলা এ দুটো বিষয় একত্র করেছেন। قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ হচ্ছে তাকদীস। আর لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ হচ্ছে তাসবীহ। আর দুটো বিষয়ই আল্লাহ তাআলার একত্ব ও এককত্ব এবং শরীক ও সদৃশ হতে পবিত্রতা নির্দেশ করে। –আলআসনা ফি শরহি আসমাইল্লাহিল হুসনা পৃ. ২১৫
আশা করি আল্লামা হালীমী রাহ.-এর এ আলোচনার মাধ্যমে উপরের দুটো নামের পার্থক্য এবং পাশাপাশি উল্লেখের মাধুর্যও উপলব্ধি করা যাচ্ছে। একইসাথে এ-ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, 'আল-মালিক' (অধিপতি) নামটির পর এ দুটো পবিত্র নামের উল্লেখ অর্থ ও মর্মে কী মাত্রা প্রকাশ করছে।
চতুর্থ গুণ: المؤمن
এ পবিত্র নামও বিস্তৃত মর্মের ধারক। সালাফ সে মর্মের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন। যেমন এক. নিরাপত্তা দানকারী অর্থাৎ, কুল মাখলুককে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কারো প্রতি জুলুম করা হবে না।
إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا
আল্লাহ কণা পরিমাণও জুলুম করেন না। আর

কোনো পুণ্য কর্ম হলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ করেন এবং নিজের নিকট থেকে মহা পুরস্কার প্রদান করেন। -সূরা নিসা (৪) : ৪০

দুই. আমান দানকারী। তিনিই ঐ সত্তা যিনি 'আমান' (আশ্রয়) দিতে পারেন। যাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আমান দিতে পারে না। কুরআন মাজীদের ইরশাদ-

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

জিজ্ঞাসা কর, সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে; যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার বিরুদ্ধে আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান। -সূরা মুমিনুন (৪০) : ৮৮

তিন. মুমিনগণকে সত্যায়নকারী। মুমিনগণ যখন তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে এক বলেন তখন তিনি তাদের কথাকে সত্যায়ন করেন। কুরআন মজীদের ইরশাদ-

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং ফিরিশতাগণ ও জ্ঞানীগণও; (আল্লাহ) ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

অর্থাৎ আহলে ইলম মুমিনগণ সাক্ষ্য দেন, আল্লাহ এক, ফিরিশতাগণ সাক্ষ্য দেন, আল্লাহ এক। আর সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি এক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তাঁর সাক্ষ্যের দ্বারা তাঁর মুমিন বান্দাদের সাক্ষ্য সত্যায়িত হয়।

চার. যিনি মুমিনদের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং তাঁদেরকে দেয়া সংবাদ সত্যে পরিণত করে তাদের ধারণাকে সত্যায়িত করেন। তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে তিনি ব্যর্থ করেন না।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ

অতপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম; আমি ওদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং যালিমদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। -সূরাতুল আম্বিয়া (২১) : ৯

ফতহে মক্কার ঘটনা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

ফতহে মক্কার দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার সিঁড়িতে দাঁড়ালেন অতপর আল্লাহর হামদ ও ছানা করলেন এবং বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করেছেন তাঁর বান্দার নুসরত করেছেন এবং সম্মিলিত দলসমূহকে একা পরাস্ত করেছেন। -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৭৯৯

সাধারণভাবেও এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণ আর এখানে 'আলমালিক'-এর সাথেও এর গভীর সাযুজ্য রয়েছে।

পঞ্চম গুণ : المهيمن। তিনি সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। আরবী ভাষার একটি ব্যবহার- هيمن الطائر পাখিটি ছানার উপর পাখা বিস্তার করল ও ডানা ঝাপটাল। এতে বেষ্টনের ভাব নিহিত রয়েছে।

তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন বান্দার জীবন ও জীবিকার সংরক্ষক তেমনি তার হৃদয় ও আত্মারও সংরক্ষক। সৃষ্টি-জগতের সকল প্রাণীর জীবিকা তিনিই দান করেন। সুস্থতা ও নিরাপত্তার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁরই হাতে হেদায়েত ও গোমরাহী।

অতপর বান্দার কর্মসমূহের তিনি সংরক্ষক। কারো কোনো কর্ম তাঁর জ্ঞানদৃষ্টির বাইরে নয় এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো সৃষ্টিই তাঁর ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের বাইরে নয়।

ষষ্ঠ গুণ- العزيز। তিনি অজেয়, পরাক্রমশালী। আরবী ভাষার ব্যবহারে حصن عزيز অর্থ অজেয় কেল্লা। أرض عزاز রুক্ষ ও কঠিন ভূমি। العزيز শক্তিমান, অজেয়, কঠিন, দুর্লভ।

তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী, অজেয় ও নির্মুখাপেক্ষী এবং ঐ মহিমান্বিত সত্তা যাঁর তুল্য আর কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলার শক্তি ও পরাক্রম সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি মানুষকে মিথ্যা উপাসনা ও গাইরুল্লাহর আরাধনা থেকে মুক্ত করতে পারে-

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

(আর কতই না ভালো হতো) যদি এই জালেমরা যখন কোনো বিপদ দেখে তখন বুঝত যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই আর কঠোর হবে আল্লাহর আযাব। -সূরা বাকারা (০২) : ১৬৫

অর্থাৎ এভাবে চিন্তা করলে কাল্পনিক দেব-দেবীর অক্ষমতা আর আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রম তাদের অন্তরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত এবং ঈমান ও তাওহীদের পথ তাদের জন্য সহজ হত। -বয়ানুল কুরআন

তাঁর পরাক্রমের এক দিক এই যে, তাঁর ফয়সালা রদকারী কেউ নেই। না জাগতিক ব্যবস্থা, না অলৌকিক ব্যবস্থা কোনোটাই তাঁর ফায়সালা রদ করতে পারে না। মানুষ বহু পরিকল্পনা করে ও নানা পদক্ষেপ নেয় কিন্তু অবশেষে তাই ঘটে এবং ঘটনাক্রম সেদিকেই এগুতে থাকে যা আল্লাহর ফায়সালা। মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের ইরশাদ-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ

ওরা কি দেখে না যে, আমি ভূমিকে তার চারদিক

থেকে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা রদকারী কেউ নেই। আর তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। ওদের আগে যারা ছিল তারাও কৌশল করেছিল, কিন্তু সকল কৌশল তো আল্লাহরই ইখতিয়ারে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তিনি তা জানেন এবং কাফেররা শীঘ্রই জানবে, শুভপরিণাম কাদের জন্য। -সূরা রা'দ (১৩) : ৪১-৪২

আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আল্লাহর হাত ফসকে যেতে পারে।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهٗ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

আল্লাহ এমন নন যে, আকাশগুলী ও পৃথিবীর কোনো কিছু তাঁকে অপারগ (সাব্যস্ত) করতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। -সূরা ফাতির (৩৫) : ৪৪

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন। না পৃথিবীতে তোমরা (আল্লাহর ফায়সালা) ব্যর্থ করতে সক্ষম আর না আল্লাহ ছাড়া আছে তোমাদের কোনো অভিভাবক। না সাহায্যকারী। -সূরাতুশ শূরা (৪২) : ৩০-৩১

তাঁর এই পবিত্র নামের মর্ম এভাবে প্রকাশ করা যায়-

الذي لا يُغلَب ولا يُغالَب

যাঁকে পরাজিত করা যায় না, এমনকি যাঁর সাথে প্রতিযোগিতাও করা যায় না।

সপ্তম গুণ- الجبار কর্তৃত্বশালী।

আরবী ভাষার ব্যবহারে বলা হয় جبره على الأمر তাকে ঐ বিষয়ে বাধ্য করল। الجبروت প্রচণ্ড শক্তি ও কর্তৃত্ব। نخلة جبارة দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষ যা হাতে নাগাল পাওয়া যায় না।

الجبار 'আলজাব্বার' আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক ছিফতে জালাল। তাঁর এ পবিত্র নাম নির্দেশ করছে, তিনি ঐ পূর্ণ প্রতাপশালী সত্তা, সমগ্র সৃষ্টির উপর যাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কুল মাখলুক তাঁর দাস, তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনিই প্রভু, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু-সিজদায় আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উল্লেখ করতেন। হযরত আওফ ইবনে মালিক আল আশজায়ী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً.

আমি একরাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (নামাযে) দাঁড়ালাম। তিনি সূরা বাকারা পড়লেন। যখনই কোনো রহমতের আয়াত পড়তেন থামতেন ও রহমত প্রার্থনা করতেন আর যখনই আযাবের কোনো আয়াত পড়তেন থামতেন ও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রুকু করলেন কিয়ামের সমপরিমাণ। রুকুতে তাঁর কথা ছিল-

سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

পবিত্র তিনি যিনি মালিক মহা কর্তৃত্ব ও সাম্রাজ্যের, অপার গরিমা ও গৌরবের।

এরপর কিয়ামের সমপরিমাণ (দীর্ঘ) সিজদা করলেন এবং সিজদাতেও ঐ রকম বললেন। এরপর দাঁড়ালেন ও আলে ইমরান পড়লেন। এরপর এক এক সূরা করে পড়তেই থাকলেন। -মুসনাদে আহমদ ৬/২৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৭৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১১৩২

অষ্টম গুণ- المتكبر

আরবী ভাষাগত দিক থেকে এই শব্দটি বিশিষ্টতার ভাব ধারণ করে। অর্থাৎ তিনিই বড়। বড়ত্ব একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বড়ত্বের ঘোষণা তাঁর জন্যই সুন্দর ও যথার্থ। সৃষ্টির ক্ষুদ্রতা তাঁর সামনেই সত্য ও বাস্তব। পক্ষান্তরে কোনো বান্দা বা দাসের পক্ষে আপন বড়ত্বের অনুভূতি আর অন্যের প্রতি তুচ্ছতার দৃষ্টি মিথ্যা, অসুন্দর ও অবাস্তব।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

يَطْوِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহকে গুটিয়ে নিবেন এরপর তা তাঁর ডান-হাতে ধারণ করে বলবেন, আমিই রাজা। কোথায় সেই কর্তৃত্ব-পরায়ণেরা? কোথায় দাম্ভিকেরা? এরপর যমীনসমূহ গুটিয়ে অন্য হাতে ধারণ করবেন এবং বলবেন, আমিই রাজা। কোথায় কর্তৃত্বপরায়ণেরা? কোথায় সেই দাম্ভিকেরা? -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৪১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৮৮

মনীষীগণ এ পবিত্র নামের আরো বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত তাবেয়ী কাতাদা ইবনে দিআমাহ রাহ. বলেন- هو الذي تكبر عن كل سوء

আবু ইসহাক আস সাবীয়ী রাহ. বলেন-

الذي يكبر عن ظلم عباده

তাবেয়ী মায়মুন ইবনে মিহরান রাহ. বলেন-

تكبر عن السوء والسيئات، فلا يصدر منه إلا الخيرات

এই সকল বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, তিনিই ঐ সত্তা যিনি

সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়-অবিচারের ঊর্ধ্বে। এ পবিত্র নাম নির্দেশ করে যে, তিনিই বড়। বড়ত্বের গৌরব ও গরিমা তাঁরই সৌন্দর্য। তিনি মাখলুকের মতো নন। মাখলুকও তাঁর মতো নয়। সুমহান তিনি, সকল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে এবং সকল অন্যায়-অবিচার থেকে পবিত্র। এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তো তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তাহলে তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করা, তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা কত বড় অন্যায়।

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ওদের শিরক হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান।

এই পূর্ণ-প্রতাপ পবিত্র নামগুলোর– অর্থাৎ আলমালিক, আলকুদ্দুস, আস সালাম, আলমুমিন, আল-মুহাইমিন, আল আযীয, আল জাব্বার ও আল মুতাকাব্বির-এর দাবি বান্দার কাছেও এটাও যে, বান্দা যেন নিজের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। নিজের অধিনস্তদের কথা, কাজ, জীবন ও কর্মের বিষয়ে মুহাসাবা জারি রাখে এবং সকল অন্যায়-অনাচার থেকে, জুলুম-অবিচার থেকে নিজেকে ও সংশ্লিষ্টদেরকে মুক্ত রাখে। অতপর সে যেন হয় মানব-শয়তান ও জিন্ন শয়তানের বিরুদ্ধে অজেয়-পরাক্রমশালী, মাখলুকের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয়, বিশ্বাস, সত্য গ্রহণ ও প্রতিশ্রুতিপূরণ যেন হয় তার ভূষণ, ঈমান ও ইলমের মর্যাদা যেন তার কাছে হয় দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে মূল্যবান। ঈমানী গাইরত ও আত্মমর্যাদা যেন তাকে করে রাখে আত্মার ধনী।

তৃতীয় পর্ব

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা।

আলখালিক অর্থ সৃষ্টিকর্তা, যিনি শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। এ অর্থে স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ।

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

আছে কোনো স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া, যিনি তোমাদের আকাশ ও ভূমি থেকে রিযক দান করেন? –সূরা ফাতির (৩৫) : ৩

নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, রিযকদাতা নেই। আর তাই মহামহিম আল্লাহর সাথে যারা শরীক করে তাদের প্রতি তাঁর সপ্রশ্ন তিরস্কার–

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

ওরা কি এমন সব বস্তুকে (তাঁর) শরীক (সাব্যস্ত) করছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট; ওরা না পারে তাদের সাহায্য করতে, না পারে নিজেদের। –সূরা আল আরাফ (৭) : ১৯১-১৯২

তো অক্ষম সৃষ্টিকে মহান স্রষ্টার সমকক্ষ করার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা ও অন্যায় আর কী হতে পারে?

الْبَارِئُ অর্থ অস্তিত্বদানকারী الْمُصَوِّرُ অর্থ আকৃতিদানকারী। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তা অস্তিত্ব লাভ করে এবং যেভাবে যে রূপ ও আকৃতিতে চান ঐভাবে ঐ রূপ ও আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করে।

বান্দার প্রতি এই সিফতের দাবি, সে যেন আপন স্রষ্টার প্রতি সমর্পিত শোকরগোযার হয় এবং এই দেহ-প্রাণ, এই হৃদয় ও মস্তিষ্ককে তার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার না করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিখ্যাত দুআর একটি অংশ –

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

আমার মুখমণ্ডল তাঁর সকাশে সিজদাবনত যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। তাকে যথাযথ রূপ ও আকৃতি দান করেছেন এবং তাতে চক্ষু ও কর্ণ স্থাপন করেছেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭১

উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের যবানে শুনেছি, 'এই দুআয় এই শিক্ষা আছে যে, এই মুখমণ্ডল শুধু তাঁর সামনেই সিজদাবনত হতে পারে যিনি তা সৃষ্টি করেছেন এবং যথার্থ রূপে সৃষ্টি করেছেন।'

যারা আল্লাহকে সিজদা করে না, আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হয় না, কিংবা হলেও তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে কিংবা কুফর ও ইলহাদে লিপ্ত হয় তাদের প্রতি মহামহিম আল্লাহর প্রশ্ন ও ভর্ৎসনা–

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এরপর (দেখ,) তোমাকে সুঠাম করেছেন। এরপর (দেখ) তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন– যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন। –সূরা ইনফিতার (৮২) : ৬-৮

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى –তাঁরই সকল উত্তম নাম।

বিশদ বর্ণনার পর এ যেন সংক্ষেপ বর্ণনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাঁর নাম ও গুণাবলী অতিপ্রিয়। সুতরাং যারা এ সম্পর্কে জ্ঞান ও মারিফাত অর্জন করে এবং এর শিক্ষা ও দাবি পূরণের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনে প্রয়াসী হয় তারাও তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ–

لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ

আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রশংসা-প্রিয় আর কেউ নেই। আর এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৬০ ●

'কুরআন-সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতা কাম্য'

–মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

মাসিক আলকাউসারের বর্তমান সংখ্যাটিতে আলকাউসারের তত্ত্বাবধায়ক ও মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর আমীনুত তা'লীম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের একটি মূল্যবান গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যার বিষয়বস্তু 'কুরআন মজীদের আয়াত-সংখ্যা।'

বর্তমান সাক্ষাৎকারে আয়াত-সংখ্যা প্রসঙ্গে আরো কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় ও কিছু ভুল চিন্তার নিরসনসহ, কুরআন মজীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় মৌলিক ও সূত্র নির্দেশকারী আলোচনা তিনি করেছেন। তাঁর অন্যান্য আলোচনার মতো এ আলোচনাটিও তালিবানে ইলম ও তালিবানে হকের জন্য চেতনা-উদ্দীপক এবং হক ও ইলমের জন্য গাইরত জাগ্রতকারী সাব্যস্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মারকাযুদ দাওয়াহ-এর উলূমুল হাদীস বিভাগের ৩য় বর্ষের তালিবে ইলম মাওলানা সায়ীদুল হক।

আল্লাহ তাআলা এই মূল্যবান আলোচনাটি কবুল করুন এবং আমাদের সকলকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন। –আবু মুহাম্মাদ

সায়ীদুল হক: আলহামদু লিল্লাহ! আলকাউসারের কুরআনুল কারীম সংখ্যা বের হচ্ছে। আমার মনে হয় পাঠকমহল বেশ আগ্রহ নিয়ে এর অপেক্ষায় আছে। আমি তো বিশেষভাবে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধটির অপেক্ষা করছি। এ সম্পর্কে আমি কিছু পড়াশুনা করেছিলাম। এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন আমার মনে থেকে গেছে। জানি না, আপনার প্রবন্ধে সেগুলোর জবাব এসেছে কি না। অনুমতি হলে প্রশ্নগুলো আরজ করার ইচ্ছা ছিল।

আবদুল মালেক: জ্বী বলুন।

সায়ীদুল হক: মোট আয়াত-সংখ্যার ব্যাপারে যে পার্থক্যের কথা শোনা যায় সে সম্পর্কে তো আমরা জানি যে, তা কুরআন মজীদের আয়াত কম-বেশি হওয়ার পার্থক্য নয়; বরং গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে এ পার্থক্য হয়েছে। আমি জানতে চাইছি আয়াত সমাপ্ত হওয়ার বিষয়টি কি অর্থ ও মর্মের দিক থেকে বক্তব্য পূর্ণ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত? আর মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তাফসীরকারদের মাঝে মতভেদ হয়ে যায়। তো এ কারণেই কি মোট সংখ্যায় পার্থক্য হয়েছে?

আবদুল মালেক: একেবারেই না। গণনা পদ্ধতির বিভিন্নতা মূলত সুন্নাহর বিভিন্নতার অন্তর্ভুক্ত। যার ভিত্তি প্রথমত নববী তাওকীফ। দ্বিতীয়ত তা'লীমে সাহাবা তথা সাহাবায়ে কেরামের শেখানো পদ্ধতি। 'তাওকীফ' অর্থ জানানো, শেখানো। চিন্তা-ভাবনা করে আকল-বুদ্ধি খরচ করে যে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না তাকে 'তাওকীফী' বিষয় বলে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে জানানো ও শেখানোর (তাওকীফের) মাধ্যমেই তা জানা সম্ভব। তো সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের শুরু ও শেষ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে জেনেছেন। এরপর সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে তাবেয়ীগণ। যেহেতু স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানানো ও সাহাবীগণের পরবর্তীদেরকে শেখানোর মধ্যেই বিভিন্নতা ছিল তাই গণনা-পদ্ধতিতেও বিভিন্নতা এসেছে। যেমন কুরআন মজীদের কিছু শব্দে একাধিক কিরাআত (পঠন-রীতি) রয়েছে। আর তা একারণে যে, এক সাহাবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এক কিরাআত শিখেছেন। আর অন্য সাহাবী দ্বিতীয় কিরাআত। একই বিষয় সাহাবীগণের কাছ থেকে তাবেয়ীদের শেখার সময়ও হয়েছে। আয়াত-সংখ্যার পার্থক্যের বিষয়টিও মূলত এ প্রকারের, যার নাম 'তানাউয়ে সুন্নাত'। 'উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা' শীর্ষক পুস্তিকায় এ বিষয়ে কিছু বিশদ আলোচনা আছে। তা পাঠ করা ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। প্রবন্ধে এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে। আয়াত-সংখ্যার বিষয়টি অর্থ অনুধাবন ও তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নয়। এ কারণেই দেখা যায় যে, অনেক জায়গায় কথা একেবারে অসম্পূর্ণ থাকার পরও আয়াত সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সায়ীদুল হক: তাহলে কি এটি সাত কেরাআতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়? অর্থাৎ কেরাআত ভিন্ন হলে সংখ্যাও ভিন্ন হয়ে যাবে?

আবদুল মালেক: না বিষয়টি এমন নয়। পার্থক্যের মূল কারণ কী তা আমি বলেছি। কেরাআত ভিন্ন হলে সংখ্যাও ভিন্ন হবে এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। উদাহরণত সাত কেরাতের একটি কেরাআতের প্রসিদ্ধ ইমাম হলেন আসেম রহ.। দ্বিতীয় আরেক কেরাআতের প্রসিদ্ধ ইমাম হলেন হামযা রহ.। আরেক কেরাআতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেন কিসায়ী

রহ.। এই তিন ইমামই কুফার অধিবাসী। তারা তিনজনই কুফী গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যার মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

তো দেখা গেল কেরাআত তিনটি কিন্তু আয়াত সংখ্যা এক।

সায়ীদুল হক: আমরা জানি উসমান রা. বিভিন্ন শহরে মুসহাফের কপি পাঠিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, যে শহরে একটি করে মুসহাফ পাঠিয়েছেন সে শহরগুলোর প্রত্যেকটিতে এক একটি সংখ্যা চালু হয়ে গেছে। তাহলে কি আয়াত-সংখ্যার বিষয়টি উসমান রা. পাঠানো মুসহাফের সাথে সম্পৃক্ত?

আবদুল মালেক: খোদার বান্দা! আয়াত সংখ্যা ও গণনা পদ্ধতির বিষয়টি 'তাওকীফে নববী' ও 'তা'লীমে সাহাবা'র সাথে সম্পৃক্ত। আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে অবিচ্ছিন্নসূত্রে চলে আসা অনুসৃত এই ইলম ও শাস্ত্রের ধারক বাহক ইমামগণ যে যে শহরে থাকতেন সেই শহরগুলোর দিকে সম্বন্ধিত করে গণনা পদ্ধতিগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন, কুফী গণনা, মক্কী গণনা, মাদানী গণনা প্রভৃতি।

উসমানী মুসহাফ বিভিন্ন হওয়ার কারণে গণনা পদ্ধতিতে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। উসমান রা. কর্তৃক পাঠানো মুসহাফগুলোর কোনোটিতেই আয়াত সমাপ্তির কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। এটি ইলমে কেরাআতের ইমামদের কাছে একটি ঐকমত্যপূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাস্তবতা। আমাদের ফিকহ-ফতোয়ার গ্রন্থাবলীতেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আবু আমর আদদানী রাহ.-এর 'কিতাবুন নাকত' ও ইবনে আবি দাউদের 'কিতাবুল মাসাহিফে' (খ. ২ পৃ. ৫১১-৫৩০) উল্লেখকৃত বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারাও তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আরো জানার জন্য مُصحف طوب قپی سرائے এ সংরক্ষিত যে মুসহাফ طيار آلتي قولاج এর তাহকীকে ছেপেছে তার ভূমিকা পড়তে পারেন।

সায়ীদুল হক: কতেক প্রাচ্যবিদ কর্তৃক লিখিত কিছু গ্রন্থে আমি পড়েছি, তারা লিখেছে যে, মদীনার মুসহাফের আয়াত-সংখ্যার সাথে অন্যান্য শহরে পাঠানো মুসহাফের আয়াত-সংখ্যায় পার্থক্য ছিল। মদীনার মুসহাফে ছয় হাজার আয়াত ছিল। অন্যান্য মুসহাফে আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি!

আবদুল মালেক: إنا لله وإنا إليه راجعون প্রাচ্যবিদদের লেখা গ্রন্থ পড়া খুবই ক্ষতিকর। সাধারণত তাদের লেখায় বিষ ছড়ানো থাকে। ইসলামী বিভিন্ন শাস্ত্র ও প্রাচ্যের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের যে আগ্রহ তার কারণ শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ নয়। তাদের কারও কারও ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হলেও সবাই এ রকম নয়। বরং তাদের অধিকাংশের অবস্থা হল, পড়াশোনার স্বল্পতা, দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং অনুধাবন শক্তির অগভীরতার মত প্রকট সমস্যা তো আছেই এর পাশাপাশি আছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি চরম বর্ণবাদী পর্যায়ের শত্রুভাবাপন্নতা, যার ফলে কখনো সচেতনভাবে কখনো অসচেতনভাবে এর প্রভাব তাদের লেখায় চলে আসে। তাই তাদের লেখা গ্রন্থ কেবলমাত্র তাদের পক্ষ থেকে ছড়ানো বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য শুধু এমন আলেমগণই পড়তে পারেন যাদের মাঝে 'তাযাল্লুয়ে তাম', 'রুসুখ ফিল ইলম', তাকওয়া ও 'রুসুখ ফিল ঈমান' (পূর্ণ সতর্কতা, দৃঢ় পাণ্ডিত্য, খোদাভীতি ও মজবুত ঈমান) প্রভৃতি গুণাবলী আছে। দেখুন না, এই আয়াত সংখ্যার বিষয়টিতেই তারা কী করল?

উসমান রা. যে ইসলামী শহরগুলোতে মুসহাফ পাঠিয়েছিলেন ঘটনাক্রমে সেই শহরগুলোই আয়াত সংখ্যা-সংক্রান্ত শাস্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া একটি বিষয়কে পুঁজি করে কিংবা এই বিষয়টির কারণে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে আয়াত-সংখ্যার বিষয়টিকে উসমানী মুসহাফের সাথে জুড়ে দিয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে লেখকের ভুলের কারণে কিংবা লিপিকারের লিপিভ্রমের কারণে লেখা হয়েছে, প্রথম মাদানী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬০০০। বাস্তবতা হল, প্রথম মাদানী গণনা অনুসারে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৭। কুরতুবী রহ. আয়াত সংখ্যার আলোচনা আবু আমর আদদানী রহ. এর 'আলবয়ানে'র বরাতে লিখেছেন। তিনি নিজেই আবু আমর আদদানীর বরাত দিয়েছেন। আবু আমর আদদানীর 'আলবয়ান'সহ এ শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থে মাদানী আওয়ালের আয়াত সংখ্যা ৬২১৭ ই লেখা হয়েছে। এই ভুলটিকে 'ভুল' হিসেবে চিহ্নিত না করে তারা বরং এর তাকলীদ করা শুরু করেছে। আর মাদানী গণনাকে মাদানী মুসহাফের সাথে জুড়ে দিয়ে এ কথার অবতারণা করেছে যে, মদীনার মুসহাফের আয়াত-সংখ্যা অন্যান্য মুসহাফের আয়াত সংখ্যা থেকে ভিন্ন?!

ইচ্ছে করেই আলোচনার এ ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে যেন পাঠকের মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, উসমান রা. কর্তৃক পাঠানো মুসহাফগুলোতে (আল্লাহ মাফ করুন) আয়াত কম-বেশের পার্থক্য ছিল। তারা গণনা পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে মুসহাফের সাথে জুড়ে দিয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল কুফী মুসহাফে মাদানী গণনা পদ্ধতি অনুসারে আয়াত গণনা করা হলে আয়াত সংখ্যা হবে ৬২১৭। এমনিভাবে মাদানী মুসহাফে কুফী গণনা পদ্ধতি অনুসারে আয়াত গণনা করা হলে আয়াত সংখ্যা হবে ৬২৩৬।

আমাদের প্রবন্ধে এর বাস্তব উদাহরণও পেশ করা হয়েছে। ইমাম নাফে মাদানীর কেরাআতওয়ালা

মুসহাফে কুফী গণনা পদ্ধতি অনুসারে আয়াত নাম্বার বসানো হয়েছে এমন ছাপা মুসহাফ আমাদের সংগ্রহেই আছে।

যাই হোক প্রাচ্যবিদরা কখনো স্পষ্টবাক্যে মিথ্যা বলে কখনো শুধু ওয়াসওয়াসা ছুড়ে দেয়, স্পষ্ট মিথ্যা বলে না। যেন কেউ প্রশ্ন করলে বেরুবার পথ বাকি থাকে। যেমন এই বিষয়টিতেই একটু পর গিয়ে লিখেছে যে, 'এই সবগুলো মুসহাফের শব্দমালা এক'। এ কথা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আয়াত-সংখ্যার পার্থক্য আয়াত কম-বেশি হওয়ার পার্থক্য নয়। নতুবা সবগুলো মুসহাফের শব্দমালা এক হবে কীভাবে।

সায়ীদুল হক: কিন্তু কুরআনুল কারীমের শব্দ-পরিসংখ্যান সম্পর্কে লিখিত বই পুস্তকে যে মোট শব্দ সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তাতে তো পার্থক্য দেখা যায়।

আবদুল মালেক: لا حول ولا قوة إلا بالله! আপনাকে তো আমি আরেকটু সমঝদার মনে করতাম। এক হল শব্দমালা এক হওয়া। আরেক হল, সেই শব্দমালাকে দু'জন লোক আলাদা আলাদা গুণল তো তাদের উভয়ের গণনার ফল এক হওয়া। দু'টি কি এক বিষয়? শব্দমালা এক, কিন্তু গণনা পদ্ধতির মাপকাঠি ভিন্ন হওয়ার কারণে দু'জনের গণনার ফল ভিন্ন হতে পারে। যেমন في الأرض। এখানে বাস্তবে দু'টি শব্দ। কিন্তু কেউ চাইলে এটিকে এক শব্দও ধরতে পারে। أنلزمكموها এখানে পাঁচটি শব্দ। কিন্তু লিপিশৈলির প্রতি লক্ষ্য করে কেউ এটিকে এক শব্দও ধরতে পারে। তো দু'জন যখন দুই দৃষ্টিকোণ থেকে গুণবে তখন তাদের গণনার ফল ভিন্ন হবেই। যদিও যে শব্দমালা গণনা করা হয়েছে সেগুলোতে কোন কম-বেশ নেই।

আর এই যে আপনি বই-পুস্তকের কথা বললেন তো প্রশ্ন হল, কার পুস্তিকা? লেখক কে? লিপিকার কে? প্রুফ দেখেছে কে? প্রকাশক কে? ছাপার তত্ত্বাবধানে ছিল কে? আপনি কি এ বিষয়গুলোও যাচাই করেছেন?

শিথিলতা ও অসচেতনতা তো এখন মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। অনেক সময় লিপিকার বা টাইপরাইটারের ভুল থেকে সৃষ্ট সংখ্যাকেও একটি স্বীকৃত সংখ্যা হিসেবে অনেকে বলতে থাকে! এটা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দীন ও কুরআন সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে অনেক অনেক সতর্কতা প্রয়োজন।

সায়ীদুল হক: তাহলে শব্দ ও হরফ সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক কথা কী?

আবদুল মালেক: আয়াত গণনার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। আয়াত গণনা শুধু হিসাব করে বের করে ফেলার মত কোন বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে হিসাব করতে হলে সেই অনুসৃত গণনা পদ্ধতি অনুসারেই হিসাব করতে হবে যা তাওকীফে নববী ও তা'লীমে সাহাবা থেকে গৃহীত। কিন্তু শব্দ ও হরফ সংখ্যার বিষয়টি এমন নয়। শব্দ ও হরফ সংখ্যা হিসাব করে বের করারই বিষয়। অর্থাৎ এখানে গণনার বিশেষ কোনো মাপকাঠি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়। সুতরাং যে কোনো বৈধ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা হোক অসুবিধা নেই। যেমন শব্দ গণনা করার ক্ষেত্রে নাহ্ব শাস্ত্রের পরিভাষার প্রতি লক্ষ করা হবে নাকি শব্দের লিখিত রূপের প্রতি। তাশদীদযুক্ত হরফকে এক হরফ ধরা হবে নাকি দুই হরফ। এ ধরনের বিষয়গুলো প্রথমে পরামর্শ করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করুন তারপর গণনা করুন। যার হিসাব যত পাকা হবে তার গণনার ফল ততবেশি সঠিক হবে। কুরআনুল কারীম তো সংরক্ষিত এবং তা সংরক্ষিতই থাকবে। এখন মুসহাফে যত হরফ ও শব্দ আছে পূর্বেও তাই-ই ছিল। কুরআনুল কারীমে কেউ একটি হরফও বাড়াতে-কমাতে পারবে না। যদি দু'জন লোক শব্দ ও হরফ হিসাব করে তাদের গণনার ফল ভিন্ন হয় তাহলে তা হবে কারো হিসাবের ভুলের কারণে কিংবা গণনা পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে।

সায়ীদুল হক: শব্দ সংখ্যা ও হরফ সংখ্যা জানার ফায়েদা কী?

আবদুল মালেক: শব্দ সংখ্যার ব্যাপারে আমি যা বুঝি, এটি একটি কৌতূহলের ব্যাপার। তবে এই কৌতূহল একটি প্রশংসনীয় কৌতূহল। কিন্তু শর্ত হল, এতে শিথিলতার পরিচয় দেওয়া যাবে না। নিখুঁতভাবে গণনার কাজটি করতে হবে।

আর হরফ সংখ্যা জানার একটি ফায়েদা হল, কুরআনুল কারীম একবার খতম করলে কম সে কম কত নেকী হবে তার মোট সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। এক হরফে দশ নেকীর হাদীস অনুসারে।

সায়ীদুল হক: আপনি কি কুরআনুল কারীমের হরফ বা শব্দমালা গণনা করেছেন?

আবদুল মালেক: এই সৌভাগ্য এখনো হয়নি।

সায়ীদুল হক: তো শব্দ সংখ্যা ও হরফ সংখ্যার ব্যাপারে কার কথা আপনার কাছে অগ্রগণ্য মনে হয়।

আবদুল মালেক: তাহকীক ছাড়া কীভাবে বলব?

সায়ীদুল হক: আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আরও কিছু কথা ছিল।

আবদুল মালেক: আচ্ছা বলুন।

সায়ীদুল হক: আয়াত সংখ্যার বিষয়টি কি আওকাফুল কুরআন বা কুরআনুল কারীমের ওয়াকফসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়?

আবদুল মালেক: আবার সেই কথা! একবার তো বললাম যে, এই ইলম ইজতিহাদী কোনো ইলম নয় বরং তা তাওকীফী তো এরপর আর এই প্রশ্নের কী অর্থ?

ওয়াকফের বিষয়টি অর্থ ও মর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত

বিষয়। অর্থ ও মর্মের বিচারে এটি নির্ধারিত হয় যে, কোথায় ওয়াকফ করা জরুরি, কোথায় ওয়াকফ করাও যায়, আবার নাও করা যায়। আর কোথায় ওয়াকফ করা মুনাসিব নয়। এ বিষয় তো আপনিও হয়তো জানেন যে, আয়াত সমাপ্ত হওয়ার বিষয়টি অর্থ ও মর্ম পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় কখনো সমাপ্তির স্থলে এসে বক্তব্য পূর্ণ হয়ে যায় আর কোথাও এমন হয় যে, আয়াত তো সমাপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু কথা ও বক্তব্য পূর্ণ হয়নি। অর্থগত দিক থেকে পরবর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের গভীর সম্পর্ক। তাই এ ধারণা করা যে, আয়াত সংখ্যার বিষয়টি ইলমুল ওয়াকফের সাথে সম্পর্কিত বিষয়- একেবারেই ঠিক নয়। ওয়াকফ তো কখনো আয়াতের মাঝখানে করাও জরুরি হয়। আর কখনো আয়াতের সমাপ্তিতেও ওয়াকফ করা জরুরি না।

সায়ীদুল হক: এ বিষয়েও কি একটু আলোকপাত করবেন যে, ইলমে আদাদি আয়াতিল কুরআনে (আয়াত সংখ্যা সংক্রান্ত শাস্ত্রে) পারদর্শী মনীষীগণ কারা? সম্ভবত তাফসীরবিদগণই এ শাস্ত্রে অধিক পারদর্শী হবেন। জালালাইন ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। কখনো কখনো একাধিক সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়।

আবদুল মালেক: ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআন 'ইলমুল কিরাআহ'-এর একটি শাখা। ইলমুল কেরাআতের মোট পাঁচ শাখা-

১. কেরাআত শাস্ত্র (সাত কেরাআতসহ অন্যান্য কেরাআত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ এবং প্রসিদ্ধ কেরাআত সম্পর্কে সম্যক অবহিতি)
২. তাজবীদ শাস্ত্র
৩. ওয়াকফ ও ইবতিদা
৪. কুরআনের লিপিশৈলী শাস্ত্র
৫. আয়াত সংখ্যা সংক্রান্ত শাস্ত্র

সাধারণত ইলমে কিরাআতে পারদর্শী ইমামগণই এ শাস্ত্রে পারদর্শী হন। বিশেষভাবে তাদের মধ্যে যাদের 'ইলমুল কিরাআহ'-এর এই শাস্ত্রে আগ্রহ বেশি ছিল এবং এ শাস্ত্রে কাজও করেছেন বেশি। তাফসীরকারদের মধ্যে যারা স্ব স্ব তাফসীরে আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন তারা ইলমে আদাদের আলোকেই এ আলোচনা করে থাকেন। কাশশাফ ও বাইযাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

তো সারকথা হল, 'ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআন' ইলমে তাফসীরের শাখা নয়, 'ইলমে কেরাআতে'র শাখা। তবে তা এমন শাখা যা স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা রাখে।

সায়ীদুল হক: আপনার প্রবন্ধ তো পঞ্চম শাখা সম্পর্কে। বাকি চার শাখা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

আবদুল মালেক: এ চার শাখা সম্পর্কে ইলমে কেরাআতে পারদর্শী আরব-অনারবের লেখকদের লেখা শত শত গ্রন্থ আছে। প্রত্যেক শতকে সকল ইসলামী শহরে এর ধারক বাহকগণ ছিলেন এবং এখনো আছেন।

সায়ীদুল হক: কমপক্ষে রুমূযে আওকাফ তথা ওয়াকফের চিহ্নাবলী সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবদুল মালেক: উপমহাদেশের মুসহাফ প্রকাশকগণ প্রথমে সাধারণত মাওলানা সাদেক হিন্দী কৃত 'রুমূযুল কুরআন'-এর সহায়তা নিতেন। এখন তো এ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলওয়াকফু ওয়াল ইবতিদা' ছেপেছে। এটি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তইফূর সাজাওয়ান্দী (৫৬০হি.) এর রচনা। ড. মুহাসিব হাশেম দরবেশ এটি তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন। শুরুতে লম্বা ভূমিকা আছে। সাড়ে পাঁচশোরও অধিক পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ইন্টারনেটে আছে। কাগজে ছাপা নুসখাও হয়তো আছে। কিন্তু আমার কাছে নেই।

যাই হোক সাজাওয়ানদী রহ. কর্তৃক বর্ণিত ওয়াকফের চিহ্নাবলী, সেগুলোর ব্যাখ্যা, কোথায় কোন ওয়াকফ বেশি উপযোগী। সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত এ সবের বিস্তারিত বিবরণ সে কিতাবে আপনি পাবেন।

হযরতুল উস্তাযকৃত 'উলূমুল কুরআনে' এই চিহ্নাবলীর ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে ইবনুল জাযারীর 'আননাশর ফিল কেরাআতিল আশর' এর আলোকে কারণ ইবনুল জাযারীও সাজাওয়ান্দীর এই চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখন আপনি সাজাওয়ানদীর কিতাব থেকেই এগুলোর ব্যাখ্যা দেখতে পারবেন।

সায়ীদুল হক: সাজাওয়ান্দী রহ. এর এ কিতাবই কি এ শাস্ত্রের বুনিয়াদী কিতাব?

আবদুল মালেক: আমি প্রসিদ্ধ কিতাব বলেছি। বুনিয়াদী কিতাব তো তার অনেক আগে লেখা হয়েছে। যার কিছু খোদ সাজাওয়ান্দী রাহ. এর কিতাবের উৎস। তবে হ্যাঁ, মুসহাফ লেখকগণ এখন যেসকল ওয়াকফের চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন তার অধিকাংশই শুরু হয়েছে সাজাওয়ান্দী থেকে। একারণে তালিবে ইলমদের মাঝে তাঁর নামই বেশি মশহূর।

সায়ীদুল হক: মুতাওয়াতির কেরাআতসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য শাস্ত্রের বড় বড় কিতাব খুলে দেখা তো আমাদের মত তালিবে ইলমদের জন্য একটু মুশকিল। এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজ পন্থা কী হতে পারে?

আবদুল মালেক: এ সম্পর্কে থানভী রাহ.-এর পুস্তিকাটি, যা বয়ানুল কুরআনের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ছাপা হয়েছে এটি যেমন সহজ তেমনি সংক্ষিপ্তও। এর চেয়েও সহজ পন্থা হল, আপনি এমন মুসহাফ সংগ্রহ করুন যার

টীকায় জায়গায় জায়গায় মুতাওয়াতির কেরাআতসমূহের আলোচনা আছে। যেমন, শামের ইলমে কেরাআতে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের শায়খ মুহাম্মদ কুরাইয়িম রাজেহের তত্ত্বাবধানে ছাপা হওয়া মুসহাফ। যার নাম হল,

القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة في هامش القرآن

প্রকাশক: দারুল মুহাজির হারামাওত। এমনিভাবে দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমে কেরাআত বিভাগের সাবেক প্রধান মাওলানা আবুল হাসান আযমী দামাত বারাকাতুহুম ১৪০৬ হিজরীতে একটি মুসহাফ ছেপেছেন। এর টীকায় জায়গায় জায়গায় মুতাওয়াতির কেরাআতসমূহের উল্লেখ আছে।

এ কথাও শুনেছি যে, গুজরাট থেকে এ ধরনের একটি মুসহাফ ছেপেছে। দারুস সাহাবা, তানতা, মিসর থেকেও এ ধরনের মুসহাফ ছাপা হয়। এ ধরনের কোন মুসহাফ নিন, তেলাওয়াতের সময়ই আপনি টীকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, এখানে অন্য কোন মুতাওয়াতির কেরাআত আছে কি নেই?

সামীদুল হক : বর্তমানে জেনারেল শিক্ষিতশ্রেণির অনেকের মধ্যে কোরআন বোঝার বেশ আগ্রহ লক্ষ করা যায়। তো সঠিকভাবে কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কী?

আবদুল মালেক : তাওযীহুল কুরআনের ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। কিন্তু তারা এর উপর আমল করেন না। তারা সংক্ষিপ্ত উপায় অন্বেষণ করেন। আমার মতে এটা ভুল। সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে কোরআন বোঝার আগ্রহ বেশ ব্যাপক। একে আরো ব্যাপক করার পরিবর্তে নিয়ম-নীতির ভিতরে আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। নিয়ম-পরিপন্থী কাজকর্মের দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি।

এ বিষয়ে মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুমের মাকালা থেকে উপকৃত হওয়া যায়, যা বর্তমান সংখ্যায় রয়েছে।

সামীদুল হক: সালাফ তো দৈনিক এক মনযিল পড়তেন আর সাধারণত সাত দিনে তাদের খতম শেষ হয়ে যেত। আমরা তো কমজোর আমাদের করণীয় কী?

আবদুল মালেক: পারার ব্যবস্থা তো কমজোরদের জন্যই। দৈনিক এক পারা হলে এক মাসে এক খতম। এরপর আধা পারা ও এক চতুর্থাংশের চিহ্নও তো আছে। এরপর আর কী! আসল কথা হল, আমরা এখন তেলাওয়াতের স্বাদই উপলব্ধি করি না। যদি তাদাব্বুর (বুঝে বুঝে) ও তারতীলের সাথে তেলাওয়াতের অভ্যাস করা যায় এবং ধ্যান করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার তেলাওয়াত গুরুত্বের সাথে শোনেন তাহলে শত ব্যস্ততা ও শত দুর্বলতার মধ্যেও কুরআনের সাথে দৈনিক একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় অবশ্যই অতিবাহিত হত।

সামীদুল হক: আমাদের এখানকার মুসহাফসমূহে কুরআন মজীদ শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ সূরা নাসের পর সাধারণত দু'টি দুআ লেখা থাকে। একটি দুআ সংক্ষিপ্ত ...اللهم انس وحشتي। অপরটি একটু লম্বা। যাতে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত প্রতিটি হরফ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলার কাছে বিভিন্ন নেক গুণাবলী প্রার্থনা করা হয়েছে। আমি এ দু'আগুলোর হাওয়ালা জানতে চাচ্ছিলাম। প্রকাশকরা তো এই উভয় দুআ অন্ততপক্ষে লম্বা দুআটিকে অবশ্যই 'কুরআন খতমের দুআ' শিরোনাম দিয়ে উল্লেখ করেন।

আবদুল মালেক: এ বিষয়টি তো সবাই বুঝবে যে, এই দুই দুআর কোনোটিই কুরআনের দুআ নয়। বাকি থাকল এগুলো হাদীসের দুআ কি না। তো এতটুকু তো আপনিও জানেন যে, হাদীস শরীফে কোন বিশেষ দুআকে 'কুরআন খতমের দুআ' নাম দেওয়া হয়নি। 'আলইতকান' 'আননাশর ফিল কিরাআতিল আশর' এবং ইমাম আলামুদ্দীন সাখাবী এর 'জামালুল কুররা' থেকে আপনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা পড়তে পারেন। হ্যাঁ বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে এ কথা তো প্রমাণিত যে, কুরআন খতম করার পর কোন না কোন দুআ কবুল হয়। তাই অবস্থানুসারে যে কোন মা'ছুর (কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত) বা গায়রে মা'ছুর (কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত নয়) দুআ করা যেতে পারে। হাদীস শরীফে পেরেশানি দূর হওয়ার জন্য একটি দুআ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দুআটি কুরআন খতমের সময়োপযোগী। আরবের কোন কোন মুসহাফ প্রকাশক এ দুআটি মুসহাফের শেষে দিয়ে থাকেন। ইমাম আলামুদ্দীন সাখাবী রহ. ও দু'আটি উল্লেখ করেছেন।

দুআটির আরবী পাঠ এই–

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

দুআটির অর্থ: ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার দাস, পুত্র আপনার দাসের, পুত্র আপনার দাসীর। আমার ঝুঁটি (পূর্ণ সত্তা) আপনার কব্জায়। আমার উপর আপনার বিধানই কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আমি আপনার সকল নামের তোফায়েলে যা দ্বারা নিজেকে আপনি গুণান্বিত করেছেন কিংবা আপন কিতাবে নাযিল করেছেন কিংবা নিজের কোনো সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছেন কিংবা আপনার কাছেই গোপন রেখেছেন, প্রার্থনা করছি, কুরআনকে করুন আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার চোখের জ্যোতি, আমার বেদনার মলম ও আমার দুশ্চিন্তার উপশম।

-মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৩৭১২

আপনি যে দু'টি দুআর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন তার মধ্যে লম্বা দুআটিতো শোনামাত্রই যে কোন তালিবে ইলম বুঝবে যে, এটি কোন বুযুর্গ কর্তৃক রচিত, মা'ছুর দুআ নয়। তবে সংক্ষিপ্ত যে দুআটি মুসহাফের শেষে লেখা হয় তা মা'ছুর দুআর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সব প্রকাশক দুআটির আসল ও সঠিক আরবী পাঠ দিতে পারেন না। দুআটির আসল আরবী পাঠ নিম্নরূপ-

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي اماماً ونوراً وهدي ورحمة-، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته اناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العلمين

দুআটির অর্থ: ইয়া আল্লাহ! কুরআনের উসিলায় আমার উপর রহম করুন এবং তাকে আমার জন্য করুন পথ প্রদর্শক ও আলো এবং হেদায়েত ও রহমত। ইয়া আল্লাহ! আমি তার যে অংশ ভুলে গেছি, তা ইয়াদ করিয়ে দিন এবং যা জানি না তা শিখিয়ে দিন। আর দিন-রাতের মুহূর্তগুলোতে তিলাওয়াতের সৌভাগ্য দিন। হে রাব্বুল আলামীন! কুরআনকে করুন আমার পক্ষে দলিল।

সায়ীদুল হক: এ দুআর শুরুতে اللهم انس وحشتي في قبري এ বাক্যটি তো সব জায়গায় লেখা দেখি।

আবদুল মালেক: সব জায়গায় কোথায়? আমি অনেক মুসহাফের শেষে দেখেছি, এ দুআ আছে কিন্তু শুরুতে এই বাক্যটি নেই।

সায়ীদুল হক: আফওয়ান।

আবদুল মালেক: শুকরান।

সায়ীদুল হক: এ বাক্যটি কি গলদ?

আবদুল মালেক: গলদ নয়। অর্থগতভাবে তো একেবারেই ঠিক। বলার উদ্দেশ্য হল, এ বাক্যটি মা'ছুর দুআর অংশ নয়।

সায়ীদুল হক: আমাকে একজন বলেছে যে, উক্ত দুআটি সুয়ূতী রহ.-এর 'যাইলুল মওযূআতে' আছে।

আবদুল মালেক: না, সেখানে শুধু প্রথম বাক্যটি আছে। পূর্ণ দুআ সেখানে নেই। থাকা উচিতও নয়।

সায়ীদুল হক: তাহলে এই দুআর হাওয়ালা কী?

আবদুল মালেক: এ দুআটি একটি মুরসাল (বরং পরিভাষা অনুসারে বলা উচিত মু'দাল) রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিস আবু মানসুর মুযাফফর ইবনে হুসাইন আলআরজানী 'ফাযায়েলুল কুরআনে' এবং মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনুয যাহহাক 'আশশামায়েল' গ্রন্থে এ রেওয়ায়েত তাখরীজ করেছেন। রেওয়ায়েতের ভিত্তি-ব্যক্তি হলেন তাবে তাবেয়ী দাউদ ইবনে কায়স। তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি কুরআন খতমের পর পড়তেন, اللهم ارحمني بالقرآن। এই দুই মুহাদ্দিসের হাওয়ালায় জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তার কিতাব 'আলকালিমুত তাইয়িবে' রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী রহ. 'আল হিযবুল আ'যমে' এ দুআটি উল্লেখ করার সময় اللهم انس وحشتي في قبري এ বাক্যটিও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল হিযবুল আ'যমের উৎস গ্রন্থগুলোর (মোট পাঁচ কিতাব: ইমাম নববীর 'আলআযকার', ইবনুল জাযারীর 'আলহিসনুল হাসীন', সুয়ূতী রহ. এর 'আলজামিউস সগীর', 'আলজামিউল কাবীর', 'আলকালিমুত তাইয়িব') কোনটিতেই এ বাক্যটি নেই।

তবে এটি ভিন্ন কথা যে, সহীহ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, কুরআন কবরে ও হাশরে কুরআনওয়ালার সঙ্গী হবে।

সায়ীদুল হক: আলহামদু লিল্লাহ! একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানতে পারলাম। আমরা এ দুআর হাওয়ালা নিয়ে পেরেশান ছিলাম।

আবদুল মালেক: এ আর এমন কি বিষয়। আলকালিমুত তাইয়্যিব যদিও এখন এত সুলভ নয় কিন্তু ইবনুল জাযারী রহ. উপরিউক্ত হাওয়ালাসহ 'আননাশর ফিল কিরাআতিল আশরে' এ সংক্ষিপ্ত দুআটি উল্লেখ করেছেন। (আননাশর, খণ্ড ২য় পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৪) 'আননাশর' তো অনেক আগেই ছাপা হয়েছে।

সায়ীদুল হক: আর দু'একটা প্রশ্ন...

আবদুল মালেক: আরে ভাই খতমের দুআ হয়ে গেছে এখন আবার প্রশ্ন!?

সায়ীদুল হক: আচ্ছা ঠিক আছে। অন্য কোন সময়।

আবদুল মালেক: জাযাকাল্লাহু খায়রান

সায়ীদুল হক: শুকরান জাযীলান।

আবদুল মালেক: ওয়াইয়্যাকুম। ●

অর্থ ও অর্থনীতি : কুরআনের নির্দেশনা

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

কুরআনে কারীম সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মানবজাতির ইহ ও পরকালীন সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর এটা যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য তাই কুরআনের হেদায়েতের বাণীগুলো সর্বজনীন এবং সকল যুগের জন্য সমান উপযোগী। আল্লাহ তাআলা যেহেতু আলিমুল গাইব তথা ভবিষ্যত দ্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা তাই কুরআনের বিধানগুলো এমনভাবে এসেছে, যা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় যেমন সে কালের বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছে তেমনি পরবর্তী যুগ ও বর্তমান যুগে সৃষ্টি হওয়া সকল চিন্তাধারা ও মতবাদ সম্পর্কেও কুরআনে হেদায়েত পাওয়া যায়। আর কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। তাই কুরআন পড়লে চিন্তাবিদগণ শুধু বিস্মিতই হন যখন তারা দেখেন, দেড় হাজার বছর পরে সৃষ্টি হওয়া নতুন মতবাদের নীতিগুলো সম্পর্কেও কুরআন থেকে নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ আগের সময়ের মানুষগণ এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যখন করেছেন তখন তাদের চিন্তায়ও হয়তো এখনকার মতবাদগুলোর কথা আসেনি। পৃথিবী যখন বলছে যে, সে উন্নত হয়ে যাচ্ছে, মানুষ সভ্য হয়ে যাচ্ছে– মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে সভ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সভ্য হচ্ছে এবং কেবল উন্নতির শিখরে উঠছে তখন একজন মুসলিম তার কুরআন দিয়ে সেসব দাবির যৌক্তিকতা বা অসারতা যাচাই করার সুযোগ পাচ্ছেন। এমনকি ঐ মতবাদওয়ালারাও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর দেখতে পাচ্ছে যে, তাদের যেসব চিন্তা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল তা ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টিতেও অসার হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের আলোচিত বিষয়গুলো যেমন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি, মানবাধিকার, নারী অধিকার, মুক্তচিন্তা প্রভৃতি সকল বিষয়েই এ কথাগুলো প্রযোজ্য। আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দেখব, অর্থ ও অর্থনীতি সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা কী? আমরা কুরআনের দর্পণে দেখার চেষ্টা করব কুরআন নাযিল হওয়ার বার-তের শ বছর পর আধুনিক অর্থনীতিরূপে চালু হওয়া মতবাদগুলোকেও।

মানবজীবনে অর্থ-সম্পদ কী পরিমাণ থাকা দরকার তা বিচার-বিচার্য বিষয় হলেও কিছু অর্থ-সম্পদ যে মানুষের জন্য জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ খানা-বাসস্থান ছাড়াও একজন মুসলমানের নামায আদায়ের জন্যও প্রয়োজন কিছু অর্থের। কারণ সতর ঢাকার জন্য কাপড়, অযু-গোসলের জন্য পানিও তো তাকে কিনতে হয়। তাই প্রচলিত অর্থনীতিগুলোকে কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের পূর্বে আমরা নজর দিতে চাই অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কুরআন কী বলে সেদিকে।

আমরা দেখতে পাই যে, অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কুরআনে কারীমের নির্দেশনা ইতিবাচক। কুরআনের কোনো জায়গায় সম্পদকে خَيْر (ভালো ও উত্তম) বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, তোমরা যে (খাইর) সম্পদই ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য (ব্যয় করবে)। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।'–সূরা বাকারা (২) : ২১৫

উক্ত আয়াতে সম্পদের দুটি দিক নিয়েই আলোচনা হয়েছে। এক. অর্থ উপার্জন, দুই. তার ব্যয় ব্যবস্থাপনা।

এখানে خَيْر-এর শাব্দিক অর্থই হল ভালো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনের সম্পদকে খাইর তথা উত্তম ও ভালো আখ্যা দিয়েছেন সঙ্গত কারণেই। যেহেতু মুমিন যা উপার্জন করবে তা তো উত্তমই হবে। সে তো কোনো খারাপ কামাই করবে না।

অন্য জায়গায় সম্পদকে فَضْل (অনুগ্রহ) বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

'আর কতক মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করবে।'–সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ২০

সূরা জুমুআয় ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

'অতপর নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ

(সম্পদ) অন্বেষণ কর।'–সূরা জুমুআ (৬২) : ১০

এর বিপরীতে সম্পদকে কুরআনে كَنْز (অনুমোদনহীন রিজার্ভ)ও বলা হয়েছে। যেমন সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

'আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও।'–সূরা তাওবা (৯) : ৩৪

উপরোক্ত আয়াত যখন নাযিল হল সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ সোনা-রূপা কিছু না কিছু তো অনেকের কাছেই থাকত। উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, যে মালের যাকাত দেওয়া হয় না সেটাই হল কানয। পক্ষান্তরে যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয়েছে সেটা كَنْز (কানয) নয়। এতে বোঝা যায়, এখানে কানয দ্বারা কী উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা কারূনের সম্পদকে কানয বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ

'আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল।'–সূরা কাসাস (২৮) : ৭৬

দেখা যাচ্ছে, সঠিক পন্থায় আয় হলে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ব্যয় হলে কুরআনের দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদ অবশ্যই ভালো ও কল্যাণকর। তবে যথাযথ পন্থায় উপার্জন ও ব্যয় না হলে সে সম্পদের খারাপ পরিণতির কথাও কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে।

কুরআনে সম্পদের ক্ষেত্রে فِتْنَة (ফিতনা) শব্দের ব্যবহারও এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা।'–সূরা আনফাল (৮) : ২৮

আল্লাহ তাআলা সম্পদ বিনা শর্তে দিয়ে দেননি; বরং এ সম্পদ দ্বারা তিনি পরীক্ষা নেন। যাকে তিনি সম্পদ দেন তাকে কিছু দায়-দায়িত্বও দেন। فِتْنَة ফিতনা-এর অর্থ এ নয় যে, বান্দা কোনো সম্পদ উপার্জন করবে না; বরং সম্পদ উপার্জন ও খরচের পরীক্ষায় সে যেন উত্তীর্ণ হয় সেদিকেই আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কুরআনে যে বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে এর জন্য সূরা জুমুআ পড়া যেতে পারে। ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন নামাযের আযান দেওয়ার পর তোমরা আল্লাহর যিকিরের প্রতি দৌড়াও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন কর। অতপর নামায শেষ হলে তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (সম্পদ) অন্বেষণ কর। এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।'–সূরা জুমআ (৬২) : ৯-১০

উক্ত আয়াতে যেমনিভাবে জুমআর দিন কিছু সময় নামায-খুতবায় ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেমনি নামায আদায়ের আগে ও পরে কামাই-রোজগারের হুকুমও এসেছে। আয়াতের 'ফযলুল্লাহ' তথা অর্থ-সম্পদ উপার্জনের কথা বলার আগে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ অর্থাৎ তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পড়। এ বাক্য রোজগারের সবগুলো বৈধ খাতের দিকেই ইঙ্গিত করে।

কৃষি

সম্পদ উপার্জনের মৌলিক ও স্বীকৃত যেসব পন্থা রয়েছে এর সবগুলোর আলোচনাই কুরআন মজীদে আছে। যেমন, মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য কৃষি খাতের কথা আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে বহু জায়গায় বলেছেন। সূরা ওয়াকিয়া দেখা যাক। আল্লাহ তাআলা বলছেন–

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ

'তোমরা যা বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা উৎপন্ন কর, না আমি তা ফলাই?'–সূরা ওয়াকিয়া (৫৬) : ৬৩-৬৪

অপর আয়াতে এসেছে–

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا

'তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন।'–সূরা হূদ (১১) : ৬১

اِسْتَعْمَرَكُمْ অর্থ জমি আবাদ করা। চতুর্থ শতাব্দীর ফকীহ ও তাফসীরবিদ ইমাম জাসসাস রাহ. আহকামুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন–

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا : يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য জমি আবাদ করার। (তিনি বলেন,) এ আয়াত দ্বারা কৃষি, ক্ষেত-খামার, গাছপালা রোপন এবং ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য জমি আবাদ করা যে আবশ্যকীয় দায়িত্ব– সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।–আহকামুল কুরআন, জাসসাস ৩/১৬৫

উক্ত আয়াতে কৃষি থেকে শুরু করে খনিজ সম্পদ, জ্বালানি তেল, লোহা ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসা

সম্পদ উপার্জনের স্বীকৃত পন্থাগুলোর অন্যতম হচ্ছে ব্যবসা। কুরআনে এসেছে–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

'আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'–সূরা বাকারা (২) : ২৭৫

সূরা জুমুআতেও ব্যবসার কথা এসেছে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সূরা নিসায় কুরআনের ইরশাদ–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোন ব্যবসা করা হলে (তা বৈধ)।'–সূরা নিসা (৪) : ২৯

উক্ত আয়াতে ব্যবসার অন্যতম শর্ত বলে দেওয়া হয়েছে যে, ব্যবসা একপক্ষীয় নয়; বরং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টি ও স্বার্থ রক্ষা করা আবশ্যক।

শ্রম

সম্পদ উপার্জনের স্বীকৃত একটি পন্থা হল শ্রম। কুরআন শ্রম ও শ্রমিকের কথা সুস্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছে। কায়িক পরিশ্রম করে উপার্জন করার রেওয়াজ আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যেও ছিল। কুরআনে মুসা আ.-এর শ্রমের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে–

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

'তাদের (নারীদ্বয়ের) একজন বলল, আব্বাজী! আপনি তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ দিন। কেননা আপনার মজুর হিসাবে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে শক্তিশালী ও আমানতদার।'–সূরা কাসাস (২৮) : ২৬

এখানের আয়াতগুলোতে শ্রমের কথা, ভালো শ্রমিকের গুণের কথা এমনকি চুক্তির মেয়াদের কথাও উল্লেখ হয়েছে। ভালো শ্রমিকের দুটি গুণ الْقَوِيُّ ও الْاَمِيْنُ সামর্থবান ও বিশ্বস্ত দুটি গুণের কথা আয়াতে এসেছে।

বর্তমান সময়ের সাথে এই 'বিশ্বস্ততা'র গুণকে মিলিয়ে নিন। আপনি কাউকে রোজ ভিত্তিতে বা মাস ভিত্তিতে চাকরি দিলে নজরদারি করে কতটুকু কাজ নিতে পারবেন। অন্যদিকে যদি চুক্তিতে কাউকে কোনো কাজ দেন তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজের মান কেমন হয়। কিন্তু সৎ শ্রমিক ও চাকুরের ক্ষেত্রে কুরআনের اَمِيْنٌ তথা বিশ্বস্ততার শব্দটির মর্মের উপর যদি আমল হয় তখন কি এ সমস্যাগুলো থাকবে?

আরেকটু সামনে গিয়ে কুরআন মালিকপক্ষের আচরণ চাকুরে ও শ্রমিকের প্রতি কী হবে– তাও ব্যক্ত করেছে এভাবে–

وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ

'আমি তোমার উপর কোন কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না।'–সূরা কাসাস (২৮) : ২৭

অর্থাৎ নিয়োগকর্তার দায়িত্ব হল তার অধীনস্থদের সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে না দেওয়া। যদি কখনো কোনো ভারি কাজ তাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে যেন তাকে সাহায্য করা হয়। এ কথাই বলা হয়েছে হাদীসে পাকে,

فإن كلفتموهم فأعينوهم

অর্থ : যদি তোমরা তাদেরকে কোনো ভারি কাজ অর্পণ কর তাহলে তাতে তাদের সাহায্য করো।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩০

উপার্জনের একটি উপায় শিল্প

কুরআন মজীদে শিল্পের কথাও এসেছে বিভিন্নভাবে। এক জায়গায় এসেছে–

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

'আর আমি নাযিল করেছি লোহা। তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি ও মানুষের বহুবিধ উপকার।'–সূরা হাদীদ (৫৭) : ২৫

আল্লাহ তাআলা লোহার খনি দিয়েছেন। তখনকার এবং এখনকার বড় বড় শিল্প লোহাভিত্তিক। আদিকাল থেকেই মানুষ লোহাকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করে আসছে। যাতায়াত, বাসস্থান, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্রসহ বহু শিল্পই লোহাভিত্তিক।

দেখা গেল, কামাই-রোজগারের মৌলিক পন্থাগুলোর কথা কুরআন মজীদে এসেছে। আর এগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে।

অর্থনীতি

অর্থ ও সম্পদ সম্পর্কে কুরআনের কিছু নির্দেশনা জানার পর এখন নজর দেব অর্থনীতির দিকে। সাথে এও দেখব, বর্তমান সময়ের দুটি অর্থনীতি–

ক্যাপিটালিজম ও স্যোশালিজম তথা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বক্তব্যগুলো কুরআনী হেদায়েতের আলোকে কেমন?

কুরআনী অর্থনীতির আলোচনায় যাওয়ার আগে এ কথা বলে নেওয়া ভালো যে, কুরআনুল কারীম প্রচলিত অর্থের কোনো বিধিবদ্ধ আইনের বা সংবিধানের বই নয়। তাই এতে ধারাবাহিক ও বিধিবদ্ধভাবে আইন-কানুনের বর্ণনা নেই। কিন্তু মানব ও জিন জাতির ইহ ও পরকালীন যত প্রয়োজন সে সবের মৌলিক নির্দেশনা কুরআনে রয়েছে। অর্থনীতিও এর বাইরে নয়। অর্থনীতির মৌলিক নীতিগুলোও কুরআন বলে দিয়েছে। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা হাদীসের মধ্যে পাই এবং পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের কাছে পাই।

প্রচলিত অর্থনৈতিক চিন্তাগুলো কুরআনের দৃষ্টিতে যাচাইয়ের শুরুতেই ব্যক্তিগত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। কয়েক বছর আগে এক জেনারেল শিক্ষিত ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন। মনে হল, সাংবাদিক। তিনি বললেন, এক জায়গা থেকে আপনার কথা শুনে এসেছি। আমার হাতে একেবারে সময় নেই। কিছুক্ষণ পর প্রেসক্লাবে একটা সেমিনার আছে। ওখানে আমার একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। বক্তব্যের সময় একদম কম। মাত্র কয়েক মিনিট। এর মধ্যে আমাকে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বলতে হবে এবং প্রচলিত অর্থনীতি সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে হবে। আমি তাকে বললাম, অর্থনীতি কি খেলার জিনিস? দুই-তিন মিনিটেই আপনাকে অর্থনীতি বলে ফেলব? লোকটি খুবই ভদ্র। অনুনয়-বিনয় করে আবার তার কথায় ফিরে এলেন। দয়া করে কটি কথা বলে দিন। তো তখন আমি যে কথা বললাম তা আগে ওভাবে চিন্তা করিনি। অর্থনীতি তো অনেকদিন থেকেই পড়ি। তার কথার ফাঁকেই হঠাৎ একটা বিষয় মনে এল। তাকে বললাম, কুরআন পড়া শুরু করুন।

الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

দেখুন, কুরআনের একদম শুরুতেই অর্থনীতির কথা আছে এবং প্রচলিত মানবচিন্তিত অর্থনীতির খণ্ডনও আছে। কুরআন প্রচলিত অর্থনৈতিক চিন্তাগুলো খণ্ডন করে দিয়েছে একেবারে শুরুতেই। আর সম্পদের ব্যাপারে কুরআনের কী নির্দেশনা তারও ইঙ্গিত একেবারে শুরুতেই রয়েছে। তিনি খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললেন, কীভাবে? বললাম, وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-এর অর্থ হল "আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য ভোগ করার উপকরণ। رزق (রিযিক)-এর অর্থই হল ভোগের উপকরণ, টাকা-কড়ি, অর্থ-সম্পদ সবকিছুই। সেখান থেকে কিছু অংশ তারা অন্যদের পিছনে খরচ করে। বললাম, দেখুন। এখানে পুঁজিবাদের চিন্তা-চেতনার খণ্ডন পাওয়া যাচ্ছে। আর পুঁজিবাদের ইতিবাচক দিকটির পক্ষে দলীল পাওয়া যাচ্ছে। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রের চিন্তা-চেতনার খণ্ডন পাওয়া যাচ্ছে এবং সমাজতন্ত্রের ইতিবাচক দিকটির পক্ষে দলীল পাওয়া যাচ্ছে। যদিও পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র সে যুগে ছিল না, কিন্তু কুরআন এমন একটা নির্দেশনা দিয়েছে, যার দ্বারা আমরা এ মতবাদগুলো যাচাই করতে পারি। এখানে বলা হয়েছে مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ 'তাদেরকে যা দিয়েছি।' এখানে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করা হয়েছে। هُمْ মানে তাদেরকে অর্থাৎ ব্যক্তি। পুঁজিবাদ ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করে। يُنْفِقُوْنَ অর্থ হল, তারা (অন্যদের পিছনে) ব্যয় করে। সমাজতন্ত্র বলে সম্পদ কারো একা ভোগের জন্য নয়; বরং তা সকলের জন্য। কুরআনও বলে, সম্পদ তোমার একা ভোগ করার জন্য নয়; বরং সকলের জন্য। নিজে ভোগ করবে, অন্যকেও দিবে। সাথে সাথে এ বাক্যটিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের খণ্ডনও পাওয়া যাচ্ছে। কারণ পুঁজিবাদ বলে, তোমার সম্পদ তোমার। সম্পদ আহরণ, সম্পদ ভোগ করা আইনের ভিতরে থেকে তোমার একান্তই অধিকার এবং নিরঙ্কুশ অধিকার। শুধু রাষ্ট্রের নিয়মের ভিতর থাকলেই হল। রাষ্ট্র শৃঙ্খলার জন্য কখনো কখনো কোনো আইন করে। সেগুলো মেনে চললেই হল। (না মানলেও চলে, মাঝেমধ্যেই তো কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আসে)। মোটকথা, সম্পদ অর্জন তোমার নিরঙ্কুশ অধিকার। কুরআন এই চিন্তাকে খণ্ডন করে, অস্বীকার করে। বাক্যের শুরুতেই এটার খণ্ডন আছে। কেননা এখানে বলা হয়েছে– رَزَقْنٰهُمْ আমি দিয়েছি। ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলমানদের বিশ্বাস ও আকীদা হল, সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ এবং কেন্দ্রীয় মালিকানা আল্লাহর। মানুষকে তিনি দিয়েছেন নিয়ন্ত্রিত ও শর্তযুক্ত মালিকানা। মুসলমান যেহেতু সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহর– এ নীতিতে বিশ্বাস করে তাই সম্পদ সম্পর্কে পরবর্তী যত নিয়ন্ত্রণ ও নীতিমালা সবগুলো সে মাথা পেতে মেনে নেয়। অন্যদিকে আয়াতের প্রথম বাক্যে ব্যক্তি মালিকানার প্রমাণ থাকায় তা দ্বারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাও খণ্ডিত হয়।

লোকটি এতটুকু শুনেই সন্তুষ্টচিত্তে চলে গেলেন। বললেন, এতেই আমার চলবে।

তো যাই হোক অর্থ সম্পর্কে কুরআনের প্রথম নীতি হল, সকল অর্থ-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তাআলা। কুরআনে কারীমে খুব স্পষ্টভাবেই বিভিন্ন স্থানে তা এসেছে। যেমন-

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।-সূরা বাকারা : ২৮৪

এখানে مَا একটি 'আম' ব্যাপক শব্দ। কোনো কিছুই এর বাইরে নেই। অর্থ ও অর্থের উৎস দুটোই এর মধ্যে আছে।

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

'আপনি জিজ্ঞেস করুন, এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তা কার, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে আল্লাহর।'-সূরা মুমিনূন (২৩) : ৮৪

আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

وَآتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ آتٰكُمْ

'আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর।'-সূরা নূর (২৪) : ৩৩

একদম স্পষ্ট। অর্থাৎ মাল ও সম্পদ আল্লাহরই। তিনি তোমাদের তা দিয়েছেন। এখানে যেমনিভাবে কেন্দ্রীয় ও নিরঙ্কুশ মালিকানা আল্লাহর-এ কথা প্রমাণিত হয়েছে তেমনি آتٰكُمْ দ্বারা ব্যক্তি মালিকানাও সাব্যস্ত হয়েছে। তবে ব্যক্তিমালিকানাটা যে শর্তযুক্ত সে ইঙ্গিতও এই আয়াতেই রয়েছে। বলা হয়েছে آتُوْهُمْ অর্থাৎ মালিক হলেও সব তুমি ভোগ করবে না, অন্যদেরও দিতে হবে। অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট আছে-

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

'এবং তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী (অভাবগ্রস্ত) ও বঞ্চিতদের হক।'-সূরা যারিয়াত (৫১) : ১৯

এই যে আমরা বলি ও বিশ্বাস করি এবং কুরআনও বলে যে, সকল সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহর-সাধারণ যুক্তিতেও তা স্পষ্ট। যদিও আল্লাহর কথাই বান্দার শিরোধার্য। তবুও বস্তুবাদী এ দুনিয়ায় আমরা প্রায়শই যুক্তি খোঁজ করে থাকি। যাহোক, আমরা দেখতে পাই যে, সকল সম্পদের মূল উৎস তিনটা :

১. মাটি ২. পানি ও ৩. আগুন। আপনি খাদ্য, পানীয়সহ যত সম্পদ দেখবেন এই তিন জিনিসের বাইরে হবে না। হয়তো মাটির খনি থেকে এসেছে। যদি বলি, প্লাস্টিক, তবে সেটা গাছ থেকে এসেছে আর গাছ মাটি থেকে এসেছে। ঐ গাছ বড় হতে পানি লেগেছে। কারখানায় তৈরি হয়ে আসতে আগুন লেগেছে। তেবে দেখুন, এ সবের কোনোটি কি মানুষ তৈরি করতে পেরেছে? মানুষ যত বাহাদুরি করুক, হাঁক-ডাক দিক, চাঁদ অতিক্রম করে মঙ্গলে চলে যাক, কিন্তু তার দৌড় আল্লাহর দেওয়া মাটি, পানি ও আগুন পর্যন্তই। কুরআনের সূরা ওয়াকিয়া পড়ুন। আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর করেই না বলেছেন-

أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ، ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ

'তোমরা যা বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা উৎপন্ন কর, না আমি তা ফলাই?'-সূরা ওয়াকিয়া (৫৬) : ৬৩-৬৪

এরপর পড়ুন-

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ، ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ

'তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা মেঘ থেকে তা নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি?'-সূরা ওয়াকিয়া (৫৬) : ৬৮-৬৯

কে না জানে যে, শিল্পোন্নতির এ যুগেও কল-কারখানাগুলোর অন্যতম উপাদান পানি। আল্লাহ তাআলা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছেন-

তোমার সম্পদের মূল উৎস মাটি আমার দেওয়া। মাটির উর্বরতা আমার দেওয়া। বসবাসের উপযোগিতা আমার দেওয়া। এরপর পানিও আমি নাযিল করি। তোমরা কি পার পানি নাযিল করতে?

এরপর বলেছেন-

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ، ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ

'তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি এর গাছ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?'-সূরা ওয়াকিয়া (৫৬) : ৭১-৭২

তাহলে আগুনও আল্লাহর দেওয়া। মোটকথা, সম্পদের মৌলিক যে উৎসগুলো, যেগুলো থেকে সম্পদ আহরিত হবে তার কোনোটাই কিন্তু মানুষ তৈরি করতে পারেনি। মানুষ ওগুলোকে কেন্দ্র করেই বড় বড় শিল্প তৈরি করছে। মানুষ এখন চাঁদে যাচ্ছে, মহাশূন্যে যাচ্ছে, মঙ্গলে বসবাসের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যেটাতে করে যাচ্ছে সেটা আল্লাহর দেওয়া সম্পদ লোহা থেকে তৈরি।

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

'আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা। যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।'-সূরা হাদীদ (৫৭) : ২৫

তাফসীরবিদগণ بَأْسٌ شَدِيْدٌ -এর ব্যাখ্যায় অস্ত্র-শস্ত্রের কথা বলেছেন। এখন এর আরো ব্যাপক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, যানবাহন, বিমান-সামগ্রী, কলকারখানা-এসবই এর আওতায় আসবে। এ সবগুলোতে مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ও আছে আবার بَأْسٌ شَدِيْدٌ ও

আছে। কেননা যখন দুর্ঘটনা ঘটে তো সব শেষ হয়ে যায়।

তো ইসলামী অর্থনীতির প্রথম কথা হল, সকল সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। এই মূলনীতি যখন মেনে নেওয়া হবে তখন দ্বিতীয় ও পরবর্তী নীতিগুলো বোঝা ও মানা সহজ হয়ে যাবে।

যেহেতু মূল মালিক আল্লাহ সুতরাং আল্লাহ তাআলা যাকে মালিকানা দিয়েছেন সে নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী নয়; বরং তার মালিকানা শর্তযুক্ত মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রিত মালিকানা। আল্লাহ তাআলা সম্পদ সম্পর্কে যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন সেগুলো তাকে মেনে চলতে হবে। কিছু করতে হবে এমন শর্ত, কিছু ছাড়তে হবে এমন শর্ত।

আগেই বলেছি, ব্যক্তির শর্তযুক্ত মালিকানা কুরআন স্বীকার করেছে–যেমন, নিজের বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে কুরআন বলেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না।'–সূরা নূর (২৪) : ২৭

غَيْرَ بُيُوتِكُمْ-এর মধ্যে নিজের বাড়ির কথা আছে। আর بُيُوتًا এর মধ্যে অন্যের বাড়ির প্রমাণ আছে। অর্থাৎ ঘরের মালিকানা যারটা তার। যার যার ঘরের মালিকানা তার তার। এজন্যই তো অনুমতি নেওয়া লাগে।

অন্য আয়াতে এসেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

'হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করে দিই এর উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে তোমরা ব্যয় কর।'–সূরা বাকারা (২) : ২৬৭

অর্থাৎ যেটা তোমরা নিজেরা কামাই করছ সেটার মালিকানা তোমাদের নিজেদের।

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ

'ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও।'–সূরা নিসা (৪) : ২

এখানেও ব্যক্তি মালিকানা প্রমাণিত হয়। এ রকম আরো বহু আয়াত রয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় কথা

অর্থ উপার্জন ও খরচের ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণগুলো মেনে চলতে হবে।

কুরআন এ ব্যাপারে কী কী বলছে এবার সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

কুরআন সম্পদ ভোগ করার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানুষ সম্পদ ভোগ করতে পারবে তবে সেটা হতে হবে হালাল সম্পদ। সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করার ক্ষেত্রে কুরআন হালাল হওয়ার শর্ত আরোপ করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা থেকে তোমরা খাও।'–সূরা বাকারা (২) : ১৬৮

এখানে বলে রাখা ভালো যে, হালালের উক্ত বিধানটি সর্বজনীন। এখানে সমাজের নিম্নশ্রেণী-উচ্চশ্রেণীর কোনো ভেদাভেদ নেই। মুসলমান হলেই তাকে হালাল খেতে হবে। এজন্য নবী-রাসূলদেরকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হতে খাও এবং সৎকর্ম কর।'–সূরা মুমিনূন (২৩) : ৫১

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছেন–

إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদেরকে সে নির্দেশই দিয়েছেন, যা তিনি তার রাসূলগণকে দিয়েছেন।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০১৫

প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভিআইপি শ্রেণীর জন্য এমন অনেক কিছু বৈধ থাকে, যা অন্যদের জন্য থাকে না। ইসলাম এ ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্ত। হালালের এ বিধান ইসলামী অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বা যে কোনো অর্থনীতি থেকে পৃথক করে দেয়। প্রচলিত পন্থায় রাষ্ট্রের আইন মেনে একজন ব্যক্তি যে কোনো জিনিস উৎপাদন করতে পারে, রাষ্ট্রের আইন মেনে যে কোনো জিনিস বেচা-কেনাও করতে পারে। আবার খেতে-পরতেও পারে। কিন্তু ইসলাম সে সুযোগ একচ্ছত্র দেয় না; বরং হালাল হওয়ার শর্ত আরোপ করে।

হালালের বিপরীত হচ্ছে হারাম, যা মুমিনের জন্য নিষিদ্ধ। এ ধরনের অনেক হারামের বর্ণনা কুরআনে রয়েছে। যেমন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতীমার বেদি ও জুয়ার তীর এ সবই অপবিত্র, শয়তানি কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।'–সূরা মায়েদা (৫) : ৯০

আরেকটি আয়াত–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, সেই পশু যা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা হয়েছে....।'–সূরা মায়েদা (৫) : ৩

সম্পদ অর্জনে একটি মৌলিক নিষেধাজ্ঞার কথা কুরআনে এসেছে এভাবে–

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। এবং মানুষের সম্পদ থেকে কোন অংশ জেনে-শুনে গ্রাস করার জন্য তা (এ সম্পর্কে মামলা) বিচারকের কাছে পেশ করো না।'–সূরা বাকারা (২) : ১৮৮

এই আয়াতে "বাতিল পন্থায় সম্পদ খেয়ো না"-এর ব্যাখ্যা তাফসীরবিদগণ বিভিন্নভাবে করেছেন। একটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হচ্ছে, শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত পন্থাগুলোর বাইরে ভিন্ন কোনো পন্থায় সম্পদ উপার্জন। পুরো আয়াতটিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, বর্তমানের বহু উপার্জন এ আয়াতের আওতাভুক্ত। আয়াতটিতে ঘুষ, অবৈধ কমিশন, বখশিশের নামে উৎকোচ, জুলুম-নির্যাতন করে অন্যের জমিজমা-সম্পদ লিখে নেওয়ার মতো বিষয়গুলো যেমন শামিল রয়েছে তেমনি আইনের ফাঁক বের করে জনগণের টাকা, রাষ্ট্রের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলোও শামিল রয়েছে। অন্যায়ভাবে মামলা-মোকাদ্দমা করে রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তি থেকে ঠিকাদারী কাজ বা অন্য কোনো কাজের অতিরিক্ত বিল আদায় করা অথবা অন্যের পাওনা আদায়ে গড়িমসি করার জন্য মামলা ঠুকে দেওয়ার যে রেওয়াজ বর্তমান সমাজে চালু রয়েছে তার সবকিছুই আয়াতটির মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

এমনিভাবে ভাগ-বাটোয়ারা কিংবা গোপন চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বা নিজের চাকরিরত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পগুলোর ব্যয় বাড়িয়ে দেওয়ার মতো বিষয়গুলোও আয়াতের আওতাভুক্ত। আর কমিশনভিত্তিক একশ্রেণীর মাল্টিপারপাস সোসাইটি এমএলএম কোম্পানি, দখলবিহীন ফরওয়ার্ড সেল এবং ক্লিক বাণিজ্যের মতো কারবারগুলোও আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

ইসলামী অর্থনীতি কোনো দেশে চালু হলে সেখানে এ ধরনের প্রতারণাপূর্ণ কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনই দেওয়া হত না। কিন্তু এমন নীতি না থাকায় এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন নিয়ে সবার চোখের সামনে হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর কখনো কখনো রাষ্ট্রের নজর সেদিকে যায়। প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে হালাল-হারামের বাছ-বিচার না থাকার কারণে এবং ইসলামের নির্দেশনা না মানার কারণে, পরকালীন লাভ-ক্ষতির বিবেচনা না থাকার কারণে এবং নিজেদের আইনে নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে তাদের অনেক নীতিতে স্ববিরোধিতাও বিদ্যমান। তারা এমনসব জিনিস তৈরি করতে দিচ্ছে, যা সকলের কাছেই ক্ষতিকর হিসেবে স্বীকৃত। যেমন, সিগারেট। একদিকে তা উৎপাদনের অবাধ লাইসেন্স দিচ্ছে অন্যদিকে প্যাকেটের গায়ে লিখে দিচ্ছে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি। এ ধরনের হাস্যকর নীতিতে শরীয়ত বিশ্বাসী নয়।

পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় বিপদগুলোর একটি হল, সম্পদ এখানে এককেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনাঢ্যদের হাতে চলে আসে। সমাজতন্ত্রের চাপে এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে যে, আগে ছিল ১১ পরিবার, ২২ পরিবার। এখন তাতে ভাগ বসিয়েছে আরো কয়েক হাজার লোক।

জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার জরিপে বার বার এসেছে যে, শুধু ১% লোক ভোগ করে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি সম্পদ। পক্ষান্তরে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি-বিধানগুলো এমনভাবে সাজানো, যাতে এত বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে সে ঘোষণাই দিয়েছেন–

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

'যাতে করে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।'–সূরা হাশর (৫৯) : ৭

পুঁজিবাদের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে 'সুদ'। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বাড়ার পেছনে যেসব উপাদান দায়ী সুদ তার অন্যতম। ইসলাম সুদকে হারাম করেছে কঠোরভাবে।

ইরশাদ হয়েছে–

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'–সূরা বাকারা (২) : ২৭৫

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকলে সুদের যে অংশই

(কারো কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও। যদি তা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।'–সূরা বাকারা (২) : ২৭৮

এ আয়াতে রিবা তথা সুদের নিষেধাজ্ঞার সাথে সাথে এর ভয়াবহতারও উল্লেখ হয়েছে।

অর্থনীতির অন্য কোনো ব্যাপারে এত বড় হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়নি, যা হয়েছে সুদ গ্রহণের ক্ষেত্রে। পাশাপাশি এ আয়াত ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে দলিল, যারা কুরআনের একটিমাত্র আয়াত

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة

'হে মুমিনগণ, তোমরা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না।'–সূরা আলেইমরান (৩) : ১৩০

দেখে বলতে চায় যে, রিবা তথা সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে হলে কিংবা কয়েকগুণ হলে হারাম।

وذروا ما بقي من الربا আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট করা হচ্ছে যে, সুদের সামান্য অংশ তথা ০.০০১ ভাগ বা তার চেয়ে কম হলেও হারাম।

'যেহেতু সুদি ব্যবস্থা মূলত একশ্রেণীর লোকদেরকেই সম্পদের পাহাড় গড়তে সহযোগিতা করে, সার্বিকভাবে সমাজের কোনো উপকারে আসে না; বরং ধ্বংস ডেকে আনে তাই আল্লাহর নিকট এটি নিকৃষ্টতম অর্থব্যবস্থা। কালামুল্লাহ শরীফে বিভিন্নভাবে সুদের পরিণতির কথা এসেছে। যেমন–

يمحق الله الربا ويربي الصدقات

'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন।'–সূরা বাকারা (২) : ২৭৬

অন্য আয়াতে–

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

'মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তো তারাই কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়।'–সূরা রূম (৩০) : ৩৯

সুদভিত্তিক প্রচলিত লাগামহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে, ধনী-দরিদ্রের মাঝে পাহাড়সম বৈষম্যের দিকে নজর দিলে শুধু পরকাল নয়, দুনিয়াতেও যে সুদি ব্যবস্থা মানুষকে মারাত্মক ক্ষতির দিকে টেনে নিচ্ছে তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এভাবেই ফুটে উঠে উপরোক্ত আয়াত দুটির যথার্থতা।

অর্থনৈতিকভাবে সুদ যে একটি অকল্যাণকর ও জুলুমপূর্ণ ব্যবস্থা তা যুক্তির নিরিখেও সহজে বোঝানো সম্ভব। কিন্তু লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা করা হচ্ছে না।

ধনী-গরিবের মাঝে যখন চরম বৈষম্য সৃষ্টি হয় তখন সমাজের অবস্থা কী দাঁড়ায়–তা আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد

'সে যখন প্রস্থান করে তখন যমিনে অশান্তি সৃষ্টি এবং ফসল ও (জীব-জন্তুর) বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না।'–সূরা বাকারা (২) : ২০৫

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, সম্পদশালীরা সম্পদের জোরে কীভাবে আধিপত্য ও রাজত্ব কায়েম করে। আয়াতে يهلك الحرث (ক্ষেত-খামার, খাদ্য-শস্য ধ্বংস করে) বলে আল্লাহ যে খবর দিয়েছেন তার বাস্তব চিত্র বর্তমানে উন্নত অনেক ধনী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। কোনো কোনো দেশ কৃষি উৎপাদন বেশি হলে বাজার দর নিয়ন্ত্রণের জন্য শত শত টন ফসল ধ্বংস করে দেয়। সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। রাজতন্ত্রভিত্তিক কোনো কোনো ধনী দেশ নিজের তৃণমূল নাগরিকদের দ্বারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফসল ফলিয়ে তা আবার নিজেরা চড়া দামে কিনে নিয়ে বাজারজাত না করেই ধ্বংস করে দেয়। উদ্দেশ্য থাকে, নাগরিকদেরকে ভিন্ন কাজে ব্যস্ত রেখে নির্বিঘ্নে শাসন করে যাওয়া। অথচ বিশ্বের কোটি কোটি লোক এখনো না খেয়ে বা সামান্য খেয়ে দিনাতিপাত করে থাকে।

ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন

হারাম পেশার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা বা করানো যাবে না–

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا

'তোমরা নিজ দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না–(বিশেষ করে) যদি তারা পূতপবিত্র থাকতে চায় (তাদের দ্বারা) পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য।'–সূরা নূর (২৪) : ৩৩

বর্তমানে তো ভদ্রনাম এসে গেছে। পতিতালয়ের জায়গায় যৌনপল্লী, পতিতা হয়ে গেছে যৌনকর্মী-সেক্স ওয়ার্কার। নাম যাই হোক, এ কাজ ও এর দ্বারা অর্থ উপার্জন জঘন্যতম হারাম।

অপচয় নিষিদ্ধ

আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত উপভোগ কর। কিন্তু কিছুতেই অপচয় করা চলবে না। ইরশাদ হয়েছে–

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

'এবং আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'–সূরা আ'রাফ (৭) : ৩১

অন্য আয়াতে –

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

'এবং যারা ব্যয় করার সময় না অপব্যয় করে এবং না কার্পণ্য করে; বরং তাদের পন্থা হল (বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা।'–সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৭

হাল আমলের নামিদামি হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোতে, বড় বড় অনুষ্ঠান ও পার্টিগুলোতে যে পরিমাণ খাবার ধনীর দুলালেরা অপচয় করে ফেলে তা দ্বারা কি হাজার হাজার দরিদ্র শিশুর মুখে দু বেলা অন্ন দেওয়া যেত না?

শেষোক্ত আয়াতটিতে অপচয়ের সাথে সাথে কার্পণ্য না করার কথাও এসেছে। অহেতুক কার্পণ্যও ইসলাম সমর্থন করে না। অন্য আয়াতে এসেছে–

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করল এবং (আল্লাহর প্রতি) বেপরোয়া ভাব দেখাল এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করল। আমি তার কষ্টের স্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেব।–সূরা লাইল (৯২) : ৮-১০

গুনাহর কাজে, অহেতুক কাজে সম্পদ খরচ করা নিষিদ্ধ

সম্পদ আছে বলেই তুমি যেখানে সেখানে তা ব্যয় করতে পার না। ইরশাদ হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

'একশ্রেণীর লোক আছে যারা অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে থাকে... ।'–সূরা লুকমান (৩১) : ৬

আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيثِ দ্বারা গান-বাদ্য ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

অহমিকা

ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে তাদের সম্পদের হক তথা যাকাত-উশর ইত্যাদি আদায় করতে বলা হলে এবং এ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ–এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তাদের কেউ কেউ জবাব দেয়, এসব তো আমার পরিশ্রম ও মেধার ফসল। এ ধরনের জবাব কিন্তু নতুন নয়। কারূনও বলেছিল–

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي

'সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি।'–সূরা কাসাস (২৮) ৭৮

সেই যুগের মহাসম্পদশালী কারূনের সাথে মূসা আ.-এর যে কথোপকথন হয়েছে তাতেও অর্থনীতির অনেক বিষয় আছে। প্রসঙ্গ যেহেতু এসেই গেল সে আয়াতটিও পড়ে নেওয়া যাক–

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي

'কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। কিন্তু সে তাদেরই প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার দ্বারা আখেরাতের আবাস লাভের চেষ্টা কর। এবং দুনিয়া থেকেও তোমার অংশ ভুলে যেও না। এবং আল্লাহ যেমন তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যের প্রতি) অনুগ্রহ কর। এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি।'–সূরা কাসাস (২৮) : ৭৬-৭৮

ধন-সম্পদের সাথে তাকওয়া না থাকলে ধনী ব্যক্তি অন্যদের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে। আয়াতে 'فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ' দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এজন্যই তার স্বগোত্রীয় লোকেরা বলেছে لَا تَفْرَحْ এত লাফ-ঝাঁপ দিও না।

এরপর সম্পদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দুটি হকের কথাই বলা হয়েছে–

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার দ্বারা আখেরাতের আবাস লাভের চেষ্টা কর। এবং দুনিয়া থেকেও তোমার অংশ ভুলে যেও না।'–সূরা কাসাস (২৮) : ৭৭

আল্লাহর রাস্তায় দান করার পাশাপাশি নিজের খরচাদির জন্য সম্পদের একটি অংশ রাখ। যে অধিক সম্পদশালী সে হরেক রকম দান-খয়রাত ও কল্যাণমূলক কাজ-কর্ম করবে। শুধুই যাকাত দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না।

إن في المال حقا سوى الزكاة

(সম্পদে যাকাত ছাড়াও আরও হক রয়েছে।) জামে তিরমিযীতে এ শিরোনামেই একটি অধ্যায় রয়েছে। এজন্য কুরআনের এ আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়–

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'এবং তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী (অভাবগ্রস্ত) ও বঞ্চিতদের হক।'–সূরা যারিয়াত (৫১) : ১৯

সূরা যারিয়াত ও মাআরিজের আয়াত। এগুলো মক্কী সূরা। যখন যাকাতের বিধান নাযিল হয়নি। অতএব এগুলো যাকাতের বাইরের হক। সুতরাং وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ-এর মধ্যে যাকাত ও অন্যান্য দান সবই শামিল।

কিন্তু ধনীকে কুরআন এ কথা বলেনি যে, তোমার সব সম্পদই দান করে দিতে হবে। বরং বলেছে وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا তোমার নিজের চলার জন্যও সম্পদ রেখে দাও। এরপর وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন) সম্পদের মূল মালিকানার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং দান-খয়রাতের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন।

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ; সম্পদশালী হয়ে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করা, ক্ষয়-ক্ষতি করা, অন্যের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করা সবকিছুকেই এ অংশ দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের একশ্রেণির বহু ধনীদের অবস্থা কি আয়াতের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে না?

দরিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ

ধনীদের সম্পদের প্রাচুর্য ও চলাফেরার বিলাসিতা দেখে গরিবদের কষ্ট হতেই পারে। এই আয়াতে গরিবদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

'আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াবই শ্রেয়। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা কেউ পাবে না।'–সূরা কাসাস (২৮) : ৮০

ধন-সম্পদ না থাকলেও যদি তুমি বৈধভাবে চল, ঈমান ও আমলে সালেহের সাথে চল তাহলে তোমার জীবন কামিয়াব।

আল্লাহকে ভুলে যাওয়া

সম্পদের বড় সমস্যা হল সম্পদের ব্যাপারে যে বিধি-বিধান আছে সেটাকে যদি ভুলে যায় তাহলে মানুষ আল্লাহকেই ভুলে যায়। আল্লাহর মহব্বত অন্তর থেকে উঠে যায়।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ। যারা অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।'–সূরা হুমাযাহ (১০৪) : ১-৩

সম্পদ জমা করে এবং গুনতে থাকে কত লাখ হল, কত কোটি হল।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

এ শিরোনামে আমরা বলব, সম্পদ অর্জন বা উপার্জনের পর করণীয় কী– সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর ইলম ও হিকমত দ্বারা এটি ভালো মনে করেছেন যে, তার সকল বান্দার সম্পদ একসমান থাকবে না; বরং এর মধ্যে যৌক্তিক তারতম্য হবে। ইরশাদ হয়েছে–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আমি পার্থিব জীবনে ওদের মধ্যে ওদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং ওদের কতককে কতকের উপর বহু মর্যাদায় উন্নিত করেছি ফলে ওদের একে অপরকে খাদেম-অধিনস্থ বানায়।'–সূরা যুখরুফ : ৩২

কিন্তু মালিকানায় তারতম্য হলেও সম্পদশালীর জন্য একাকী তা ভোগ করার সুযোগ নেই; বরং তার সম্পদে অন্যদের যে হকগুলো রয়েছে তা তাকে আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে কিছু কথা কারূন সংক্রান্ত আয়াতে গেছে। সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তার একটি হল উশর। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

'এবং যখন ফসল কাটার দিন আসবে তখন তার হক আদায় করবে।'–সূরা আনআম (৬) : ১৪১

অর্থাৎ যা খাদ্য-শস্য হবে তার এক দশমাংশ (সেচে হলে ৫%) গরিবদের জন্য দিতে হবে। এখানে حَقَّهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ ফসল গরিবের হক তথা অধিকার। জমি মালিকের জন্য এটা দরিদ্রের প্রতি কোনো করুণা নয়।

এ সম্পর্কিত আরেকটি আয়াত হল–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

'হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করে দিই এর উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে তোমরা ব্যয় কর।'–সূরা বাকারা (২) : ২৬৭

এখানে وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا দ্বারাও উশরের কথা বলা হয়েছে।

কুরআনে দান-খয়রাতের সাথে طَيِّبٰتِ-এর কথা এসেছে। অর্থাৎ পুতঃপবিত্র, হালাল সম্পদ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। হারাম ও অবৈধ সম্পদ ব্যয় করার কথা আসেনি। কারণ মুমিনের জন্য হারাম আয় করার সুযোগই নেই। বর্তমানে সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেক কথিত দানশীলদের(!) কথা মনে করুন। তাদের আয়-উপার্জনগুলো হালালের মানদণ্ডে কতটুকু উত্তীর্ণ!

যাকাত

সম্পদের যাকাত আদায়ের কথা কুরআনের অসংখ্য জায়গায় এসেছে। যাকাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। যাকাতের গুরুত্বের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন নামাযের সাথে অনেক জায়গায় যাকাতের কথা বলেছে।

একটি আয়াতের আবেদন লক্ষণীয়। তা হল–

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

'আর আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এ রহমত সে সব লোকদের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে।'–সূরা আরাফ (৭) : ১৫৬

যাকাত এমন বিধান, যা পালন না করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় যেমন কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়। যাকাতের বিধান বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি যাকাত। এটি ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার। এর দ্বারা যাকাতদাতা পুতঃপবিত্র হয়। ইরশাদ হয়েছে–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

'আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন, এবং পরিশোধিত করবেন।'–সূরা তাওবা (৯) : ১০৩

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বিশ্বসংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সংক্রান্ত জরিপগুলো দেখুন। উন্নত রাষ্ট্রের কথা ছাড়ুন। শুধু অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে নজর দিন। সেখানে সম্পদের কত ছড়াছড়ি। বড় বড় অট্টালিকা, দামি দামি গাড়ি, পাঁচ তারকা হোটেল ও বিনোদনের কত ব্যবস্থা। অথচ সে দেশের একটি বিশাল অংশ বনি আদমের বাস চরম দারিদ্রের মধ্যে। যদি যাকাতের বিধান যথাযথভাবে পালন করা হত, যদি ধনীরা তাদের সম্পদের ২.৫% হিসাব করে গরিবদের দিত তবে কি এ বৈষম্য থাকত?

মোটকথা, ইসলামী সমাজব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতির কথা এলেই শুরুতেই আসবে যাকাতের কথা। এ জন্যই কুরআনে যাকাতের কথা এসেছে বহুবার, বিভিন্নভাবে।

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী প্রভৃতির প্রতি লক্ষ রাখা

যাকাত তো ফরয হক। অবশ্য-আদায়যোগ্য বিধান। কিন্তু মুমিন বান্দা তো আইনী দায়িত্বের বাইরে কিছু নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও পালন করবে। এজন্যই সূরা বাকারার আয়াতে সম্পদ ব্যয় ও দান-খয়রাতের কথা এসেছে এভাবে–

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য (ব্যয় করবে)। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।'–সূরা বাকারা (২) : ২১৫

এ ধরনের আরো বহু আয়াত বিভিন্ন জায়গায় এসেছে।

শেষ কথা

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতগুলো ছাড়া আরো অনেক আয়াতে অর্থ ও অর্থনীতির আলোচনা এসেছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় এখানেই সমাপ্ত করা হল। আফসোস! আজকের কোনো একটি মুসলিম রাষ্ট্রও যদি বিজাতির অন্ধ অনুকরণ বাদ দিয়ে কুরআনী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করত তবে সে দেশে ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজই কেবল কায়েম হত না; বরং অবশ্যই সেটিই হত অন্যদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ। ●

কুরআনুল কারীম

হেদায়েত গ্রহণ ও দলীল উপস্থাপন, কিছু নিবেদন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ

কুরআন কারীম থেকে শিক্ষা ও হেদায়েত গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের অনেক তালিবে ইলমের মাঝে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। এই মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য উপরের শ্রেণির তালিবানে ইলম, দু'এক বছরের মধ্যেই যারা মুদাররিস হয়ে যাবেন এবং দ্বীনী খেদমতের কোন অঙ্গনে প্রবেশ করবেন। আপাতত তাদের উদ্দেশ্যেই কিছু কথা নিবেদন করতে চাচ্ছি।

ক. কিছু তালিবে ইলম কুরআন কারীম শুধু তেলাওয়াতই করে, তারতীল ও তাদাব্বুর তথা ধীর-স্থিরভাবে উপলব্ধির সাথে তেলাওয়াতের চিন্তা করে না। অথচ কিছু সময় তো অন্তত অর্থ বুঝে ও মর্ম উপলব্ধি করে তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করা উচিত।

খ. কেউ তো কুরআনকে শুধু তেলাওয়াতের কিতাব মনে করে আর কেউ কেউ যেন শুধু জ্ঞান ও তথ্য আহরণের গ্রন্থ মনে করে। অথচ কুরআন কেবলই জ্ঞান ও তথ্যের জন্য নয়। কুরআন তো সত্যাসত্যের মাঝে পার্থক্যকারী, হৃদয় ও মস্তিষ্কের জ্যোতি, হেদায়েত ও উপদেশবাণী। কুরআন এক প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব, আলো ও উপশম। সুতরাং একজন তালিবে ইলমের তেলাওয়াত হওয়া উচিত কুরআনের এ সকল গুণ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য।

তালিবে ইলমের কুরআন অধ্যয়ন হবে তেলাওয়াতের সাথে আর তার তেলাওয়াতও হবে অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সাথে। হ্যাঁ, তেলাওয়াতের নির্ধারিত পরিমাণ পূর্ণ করার জন্য কখনো তাজবীদ-মাখরাজের প্রতি লক্ষ রেখে হালকা উপলব্ধির সাথে একটু দ্রুত তেলাওয়াত করতে সমস্যা নেই। তবে একটা সময় তো নির্ধারিত রাখতে হবে পরিপূর্ণ অনুধাবনের সাথে কুরআন মুতালাআর জন্য।

গ. কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলোর প্রতিও সযত্ন দৃষ্টি রাখা জরুরি, যে বিষয়গুলোর আলোচনা মাওলানা আবদুল মতিন সাহেবের নিবন্ধে এসেছে।

ঘ. সাহাবায়ে কেরামের কুরআন শেখার এই যে পদ্ধতি– تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن 'আমরা আগে ঈমান শিখেছি পরে কুরআন শিখেছি'– সে অনুযায়ী উপরের শ্রেণির তালিবানে ইলমের জন্য জরুরি হলো দ্বীনের মূল ও বুনিয়াদী বিষয়ের ইলম এবং মেযাজে শরীয়ত বিষয়েও কিছু রুচিবোধ পয়দা হওয়া।

এক্ষেত্রে দ্বীনের গভীর ইলম রাখেন এমন আহলে দিল বুযুর্গদের নির্বাচিত রাসায়েল অধ্যয়ন ইনশাআল্লাহ তালিবে ইলমদের জন্য উপকারী হবে।

ঙ. কোন কুরআন তরজমা থেকে ইস্তেফাদার ক্ষেত্রেও তালিবে ইলমকে সজাগ থাকতে হবে। পর্যালোচনার সাথে অধ্যয়ন করতে হবে। যেন ঐ তরজমার কোন অসংগতি বা ভুল-ত্রুটিকে গ্রহণ না করে ফেলে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল তরজমাতেই সন্তুষ্ট না হয়ে যায়।

চ. তাফসীরের কিতাব থেকে ইস্তেফাদার ক্ষেত্রে প্রথমে তো নিজের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নির্ধারণ করা চাই। কিন্তু এরপরও মনে রাখতে হবে যে, তাফসীরের কিতাবে আলোচিত বিষয়গুলো বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে:

١. ما دل عليه القرآن بعبارة النص

٢. ما دل عليه القرآن بطريق من طرق الدلالة القطعية سواها

٣. ما دل عليه القرآن بطريق من طرق الدلالة الظنية

وهذا النوع يدخل فيه جل استنباطات العلماء، واجتهادات الفقهاء، واستخراجات المفسرين العظام.

٤. ما أخذ من القرآن على طريق الاستلهام والوجدان، ولكن لايتأتى ذلك تحت وجوه الدلالة المتلقاة بالقبول، وإن كان لا يدخل أيضا تحت الوجوه الباطلة للدلالة، وأما ما كان من ذلك يدخل تحت بعض وجوه الدلالة المعروفة فهو ملحق بأحد الأقسام المذكورة، ومالم يدخل فهذا حكمه مذكور في «علوم القرآن»، للأستاذ الشيخ محمد تقي العثماني ص ٣٥٣ - ٣٥٦

٥. ما وقع فيه زلة من صاحب التفسير من حيث الرواية أو الدراية

٦. ما دخل فيه من الروايات (المرفوعة، أو الموقوفة، أو المقطوعة) المنكرة إسنادا ومتنا، وكذا ما دخل فيه من الإسرائيليات المنكرة

٧. ما دخل فيه من الآراء مما يدخل تحت حدود الرأي

المذموم، التي أوضحها السيد الأستاذ في "علوم القرآن" ص ٣٥٦ - ٣٥٩

এ তো স্পষ্টই যে, এই সবগুলো একই স্তরের বিষয় নয়। আর প্রতিটি স্তরের হুকুমও আলাদা।

(ومعلوم أن حكم المراتب الثلاثة الأخيرة الطرحُ والتركُ مع رعاية الأدب بعن صدر من قلمهم مثل هذا، وجلَّ من لا يخطئ)

সুতরাং পর্যালোচনামূলক অধ্যয়ন জরুরি। ইস্তেদাদ সম্পন্ন তালিবে ইলমের কর্তব্য, নিজেকে এ প্রকারের মুতালাআর যোগ্য ও অভ্যস্ত করে তোলা।

ছ. কখনো কোন কোন তালিবে ইলমের মনে কোন আয়াত বা আয়াতের অংশবিশেষের মারজূহ তরজমা বা মারজূহ তাফসীর এমনভাবে বসে যায়, যেন রাজেহ তরজমা বা তাফসীর সে কখনো শোনেইনি; দেখেওনি। এ বড় আফসোসের বিষয়। যেমন ৮:৬৪, ৯:১২২, ১২:১০৮, ৫১:৫৬ নং আয়াতগুলোর ব্যাপারে এমনটি দেখা যায়।

জ. কখনো দেখা যায়, কোন কোন বাক্যের অন্য সম্ভাব্য তরজমা বা তাফসীর (তা রাজেহ বা মারজূহ বা সমপর্যায়ের) একেবারেই জানা থাকে না। ফলে যখন কারো কাছে ভিন্ন তরজমা বা তাফসীর শোনে তখন শুধু না জানার কারণে তা অস্বীকার করে বসে। অথচ তালিবে ইলমের শান তো এমন হওয়া উচিত যে, গ্রহণ ও বর্জন উভয় ক্ষেত্রেই সে ধীর-স্থির ও সতর্ক হবে।

ঝ. শেষ কথা হল– অনেক সময় আমরা শুধু তরজমা বুঝতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করি। আয়াতের দাবী ও বার্তা কী– তা উপলব্ধির চেষ্টা করি না। নিঃসন্দেহে এটা বড় ক্ষতির কারণ। তাই আয়াতের অর্থ বোঝার পর এর বার্তা উপলব্ধির চেষ্টাও গুরুত্বের সাথে করা উচিত।

কুরআনের সব ধরনের আয়াতেই বার্তা থাকে। শুধু আদেশ-নিষেধের আয়াতেই বার্তা রয়েছে– এমন নয়; বরং সব ধরনের আয়াতেই এবং প্রতিটি আয়াতেই পয়গাম ও বার্তা রয়েছে। ভবিষ্যতের সংবাদ হোক বা অতীতের ঘটনা; উপমা ও দৃষ্টান্ত সম্বলিত আয়াত হোক বা প্রতিশ্রুতি ও হুঁশিয়ারির আয়াত, কাফের-মুশরিক, ইহুদী-খৃস্টান ও মুনাফিকদের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত হোক বা মুমিন মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত, পূর্বেকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে হোক বা এই উম্মতের ব্যাপারে, মোটকথা সব ধরনের আয়াতেই আমাদের জন্য রয়েছে পয়গাম ও বার্তা।

যেমন, আল্লাহ তাআলার ইরশাদ– وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ; 'তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। –সূরা শুরা (৪২) : ১১

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ জানানো হয়েছে। এ তো হলো আয়াতের অর্থ। এটুকু বোঝা এবং এ অনুযায়ী বিশ্বাস রাখাও কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কিন্তু এই সংবাদের সাথে আয়াতের একটি পয়গাম ও বার্তাও রয়েছে। তা হলো, আমরা যেন আমাদের দিন-রাতের কথা ও কাজ, অবসর ও ব্যস্ততা এবং সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা, সবকিছুর দিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখি, এগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির খেলাফ হচ্ছে না তো। মানুষের কাছে জবাবদিহিতা থেকে বেঁচে গেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ আসল জবাবদিহিতা তো আল্লাহর কাছে। তিনি তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী, সব শোনেন এবং সব জানেন। অন্তরের গোপন খবরও জানেন। আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর সামনে। কাজেই আমার মাঝে এই সংকোচ থাকা উচিত: আমার মাওলা যেন আমাকে তার নাফরমানীর কাজে না দেখেন এবং তিনি অপছন্দ করেন এমন কোনো অবস্থায়ও না দেখেন।

অথবা যখন এ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করি–

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'কেউ কণা পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ কণা পরিমাণ অসৎকর্ম করে থাকলে তাও দেখতে পাবে'। –সূরা যিলযাল (৯৯) : ৭-৮

এক তো হলো আয়াতের মাফহুম ও মর্ম– হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সকল কৃতকর্ম নিজের সামনে উপস্থিত পাবে। অণু পরিমাণ নেক আমল করলে সেটাও দেখতে পাবে তদ্রূপ অণু পরিমাণ মন্দ আমল থাকলে সেটাও দেখতে পাবে। এটি হাশর-ময়দানের একটি চিত্র, যা আখেরাতে ঈমানের অংশ।

তবে এ আয়াত দু'টিতে ময়দানে মাহশারের দৃশ্য অবতারণের পিছনে একটি বার্তা এও যে, আমরা যেন ঐ দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আর এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা এই না হয় যে, শুধু বড় কোন আমলের সুযোগ এলে সেটা করবো ছোট আমলে গুরুত্ব দিবো না তদ্রূপ এই শিথিলতাও করবো না যে, শুধু বড় গুনাহ থেকেই বেঁচে থাকবো, ছোট ছোট গুনাহকে ক্ষতির কারণ নয় মনে করে তা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সচেষ্ট হবো না। বরং আমলের ব্যাপারে আমাদের কর্মপন্থা তো এমন হওয়া উচিত যে, ভালো কাজ যত ছোট ও সহজ হোক তা আমি ছাড়বো না। আর গুনাহর কাজ যত ছোট ও সামান্যই মনে হোক তা করবো না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا

(কোন নেক আমলকে ছোট ভেবো না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬২৬) এবং

إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا

(যে গুনাহগুলোকে সাধারণ মনে করা হয় সেগুলো থেকে বেঁচে থাক কেননা আল্লাহর কাছে সেগুলোর ব্যাপারেও প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২৪৩)-এর মধ্যে উল্লিখিত আয়াত দু'টির এই বার্তাই স্পষ্ট করা হয়েছে।

তালিবে ইলমগণ যদি এ আয়াতের অধীনে 'আদদুররুল মানসূর' থেকে সংশ্লিষ্ট আছারগুলো মুতালাআ করেন তাহলে আঁচ করতে পারবেন যে, এ দুই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা কেমন হয়েছিলো এবং আয়াতের পয়গামের উপর আমল করার ব্যাপারে তাঁরা কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আমাদের আসাতিযায়ে কেরাম এই কথাটি আমাদেরকে এভাবে বোঝাতেন-

قرآن کریم کی ہر خبر متضمن انشاء ہے.

"কুরআনের প্রতিটি সংবাদের মধ্যে আদেশ নিষেধ রয়েছে।"

যে সকল আয়াত কাফের মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো তেলাওয়াতের সময় এই ভেবে অতিক্রম করে যাওয়া হয় যে, এ আয়াত তো কাফের মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে তাদের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত থেকে উপদেশ গ্রহণ তো ঐ কাফের মুশরিকদের কাজ।

অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে তো সন্দেহ নেই আমরা কুরআন কারীমের অনেক হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবো এবং কুরআন কারীমের অনেক বার্তা সম্পর্কে বেখবর থেকে যাবো। এরচে' বড় মাহরূমী ও বঞ্চনা আর কী হতে পারে!

কুরআনের আয়াতে যে সকল বিষয়কে কাফেরদের স্বভাব আখ্যা দেয়া হয়েছে, যার কারণে তাদের নিন্দা করা হয়েছে, তাদের উপর আযাব নেমে আসার কথা বলা হয়েছে বা আযাবের হুঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে সে সকল আয়াতের বড় শিক্ষা তো এই যে, এ সকল কর্মকাণ্ড হারাম এবং সেগুলো থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা ফরয। সাথে সাথে এই সকল আয়াতে এ বার্তাও আছে যে, তুমি তো মুমিন-মুসলিম, তুমি তো রহমানের বান্দা, তোমার মধ্যে কাফেরের স্বভাব-চরিত্র কেন আসবে! এটা কিছুতেই তোমার জন্য শোভা পায় না। তোমার মধ্যে থাকা চাই মুমিনদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য। তোমার মধ্যে কুফর শিরক ও নিফাকের বৈশিষ্ট্য কেন ঢুকবে? তুমি তো ধারণ করবে ঈমানের গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং শারাইয়ে ইসলাম তথা ইসলামের বিধি-বিধান।

এই আয়াতগুলোতে এ পয়গামও আছে যে, মন্দ স্বভাবেরও স্তরভেদ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচে' মারাত্মক প্রকার যদিও কাফেরদের মাঝেই পাওয়া যায় তবে হে মুসলমান! তোমাদেরকে তাদের অবস্থা শোনানোর উদ্দেশ্য হল, তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে পরখ করবে, তোমাদের মধ্যে যেন ঐ সকল স্বভাব-চরিত্রের কোনো পর্যায়ের উপস্থিতিও না থাকে!

তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কথা শোনানোর মাঝে আমাদের জন্য এ পয়গামও আছে যে, ঐ ধরনের আযাব-আল্লাহ না করুন- আমাদের উপরও আসতে পারে! কারণ আমরা তো আমাদের কাজে-কর্মে, স্বভাব-চরিত্রে এবং আমাদের জীবন ধারায় তাদের রীতি-নীতিই গ্রহণ করে নিয়েছি! তাই আমাদের মধ্যে মুমিনের এ গুণ থাকা চাই- وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ [এবং যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত।] কেননা إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ [নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয়, যা হতে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।-সূরা মা'আরিজ (৭০) : ২৭,২৮]

কাফেরদের ব্যাপারে আখেরাতের কোন আযাবের আলোচনা এলে তাতে আমাদের জন্য এ পয়গামও থাকে যে, দ্বীন-ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের ভিন্নতা স্বত্ত্বেও কাজ-কর্মে স্বভাব-চরিত্রে, লেনদেন ও মেলামেশায় তাদের সাথে মিল ও ঐক্যের কারণে সে ধরনের আযাব আমাদের উপরও এসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই তাদের সাথে সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

সূরা আহকাফে ইরশাদ হয়েছে-

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

'এবং সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হবে (এবং বলা হবে) তোমরা নিজেদের অংশের উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ পার্থিব জীবনে (ভোগ করে) নিঃশেষ করে ফেলেছ এবং তা বেজায় ভোগ করেছ। সুতরাং আজ বিনিময় রূপে তোমরা পাবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে না-হক গৌরব করতে। এবং যেহেতু তোমরা নাফরমানী করতে। -সূরা আহকাফ (৪৬) : ২০

রেওয়ায়েতে এসেছে, একবার ওমর রা. এক সাহাবীকে নসীহত করে বলেছিলেন-

أَكُلَّمَا اشْتَهَيْتُمْ شَيْئًا اشْتَرَيْتُمُوهُ، أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

'যখন যা ভালো লাগে তা-ই খরিদ করে ফেলবে? এই আয়াতটির প্রতি কি একটুও লক্ষ কর না? أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا [তোমরা নিজেদের অংশের উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ পার্থিব জীবনে (ভোগ করে) নিঃশেষ করে ফেলেছ এবং তা বেজায় ভোগ করেছ।] অথচ ঐ সাহাবী পরিবারের জন্য মাত্র এক দিরহামের গোশত আনতে যাচ্ছিলেন' (সাঈদ ইবনে মানসুর, আবদ ইবনে হুমাইদ, হাকেম, বায়হাকী -আদ্দুররুল মানছুর খ. ৬ পৃ. ৪৭)

আর ওমর রা.-এর নিজের ঘটনা তো প্রসিদ্ধ- কতক আগন্তুক নিয়মিত ওমর রা.-এর খাবার খুব সাধারণ দেখে বিস্মিত হলো তখন ওমর রা. বললেন-

إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ أَرَى تَقْذِيرَكُمْ وَكَرَاهِيَتَكُمْ طَعَامِي أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُ لَكُنْتُ أَطْيَبَكُمْ طَعَامًا وَأَرْفَهَكُمْ عَيْشًا أَمَا وَاللهِ مَا أَجْهَلُ عَنْ كَرَاكِرَ وَأَسْنِمَةٍ وَعَنْ صِلَاءٍ وَصِنَابٍ وَصَلَائِقَ وَلَكِنِّي وَجَدْتُ اللهَ عَيَّرَ قَوْمًا بِأَمْرٍ فَعَلُوهُ فَقَالَ: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

'আমি বুঝতে পারছি যে, আমার এই সাধারণ খাবার তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না। ওহে! আমি যদি চাই তাহলে তোমাদের সবার চে' উত্তম খানা গ্রহণ করতে পারি এবং তোমাদের সবার চে' স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপন করতে পারি। আমার কি জানা নেই, সিনার অংশ এবং উটের কুঁজ সম্পর্কে! ভুনা (ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি), সরিষা ও কিসমিস দ্বারা প্রস্তুতকৃত তরকারি এবং দুধ মিশ্রিত সুজির বিষয়ে! কিন্তু আমি দেখেছি যে, আল্লাহ তাআলা এক জাতিকে তিরস্কার করে বলেছেন- أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا [তোমরা নিজেদের অংশের উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ পার্থিব জীবনে (ভোগ করে) নিঃশেষ করে ফেলেছ এবং তা বেজায় ভোগ করেছ।] সে জন্য আমি চাচ্ছি না যে, আমার অবস্থাও তাদের মত হোক'। -ইবনুল মুবারাক, ইবনু সা'আদ, আহমাদ ফিয যুহদ; আবদ ইবনু হুমাইদ, আবু নুআইম ফিল হিলয়াহ -আদ্দুররুল মানছুর খ. ৬ পৃ. ৪৭-৪৮

ভাববার বিষয় যে, এখানে না ওমর রা. নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন যে, এ আয়াত তো কাফেরদের ব্যাপারে এসেছে! আর না ঐ সাহাবী ওমর রা.কে এ ধরনের কোন জবাব দিয়েছেন।

বোঝা গেল যে, নিজের মুহাসাবা ও নসীহত গ্রহণের বিষয়ে আয়াতের শানে নুযূল ও আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মুখ্য নয়; বরং দেখতে হবে, আমার অবস্থা তাদের অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে না তো, যাদের আল্লাহ তিরস্কার করেছেন! এভাবে উপদেশ গ্রহণ করাই মুমিনের কাজ। তবে এই ধরনের বাহ্যিক সামঞ্জস্যের কারণে অন্য কোনো মুমিনকে সরাসরি এ আয়াতের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করার অধিকার কারো নেই।

একইভাবে ওমর রা.-এর এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, উল্লেখিত আয়াতের শিক্ষার অনুসরণের জন্য প্রত্যেককেই জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ওমর রা.-এর হুবহু অনুসরণ করতে হবে। এটা তো আমাদের জন্য হয়ত সম্ভবও নয়। কিন্তু নিজের মুহাসাবা তো অবশ্যই করতে হবে এবং নিজের অবস্থা অনুযায়ী ঐ পয়গাম কোনো না কোনো পর্যায়ে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতার কারণে নিজেকে ভর্ৎসনাও করতে হবে। অন্যথায় আমরা তো ভোগ-বিলাসে ডুবে যাবো।

এমনিভাবে সূরা ইয়াসীন (৩৬)-এর ৬৫ নং আয়াতে এবং সূরা হা মিম সাজদা (৪১)-এর ২০-২২ আয়াতে এসেছে যে, কাফের যখন তার অপরাধ অস্বীকার করবে তখন তার মুখ মহর করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তার বাকশক্তি হরণ করা হবে। তখন তার জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি দিতে থাকবে।

প্রশ্ন হলো- এই ভীতিকর দৃশ্যের বর্ণনা কুরআন মুসলমানদের সামনে কেন পেশ করলো? শুধুই কি এজন্যে যে, সে তা তেলাওয়াত করে সাওয়াব অর্জন করবে এবং অন্তরে এ বিশ্বাস রাখবে যে, কাফেরের সাথে এমন আচরণই করা হবে! বরং এখানে তো তার জন্য এ পয়গামও আছে যে, কালিমা পড়া সত্ত্বেও তার যিন্দিগী যদি কাফেরদের মত অবাধ্যতার যিন্দিগী হয় তাহলে তাকেও এ অবস্থার মুখোমুখি করা হতে পারে! এ ছাড়া যে কোনো গুনাহের ব্যাপারেই তো মুমিনের মনে এই ভয় থাকা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَغْفُلْنَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

"তোমরা সুবহানাল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বেশি বেশি পড় এবং আঙ্গুল দিয়ে গুণে গুণে পড়। কেননা আঙ্গুলগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং সেগুলোকে দিয়ে বলানো হবে।" (ইবনে আবি শায়বা; হাকেম; বায়হাকী -আদ্দুররুল মানছুর খ. ৫ পৃ. ২৯১)

তো এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নেক আমল করতে বলা হয়েছে। তোমার বাকশক্তি বন্ধ করে দিলে এবং ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যবান খুলে দেয়া হলে সেগুলো যেন কেবল নেক আমলেরই সাক্ষ্য দেয়।

তদ্রূপ সূরা আরাফে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না। এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল'। –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৭৯

এ আয়াত কাফেরদের প্রসঙ্গে হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন শক্তিশালী লক্ষণ দ্বারা এটাকে কাফেরদের জন্যই ধরে নিয়ে নিজে তা থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও এক ধরনের উদাসিনতা, যার নিন্দা এই আয়াতে করা হয়েছে। এটা ঠিক যে, সবচে' কঠিন উদাসিনতা হলো কুফর ও শিরকের উদাসীনতা। কিন্তু আল্লাহর কাছে সব উদাসীনতাই নিন্দনীয়।

মুমিনের জন্য এ আয়াতের পয়গাম হলো– মুমিন সব ধরনের উদাসীনতা থেকে দূরে থাকবে। সে সর্বদা সত্য শোনার, সত্য দেখার এবং সত্যকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট থাকবে। সে আল্লাহর প্রতিটি নেয়ামতের কদর করবে এবং প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করবে। তা দিয়ে ঐ কাজই করবে যে জন্য আল্লাহ তা দিয়েছেন।

মোটকথা কালামে পাক তেলাওয়াতের সময় বোধ ও উপলব্ধির সাথে তেলাওয়াত করতে হবে। আর এ উপলব্ধির সর্বনিম্ন স্তর হলো আয়াতের পয়গাম ও বার্তা অনুধাবনের চেষ্টা করা এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়নের পূর্ণ চেষ্টা করা।

আয়াতের পয়গাম ও বার্তা উপলব্ধির জন্য 'তাফসীরে উসমানী'র (ফাওয়ায়েদে উসমানীয়ার) মুতালাআ আশা করি মুফীদ ও উপকারী হবে।

কুরআনের আয়াত থেকে দলীল উপস্থাপন

আয়াত থেকে দলীল পেশ করার ক্ষেত্রেও কখনো কখনো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়। সেগুলোরও সংশোধন জরুরি।

১. যে আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করা হবে সে আয়াত ভালোভাবে স্মরণ না থাকা সত্ত্বেও শুধু ধারণার ভিত্তিতে আয়াত তেলাওয়াত করা। প্রথম কথা তো হল ধারণার উপর ভিত্তি করে পড়া ঠিক নয়, যদিও ঘটনাক্রমে পড়াটি সঠিক হয়ে যায়। আর যদি সন্দেহের ভিত্তিতে পড়তে গিয়ে ভুল হয়ে যায় তাহলে তো তা আরো মারাত্মক কথা।

এজন্য দলীল পেশ করার পূর্বে যে আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করা হবে তা সঠিক বলছি কি না সে ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে।

২. কখনো আয়াতের পূর্বাপর উল্লেখ না করে আয়াতের অংশবিশেষ দিয়ে দলীল পেশ করা হয়। এই ভাবে দলীল পেশ করার একটা অনিষ্টের দিক হলো কখনো কখনো পুরো আয়াত সামনে না থাকার কারণে আয়াতের সঠিক মর্ম যেহেনে থাকে না, ফলে ভুল তরজমা বা ভুল তাফসীর করা হয়।

এজন্য সংশ্লিষ্ট আয়াতের পূর্বাপরসহ উল্লেখ করা উচিত।

আমার মনে পড়ছে, আমি কোন এক প্রবন্ধে এর কিছু দৃষ্টান্তও পেশ করেছিলাম। যেমন, ইলমের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ [সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১] থেকে তেলাওয়াত শুরু করা। অনুরূপভাবে আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য তাকওয়া ও খোদাভীতি শর্ত সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ [সূরা আনফাল (৮) : ৩৪] দিয়ে দলীল পেশ করা। তেমনিভাবে আয়াতের পরবর্তী অংশ যেহেনে না থাকার কারণে لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ [সূরা রা'দ (১৩) : ১৪]-এ আয়াতকে দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাবা।

অথবা যেমনটি আমি করাচী থাকাবস্থায় একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম, সে তাকলীদের প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে সূরা নাহল এর ৪৩ নং আয়াতের শেষাংশ এবং ৪৪ নং আয়াতের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করেছিলো।

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

'যদি তোমরা না জান তাহলে আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করো। দলীল প্রমাণের সাথে এবং কিতাব দিয়ে'। –সূরা নাহল (১৬) : ৪৩-৪৪

তার বক্তব্য ছিলো ইলম অর্জনের একটি পন্থা তো এই যে, ব্যক্তি দলীল-প্রমাণ ও কিতাব থেকে ইলম অর্জন করবে। যার দলীল প্রমাণের ইলম নেই সে আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করে আমল করবে!!

অর্থাৎ তিনি بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ -কে لَا تَعْلَمُونَ -এর সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করেছেন। অথচ এটার সম্পর্ক أَرْسَلْنَا -এর সাথে যেটা এখানে উহ্য রয়েছে। যা আয়াতের পূর্বাপর থেকে বুঝা যাচ্ছে। যদি আয়াতের পূর্বাপর তার যেহেনে উপস্থিত থাকতো, আরবী ভাষা-রীতির

সামান্য রুচিবোধও থাকতো বা অন্তত দু'একটি তাফসীরের কিতাব খুলে দেখতো তাহলে এই আয়াত দ্বারা এমনটি বলতো না।

আয়াতদ্বয়ের মর্ম হল, আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি তারা সবাই মানুষ ছিলেন (কেউ ফেরেশতা ছিলেন না) এবং প্রত্যেককেই আমি দলীল-প্রমাণ (মুজেযা) এবং কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছি। (হে কুরাইশ জাতি!) যদি এ বাস্তবতা তোমাদের জানা না থাকে তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ!

তো এ আয়াত থেকে বৈধ তাকলীদের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কেরাম ও হাদীসের অনেক ইমাম এ আয়াত দিয়ে তাকলীদের বৈধতার ব্যাপারে দলীল পেশ করেছেন। আরবের আলিমগণও এ আয়াত দিয়ে তাকলীদের বৈধতার দলীল পেশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আবু বকর জাবের আলজাযাইরীর ''আইসারুত তাফাসীর'' দেখা যেতে পারে। তবে করাচীর ঐ লোক যেভাবে দলীল পেশ করেছেন সেটা ভুল ছিলো।

করাচী থেকে যখন ঢাকায় এলাম তখন এখানকার লোকদের লেখা কিছু বাংলা পুস্তিকা দৃষ্টিগোচর হলো, যেখানে তাকলীদকে হয়তো শিরক সাব্যস্ত করা হয়েছে, অথবা গোমরাহী আখ্যা দেওয়া হয়েছে!

ঐ সকল পুস্তিকায় এই বেদআত উদ্ভাবন করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের জন্য যদিও আলেমের কাছে মাসআলা জানতে চাওয়ার অনুমতি আছে তবে শর্ত হল আলেমের কাছ থেকে মাসআলা দলীলসহ জানতে হবে এবং আলেম মাসআলা বলার সময় দলীলসহ বলতে হবে। কোন আলেম দলীল উল্লেখ না করলে তার মাসআলা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তারা তাদের এই বিদআতের ব্যাপারে সূরা নাহল এর উল্লেখিত দুই আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করে। অর্থাৎ সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতের শেষাংশ ও ৪৪ নং আয়াতের শুরুর অংশে।

তারা بِالْبَيِّنَاتِ -কে فَاسْأَلُوا এর সাথে সম্পৃক্ত মনে করেছেন। এখানেও ঐ একই কথা। আয়াতের পূর্বাপর যদি তাদের কাছে স্পষ্ট থাকতো এবং যদি আরবী ভাষা-রীতির সামান্য রুচি থাকতো তাহলে হয়তো তারা এমন করত না। হায়! তারা যদি বুঝতো যে, সাধারণ মানুষের জন্য দলীল জানাকে আবশ্যক করে নেয়া এবং আলেমদের জন্য সর্বাবস্থায় প্রশ্নকারীকে দলীলসহ মাসআলা বলা জরুরি আখ্যা দেয়া এমন একটি নব উদ্ভাবিত চিন্তা, যা উসূলের আলোকেও ভুল সাহাবা-তাবেয়ীনের অনুসৃত পদ্ধতি এবং উম্মতের ইজমারও পরিপন্থী।

তো বলছিলাম দলীল উপস্থাপনের সময় সংশ্লিষ্ট আয়াতের পূর্বাপর যেহেনে উপস্থিত থাকা উচিত। এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা উল্লেখও করা উচিত। যাতে অজ্ঞতাবশত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা না হয়ে যায় এবং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে ভুল কথা প্রমাণের অপরাধে না জড়াতে হয়।

৩. কুরআনের বিষয়টি বড় নাযুক ও স্পর্শকাতর। পর্যাপ্ত তাহকীক ছাড়া কেবলই পুরনো মুতালাআ বা অসম্পূর্ণ মুতালাআর উপর ভিত্তি করে বা নির্ভরযোগ্য কিতাবের মুরাজাআত অথবা নির্ভরযোগ্য আলেমের সাথে আলোচনা ছাড়া শুধুই নিজের মনে আসা চিন্তার উপর নির্ভর করে কোন আয়াত থেকে কোন বিষয়ের দলীল নিয়ে নেয়া ঠিক নয়। এভাবে নিজের অজান্তেই কখনো কখনো মারাত্মক ধরনের ভুলও হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে কিছু কিছু লোককে বড় দুঃসাহসী বলে মনে হয়, জটিল থেকে জটিল বিষয়ে নিজের বুঝের উপর নির্ভর করে কুরআনের আয়াত থেকে দলীল পেশ করে বসে। যেমন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মূল মাকসাদ কী ছিলো এবং তার উম্মতের যিন্দিগীর আসল মিশন কী-এমন জটিল প্রশ্নের সমাধানও কেউ মুহূর্তেই দিয়ে দেয়।

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

'(হে নবী!) বলে দাও, এই আমার পথ, আমি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও'। -সূরা ইউসুফ (১২) : ১০৮

এই আয়াত তেলাওয়াত করে বলে দেয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার উম্মতের একটাই পথ, একটাই মিশন। আর তা হলো আল্লাহর দিকে আহ্বান। যেন তাদের নিকট আরবী ভাষায় ইসমে ইশারা দ্বারা বাক্যের আগামী অংশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়!

না পিছনের আয়াতে مشار إليه তালাশ করে, না আয়াতের পূর্বাপর দেখে! ব্যস, যা মনে আসে বা দু' এক কিতাবে যা পেয়ে যায় সেটাই দৃঢ়তার সাথে বলে দেয়, যেন এটিই আয়াতের একমাত্র ব্যাখ্যা!

৪. কখনো এমন হয় যে, কিছু শব্দ আমাদের পরিভাষায় প্রচলিত অথবা আমাদের ইলমী আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত, ঘটনাক্রমে সেটি কুরআনেরও শব্দ। ঐ শব্দের পরিভাষাগত অর্থ কখনো কুরআনী অর্থের কাছাকাছি হয়, কখনো বা কুরআনী অর্থ থেকে অনেক দূরবর্তী হয়। আবার কখনো দুই অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। তো এসব অবস্থায় আমাদের মত অপরিপক্ক ইলম ওয়ালারা কখনো

কখনো শব্দের মিল দেখেই ধোঁকা খেয়ে যায় এবং কুরআনের শব্দকে নিজের যেহেনের ঐ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করে ফেলে। যেটা বড়ই ভয়াবহ।

প্রতি যুগের মুহাক্কিক আলিমগণ এ বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন। নিকট অতীতে মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ. তার উর্দূ তাফসীরের ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি শুধু একটি উদাহরণ পেশ করছি–

এক হল কোনো মৃত বুযুর্গকে অসীলা মনে করে সরাসরি তার কাছে সাহায্য চাওয়া এবং উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের কোনো বিষয় তার কাছে প্রার্থনা করা।

আরেক হল আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময়, দুআ করার সময় কোনো বুযুর্গের অসীলার উল্লেখ করা।

প্রথমটা তো সুস্পষ্ট শিরক। আর দ্বিতীয়টা যদি বাতিল আকীদা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয় তাহলে অনেক আলেমের মতে বৈধ। কিছু কিছু আলেমের মতে বিদআত। আর কতেক শিরকের পৃষ্ঠপোষক বেদআতী প্রথমটাকেও জায়েয বলে। نعوذ بالله العظيم

অসীলার মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, কেউ কেউ কোনো চিন্তা-ফিকির ছাড়াই এ ব্যাপারে সূরা মায়েদা-এর ৩৫ নং আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে বসে!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার নৈকট্য তালাশ করো এবং তার রাস্তায় চেষ্টা-পরিশ্রম করো যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'–সূরা মায়েদা (৫): ৩৫

কিছু লোককে দেখেছি তারা বৈধ অসীলা– যে ব্যাপারে আপন জায়গায় দলীল বিদ্যমান আছে– এর ব্যাপারে এ আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে। এটা বড় মন্দ কাজ। কেননা, এ আয়াতে পারিভাষিক 'তাওয়াসসুল' বা উর্দূ 'অসীলা'র কথা বলাই হয়নি। এ আয়াতে **আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণের** কথা বলা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলা। এমনকি কতক শিরকের পৃষ্ঠপোষক শিরকী অসীলা প্রমাণের জন্যও এ আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে, যা এ আয়াতের সুস্পষ্ট তাহরীফ ও বিকৃতি।

মাওলানা দরিয়াবাদী রাহ. বড় চমৎকার লিখেছেন–

"যারা অসীলার মাধ্যমে বুযুর্গানে দ্বীনের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং নবীদের কাছে ও ওলীদের কাছে প্রার্থনাকে জায়েয বলেছেন, তারা আরবীভাষার অসীলাকে –যার অর্থ নৈকট্য– উর্দূ ভাষার অসীলার –যার অর্থ মাধ্যম– সমার্থক মনে করেছেন। আর এমন কঠিন ও মারাত্মক ভুল খুব বিরল নয়; বরং প্রচুর ঘটে থাকে। আল্লামা আলূসী এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোটকথা কতক বেদআতী 'অসীলা' শব্দ থেকে নিজেদের জন্য আশ্রয় খোঁজে যা সম্পূর্ণ অসার ও ভিত্তিহীন।"

দুই শব্দের শাব্দিক মিল বা কোন ধরনের সামঞ্জস্যের কারণে নিজের অজান্তে কোন আয়াত বা হাদীসের অর্থ পুরোপরি বা আংশিক পরিবর্তন করে ফেলার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তালিবে ইলমের মাঝে দ্বীনের এতটুকু সমঝ অন্তত থাকা উচিত যার দ্বারা সে এ ধরনের অজান্তে কৃত তাহরীফ না নিজে করবে, না অন্য কারো দ্বারা ঘটলে তার দ্বারা প্রভাবিত হবে।

এ তো হল অজান্তে তাহরীফে জড়িয়ে পড়ার বিষয়। থাকল ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো আয়াতের মর্ম বিকৃতি তো এটা মূলত বাতিলপন্থী ও বিদআতীদের অভ্যাস।

তাদের বিকৃতি সাধারণত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হয়ে থাকে যার দ্বারা অন্তত তালেবানে ইলম ইনশাআল্লাহ ধোঁকায় পড়বেন না। ইমাম শাতিবী রহ. 'আলই'তিসাম' কিতাবে প্রত্যেক প্রকার বেদআতীদের দলীল উপস্থাপনের বাতিল ও ভ্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা তালিবে ইলমের জন্য অবশ্যই মুতালাআ করার মত। এটাই সেই অর্থ ও মর্ম বিকৃতির ব্যর্থ অপচেষ্টা, যার মাধ্যমে কেউ সোশালিজম (সমাজতন্ত্র) কে সরাসরি ইসলাম প্রমাণ করতে চেয়েছে। কেউ ক্যাপিটালিজম (পুঁজিবাদ)-কে, কেউ সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা)-কে, কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে খৃস্টবাদ ও কাদিয়ানী মতবাদকেও ইসলাম প্রমাণ করতে চেয়েছে।

বেদআতীদের মধ্যে তাকদীর অস্বীকারকারী কাদরিয়া গোষ্ঠী, কবীরাহ গুনাহকারীকে কাফের সাব্যস্তকারী, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত অস্বীকারকারী খারেজী গোষ্ঠী, আল্লাহ তাআলার ছিফাত অস্বীকারকারী জাহমিয়া গোষ্ঠী এবং আল্লাহ তাআলাকে মাখলুকের সদৃশ সাব্যস্তকারী মুজাসসিমা গোষ্ঠী, এমনকি ইসলামী ফিকহ ও শরীয়তকে অস্বীকারকারী বর্তমান সময়ের প্রগতিবাদী গোষ্ঠী এবং হাদীস ও সুন্নাহকে অস্বীকারকারী তথাকথিত আহলে কুরআন গোষ্ঠী– এরা সবাই কুরআন কারীমকেই তাদের অপপ্রয়াসের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে। সবারই মূলপুঁজি হলো কুরআন কারীমের অর্থ ও মর্মের বিকৃতিসাধন।

নিকট অতীতের গোঁড়া বেদআতী মৌলভীরা যারা শিরক ও বেদআতের কট্টর সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলো ওরা خزائن العرفان في تفسير القرآن এবং جاء الحق বই দুটিতে এ কাজই করেছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল গায়েব বিশ্বাস করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মুখতারে কুল, হাজির নাজির ও কঠিন বিপদে ত্রাণকর্তা মনে করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবত্ব অস্বীকার করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মান্নত জায়েয বলা এবং এ জাতীয় শিরকী আকীদা ও আরো অনেক মারাত্মক বেদআত প্রমাণ করার জন্য সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াতের অর্থগত বিকৃতিরই আশ্রয় নিয়েছে। একাধিক গ্রন্থে এসকল বিকৃতির বাস্তবতা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মাওলানা সারফারায খান সফদর রাহ.-এর 'তানকীদে মাতীন বর তাফসীরে নাঈমুদ্দীন' এবং 'ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দি তাওযীহিল বায়ান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অর্থ ও মর্ম বিকৃতির একটি সূক্ষ্ম প্রকার হল, কোনো কিছুর স্বরূপ পরিবর্তন না করে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তার যে অবস্থান নির্ধারিত তা পরিবর্তন করে দেয়া এবং সে উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দলীলসমূহে নিজের মতকে প্রমাণের জন্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রয়োজন মত পরিবর্তন করা। কোনো কোনো আধুনিক চিন্তাবিদের কলমে কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা (ইলাহ, রব, ইবাদত, দ্বীন)-এর ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে, যার কারণে কত বিধি-বিধানেই না প্রভাব পড়েছে এবং কতকিছুর অবস্থা ও অবস্থান বদলে গেছে! তলাবায়ে কেরাম বিশেষভাবে এ বিষয়ের জন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো মুতালাআ করতে পারেন:

'আছরে হাযের মেঁ দ্বীন কি তাফহীম ও তাশরীহ' মাওলনা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী; 'মাওলানা মওদূদী সে মেরী রেফাকাত ...' মাওলানা মনযূর নোমানী; 'জামাআতে ইসলামী : এক লামহায়ে ফিকরিয়্যাহ' শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী।

এটি আল্লাহ তাআলার কুদরত ও খাস রহমত যে, তিনি কুরআন হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং একে নিজের যিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। তাই কোন বিকৃতিকারীর বিকৃতি কখনই টিকে থাকতে পারে না। ولله تعالى الحمد أولاً وآخراً

৫. অবচেতনভাবে বিকৃতির একটি প্রকার এটিও যে, শুধু শাব্দিক মিল থাকার কারণে কোনো আয়াত বরকতের উদ্দেশ্যে কোথাও লিখে দেয়া।

যেমন হিকমত ও ফালসাফার কোন কিতাবের শুরুতে প্রকাশক কর্তৃক লিখে দেয়া হলো—

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

অথচ এই আয়াতে কারীমায় উল্লেখিত হিকমতের সাথে ফালসাফার দূরতম সম্পর্কও নেই। বা কেউ নিজের দলের নাম হিযবুল্লাহ রেখে তার জন্য সরাসরি أُولٰئِكَ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আয়াতটি প্রয়োগ করলো, যদি তাদের মধ্যে হিযবুল্লাহর সিফাত থাকেও তাও এমন করা উচিত নয়, কারণ হিযবুল্লাহর সিফাতগুলো তো ব্যাপক তা সকল সুন্নাহ অনুসারী মুমিনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ. একটি চমৎকার ঘটনা লিখেছেন। করাচীর বাইয়্যিনাত পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতার শিরোনাম হলো— بصائر و عبر । হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরী রহ. যতদিন হায়াতে ছিলেন ততদিন بصائر و عبر তিনি নিজেই লিখতেন। একবার হযরত বানুরী রহ. بصائر و عبر লিখে শেষে এ বাক্য লিখে দিলেন هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى মাওলানা লুধিয়ানবী রহ. শেষের ঐ বাক্য ছাপলেন না। পরবর্তী মাসেও এমন হলো এবং হযরত গুরুত্ব দিয়ে বলে দিলেন যে, এ বাক্য ছাপা হবে। তখন মাওলানা লুধিয়ানবী রহ. হযরতকে আদবের সাথে বললেন যে, উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় هٰذَا দ্বারা কি আমাদের সম্পাদকীয় بصائر و عبر উদ্দেশ্য? আমি থানবী রহ.-এর কোন এক লেখায় পড়েছি যে, এভাবে আয়াতের প্রয়োগও আয়াতের এক ধরনের বিকৃতি। এ কথা শুনে বানুরী রাহ. আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, আচ্ছা! ঠিক আছে। (শাখছিয়্যাত ও তাআছ্ছুরাত)

হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. اصلاح انقلاب امت -কিতাবে লিখেছেন—

قرآن مجید کی آیات کو بعض اوقات غیر معنی مقصود میں نقل یا کتابۃ برتا جاتا ہے، مثلا جنتری پر یہ آیت لکھ دی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کا حاصل یہ دعوی ہے کہ ہماری یہ جنتری أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی عمدہ جنتری ہے، یا کسی کتاب کی لوح پر کوئی آیت لکھ دی، جس میں مطبع یا صاحب مطبع کے نام کے مناسب کوئی لفظ یا معنی ہوں...، یہ سب تحریف ہے جس سے توبہ واجب ہے، اور بعض اوقات اس میں بعضے اہل علم جن کو کسی دوسرے فن میں زیادہ غلو واہتمام ہوتا ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. -اصلاح انقلاب امت ج ۱ ص ۷۵

মাওলানা লুধিয়ানবী রাহ. সম্ভবত থানবী রাহ.-এর উক্ত ইবারতের দিকেই ইশারা করেছেন।

৬. কিছু বিষয় এমন আছে যার মূল

কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত কিন্তু তার পারিভাষিক নাম কুরআন-হাদীসে নেই। যেমন, তাসাওউফ ও ইলমে কালাম। ভ্রান্ত তাসাওউফ ও তার সকল তরীকা তো সর্বাবস্থায়– নাম ও বস্তু, ভিতর ও বাহির এবং শব্দ ও মর্ম সব দিক থেকেই ভ্রান্ত। কিন্তু আহলে হকের তাসাওউফ যার হাকীকত হলো ইহসান, এখলাস ও তাযকিয়া তথা কলব ও রূহের পরিশুদ্ধি তাতো সর্বাবস্থায় প্রশংসিত ও কাম্য। তা সত্ত্বেও নামটা (তাসাওউফ, সূফী) যেহেতু নতুন এবং তাসাওউফও একটি স্বতন্ত্র ফন যার মধ্যে অনেক পরিভাষা, রীতি-নীতি, অনেক ইজতেহাদী বিষয়, অনেক রুচিগত বিষয়, এমনকি অনভিজ্ঞ সূফীদের অনেক যাল্লাত ও বিচ্যুতিও অন্তর্ভুক্ত এজন্য তাসাওউফকে (যে তাসাওউফ সমষ্টিগতভাবে হক তাকেও) সরাসরি কোন আয়াতে কারীমার মেসদাক ও উদ্দিষ্ট অর্থ আখ্যা দেওয়া শুদ্ধ নয়। হ্যাঁ, তাসাওউফের স্বরূপ ও হাকীকত বর্ণনা করে ঐ হাকীকতকে কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সাব্যস্ত করা ঠিক আছে। একথা স্পষ্ট না করে যদি শুধু তাসাওউফ শব্দ ব্যবহার করে তাকে সরাসরি কোন আয়াতের মেসদাক আখ্যা দেয়া হয় তাহলে অনেকেরই এ ভুল ধারণা হবে যে, তাসাওউফ তার সকল পরিভাষা ও রীতি-নীতি এবং সকল ইজতিহাদী ও রুচিগত বিষয়সহ সরাসরি কুরআন হাদীসে রয়েছে। অথচ বাস্তবতা তো এমন নয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি আমার এ কথা থেকে প্রমাণ করতে চায় যে, আমি সহীহ তাসাওউফের বিরোধী তাহলে তা মারাত্মক ভুল হবে। আলহামদু লিল্লাহ, আমার কিতাব 'তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' ১৫ বছর পূর্ব থেকে প্রকাশিত।

আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল, কোন সহীহ বিষয়ের জন্য কুরআনে কারীম থেকে দলীল পেশ করতে গিয়ে ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত নয়। কেননা এ থেকে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয় এবং বিরোধীদেরকে আপত্তি তোলার সুযোগও করে দেয়া হয়। এরচে' বড় কথা হলো, এ পদ্ধতি দলীল উপস্থাপনের স্বীকৃত উসূলের পরিপন্থী।

একই কথা ইলমে কালামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার বড় আশ্চর্য লেগেছে যখন এক গ্রন্থকারকে قُلْ ... بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [সূরা ইউসুফ (১২) : ১০৮]এ আয়াতের অধীনে লিখতে দেখেছি– এ আয়াত এ কথার প্রমাণ যে, ইলমে কালাম ছিলো নবীগণের পেশা (ব্যস্ততা)!!

ইলমে কালাম একটি নতুন শাস্ত্র। তাতে নতুন নতুন পরিভাষা, ব্যক্তিগত মতামত, নবউদ্ভাবিত চিন্তা-ফিকির এবং নিছক সম্ভাবনানির্ভর প্রস্তাবনা-জাতীয় মতামতের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।

অন্যদিকে একই নামেই বেদআতী-কালাম শাস্ত্রবিদদেরও রয়েছে স্বতন্ত্র ইলমে কালাম। সুতরাং কোন ভূমিকা ও বিশ্লেষণ ছাড়া এটা বলে দেয়া –তা আবার কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিতে– যে, ইলমে কালাম নবীগণের ব্যস্ততা ছিলো কত মারাত্মক অসতর্কতা!

কোনো সন্দেহ নেই যে, সহীহ ইলমে কালামের মূল কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান আছে কিন্তু কুরআন হাদীস থেকে তা প্রমাণ করার ঐ উসলূব সঠিক হতে পারে না যেটা উক্ত গ্রন্থকার গ্রহণ করেছেন।

মনে রাখা উচিত, প্রত্যেক যুগেই কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ও হেদায়েতকে ঐ যুগের লোকদের জন্য সহজবোধ্য করার স্বার্থে সে যুগের ভাষা ও পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু তার জন্যও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি আছে যেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। এবং এর নির্দিষ্ট পন্থাও আছে যার সঠিক অনুশীলন কাম্য। অন্যথায় অবচেতনভাবে নিজেও কোন প্রকার বিকৃতিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে এবং পাঠকদের জড়িয়ে দেয়ার আরো বেশি আশঙ্কা থাকে।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রাহ. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মরহুমের ব্যাপারে –যখনও তার সকল বিচ্ছিন্ন চিন্তা-ফিকির মানুষের সম্মুখে আসেনি তখনই– নিজের আশঙ্কা ব্যক্ত করে যে তিনটি কথা লিখেছিলেন তার দ্বিতীয়টি ছিল এই–

"دوسری چیز طرز تعبیر ہے، مسائل اسلامیہ کی تشریح مغربی اصطلاحات کے ذریعہ ہو تو تعبیر نسبۃً آسان ہو جاتی ہے، اس لئے یہ راستہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس راستے سے قلب حقائق کا بڑا اندیشہ رہتا ہے، اس لئے بڑی احتیاط کی راہ ہے"

–'মাকাতিবে সুলাইমান' ১৬৫ (লাহোরের ছাপা); 'মওদূদী ছাহেব আওর উন কী তাহরীরাত কে মুতাআল্লিক চান্দ আহাম মাযামীন' ৫৭ (তারতীব : মুহাম্মাদ ইকবাল হুশিয়ারপুরী, দারুল ইশাআত, করাচী)

কুরআন কারীম থেকে হেদায়েত গ্রহণ ও দলীল উপস্থাপন একটি দীর্ঘ ও গভীর বিষয়। আপাতত এ কথাগুলোর মাধ্যমেই সমাপ্তি টানছি। আল্লাহ এগুলোকে কবুল ও মাকবুল করেন। আমীন। ●

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
১৫/৭/১৪৩৭ হি.
২৩/৪/২০১৬ ঈ.

কুরআন একটি স্বচ্ছ আয়না

(যে আয়নায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজ নিজ চেহারা দেখে নিজেদের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণয় করতে পারে)

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.

আমি আমার এক প্রিয়বন্ধুর মুখে সূরা আম্বিয়া-এর তিলাওয়াত শুনছিলাম। এ সূরার একটি আয়াত, যা গভীর চিন্তার দাবি রাখে, নিজের মধ্যে গভীর শিক্ষার উপকরণ ধারণ করে, আমার চিন্তায় অসংখ্য অর্থের দুয়ার খুলে দিল।

আল্লাহপাক ঘোষণা করেন,

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি এমন এক কিতাব, যার ভেতর তোমাদের আলোচনা রয়েছে। তোমরা কেন চিন্তা করো না?"–সূরা আম্বিয়া (২১) : ১০

এ আয়াত আমাদের বলে, কুরআন একটি পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সত্য ও বিশ্বস্ত আয়না। যে আয়নায় প্রত্যেক মানুষ নিজের চেহারা-সুরত দেখতে পারে। সমাজে নিজ অবস্থানও নির্ণয় করতে পারে। আল্লাহ পাকের নিকটও নিজ মর্যাদার ধারণা পেতে পারে। কারণ, কুরআন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করে। কুরআনে উত্তম ও আদর্শ মানুষের নমুনা যেমন আছে, তেমনি আছে অধম ও মন্দ লোকের নমুনাও। আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে বলেছেন– فِيهِ ذِكْرُكُمْ অর্থাৎ 'এ কিতাবে তোমাদের আলোচনা আছে'। তোমাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতের এমন অর্থ অনেক আলেমই করেছেন।[১]

আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম কুরআনকে একটি জীবন্ত, সবাক, জীবনঘনিষ্ঠ কিতাব মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে কুরআন কোন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বীয় জিনিস নয়, যা কেবল অতীত ও প্রাচীনকালের লোকদের নিয়ে আলোচনা করে। জীবিত মানুষ সম্পর্কে যার কোন বক্তব্য নেই। এবং সদা পরিবর্তনশীল মনুষ্য যিন্দেগী নিয়ে এবং অগণিত অসংখ্য মানুষ যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করছে তাদের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গগণ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নিজের ভেতরের মানুষটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। প্রতিটি বিষয়ই তাদের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হত। তাঁরা এ কুরআনের সাহায্যেই পথ চলতেন। এই বিরল-বিস্ময়কর কিতাবেই নিজেদেরকে খুঁজে বেড়াতেন। নিজ রুচি ও প্রকৃতির আসল রূপ এখানেই খুঁজতেন এবং খুব সহজেই এ কিতাবে নিজেকে আবিষ্কার করতেন। নিজেকে চিনে নিতেন।

কুরআনের আলোকে নিজকে কল্যাণসিক্ত দেখতে পেলে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করতেন। নেতিবাচক কিছু দেখলে তাওবা ও ইস্তিগফার করে নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করতেন।

হযরত আহনাফ বিন কায়েস রাহ.-এর ঘটনা

এ আয়াতের তিলাওয়াত শুনে আমার হৃদয়পটে হযরত আহনাফ বিন কায়স রহ.-এর কাহিনী জেগে উঠলো। হযরত আহনাফ বিন কায়স রাহ. বিখ্যাত তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত। সাইয়্যেদুনা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাযি.-এর বিশিষ্ট শিষ্যদের অন্যতম। সহনশীলতা ও গাম্ভীর্যের উপমাস্বরূপ ছিলেন। এতদসত্বেও যখন ক্রোধান্বিত হতেন, তখন তার আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বকীয়তার ঘুমন্ত সিংহ জেগে ওঠতো। আরবের লোকেরা বলতো 'যখন আহনাফ ক্রোধান্বিত হয়, তখন এক লক্ষ তরবারীও ক্রোধান্বিত হয়, কোষমুক্ত হয়।'

আমি এ কাহিনী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুন নাসর আল মারওয়াযী রহ. (মৃত ২৭৫ হিজরী)-এর বিখ্যাত কিতাব 'কিয়ামুল লাইল'-এ পাঠ করেছি। সংকলক হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য। তিনি এ কিতাব সম্ভবত নিজ শহর বাগদাদে অবস্থানকালেই রচনা করেছেন।

ঘটনাটি এই যে, একদিন হযরত আহনাফ বিন কায়েস রহ. বসেছিলেন, এ সময় উপরোক্ত আয়াত এক ব্যক্তিকে তেলাওয়াত করতে শুনলেন। এ আয়াত শুনে তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, আমার আলোচনা আছে? আচ্ছা! কুরআনুল কারীম আনো, দেখি আমি তাতে নিজ আলোচনা খুঁজে পাই কি না? দেখি তো আমি কাদের সঙ্গে। কাদের সাথে আমার সাদৃশ্য!... তিনি যখন কুরআন খুললেন তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি তার নজরে পড়ল।

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত। তাদের ধন-সম্পদে যাচক ও বঞ্চিতের (যথারীতি) হক থাকত।"–সূরা

১. এছাড়া অন্য অর্থের অবকাশও আছে।–অনুবাদক

যারিয়াত (৫১) : ১৭-১৯

অতঃপর এ আয়াতে দৃষ্টি পড়লো–

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"(রাতের বেলা) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে।" –সূরা সাজদা ৩২) : ১৬

অতঃপর একদল লোকের আলোচনা তার চোখে পড়লো, যাদের পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে :

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

"সে দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।"–সূরা ফুরকান (২৫) : ২৪

এরপর তিনি এমন লোকদের মুখোমুখি হলেন, যাদের পরিচয়–

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।"–সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৪

এরপর তার সামনে এমন কিছু মানুষের চিত্র এলো যাদের আলোচনা কুরআন এভাবে করেছে :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব-অনটন থাকে। যারা স্বভাবের কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম।"–সূরা হাশর (৫৯) : ৯

এরপর তাঁর সামনে এ আয়াত এলো :

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"এবং যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কর্ম পরিহার করে এবং যখন তাদের ক্রোধ জাগে, তখন ক্ষমা প্রদর্শন করে। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকর্মে) ব্যয় করে।"–সূরা আশশূরা (৪২) : ৩৭-৩৮

তিনি থেমে গেলেন এবং বললেন, হায় আল্লাহ! আমি তো এখানে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না। এরপর তিনি অন্যত্র নিজেকে খুঁজতে লাগলেন। তখন তিনি একদল লোকের আলোচনায় দেখতে পেলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

"তাদের অবস্থা তো ছিল এই যে, তাদেরকে যখন বলা হত, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তখন তারা অহমিকা প্রদর্শন করত। এবং বলত, আমরা কি এমন যে, এক উন্মাদ কবির কারণে আপন উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?"–সূরা আসসাফফাত (৩৭) : ৩৫-৩৬

এরপর ঐ সকল লোকের আলোচনা দেখতে পেলেন যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ

"কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না। আর যারা অহেতুক আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হত, আমরাও তাদের সঙ্গে তাতে মগ্ন হতাম। এবং আমরা কর্মফল দিবসকে অবিশ্বাস করতাম। পরিশেষে সেই নিশ্চিত বিষয় আমাদের সামনে এসেই গেল।"–সূরা মুদ্দাসসির (৭৪) : ৪২-৪৭

তিনি এ আলোচনা পাঠ করা মাত্রই থেমে গেলেন এবং বললেন, আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ সকল লোক থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি।

এরপরও তিনি কুরআনুল কারীমের পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে যখন এ আয়াতে দৃষ্টি পড়লো

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"অপর কিছু লোক এমন, যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে। তারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিলিয়ে ফেলেছে। আশা করা যায় আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।–সূরা তাওবা (৯) : ১০২

তখন তিনি বলে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি তো এদেরই দলভুক্ত।

আসুন আমরাও নিজেদেরকে খুঁজি

আসুন আমরাও আমাদের আলোচনা, ধীরস্থিরভাবে বিশ্বস্ততার সাথে অনুসন্ধান করি। কুরআন যেহেতু সুসংবাদদাতা এবং ভীতি-প্রদর্শনকারী নেককার ঈমানদারের আলোচনা যেমন এতে আছে, কাফের-মুশরেকের আলোচনাও আছে। কুরআন ব্যক্তি

ও গোষ্ঠী উভয়ের আলোচনাই করেছে। সকলের বিবরণই এতে দেখা যায়।

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

"এবং মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে, আর তার অন্তরে যা আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষীও বানায়, অথচ সে (তোমার) শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কট্টর। সে যখন উঠে চলে যায়, তখন যমীনে তার দৌড় ঝাঁপ হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে তাতে অশান্তি ছড়াবে এবং ফসল ও (জীব-জন্তুর) বংশ নিপাত করবে, অথচ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তখন আত্মাভিমান তাকে আরও বেশি গুনাহে প্ররোচিত করে। সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট হবে এবং তা অতি মন্দ বিছানা।"–সূরা বাকারা (২) : ২০৪-২০৬

এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"এবং (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু।"–সূরা বাকারা (২) : ২০৭

আরেক দলের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনও নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"–সূরা মায়েদা (৫) : ৫৪

অপর আরেক দলের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

"এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি।"–সূরা আহযাব (৩৩) : ২৩

কুরআন তাঁর অনুসারীদেরকে শোকর ও কৃতজ্ঞতাবোধের উৎসাহ দিয়েছে। নাশোকর ও অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করেছে। সদাচরণের বদলা অসদাচরণ দ্বারা দেওয়ার নিন্দা করেছে। এবং এ ধরনের লোকের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে ঘোষণা করেছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ সম্প্রদায়কে ধ্বংস-নিবাসে পৌঁছে দিয়েছে।"–সূরা ইবরাহীম (১৪) : ২৮

উপরোক্ত বিষয়টি এমন একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়েছেন যারা আল্লাহপাকের নিআমতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে নিজেদের স্বচ্ছলতা ও ধনাঢ্যতার আহমিকায় লিপ্ত হয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছে,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যা ছিল নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। চতুর্দিক থেকে তার জীবিকা চলে আসত পর্যাপ্ত পরিমাণে। অতঃপর তা আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা শুরু করে দিল। ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করালেন।"–সূরা নাহল (১৬) : ১১২

মানবীয় বৈশিষ্ট্যের শাশ্বত নমুনা

মানব-বৈশিষ্ট্যের এ শাশ্বত নমুনা কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে বর্ণিত হয়েছে।

কোথাও কোন স্বৈরাচারী শাসকের নামে, যেমন ফিরআউন। কোথাও কোন দুষ্ট মন্ত্রী বা নেতার নামে, যেমন হামান। আবার কোথাও অহংকারী ও কৃপণ পুঁজিপতির নামে, যেমন কারূন। কোথাও আবার কোন অবাধ্য অত্যাচারী সম্প্রদায়রূপে, যেমন 'আদ সম্প্রদায়। আবার কোথাও কোন কারিগরিবিদ্যায় পারদর্শী জাতিরূপে, যেমন সামুদ সম্প্রদায়।

এ সবই মানব-বৈশিষ্ট্যের শাশ্বত নমুনা। যদিও এসকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নির্ধারিত ভূখণ্ডে নির্ধারিত সময়ে ছিলো কিন্তু কুরআন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যখন উল্লেখ করেছে, তখন তারা সময় ও ভূখণ্ডের

(বাকি অংশ ২৭১ পৃষ্ঠায়)

ইহজাগতিকতা : এক প্রাচীন বিকার

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর যবানে একটি শিরোনাম বাক্য শুনেছিলাম– زاویۂ نگاہ درست کریں (দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করুন)। সত্যি, দৃষ্টিভঙ্গি এক গুরুতর ব্যাপার। জীবন ও জগতের মূল্যায়নে এবং কর্ম ও আচরণের গতিধারা নিয়ন্ত্রণে দৃষ্টিভঙ্গির রয়েছে গভীর প্রভাব। আবার দুটো অভিন্ন কর্মের মাঝেও আকাশ-পাতালের ব্যবধান ঘটে যায় শুধু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির শুদ্ধি ও পরিশুদ্ধি অতি প্রয়োজন। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে সঠিক কর্মের অধিকারী করে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের কর্মকে মহিমা দান করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের সূত্র বা মানদণ্ড কী? এর প্রধান সূত্র আলকুরআনুল কারীম। মানবের যিনি স্রষ্টা তিনি মানবের সবকিছুর পরিশুদ্ধির জন্য নাযিল করেছেন হেদায়েতের কিতাব– আলকুরআনুল কারীম। এই কিতাব মানুষকে সকল বিষয়ে সরল পথের সন্ধান দান করে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

অর্থাৎ এই কুরআন পথনির্দেশ করে যা সর্বাধিক সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত তার দিকে। –সূরা ইসরা (১৭) : ৯

সুতরাং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যেতে পারে কুরআন মজীদ থেকেই।

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার রবের বাণী পরিপূর্ণ ...। –সূরা আনআম (৬) : ১১৫

চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই একটিমাত্র বাক্যে কুরআনের পরিচয় এবং কুরআনের দ্বীন, ইসলামের পরিচয় এসে গেছে। এখানে দুটো শব্দ : صِدْقًا وَعَدْلًا 'সিদক' মানে সত্য আর 'আদল' মানে ন্যায়। আল্লাহর বাণী 'সত্য' ও 'ন্যায়ে'র দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। 'সিদক' ও 'আদল' এই দুই শব্দের তাৎপর্য কী?

কালিমা বা বাণী মৌলিকভাবে দুই প্রকার : এক. আখবার বা সংবাদ, আর দুই. আহকাম বা বিধান। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সকল বাণী যা সংবাদ-শ্রেণীর তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'সিদকে তাম' পূর্ণ সত্য। আর তাঁর যত হুকুম ও বিধান তা 'তাকভীনী' (প্রাকৃতিক) বিধান হোক বা 'তাশরীয়ী' (করণীয়-বর্জনীয় সংক্রান্ত) তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'আদলে তাম' শতভাগ যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত।

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম কাতাদা রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

صدقا : فيما وعد، وعدلا : فيما حكم

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ সত্য আর তাঁর ফয়সালাসমূহ শতভাগ যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত।

তাঁর এই ব্যাখ্যা ইমাম ইবনে আবী হাতিম রাহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।–তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, বর্ণনা : ৭৮০৭, ৭৮০৮, সূরা আনআম (৬) : ১১৫ দ্রষ্টব্য

সুতরাং কুরআন মজীদই হচ্ছে ঐ সূত্র, যা মানুষকে সকল বিষয়ে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে।

আলোচনার একটি বিষয় হতে পারে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। পার্থিব জীবনকে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে الْحَيَاةُ الدُّنْيَا 'আলহায়াতুদ দুনয়া'। পার্থিব জীবন-এর কাছাকাছি আরেকটি বিষয় হচ্ছে 'আদদুনয়া' বা পার্থিব জীবনের নানা উপকরণ যেমন– ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ইত্যাদি।

***

এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন কী?

অন্তত চারটি কারণে এ আলোচনা প্রয়োজন : এক. সাধারণ বুদ্ধি বলে, প্রত্যেক বিষয়কে সঠিকভাবে জানা কাম্য। কোনো বিষয়ে ভুল চিন্তা বা অবাস্তব ধারণা একটি জ্ঞানগত দোষ। সুতরাং তা থেকে মুক্ত থাকা জ্ঞানীমাত্রেরই কাম্য। এখন যে বিষয় যত বিস্তৃত ঐ বিষয়ে ভুল ধারণা তত বড় দোষ।

দুই. মানুষের কর্ম ও আচরণ তার চিন্তা ও বিশ্বাসের অধীন। সুতরাং কর্ম ও আচরণের শুদ্ধির জন্য চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। বাবা-মায়ের সাথে একজন সন্তানের সুসন্তানসুলভ আচরণের প্রথম শর্ত হল বাবা-মাকে বাবা-মা হিসেবে জানা। যে আপন মা-বাবাকে চেনেই না সে কীভাবে তাদের সাথে সন্তানসুলভ সদাচার করবে? সে তো তাদের সাথেও ঐ আচরণ করবে যা

সাধারণ কোনো মানুষের সাথে করে থাকে। তাহলে এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের কর্ম ও আচরণ তার চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত। সুতরাং কর্মের শুদ্ধির জন্য চিন্তার পরিশুদ্ধি অতি প্রয়োজন।

এ দুটো কারণ হচ্ছে সাধারণ। আর বিশেষভাবে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার আরেক কারণ এই যে, এটি একটি ক্ষুদ্র বা খণ্ডিত বিষয় নয়, একটি পূর্ণ ও বিস্তৃত বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির বিরূপ প্রভাব প্রকাশিত হবে জীবনের অসংখ্য ক্ষেত্রে।

আর চতুর্থত, পার্থিব জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এজন্যও প্রয়োজন যে, এই সম্পদ মানুষ একবারই মাত্র লাভ করে থাকে। জীবনের ছোট-বড় বহু কিছু এমন রয়েছে, যা মানুষ একাধিকবার পেতে পারে। ফলে প্রথমবারের ভুল দ্বিতীয়বারে সংশোধন করার সুযোগ থাকে, কিন্তু পার্থিব জীবন? এ তো এমন এক বিষয়, যা মানুষকে একবারই মাত্র দেওয়া হয় আর এর উপরই নির্ভর করে তার অনন্ত জীবনের মুক্তি ও সাফল্য। সুতরাং এই বিষয়ে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি তাকে এমন ক্ষতির মুখোমুখি করতে পারে, যা পূরণের আর কোনো উপায় থাকবে না।

এই সকল কারণে বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আর তাই প্রয়োজন সঠিক সূত্র থেকে বিষয়টির সঠিক আলোচনার।

***

কুরআন মজীদের অনেক বড় 'হুসন' ও 'ইহসান' সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ এই যে, কুরআন মানবজাতিকে এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান সরবরাহ করেছে এবং এ প্রসঙ্গে যুগে যুগে মানবজাতি যে সকল বিভ্রান্তি ও অবাস্তব বিশ্বাসের শিকার হয়েছে সেগুলোও চিহ্নিত করেছে। শুধু চিহ্নিতই করেনি ঐ সকল চিন্তাগত বিভ্রান্তির স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও ফলাফলও বর্ণনা করেছে। যাতে জীবন সম্পর্কে সঠিক চিন্তা ও ভুল চিন্তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়। আরবীতে প্রবাদ আছে- وبضدها تتبين الأشياء বস্তুর পরিচয় স্পষ্ট হয় বিপরীতটির মাধ্যমে।

***

বর্তমান নিবন্ধে উদাহরণস্বরূপ শুধু একটি ভুল চিন্তা নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

পার্থিব জীবন সম্পর্কে এক মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত, যা কুরআন চিহ্নিত করেছে তা এই-

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

অর্থাৎ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন।

ইহজীবনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই যে ভুল- এ কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নয়। এক বাস্তব ব্যাপার। অতীতেও বহু মানুষ এই ভুলের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এখনো বহু মানুষ সেই একই ধ্বংসের পথে রয়েছে। সুতরাং কুরআন মজীদ যা সর্বশেষ আসমানী কিতাব, এই চরম ভ্রান্তি স্পষ্ট ভাষায় চিহ্নিত করেছে। একই সাথে বর্ণনা করেছে এই ভ্রান্তির কারণ ও ফলাফলসমূহও।

সূরা আনআমের ২৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

ওরা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হব না। (৬ : ১৯)

একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে সূরা জাছিয়ার ২৪ নম্বর আয়াতে। তবে ওখানে আরেকটু কথাও আছে।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

ওরা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি। আর কালই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত এ বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই, ওরা তো শুধু মনগড়া কথা বলে। (৪৫ : ২৪)

এই আয়াতে মক্কার মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে। কাতাদাহ রাহ. বলেছেন-

لعمري! هذا قول مشركي العرب

অর্থাৎ এই আয়াতে মক্কার মুশরিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।-তাফসীরে তবারী ১১/২৬৩

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. বলেছেন-

هذا قول زنادقة قريش الذين ينكرون الصانع الحكيم

এ হচ্ছে কুরাইশের যিন্দীকদের কথা, যারা প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করত।-আহকামুল কুরআন ৩/৩৮৯

সূরা আন'আমের আয়াতে শুধু আছে-

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

অর্থাৎ আখেরাতে পুনরায় জীবিত হওয়ার ইনকার। আর এই আয়াতে রয়েছে প্রজ্ঞাবান স্রষ্টারও ইনকার। তো কুরাইশের এই যিন্দীকেরা প্রজ্ঞাবান স্রষ্টাকে অস্বীকার করত এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, সবকিছুকে 'যুগ' বা 'কালে'র সাথে যুক্ত করত। এ রকম আরো কিছু আয়াত কুরআন মজীদে আছে।

এখান থেকে দুটো বিষয় পাওয়া যাচ্ছে : এক. দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র জীবন মনে করার যে চিন্তা এর প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে আখেরাতের ইনকার। আরেক স্তম্ভ হচ্ছে প্রজ্ঞাবান পরম করুণাময় আল্লাহর অস্তিত্বের ইনকার। এই কুফর অতীতেও ছিল, এখনও আছে। এবার আপনি কুরআন মজীদ

পড়তে থাকুন এবং কুরআনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে থাকুন। আপনি দেখবেন, এই অবিশ্বাসী শ্রেণির নানা অপযুক্তি কুরআন একে একে খণ্ডন করেছে এবং সেগুলোর অসারতা বর্ণনা করেছে।

আমাদের কুরআন অধ্যয়নের একটি বিষয়বস্তু এই হতে পারে যে, আখেরাতে অবিশ্বাসী গোষ্ঠির কী কী অপযুক্তি কুরআন বর্ণনা করেছে এবং এর কী জবাব দান করেছে।

এ বিষয়ে লম্বা আলোচনা এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এখানে শুধু একটি আয়াত উল্লেখ করছি। সূরা ইয়াসীনের বিখ্যাত আয়াত–

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ

মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী? এবং সে আমার সম্পর্কে কী অদ্ভুত কথা বলে– مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?'

মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর আবার জীবিত হওয়া ওদের কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে। এই যে অসম্ভব মনে করা– এটাই আসলে আখেরাতের ইনকারের বড় কারণ। মরেই তো গেলাম, আবার জীবিত হব কীভাবে? এটাই হল মূল প্রশ্ন এবং আখেরাতের ইনকারের বড় কারণ।

এই প্রশ্নের জবাবে কুরআন মজীদের ইরশাদ–

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ أَنْشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝

তোমার প্রথম সৃষ্টি? তোমার প্রথম সৃষ্টি কীভাবে? কীভাবে তুমি ভুলে গেলে সে কথা? যিনি তোমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।

কুরআন এখানে বুদ্ধিকে সম্বোধন করেছে। আমরা যদি একটুখানি যুক্তির ভাষায় কথা বলি তাহলে এভাবে বলতে পারি, ওরা যে আখেরাতকে ইনকার করছে এবং অসম্ভব মনে করছে, যুক্তির নিরিখে তা কি অসম্ভব? মোটেই অসম্ভব নয়। মানুষের পুনরায় সৃজিত হওয়া অসম্ভব কেন হবে? এটা যে খুবই সম্ভব ব্যাপার– এর প্রমাণ তো মানুষের বর্তমান অস্তিত্ব। তুমি তো আগে ছিলে না। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছ। তোমার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা এমন এক 'সম্ভব' ব্যাপার, যা এক প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। তো দ্বিতীয়বার সৃজিত হওয়া 'অসম্ভব' ব্যাপার নয়, তবে দুনিয়ার এই জীবনে আমরা হুবহু এই ঘটনাটা ঘটতে দেখিনি।

যারা মারা গেছে তাদের কাউকে পুনরায় জীবিত হতে দেখিনি! কিন্তু এর দ্বারা তো সেটা অসম্ভব বলে প্রমাণ হয় না। তোমরা জীবিত হতে দেখনি তাই সে জীবিত হতে পারে না– এটা কেমন যুক্তি? তো পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে কুরআন বলে যে, এখানে কোনো 'ইস্তেহালা' নেই। এটা বরং একেবারে সম্ভব ব্যাপার।

আর এ তো খুবই সহজ কথা যে, যা কিছু সম্ভব তা হয়েছে কি হয়নি, হবে কি হবে না– এ সম্পর্কে যুক্তি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সত্য সংবাদ। তো পুনরুত্থানের বিষয়টি যুক্তির নিরিখে সম্ভব, এরপর এ সম্পর্কে এক সত্য ও দ্ব্যর্থহীন সংবাদ পাওয়া গেছে। যিনি স্রষ্টা তাঁর পক্ষ থেকে যখন জানিয়ে দেওয়া হল যে, এটা ঘটবে তখন কোনো সন্দেহ নেই যে, আবার মানুষকে জীবিত করা হবে। কুরআন মজীদে অন্তত তিন জায়গায় আল্লাহ তাআলা এই পুনরুত্থান সম্পর্কে কসম করেছেন। কসমের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সংবাদ দান করেছেন যে, পুনরুত্থান অনিবার্য, নিশ্চিত।

আলকাউসারে 'ঈমান বিল আখিরাহ' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ওখানে পুনরুত্থান সংক্রান্ত ঐ তিনটি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যে তিন আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কসম করেছেন।

'ইছবাতুল মাআদ' বা 'পুনরুত্থান' এ নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এই প্রসঙ্গটা এখানে এজন্য আসছে যে, দুনিয়ার জীবনকে যারা একমাত্র জীবন মনে করে, তাদের বিশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ– وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ আখিরাতের ইনকার। আরেক রুকন– وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ স্রষ্টার ইনকার।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এই আয়াতগুলো থেকে জানা গেল তা হচ্ছে, এই যে চিন্তাগত বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি এ মোটেই প্রগতি বা আধুনিকতা নয়। নতুন কোনো গবেষণাও নয়। এ এক প্রাচীন বিচ্যুতি, যুগ যুগ ধরে সমাজের মত্ত ও দাম্ভিক লোকেরা যার শিকার হয়ে এসেছে। সুতরাং কুরআন মজীদ এই গোমরাহী সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছে।

দেখুন, কুরআন মজীদ মক্কার মুশরিকদের আকীদা হিসেবে তা উল্লেখ করেছে। এরও আগে কওমে আদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়েও এ দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। তাদের মতো অবিশ্বাসী শ্রেণীর বক্তব্য–

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

সে কি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমাদের মৃত্যু হবে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবে তারপর তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি (এখানেই) এবং আমরা উত্থিত হব না।—সূরা মুমিনূন (২৩) : ৩৫-৩৭

সুতরাং এটা নতুন কোনো বিষয় নয়, নতুন কোনো জড়তা-মুক্তির ব্যাপার নয়; বরং এ এক প্রাচীন জড়তা ও মত্ততা। কুরআন যার স্বরূপ, প্রকাশ ও ফলাফল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে একে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছে—

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ

সুতরাং এখন যে ধ্বংস হবে বুঝেশুনে ধ্বংস হবে। যে মুক্তি পাবে বুঝেশুনে মুক্তি পাবে।

***

প্রত্যেক চিন্তারই কিছু বাস্তব প্রকাশ থাকে। অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম, আচরণ ও বৈশিষ্ট্য যা ঐ চিন্তার সাথে যুক্ত এবং ঐ চিন্তা থেকেই উৎসারিত। এদিক থেকে গোড়ার চিন্তাটিকে বলা যায় ঐ সকল কর্ম ও আচরণের প্রসূতি। তো পার্থিব জীবনের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে এই যে ভয়াবহ বিভ্রান্তি—

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

(পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন)-এর প্রকাশগুলো কী বা ঐ কর্ম ও আচরণগুলো কী, যা এই চিন্তা থেকে উৎসারিত— এ নিয়েও আমরা একটু আলোচনা করতে পারি। এই আলোচনাটা এই জন্য, যাতে গোড়ার কুফর থেকে পবিত্র থাকার সাথে সাথে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকেও পবিত্র থাকা যায়। কুরআন ও সুন্নাহয় যেমন ঈমান ও কুফরের বিবরণ আছে, তেমনি শুআবুল ঈমান ও 'শুআবুল কুফর' তথা ঈমান ও কুফরের শাখা-প্রশাখার বিবরণও আছে। মুমিন হওয়ার জন্য যেমন কুফর থেকে পবিত্র থাকা জরুরি, তেমনি ঈমানকে রক্ষা করার জন্য ও পূর্ণাঙ্গ করার জন্য কুফরের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকেও পবিত্র হওয়া জরুরি। এটা ইসলামের ও কুরআনের এক সৌন্দর্য যে, কুফরের পাশাপাশি কুফরের শাখা-প্রশাখার বিবরণও বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। আলোচ্য দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

১. এর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইনকারুর রুসুল অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার করা।

কুরআন মজীদের ইরশাদ—

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

এবং ওদেরই একজনকে ওদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল,) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরি করেছিল ও আখেরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিল, এ তো তোমাদের মতো একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর সে তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সে-ও তা-ই পান করে।

তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সে কি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অসম্ভব।

একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এবং আমরা উত্থিত হব না।

সে তো এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই। —সূরা মুমিনূন (২৩) : ৩২-৩৮

উপরের আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে হযরত হূদ আ.-এর দাওয়াত আর তাঁর কওমের দাম্ভিক শ্রেণির জবাব। এখানে ওদের যে দুটো বৈশিষ্ট্য প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, 'যারা কুফরি করেছিল ও আখেরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছিল।' এই শ্রেণির লোকেরা নবীগণকে অস্বীকার করে থাকে এবং এই অবিশ্বাসের পক্ষে নানা মিথ্যাচার ও অপযুক্তির অবতারণা করে থাকে। যেমন 'সে তো আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে।'—এ এক দাবি ও মিথ্যাচার। এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

এরপর 'এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ...।' এ এক অপযুক্তি। কারণ আল্লাহর

রাসূলগণ তো মানুষই হয়ে থাকেন। ফেরেশতা হন না। আর মানুষ মানুষের আনুগত্য করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেন? জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত মানুষের আনুগত্যই তো মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে রক্ষা করে। এ তো এমন এক বাস্তবতা, যা দলিল-প্রমাণ দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, মূর্খ ও দাম্ভিক লোকদের আনুগত্য মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

হূদ আ.-এর দাওয়াত ও তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক শ্রেণির জবাবের আরো বিবরণ রয়েছে : সূরা আরাফ ৬৫-৭২; সূরা হূদ ৫০-৬০; সূরাতুশ শুআরা ১২৩-১৪০ ও সূরাতুল আহকাফ ২১-২৬-এ।

এখানে শুধু সূরা হূদের আরেকটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঐ আয়াতে প্রথমে আদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে–

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد

এই আদ জাতি তাদের রবের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলগণকে আর অনুসরণ করেছিল প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ। –সূরা হূদ (১১) : ৫৯

কী অদ্ভুত সংঘাত কথায় ও কাজে। একদিকে ওরা রাসূলগণের কল্যাণপূর্ণ আনুগত্য এই বলে বর্জন করেছিল যে, 'ওরা তো আমাদেরই মতো মানুষ', অন্যদিকে পালন করেছিল ওদের উদ্ধত স্বৈরাচারীদের অন্যায় আদেশ, যা তাদের দুনিয়া-আখেরাতে অভিশাপগ্রস্ত করল।

দুই

এই দর্শনের দ্বিতীয় মাযহার বা প্রকাশ 'ইত্তেবায়ে হাওয়া' বা ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ।

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। কেননা এ তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়েছে। –সূরা সদ (৩৮) : ২৬

তাহলে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে খেয়াল-খুশির অনুসারীদের মূল পরিচয় হচ্ছে আখেরাত-বিস্মৃতি। যা তাদেরকে চরম শাস্তির শিকার করবে।

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

তুমি কি লক্ষ করেছ ঐ ব্যক্তিকে, যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ আপন জ্ঞান অনুযায়ী তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথ দেখাবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

ওরা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন; আমরা মরি ও বাঁচি আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুত এই ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই, ওরা তো শুধু মনগড়া কথা বলে। –সূরা জাছিয়া (৪৫) : ২৩-২৪

খেয়াল-খুশির অনুসরণ ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার মাত্রাও বিভিন্ন, এর ক্ষেত্রও অতি বিস্তৃত। ধর্ম-কর্ম থেকে শুরু করে উপার্জন, লেনদেন, সামাজিকতা ইত্যাদি সবই এর এক এক ক্ষেত্র। দেখুন কুরআন মজীদের বিবরণ–

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد

মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। মাপে ও ওজনে কম করো না; আমি তোমাদের সমৃদ্ধিশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তির।

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মেপো ও ওজন করো। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।

যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যা বাকি থাকবে তা তোমাদের জন্য উত্তম; আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

ওরা বলল, হে শুআইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা

যার ইবাদত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমাদের ধন-সম্পদে আমরা যা চাই তা করা(ও)? তুমি তো সহিষ্ণু, ভালো মানুষ বটে। –সূরা হুদ (১১) : ৮৪-৮৭

এখানে 'অথবা আমাদের ধন-সম্পদে আমরা যা চাই তা করাও?' কথাটি সম্পদের উপার্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্পষ্ট স্বেচ্ছাচারী মানসিকতার ধারক। আল্লাহর নবী আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'মাপে ও ওজনে কম দিও না, মানুষের প্রাপ্য কম দিও না'-এর জবাবে ওরা ঐ উপহাস-বাক্য উচ্চারণ করল। বর্তমান সময়ের পরিভাষায় একে বলা যেতে পারে 'সম্পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা।' এখন তো স্বাধীনতা শব্দটি স্বেচ্ছাচার অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন : সূরা আরাফ : ৮৫

ওখানে এই কওম, যাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা ওদের সম্পর্কে হযরত শুআইব আ.-এর এই বাণীও বর্ণিত হয়েছে–

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ

'আর তোমরা পথে পথে বসে (পথিকদের) সন্ত্রস্ত করো না।' এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর রাহ. লেখেন–

أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم

অর্থাৎ পথে পথে বসে মানুষকে হুমকি দিও না যে, ওদের ধন-সম্পদ তোমাদের না দিলে তোমরা ওদের মেরে ফেলবে।' –তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৩৭০

তো ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি এগুলোও ছিল ঐ কওমের বৈশিষ্ট্য। সূরাতুল ফাজরে বলা হয়েছে–

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

মানুষ তো এই রূপ যে, তার রব যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। এবং যখন তার রিযক সংকুচিত করে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন। না কখনো নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং তোমাদের অভাবগ্রস্তদের খাদ্যদানে একে অপরকে উৎসাহিত কর না এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ খেয়ে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালোবাস। –সূরা ফাজর (৮৯) : ১৫-২০

ধর্ম-কর্মের ক্ষেত্রেও 'আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ইবাদত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে?' এ কথাটিও ইচ্ছার অনুগামিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম-কর্মের ক্ষেত্রেও আল্লাহর আদেশ পালন নয়; বরং ধর্মের নামে নানা অধর্ম-শিরক, বিদআত ও নানা রকম আনুষ্ঠানিকতা ও ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজ, পূর্ব-অভ্যস্ততার কারণে যা ভালো লাগে এবং যাতে রয়েছে ইচ্ছা পূরণের নানা অনুষঙ্গ, এগুলো তো স্বেচ্ছাচারিতারই এক রূপ।

মক্কার মুশরিকদের বিখ্যাত মূর্তি লাত, উযযা, মানাতের নাম উল্লেখ করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ

এগুলো কতক নামমাত্র, যা রেখেছ তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলিল প্রেরণ করেননি। ওরা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে অথচ ওদের কাছে এসেছে ওদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ। –সূরা নাজম (৫৩) : ২৩

ধর্মের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার শুধু পৌত্তলিকদের মধ্যেই নয়, কিতাবীদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছিল, ফলে তারা আল্লাহর হেদায়েত থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি ওদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি ওদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। –সূরা বাকারা (২) : ১২০

কিবলা প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে কুরআনের ইরশাদ–

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি ওদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, নিশ্চয়ই তখন তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। –সূরা বাকারা (২) : ১৪৫

আল্লাহর পক্ষ হতে যে দ্বীন ও শরীয়ত এসেছে, যা গোটা মানবজীবন শামিল করে এর বিপরীত সকল মত-পথ কুরআনের দৃষ্টিতে 'খেয়াল-খুশি' হিসেবে চিহ্নিত। ইরশাদ হয়েছে—

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের এক বিশেষ পথের উপর, সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর। অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। —সূরা জাছিয়া (৪৫) : ১৮

তিন

এই জীবন-দর্শনের আরেক প্রকাশ বা বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর পথ থেকে দূরে থাকা এবং দূরে রাখা। সূরা আনআমের ২৬ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

ওরা তার (প্রতি ঈমান আনা) থেকে নিবৃত্ত রাখে আর নিজেরাও তার (প্রতি ঈমান আনা) থেকে দূরে থাকে। ওরা শুধু নিজেদেরকেই ধ্বংস করে, কিন্তু ওরা উপলব্ধি করে না। —সূরা আনআম (৬) : ২৬

সূরা ইবরাহীমের শুরুর দিকে বলা হয়েছে—

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ

আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, এ তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোতে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ, আল্লাহ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফেরদের জন্য। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে ভালোবাসে এবং আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে আর আল্লাহর পথে বক্রতা কামনা করে। ওরাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। —সূরা ইবরাহীম (১৪) : ১-৩

'যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে ভালোবাসে' অর্থাৎ আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রগামী করে, দুনিয়ার জন্যই ওদের সকল চিন্তা ও প্রয়াস, আখেরাতের কোনো স্থান ওদের কাছে নেই। —দ্রষ্টব্য : তাফসীরে ইবনে কাসীর

এটা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার চূড়ান্ত অবস্থা, যা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে ওদের চেয়ে বড় জালেম আর কে? ওদের উপস্থিত করা হবে ওদের প্রতিপালকের সামনে এবং সাক্ষীগণ বলবে, এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! আল্লাহর লানত জালেমদের উপর। যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে আর এরাই আখেরাতকে প্রত্যাখ্যান করে। —সূরা হূদ (১১) : ১৮-১৯

فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ

অতপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, আল্লাহর লানত জালেমদের উপর — যারা আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত; ওরাই আখেরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। —সূরা আরাফ (৭) : ৪৪-৪৫

সারকথা এই যে, এই জীবনদর্শনে বিশ্বাসীদের এক বড় বৈশিষ্ট্য, যা কুরআন মজীদ বিভিন্ন জায়গায় বারবার উল্লেখ করেছে, আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করা এবং তাতে নানা দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা। কুরআন মজীদের এই বর্ণনা পড়ুন আর চারপাশের ইহজাগতিকতাবাদীদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডাসমূহ পর্যবেক্ষণ করুন। এ সবের স্বরূপ ও কারণ বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

কুরআন মজীদের এই বিবরণ থেকে মুমিনের শিক্ষা গ্রহণের বিষয় হচ্ছে, এই সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করা এবং এগুলো থেকে সর্বতোভাবে নিজেকে পূতপবিত্র রাখা। দায়ীদের গ্রহণের বিষয় হচ্ছে, সমসাময়িক প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় হতোদ্যম না হওয়া এবং অস্থিরতার কারণে শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন না করা। আর সকল মুমিনের কর্তব্য — এই সব প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত না হওয়া।

কুরআন থেকেই জানা যাচ্ছে যে, আখেরাতে অবিশ্বাসী শ্রেণির মাঝে এ সকল বৈশিষ্ট্য যুগ যুগ ধরে ছিল। সমসাময়িক যা কিছু তা এরই ধারাবাহিকতা মাত্র।

সূরা হূদে এদের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখের পর ইরশাদ হয়েছে—

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ

ওরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে সক্ষম ছিল না এবং আল্লাহ ছাড়া ওদের কোনো অভিভাবক ছিল না; ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে; ওদের শোনার সামর্থ্য ছিল না এবং ওরা দেখতও না। -সূরা হূদ (১১) : ২০

অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই ওদের ধ্বংস করতে পারতেন। আর সেক্ষেত্রে না ওরা নিজেরা আত্মরক্ষা করতে পারত আর না ওদের এমন কোনো অভিভাবক ছিল যে ওদের রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। আখেরাতে ওরা ওদের কর্মফল ভোগ করবে।

চার

এই জীবনদর্শনের আরেক প্রকাশ, ঈমান আনার পর সত্য দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া।

সূরা নাহল-এর ১০৫-১০৯ আয়াতে এসেছে-

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফর করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত। এ এই জন্য যে, ওরা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় আর আল্লাহ কাফের কওমকে হেদায়াত করেন না। ওরাই ঐ সকল লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং ওরাই গাফিল। নিশ্চয়ই ওরাই হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। (১৬ : ১০৬-১০৯)

সূরা মুহাম্মাদে ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَ اَمْلٰى لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ

যারা নিজেদের কাছে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান ওদের কাজকে শোভন করে দেখিয়েছে এবং ওদেরকে মিথ্যা আশা দিয়েছে।

এ এই জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করেছে ওদেরকে এরা বলে, আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ ওদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। -সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ২৫-২৬

পার্থিব নানা স্বার্থ হাসিলের জন্য ইয়াহুদ-নাসারা ও বিধর্মীদের সাথে সখ্য ও ওদের আনুগত্য মানুষের দ্বীন ও ঈমান বিনষ্ট হওয়ার এবং অবশেষে সত্য দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়ার অনেক বড় কারণ। কুরআন মজীদে বারবার এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তোমরা যদি তাদের কোনো দলের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর কাফের বানিয়ে ছাড়বে।

কীরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে যখন তোমাদের নিকট পঠিত হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর রাসূল? কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১০০-১০১

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তাদের হৃদয়ের ঈর্ষাবশত তোমাদেরকে কুফরিতে ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তোমাদের ঈমান আনার পর। অতএব ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোনো নির্দেশ দেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। -সূরা বাকারা (২) : ১০৯

পাঁচ

এই জীবনদর্শনের আরেক মাযহার ও প্রকাশ, মুমিনদের অবজ্ঞা করা ও নির্বোধ মনে করা। আর এর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে, যাঁরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মুমিন বান্দা সেই নবী ও রাসূলগণকে অবজ্ঞা করা। সূরা বাকারার ১৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ

যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ঈমান আন,

তারা বলে, নির্বোধরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না। (২:১৩)

সূরা আরাফের ৬৬ নং আয়াতে হূদ আ.-এর কওম কওমে আদ সম্পর্কে এসেছে–

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

তার কওমের প্রধানেরা যারা কুফরী করেছিল (হূদ আ.-এর দাওয়াতের জবাবে) বলল, আমরা তো দেখছি, তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি। সে (হূদ আ.) বলল, হে আমার কওম! আমি নির্বোধ নই; বরং আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। ... –সূরা আরাফ (৭) : ৬৬-৬৮

আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ. 'তাফসীরে মাজেদী'তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন–

داعیانِ حق کو جواب بھی ہر قوم کے روشن خیالوں کی طرف سے یکساں ہی ملا ہے، مرشد تھانوی رح نے فرمایا کہ عقلاء دین کو سفیہ کہنے کا طریقہ سفہائے قدیم سے چلا آرہا ہے۔

হকের দায়ীগণ প্রত্যেক কওমের 'প্রগতিশীল'দের পক্ষ থেকে অভিন্ন জবাব পেয়েছে। মুর্শিদ থানভী রাহ. বলেন, দ্বীনের বুদ্ধিমানদের নির্বোধ বলার ধারা প্রাচীনযুগের বুদ্ধিহীন শ্রেণি থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। –তাফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা : ৩৭৭, হাশিয়া ৯০

মিথ্যাকে সত্য মনে করা যেমন নির্বুদ্ধিতা, তেমনি সত্যকে মিথ্যা বলাও নির্বুদ্ধিতা। বিশেষত এই অস্বীকার যখন ব্যক্তির নিজের ক্ষতিগ্রস্ততা টেনে আনে। সে-ই তো বুদ্ধিমান যে নিজের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং বিপদের শিকার হওয়ার আগেই আত্মরক্ষার প্রয়াস গ্রহণ করে। নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের প্রধান কথা ছিল, আখেরাতের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করা। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাফা পাহাড়ের ওপর প্রকাশ্য দাওয়াতের সেই বাণীগুলো স্মরণ করুন–

فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد

এক কঠিন আযাবের পূর্বে (ঐ বিষয়ে) আমি তোমাদের সতর্ককারী। –সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৯৭১

নিজের বিপদ বুঝতে না পারা এবং হিতাকাঙ্ক্ষীকে তাচ্ছিল্য করার মাঝে কোনো গৌরব বা বীরত্ব নেই। একে গৌরব ও বীরত্বের ব্যাপার মনে করা তো নির্বুদ্ধিতাই বটে।

ছয়

এই জীবনদর্শনে বিশ্বাসীদের আরেক বৈশিষ্ট্য, নানাভাবে মুমিনদেরকে সন্ত্রস্ত করা। যুগে যুগে কাফের-মুশরিক শ্রেণির এই বৈশিষ্ট্য কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে–

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

কাফেরেরা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। অতপর রাসূলগণকে তাঁদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন, জালেমদের আমি অবশ্যই বিনাশ করব।

ওদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই; এ তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির। –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ১৩-১৪

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ

তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, হে শুআইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। সে বলল, যদিও আমরা তা ঘৃণা করি তবুও? –সূরা আরাফ (৭) : ৮৮

সাত

এই জীবন-দর্শনের আরেক বৈশিষ্ট্য, দ্বীনী ইলমের না-কদরী। আখেরাতেই যার বিশ্বাস নেই, আখেরাতের সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট সবকিছু তার কাছে মূল্যহীন হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাঁর বিধি-বিধানের জ্ঞান, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও ইহতিরাম, তাঁর আনীত আদর্শ ও জীবনব্যবস্থার অনুসরণ, দুনিয়ার জীবনের সকল কামনা-বাসনা পূরণ না করার শিক্ষা, এই সবকিছু এই চিন্তা ও দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং এ দর্শনে বিশ্বাসীদের কাছে এই সব

বিরক্তির ব্যাপার। এই জ্ঞান তার কাছে অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতা। সূরা আরাফে যে আছে, কওম তাঁর নবীকে বলছে–

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

তার কওমের প্রধানেরা, যারা কুফরী করেছিল (হুদ আ.-এর দাওয়াতের জবাবে) বলল, আমরা তো দেখছি, তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি।

এ আসলে এই মানসিক অবস্থারই প্রকাশ। সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গতম ওহী আলকুরআনুল কারীম সম্পর্কে কাফেরদের উক্তি–

إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

এগুলো তো আগের যুগের কথা। এগুলো তো সেই পুরনো কথা। এ-ও এই মানসিক অবস্থারই প্রতিনিধিত্ব করে। আলকাউসারের (মে' ১৫ ঈ.) সংখ্যায় "দয়াময়! আলো দিন এই অন্ধ চোখে" শীর্ষক লেখাটিতে কিছু হাওয়ালাও এসেছে। এটা ওদের এক সাধারণ প্রবণতা কুরআন ও কুরআনের ইলম সম্পর্কে এ কথা বলে দেওয়া যে, এ তো পুরনো কথা। অথচ কে না জানে, সত্য পুরনো হলেও সত্য। আর মিথ্যা নতুন হলেও মিথ্যা।

আট

এই জীবন-দর্শনের আরেক বৈশিষ্ট্য, পার্থিব বিত্ত-বৈভবের জন্য লালায়িত হওয়া এবং বিত্তশালীদের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ ও আক্ষেপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।

সূরা কাসাসের ৭৯-৮০ নং আয়াতে কারূনের ঘটনায় এসেছে–

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যেরূপ দেওয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হত। প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান! (২৮:৭৯)

পার্থিব জীবন কামনা করার এক পর্যায় তো হল কুফর। আখেরাতকে অস্বীকার করে পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে কামনা করা। আরেক পর্যায় হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা। আখেরাতের প্রতি ঈমান থাকলেও তা এত দুর্বল যে, তা সাধারণত বিস্মৃতির মধ্যেই থাকে। ফলে জীবনযাত্রায় এই বিশ্বাসের প্রভাব সাধারণত দেখা যায় না। এই দুই শ্রেণীরই বৈশিষ্ট্য– কাফের-মুশরিকদের বিত্ত-বৈভব দেখে তাদের মনে হয়, ওরা তো মহাসৌভাগ্যবান।

হায়! এই মিসকীনদের কে বোঝাবে, সৌভাগ্যবান তো সে যার ঈমান নসীব হয়েছে।

এই যে চিন্তাধারা এর সাথে দেখুন, আমাদের যুগের এই চিন্তার কত মিল– পশ্চিমারা কত এগিয়ে গেল! বিত্ত-বৈভব, প্রযুক্তি, উন্নতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি সব দিক থেকে ওরা অগ্রসর। ওরাই তো মহাসৌভাগ্যবান!

পরের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীলগণকেই তা দেওয়া হয়।–সূরা কাসাস (২৮:৮০)

এই আয়াত আমাদের জানাচ্ছে, জ্ঞানী ও আহলে ইলম তারা যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের ঈমান ও আমলে সালিহের প্রতিদানকে দুনিয়ার সকল বিত্ত-বৈভবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

এ পর্যন্ত একটি কুফরী জীবন-দর্শন ও তার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল। আমরা যদি কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকি তাহলে এই জীবনদর্শনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন আয়াতে পেয়ে যাব। এই আলোচনার উদ্দেশ্য, আমরা যারা মুমিন, আমাদের যেমন সকল কুফরী দর্শন থেকে আত্মরক্ষা করা কর্তব্য, তেমনি ঐ সকল কুফরী দর্শনের শাখা-প্রশাখা ও কর্মগত বৈশিষ্ট্য থেকেও আত্মরক্ষা করা কর্তব্য। কারণ কর্মগত কুফর মানুষকে ধীরে ধীরে বিশ্বাসগত কুফরের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া একজন মুমিনের জন্য কত লজ্জার ব্যাপার যে, কর্ম ও আচরণে কুফরের একটি বৈশিষ্ট্য বহন করে চলা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন। ●

পুনশ্চ : শিরোনাম 'ইহজাগতিকতা' শব্দটি Secularism অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত English-Bangla Dictionary তে Secularism শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা; ইহবাদ।

আলকুরআনে বুদ্ধিমানের পরিচয়

মাওলানা আবরারুযযামান পাহাড়পুরী

উলুল আলবাব। কুরআনে কারীমের একটি শব্দ। উলু মানে অধিকারী। আলবাব মানে আকল, বুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তা। উলুল আলবাব মানে হল বুদ্ধির অধিকারী বা বুদ্ধিমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ শব্দটি পবিত্র কুরআনে অনেকবার ব্যবহার করেছেন। এর কাছাকাছি অর্থের আরেকটি শব্দ আছে, উলুল আবছার। মানে চোখওয়ালা বা চক্ষুষ্মান। এ উলুল আলবাব বা উলুল আবছার সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন? কোথাও কোন ঘটনা বা আদেশ-নিষেধ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় এসবের মাঝে আছে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ। কোথাও বলেছেন, বুদ্ধিমানরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। আমাদের জানার বিষয় হল বুদ্ধিমান কারা, কাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তারাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। কাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এসব কিছুর মাঝে কেবল বুদ্ধিমানদের জন্যই উপদেশ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান কারা?

এ এক বিস্তৃত বিষয়। বুদ্ধি এমন এক বাস্তবতার নাম, যা ছাড়া জীবন চলে না। প্রতি পদে প্রতি পদক্ষেপে বুদ্ধির নির্দেশনা জরুরি। যার বুদ্ধি যাকে যেমন নির্দেশনা দেয়, সে সেভাবেই চলে। কারো বুদ্ধি তাকে সৎ-পথে চালায়। কারো বুদ্ধি তাকে বিপথগামী করে। তবে কি বুদ্ধির নিজস্ব কোন সংজ্ঞা নেই? বুদ্ধি কি তবে একটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার? এমনকি একটি পশুও তো যা কিছু করে, বুদ্ধি নিয়েই করে। আমাদের মনে কৌতূহল, তবে কি পশুকেও বুদ্ধিমান বলতে হবে? সুলাইমান আ.-এর সেই পিপড়ার দল, তাদেরও তো বুদ্ধি ছিল। তারা বুদ্ধিমান। মানুষও বুদ্ধিমান। দুই বুদ্ধিমানের মধ্যে তো অবশ্যই পার্থক্য আছে। কী সেই পার্থক্য?

আবার মানুষে মানুষে কত ব্যবধান। কেউ একটা কাজকে ভীষণ ভাল মনে করছে। একই কাজ অন্য কারো কাছে চরম মন্দ। আপন আপন কাজকে প্রত্যেকেই যার যার যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। সবটাই 'যুক্তিযুক্ত'। সবগুলোই আকল ও বুদ্ধিপ্রসূত। মানুষের সমাজে বুদ্ধির অসংখ্য অগণিত সংজ্ঞা, কোনটা ঠিক? হাজার দলের হাজার মানুষ। সবাই যার যার বুদ্ধিকে অবলম্বন করে চলছে। সুতরাং সবাই বুদ্ধিমান। তবু আমরা কথায় কথায় কাউকে বলি, লোকটা বুদ্ধিমান। কখনো বলি, সে তো চরম বোকা।

বুদ্ধির যিনি স্রষ্টা, তিনি কী বলেন বুদ্ধি সম্পর্কে? তাঁর দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান কারা? তিনি কাদেরকে বুদ্ধিমান বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন? বুদ্ধিমানদেরকে তিনি কিছু দায় দায়িত্ব দিয়েছেন। কী সেসব যিম্মাদারি? বুদ্ধিমানের কিছু গুণের কথা আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা নিজেই উল্লেখ করেছেন। কী সেই গুণাবলী?

বুদ্ধিমানদের অন্যতম প্রধান গুণ যিকির ও ফিকির

সূরা আলে ইমরানের শেষের দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, আসমান যমীনের সৃষ্টির মাঝে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন। এরপর আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিমানদের কিছু পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের কিছু সিফাতের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম সিফাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে সর্বহালতে।

এরপর বলেছেন, "এবং তারা ফিকির করে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নিয়ে।" –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৯১, ১৯২

তো আকল ও বুদ্ধির স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতে বুদ্ধিমানের যে পরিচয় বা গুণাবলীর বিবরণ দিলেন, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, যিকির ও ফিকির হল বুদ্ধিমান মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিফাত ও গুণ।

যিকির ও ফিকির। ছোট্ট দুটি শব্দ। হরফের হিসেবে সামান্যই এর পরিধি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শব্দদুটির বিস্তৃতি অনেক। একজন ইনসানের প্রকৃত ইনসানিয়াত নির্ভর করে এ দুটি সিফাতের উপর। যিকির ও ফিকির। সামান্য দুটি শব্দ। অথচ কী অসামান্য এর পরিধি ও বিস্তার। কী অসীম শক্তি ও প্রভাব নিয়ে মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে শাসন করছে এ শব্দদুটি!

বুদ্ধিমানরা আল্লাহকে স্মরণ করে। তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে স্মরণ করে। জীবনে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না আল্লাহকে। আল্লাহকে যে ভুলে যায়, আল্লাহর স্মরণ থেকে যে গাফেল থাকে, সে কখনো বুদ্ধিমান হতে পারে না। যিকরুল্লাহ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফলত ও উদাসীনতা কখনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হতে পারে না। আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর নির্দেশকে লংঘন করে বুদ্ধিমত্তার যতই প্রকাশ ঘটানো হোক, না না, আল্লাহর ভাষায় আল্লাহর সিদ্ধান্তে সে কখনো বুদ্ধিমান নয়।

বুদ্ধিমান আল্লাহকে স্মরণ করে। কতক্ষণ করে? কীভাবে করে? আল্লাহ তাআলা নিজেই তার বিবরণ দিচ্ছেন এভাবে, "তারা আল্লাহকে স্মরণ করে

দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায়।" উদ্দেশ্য হল সর্বাবস্থায়। জীবনের যত আয়োজন, যত উদ্যোগ, যত কর্ম, যত তৎপরতা, সবখানে সর্বহালতে আল্লাহকে স্মরণ রাখে বুদ্ধিমান লোকেরা। এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, কখনো যে আল্লাহকে স্মরণ করে না, সে যেমন আল্লাহর নযরে বুদ্ধিহীন ও চরম বোকা, আল্লাহর যিকির ও স্মরণ থেকে যে মাঝেমাঝে গাফেল হয় কিংবা জীবনের কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ রাখে, কিছু ক্ষেত্রে ভুলে যায়, সেও আল্লাহর নযরে বুদ্ধিমান নয়।

বুদ্ধিমান আল্লাহকে স্মরণ করে, যবানেও করে, অন্তরেও করে এবং তার যিকিরের এক বৈশিষ্ট্য হল, একই সঙ্গে সে তার চিন্তাশক্তিকেও সচল ও সক্রিয় রাখে। তার যিকির হয় ফিকিরওয়ালা। যবান ও কলবের যিকিরের পাশাপাশি তার দিল ও দেমাগ এবং তার মস্তিষ্কের প্রতিটি বিন্দু চিন্তার এক বিস্তৃত জগতে ব্যাপৃত থাকে। অর্থাৎ যিকিরওয়ালা ফিকির ও ফিকিরওয়ালা যিকির।

বুদ্ধিমান ফিকির করে। কী নিয়ে ফিকির করে? আল্লাহর মাখলুক নিয়ে ফিকির। একটি ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। একে তো আল্লাহর মাখলুক। আবার ফিকির। উভয় শব্দই মহা সমুদ্র। আল্লাহ বলেছেন আসমান ও যমীনের সৃষ্টির কথা। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নিয়ে ফিকির। কী অর্থ? আসমান ও যমীনের ব্যাপকতায় কত কিছুই না আছে। আমি আছি। আমার চারপাশের পরিবেশ আছে। এসব কিছু নিয়ে ভাবা, এসব কিছুর মধ্যে চিন্তা করে এক আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। জীবনের যত উদ্যোগ, যত আয়োজন, সবকিছুর পেছনে যে মহান আল্লাহর মহা শক্তি কার্যকর, তাকেই খুঁজে বের করা। এটা বুদ্ধিমানের কাজ। দুনিয়ার যত বাহ্যিকতা, সে বাহ্যিকতায় পড়ে না থেকে এর আড়াল থেকে আল্লাহ ও আখেরাতকে দেখতে পাওয়া। এটা প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সূরা রূমের আয়াত, "তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিকটাই জানে। আখেরাত থেকে গাফেল থাকে।" অর্থাৎ এরা কখনো বুদ্ধিমান নয়। গাফলত ও উদাসীনতা কখনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হতে পারে না।

বুদ্ধিমান চিন্তা করবে। তার চিন্তার একটা নির্ধারিত গতিও থাকবে। চিন্তার লক্ষ্য ও উপলক্ষ একটাই হবে। চিন্তার কেন্দ্রে একটি বিষয়ই থাকবে। কী সেই বিষয়? আল্লাহ তাআলার পরিচয়। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব। আল্লাহ তাআলার আযমত ও মহত্ত্ব।

আল্লাহ তাআলা যিকিরের সাথে ফিকিরকে সংযোগ করে দিলেন। বোঝালেন, শুধু যিকির যথেষ্ট নয়। আবার ফিকিরকে একা না রেখে তার সাথে যিকিরকে সংযোগ করে দিলেন। বোঝালেন, শুধু ফিকিরও যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ বুদ্ধিমানের যিকির যেমন হবে ফিকিরওয়ালা, ফিকিরও তেমনি হবে যিকিরওয়ালা এবং তার এ যিকির ও ফিকির ধীরে ধীরে আল্লাহর দিকেই মুতাওয়াজ্জিহ করে। তখন তার যবান থেকে অবচেতনভাবেই যেন বের হয়ে আসে- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا মাখলুককে নিয়ে ভাবলে, ভাবতে থাকলে, ভাবতে ভাবতে একসময় তাঁর অজান্তেই তাঁর যবান থেকে উচ্চারিত হবে, আল্লাহ! আপনি তো এতসব এমনি এমনি তৈরি করেননি। বিনা কারণে তো তৈরি করেননি। এর পেছনে তো আপনার গভীর রহস্য লুকায়িত আছে। এতসব কিছু দিয়ে আপনি আমাদেরকে আসলে কী দিতে চান মাওলা। শুধুই এগুলো? এসবের মাঝেই আমরা আটকে থাকব? যিন্দেগীর এসব উপকরণ দেখেও ভোগ করেই কি আমাদের জীবন সমাপ্ত হবে? এসবের মাঝে ডুবে থেকে আমরা হারাবো আমাদের আখেরাত? বুদ্ধিমান ভাবতে থাকে। একসময় তার যবানে অবচেতনভাবেই উচ্চারিত হয় ফরিয়াদ, আল্লাহ, না না, আমাদেরকে জাহান্নাম দিয়ো না! আসমান যমীনের এতসব নেয়ামতকে আমাদের জন্য আযাবের কারণ বানিয়ো না মাওলা! سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ আল্লাহ! আপনি পাক, আপনি পবিত্র, সুতরাং আপনিই আমাদেরকে বাঁচান জাহান্নামের আগুন থেকে।

আকলমান্দ তো সে-ই যার চিন্তা ও ফিকিরের চূড়ান্ত আখেরাত। যার দৃষ্টির শেষ সীমানায় আল্লাহ তাআলার রেযামন্দী, আল্লাহ তাআলার গযব ও কহরের প্রকাশক্ষেত্র জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

এ এক অন্য জগৎ। চিন্তা ও ফিকিরের এ এক বিস্ময়কর দিগন্ত। বিস্তৃত আকাশ, বিস্তীর্ণ যমীন, সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, সারি সারি উট, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, শান্ত স্নিগ্ধ নদীর পানি, উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রের জল- সবখানে সে দেখে তার মাওলার কুদরতের প্রকাশ। দুচোখজুড়ে শুধুই আল্লাহর, শুধুই তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় মাওলার অপরিসীম রহমতের প্রকাশ। বুদ্ধিমান নিঃসঙ্গ থাকে না। সে হাঁটে চলে ফেরে, দুনিয়ার যত কাজ সবই করে, সবকিছুর অন্তরালে সে শুধু ভাবে, আমার সাথে আমার মাওলা আছেন। তিনি আমাকে দেখছেন, আমার কথা শুনছেন, আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশের ভাব ও অনুভূতি সম্পর্কেও তিনি অবগত! আমি তো একা নই। আমার চারপাশে এই যে এত আয়োজন, এত হইচই, এত চাঞ্চল্য এত উচ্ছলতা, এতসব কিছুর মাঝে আমি শুধু আমার মাওলাকেই দেখতে পাই। তাঁরই মদদ ও নুসরতের প্রত্যাশা করি। তাঁর নারাজি ও অসন্তুষ্টির ভয় করি।

যারা মাওলাকে খোঁজে ফেরে, এখানে সেখানে কতখানে, কোথাও সে দেখতে পায় না তার স্রষ্টাকে, আল্লাহ যে বিস্ময় প্রকাশ করছেন তাদের উপর। তারা আমাকে কোথায় খোঁজে? এই যে সারি সারি

উটের দল, একটু ভাবুক না মানুষ, এখানেই তারা পেয়ে যাবে আমার অস্তিত্বের প্রমাণ। أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ "তারা কি দেখে না উটের দিকে, কীভাবে সম্ভব হল এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি?" একটু ভাবুক, একটু চিন্তা করুক। এমনি এমনি তো আর সৃষ্টি হয়ে যায় না, এর পেছনে তো আছেন কোন মহান কারিগর। এভাবেই মানুষ চিনে ফেলতে পারে আমাকে। কিন্তু কেন মানুষ চিন্তা করে না?

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ আকাশের উচ্চতায়, তারা খুঁজুক না আমাকে, এত উঁচু এত মহান আকাশ– এমনি এমনি তো হয়ে যায়নি। কেউ তো একজন আছেন এর নেপথ্যে, মহান তিনি মহান সেই সত্তা। এভাবেই তো সে পেয়ে যেতে পারে আমাকে।

তোমার চোখের সামনে এই যে যমীন, হাত বাড়ালেই তো ছোঁয়া যায়। যমীনের এই যে বিস্তৃতি, তাকালেই তো চোখ জুড়িয়ে যায়। কেন, তুমি কি পারো না যমীনের এই বিস্তৃতির মাঝেই তোমার মাওলাকে খুঁজে নিতে? وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ "তারা কি চিন্তা করে না আমার যমীন নিয়ে, কীভাবে এমন অপরূপ সুন্দর বানিয়ে তা বিছিয়ে দেওয়া হল।" একটু যদি চিন্তা করে, এখানেই সে পেয়ে যাবে আমাকে, তার অস্তিত্বের স্রষ্টাকে।

বুদ্ধিমানরা কী চায় আল্লাহর কাছে?

চাওয়ার তো কত কিছুই আছে। ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি। কত কিছুই তো আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন অন্যভাবে। বুদ্ধিমানদের চাহিদার একটি তালিকাও আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন সূরা আলে ইমরানের ১৯১ থেকে ১৯৪ নং আয়াতে।

বুদ্ধিমানরা আল্লাহর কাছে চায় :

এক. "হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।"

দুই. "হে আমাদের রব! আপনি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন।"

তিন. "নেককার বান্দাদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন।"

চার. "কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না।"

আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা

সূরা রা'দ, আয়াত নম্বর বিশ। এর আগের আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যারা বুদ্ধিমান তারাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। তো বুদ্ধিমান কারা? আল্লাহ তাআলা নিজেই পরিচয় দিচ্ছেন বুদ্ধিমানদের :

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ

"যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।"

আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার দুই অর্থ। এক হল আলাসতু বিরাব্বিকুমের ওয়াদা। রূহের জগতে আদম আলাইহিস সালামের ঔরস থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা তাঁর সমস্ত বংশধরকে বের করে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা নিয়েছিলেন। সেই ওয়াদার খোলাসা ছিল– আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করা, রব হিসেবে আল্লাহর সাথে বান্দার যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়, প্রতিটি সম্পর্কের দাবি রক্ষা করা। শিরক থেকে পাক সাফ থাকা। আল্লাহ তাআলার বিধানগুলোকে মনে প্রাণে কবুল করে নেয়া। সেই ওয়াদার সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল এমন– আল্লাহ তাআলা মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' সমস্ত মানুষ উত্তর দিয়েছিল, بَلَىٰ 'অবশ্যই আপনি আমাদের প্রতিপালক।' এ কথার মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে এ ওয়াদায় আবদ্ধ হয়েছিল যে, আপনার হুকুমের বাইরে কোন কাজ আমরা করবো না। আপনার পছন্দের বাইরে কোন কিছুকে আমরা পছন্দ করবো না। আপনি যে দ্বীন ও ধর্ম আমাদেরকে দান করবেন তাকেই আমরা আমাদের জন্য একান্ত আপন ধর্ম হিসেবে বরণ করে নেবো। এ হল আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার এক তরজমা।

আরেক হল মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা। একজন বুদ্ধিমান মানুষ পারস্পরিক ওয়াদাগুলোও পূরণ করে। কারণ সে জানে, এ ওয়াদা পূরণ না করলে সেই ওয়াদাও রক্ষা হল না। মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করাতো আল্লাহরই হুকুম। জীবনের যত ধরনের যত লেনদেন, যত প্রকার আদান প্রদান, যত কিসিমের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের দাবি– সবই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হল, এসব ওয়াদা, যার কোনটা উচ্চারিত, কোনটা অনুচ্চারিত সবগুলোই পূর্ণ করা, পূর্ণ করে যাওয়া।

এ আয়াত থেকে এবং আয়াতের পূর্বাপর থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল, ধোঁকা, প্রবঞ্চনা, ওয়াদা খেলাফী, ঋণখেলাফী– এসব কখনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কিছুতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শয়তানের ধোঁকায়, নফসের প্রবঞ্চনায় মানুষ এসব কাজকে যতই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করুক না কেন। বর্তমান সময়ে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ময়দানে এ কাজগুলো অনেকের কাছে এক ধরনের ব্যবসায়িক পলিসির শামিল হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। এক বুদ্ধিমত্তা, যা মানুষ নিজেরা তৈরি করেছে, বুদ্ধিমত্তার আরেক পরিচয় যা খালিকুল আলবাব-বুদ্ধিমত্তার স্রষ্টা নিজেই পেশ করেছেন। মানুষের দৃষ্টিতে যেটা বুদ্ধিমত্তা তাতে প্রলেপ আছে, রূহ নেই। আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে যেটা বুদ্ধিমত্তা তাতে রূহ আছে প্রলেপ নেই। হাকীকত আছে, বাহ্যিকতার ধোঁকা নেই। মানুষ ভাবে, ধোঁকা দিয়ে দুপয়সা কামাই করলাম, দারুণ চালাক আমি।

লোকটাকে ধোকা দিয়ে কেমন বোকা বানালাম, দারুণ বুদ্ধিমান আমি। সে হয়ত কিছু অর্জন করেছে, কিন্তু সেই অর্জনে বরকত নেই। সেই অর্জনে প্রশান্তি নেই। আছে কলহ বিবাদ। আছে ইবাদতে অনাগ্রহের বীজ। আছে রাব্বে করীমের মুহাব্বত ও ভালবাসা থেকে দূরে সরে পড়ার সূক্ষ্ম উপকরণ। আছে আখেরাতের বরবাদী, জান্নাতের অনন্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চনা ও মাহরূমী। আখেরাতকে ধ্বংস করে মানুষ কী করে বুদ্ধিমান হয়?

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

দুনিয়ার বাহ্যিকটাই কেবল তারা দেখল, আখেরাতকে ভুলে বসে থাকল। কীভাবে সে বুদ্ধিমান হল? এ তো অসম্ভব ব্যাপার। নবীজিও তো বলে দিয়েছেন সে কথা–

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت

"বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি যে নিজের মুহাসাবা করে এবং মওতের পরের জীবনের জন্য আমল করে।" এটা নবীজির কথা। এটা আল্লাহ তাআলার দেয়া বুদ্ধিমানের পরিচয়ের নববী ব্যাখ্যা।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগে আল্লাহর হুকুমকে আগে রাখা

সম্পর্ক ও সংযোগ- মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ একা চলতে পারে না। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছাড়া জীবন চলে না। সেই সম্পর্ক কোনটা রক্তের ও আত্মার। কোনটা লেনদেন, মুআমালা ও মুআশারার। কোনটা আবার স্বার্থ ও স্বার্থসিদ্ধির। যে কোন সম্পর্কের পেছনে অবশ্যই কোন না কোন সূত্র থাকে। সে সূত্র ধরেই সম্পর্ক তৈরি হয়, সে সূত্র ধরেই সম্পর্কের ঘনত্ব ও গভীরতা বাড়ে। আবার সেই সূত্র ধরেই সম্পর্কে তৈরি হয় টানাপোড়েন, এমনকি কখনো বিভেদ ও বিচ্ছেদ। সবকিছুর একটি সূত্র থাকে। যখন সে সূত্রে টান পড়ে তখনই সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়। উত্থান আসে, পতন আসে। জোয়ার আসে, ভাটা আসে।

মানুষে মানুষে সম্পর্ক একটা থাকেই। মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক, ভাই বোনের পারস্পরিক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, গোত্রীয় ও বংশীয় সম্পর্ক, পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে, জীবনের পদেপদে মানুষের সাথে মানুষের যত রকম যত সম্পর্ক– সবখানে সব সংযোগে অভীষ্ট মাকসাদ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য যদি হয় রেযায়ে মাওলা ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, তবে সেটাই হবে পরম বুদ্ধিমত্তা। আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিমানের পরিচয় সূরা রা'দের বিশ নম্বর আয়াতে এভাবেই দিয়েছেন– ويصلون ما أمر الله به أن يوصل "এবং বুদ্ধিমানেরা আল্লাহ যেখানে সম্পর্ক করতে বলেন সেখানেই সম্পর্ক করে।" সন্তান তার মা-বাবার সাথে সম্পর্ক আল্লাহর জন্যই রাখে। মা-বাবার দিলে সামান্য ব্যথা আসবে, এটা যেহেতু আল্লাহ সহ্য করবেন না, এজন্য মা-বাবাকে 'উফ' পর্যন্ত সে বলে না। আবার মা-বাবার নির্দেশের সামনে আল্লাহর হুকুমকে সে জলাঞ্জলি দেয় না। কুরআনে কারীমের দুটি আয়াতে এ মহা সত্যটিও আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"তাঁদেরকে উফ বলো না। তাঁদের সঙ্গে রাগত স্বরে উচ্চ আওয়াজে কথা বলো না। দয়ার্দ্র হয়ে আনুগত্যের ডানা তাদের সামনে বিছিয়ে দাও। বলো, হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি তাঁদেরকে রহম করুন, যেমন তাঁরা আমার শৈশবে আমাকে করেছেন।"

একদিকে এমন নির্দেশ। সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য এমনই বজ্র কঠিন ফরমান। অপরদিকে একই সন্তানকে বলা হচ্ছে, এ মা-বাবাই যদি তোমাকে আমার হুকুম লংঘন করার নির্দেশ দেন, তখন তাঁদের নির্দেশ তুমি মানবে না। মানতে পারবে না। কিছুতেই মানা যাবে না।

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

"তাঁরা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরকের নির্দেশ দেন, তুমি তাঁদের সে নির্দেশ মানবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তাঁদের সাথে আচরণকে ঠিক রাখবে।"

এ এক হাকীকত। এ হাকীকত যদি আমাদের বোধগম্য হত, তাহলে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যেত ইতিহাসের সেই পাতাগুলো, যেখানে আমরা দেখতে পাই একটি বিড়ালকে, এমন আদনা এক মাখলুককেও সামান্য কষ্ট দিয়ে এক 'নেককার' জাহান্নামী হয়ে যায়। আবার এক কুকুরকে পানি পান করিয়ে এক 'বদকার' জান্নাতের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে।

আমাদের সমাজ, এ সমাজের হালচিত্রে আমরা দেখি, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য কতভাবে, কত নির্দয়ভাবে আল্লাহর স্পষ্ট হুকুমকে লংঘন করা হচ্ছে। মানুষের সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে এবং একেই মনে করা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। আমাদের সমাজে তৈরি হওয়া বহু রসম, দ্বীন-বিরোধী বহু কাজ, বহু কর্মকাণ্ড দেদারসে চলছে, শুধুই পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য। শুধু একটি, স্রেফ একটি হাকীকত, একটি মহাসত্য আমাদের চিন্তা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা অনুপস্থিত থাকার কারণে আমরা সম্পর্ক রক্ষার চিন্তাকেই প্রধান বানিয়ে রেখেছি। যেভাবেই হোক, সম্পর্ক ঠিক রাখাকেই ভাবছি বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কারভাবে, খুবই স্পষ্টভাবে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে বললেন, বুদ্ধিমানেরা সম্পর্ক সেখানেই ঠিক রাখে, যেখানে আল্লাহ ঠিক রাখতে বলেছেন।

যেখানে আল্লাহর হুকুম লংঘিত হয়, আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, সেখানে সম্পর্ক ঠিক না রাখাটাই আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং পরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের ফিকির

বুদ্ধিমানের আরেক পরিচয় হল, বুদ্ধিমানরা আল্লাহ তাআলাকেই শুধু ভয় করে। তাদের ভয় ভীতির একমাত্র জায়গা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ভয় যখন বিস্তৃত হয়ে যায়, ভীতি যখন বহু জায়গায় বিভক্ত হয়ে যায়, তখন মানুষের জীবনে শৃংখলা থাকে না। জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। প্রশান্তি বিলুপ্ত হয়। অস্থিরতা যিন্দেগীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। ভীতির ক্ষেত্র যদি মানুষ হয়, নানান প্রকৃতির নানান মানুষ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। একই সময়ে অনেক দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। একজন মানুষ, তার সাধ্যের সীমানা যতই বিস্তৃত হোক, শত প্রকৃতির শত মানুষকে এক সাথে খুশি রাখার ক্ষমতা তার নেই। এটা সম্ভব না। সাধ্যের বাইরের কোন চাপ নিজের উপর নিয়ে নেয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়টাও এমনই। আল্লাহ এক। গাইরুল্লাহ তো অগণিত। অগণিত মাখলুকের ভয়, সেই ভয়কে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালনা এক অসম্ভব কঠিন ব্যাপার। এর বদলে এক আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে চলা সত্যিই সহজ। আল্লাহওয়ালাদের ইতিহাসেও দেখা যায় এমনটা। তাঁদের জীবনে শান্তি থাকে। ইতমেনান থাকে। কেননা তাদের ভয়ের ক্ষেত্র একটা। একটা জায়গাকেই তাঁরা ঠিক রাখার চেষ্টা করেন। সেই এক জায়গাকে ঠিক রাখার চেষ্টাকেই তাঁরা তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নেন। এটা বুদ্ধিমানের কাজ। কেন বুদ্ধিমানের কাজ? কারণ, একে তো এর দ্বারা চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু একটা থাকে, যা সবদিক নিয়েই পরম স্বস্তিকর। দ্বিতীয়ত বুদ্ধিমান লোকেরা এর দ্বারা তাদের দুনিয়াকেও ঠিক রাখতে সক্ষম হয়। মনে পড়ছে নবীজির ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কথা। তিনি বলেছেন, যদি ইলমওয়ালারা ইলমকে হেফাযত করত এবং ইলমের যথাযোগ্য ব্যবহার করত, তাহলে তারা এর দ্বারা তাদের যমানার মানুষের নেতৃত্ব দিতে পারত। কিন্তু তারা দুনিয়া অর্জন করার জন্য ইলমকে দুনিয়াদারদের পেছনে খরচ করেছে, তাই তারা দুনিয়াবাসীর নযরে হেয় ও তুচ্ছ হয়ে গেছে।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি—

من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك

"যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তা ও পেরেশানীর কেন্দ্রবিন্দু একটাকে বানাবে, আখেরাতকে বানাবে, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা ও পেরেশানীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যাকে তার চিন্তা দুনিয়ার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নিপতিত করবে, দুনিয়ার হাজার রকম চিন্তার যেকোন উপত্যকায় তার মৃত্যু ঘটুক, এতে আল্লাহ তাআলা মোটেও পরোয়া করবেন না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৫৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৬৫৮

এটা বুদ্ধিমানের কাজ। চিন্তার বিস্তৃতি না রেখে চিন্তাকে এককেন্দ্রিক অর্থাৎ শুধুই আল্লাহমুখী করে নিজেকে শান্তি দেয়া। দুনিয়ার জীবনটাকে পেরেশানীমুক্ত রাখা। এটা মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয়। আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিমান তাদেরকে বলছেন, যারা তাদের ভয়-ভীতির সম্পর্ক শুধু আল্লাহ তাআলার সাথে রাখে। অন্য সমস্ত কিছু থেকে চিন্তাকে মুক্ত করে শুধুই আল্লাহকে খুশি রাখার ফিকির করে। আল্লাহ তাআলাও বান্দার এ কাজের পুরস্কার এভাবে দেন যে, মানুষের অন্তরেও তার প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা তৈরি করে দেন।

إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন কোন বান্দাকে মুহাব্বাত করেন, জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। জিবরীল তখন তাকে ভালবাসতে শুরু করে। এরপর জিবরীল আসমানের বাসিন্দাদের ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। আসমানওয়ালারা তখন তাকে ভালবাসতে শুরু করে। এরপর পৃথিবীবাসীদের অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও ভালবাসা ঢেলে দেয়া হয়।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২০৯

তো এটা অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ যে, আল্লাহকেই শুধু খুশি করার চেষ্টা করা হল। এতে আল্লাহও খুশি হলেন আবার আসমান ও জমিনের সবাইকেও তার উপর খুশি করে দিলেন। ফিকির থাকল একজনকে নিয়ে, চিন্তার কেন্দ্রে থাকলেন শুধুই একজন, অথচ এতে করে সেই একজনও খুশি হলেন, বাকি সবাইও খুশি হয়ে গেল।

ধৈর্য ও সবর

বুদ্ধিমান বান্দাদের আরেক সিফত হল ধৈর্য ও সবর। সূরা রা'দের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সিফতটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ

বলছেন, "(বুদ্ধিমান তারা) যারা আপন রবের সন্তুষ্টি লাভের আশায় ধৈর্য-ধারণ করে।"

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, বুদ্ধিমান মানুষ ধৈর্য-ধারণ করে এবং সেটা শুধুই আল্লাহর জন্য করে। বোঝা যায়, ধৈর্য ধারণ দুনিয়াবী উদ্দেশ্যেও হতে পারে। কিন্তু সেটা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দুনিয়া অর্জনের পেছনে যারা দিনরাত ছুটোছুটি করে, সকাল থেকে সন্ধ্যা বিরতিহীন মেহনত করে, আল্লাহর হুকুমকে ভুলে গিয়ে শুধুই দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে, ধৈর্য ধারণ তারা তো কম করে না। তাদের ধৈর্য-ধারণের মাকসাদ একটাই–দুনিয়া উপার্জন।

সূরা রা'দের ২২নং আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারি, তারা বুদ্ধিমান হলেও আল্লাহ তাআলার নযরে নয়। অস্থায়ী দুনিয়াকে যে জীবনের সকল শ্রম ও মুজাহাদার মূল মাকসাদ বানাবে, সে কী করে বুদ্ধিমান হতে পারে? সেখানে তো আল্লাহ তাআলার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টি মাকসাদ থাকে না। কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যানুযায়ী সবর ও ধৈর্য তিন প্রকার : এক, আনুগত্যে সবর। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মানতে যতই কষ্ট হোক ধৈর্যের সাথে হুকুম মেনে যাওয়া। দুই, নাফরমানী থেকে সবর। অর্থাৎ গুনাহের পরিবেশ পেয়েও গুনাহের প্রবল ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করে গুনাহ থেকে বিরত থাকার কষ্ট মেনে নেয়া। তিন, বিপদে সবর। অর্থাৎ ছোট-বড় যেকোন বিপদে আল্লাহ তাআলার উপর অভিযোগ না এনে নিজের আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে নযর দিয়ে সবর করে যাওয়া। এ তিন প্রকারের প্রত্যেকটিই একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। বোঝা যায়, সবর গাইরুল্লাহর জন্যও হতে পারে। যেখানে উদ্দেশ্য গাইরুল্লাহ, সেখানে সবর যত উচ্চমানেরই হোক, সূরা রা'দের ২২নং আয়াত থেকে বুঝে আসে, আল্লাহ তায়ালার কাছে তা কখনো বুদ্ধিমানের পরিচয় না।

নামায

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই বুদ্ধিমানের আরেক পরিচয় দিচ্ছেন– وأقاموا الصلاة, বুদ্ধিমান তারা, যারা নামায পড়ে, নামায কায়েম করে। নামাযকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের ভিত্তি বলেছেন। ইসলামের পাঁচ রুকনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হল নামায। বুদ্ধিমানের পরিচয় হল সে নিয়মিত নামায পড়বে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে বিশ্বাস করবে, নামাযের মাঝেই আছে সমাধান। সংকটের দুনিয়ায় সে হন্যে হয়ে ছুটে না ফিরে সমাধান খুঁজবে নামাযের মাঝেই। যতবার সংকটাপন্ন হবে তার জীবন, ততবার তার মনে পড়বে প্রিয় নবীজির মুবারক অভ্যাস–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة

যখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কারণে চিন্তাগ্রস্ত হতেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। মনের মধ্যে যখন কোন পেরেশানী, হাজার রকম হাজার সংকটে হৃদয় যখন যারপরনাই সংকুচিত, মনে পড়বে প্রিয় নবীর প্রিয় বাণী– جعلت قرة عيني في الصلاة 'আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযের মধ্যে।'

মানুষের কাছ থেকে কতভাবে কত আঘাত পেয়ে জীবনটা এখন বিষাক্ত, বুকের উপর কষ্টের পাথর, তাতে কী? আমার আছে একজন প্রগাঢ় বন্ধু, যার সাথে একান্তে নিবিড়ভাবে কথা বলার সুযোগ আমার আছে– যেকোন সময়, যেকোন জায়গায়, যেকোন মুহূর্তে। তিনি হলেন আমার আল্লাহ। আমি জানি– أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে কাছাকাছি হয়, যখন সে সেজদায় থাকে। আল্লাহর বুদ্ধিমান বান্দারা তাই করে। সুখ শান্তির জন্য, মনের প্রশান্তির জন্য দিগ্বিদিক ছুটে বেড়ায় না। তারা বুদ্ধিমানের কাজ করে। সমাধানের সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে নিশ্চিত রাস্তাটা তারা অবলম্বন করে। তারা আল্লাহ তাআলার সামনে সেজদাবনত হয়। দিল ও মন উজাড় করে দিয়ে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করে, আল্লাহ আমাদের বিপদ দূর করুন। আমাদের মনের যত ব্যথা, যত কষ্ট আপনি ছাড়া কেউ নেই আমাদেরকে শান্ত করার, প্রশান্তি দেওয়ার। আল্লাহ, আপনিই দূর করুন আমাদের মনের যত জ্বালা, যত ব্যথা, যত কষ্ট, যত বেদনা।

বুদ্ধিমান জানে, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। বুদ্ধিমান জানে, মানুষের কাছে হতাশা ছাড়া আর কিছুর আশা করা যায় না। বুদ্ধিমান তাই জীবনের সকল আয়োজনে, সকল দুঃখ-পেরেশানীতে কেবলই মাওলায়ে পাকের সামনে সেজদাবনত হয়। অনিশ্চিতের বিস্তৃতির মাঝে নিজেকে না হারিয়ে সে নিশ্চিত ও স্থির জায়গায় সমাধানের সন্ধান করে। لم تقرع بابا مغلقا وتترك بابا مفتوحا বুদ্ধিমান এমনটা করে না। খোলা দরজা রেখে বন্ধ দরজায় করাঘাত করে না। হৃদয়-মন দিয়ে সে বিশ্বাস করে, আমার যত চাওয়া, আমার যত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু পুরো করার জন্য আমার আল্লাহ তো প্রস্তুতই আছেন। দেয়ার জন্য যিনি সদা প্রস্তুত, তার কাছে না গিয়ে কেন আমি অনিশ্চিত জায়গায় বারবার মাথা নত করবো। আমার তো আছে নামাযের শক্তি। আমার তো আছে সেজদার মহা দৌলত। আমার আছে চোখের পানি এবং একজন দয়াময় মাওলা। সুতরাং আমার কিসের চিন্তা, কিসের এত পেরেশানী!

যার নামায ঠিক আছে, আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক আছে। আল্লাহ তাআলার সাথে যার সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঠিক আছে, তার পুরো যিন্দেগীর

দায়িত্বই কিন্তু আল্লাহ তাআলাই নিয়ে নেন। সুতরাং বুদ্ধিমান তো সে-ই, যে তার নামাযকে ঠিক রেখে আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করে যায়। নামায ছেড়ে দিয়ে মাওলায়ে পাকের সাথে সম্পর্ক বরবাদ করে সে অযথাই নিজেকে সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত করে রাখে না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিমানের সিফাতের তালিকায় নামাযের কথাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন।

পৃথিবীতে কত মানুষ কতভাবে কত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বুদ্ধিমান মানুষের একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা হল, যতবার তারা দুনিয়ার কাজের জন্য কিংবা দ্বীনের অন্য কাজের জন্য নামাযকে পিছিয়েছে ততবারই তারা সংকটে পড়েছে। কাজের বরকত হারিয়েছে। কাজের রূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মন বারবার বলেছে, কাজটা শেষ করেই নামায পড়ি, তবু মনের কথা না শোনে যখনই নামাযকে আগে রেখেছে এবং إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا আয়াতটি মনে রেখেছে, مَوْقُوتًا শব্দটি বারবার ইয়াদ করেছে, তখনই সে সফলতা পেয়েছে। তখনই সে যিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে আপন মাওলার সান্নিধ্যের স্বাদ অনুভব করেছে।

বুদ্ধিমানদের জন্য রাব্বে কারীমের বিশেষ বার্তাও এসেছে বড় মুহাব্বতমাখা শব্দে—

ابن آدم اركع لي أول النهار أربعا أكفك آخره.

আদমের বেটা, শোন, তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য, শুধুই আমার জন্য চার রাকাত নামায পড়, দিনভর তোমার যত কাজ সব সুন্দরভাবে আমি সমাধা করে দেব। কী আজিব কী বিস্ময়কর দরদমাখা শব্দ! 'ইবনা আদাম!' আদমের বেটা! যেন আল্লাহ তাআলা কানে কানে বলে দিচ্ছেন সফলতার রহস্য। যেন আল্লাহ লুকিয়ে লুকিয়ে প্রিয় বান্দার হাতে তুলে দিচ্ছেন সাফল্যের চাবিকাঠি। চার রাকাত নামায। মাত্র চার রাকাত। অথচ কী বিপুল এর শক্তি। কী অপার এর মহিমা। সারা দিনের যত কাজ, যত ঝামেলা, যত পেরেশানী, সব আমি তুলে দিলাম এমন এক সত্তার হাতে, যার হাতে সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে থাকা যায়। যদি দিল দিয়ে পড়া যায় এ হাদীস, তাহলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, আমার রব আমাকে গোপন কোন বুদ্ধি শেখাচ্ছেন। শুধুই আমাকে শেখাচ্ছেন। একান্তই আমাকে।

আহা, যদি বুঝতে পারতাম, নামাযের মাঝে বুদ্ধির কী অফুরন্ত উৎস লুকিয়ে আছে!

গোপনে প্রকাশ্যে আল্লাহর রাহে খরচ

বুদ্ধিমানদের আরেক সিফাত আল্লাহ তাআলা যা উল্লেখ করলেন তা হল, বুদ্ধিমান লোকেরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করে। গোপনে করে। প্রকাশ্যেও করে। দান করা মানে তো নিঃশেষ করা। এটা বুদ্ধিমানের কাজ হল কী করে? এখানে আছে চিন্তার বিরাট উপাদান। ভাবনার বিষয় আছে বিস্তর। বুদ্ধিমানেরা খরচ করে। আল্লাহ তাআলার দাবি এমনটাই। বুদ্ধির যিনি স্রষ্টা, তিনি দাবি করছেন এমনটাই। অথচ দুনিয়ার তাবৎ বুদ্ধিওয়ালাদের কথা তো ঠিক উল্টো। দুনিয়ার চাকাটাই যেন ঘুরছে সঞ্চয়ের মানসিকতার উপর। দুনিয়ার মানুষ মনে করে, মনে- প্রাণে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তাআলাও মানুষকে এ ফিতরাত ও তবিয়ত দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সঞ্চয় করতে ভালবাসে। সম্পদ ধরে রাখতে তার ভাল লাগে। وإنه لحب الخير لشديد 'সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রবল।' والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 'সোনা-রূপার ঢের জমা হয়ে গেলেও তৃপ্তি মেটে না মানুষের।'

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب.

দু' দুটি ময়দানও যদি ভরপুর হয়ে যায় সোনা-রূপা দিয়ে, বনী আদম বলবে, আমার আরো চাই। কবরের মাটি মুখে যাওয়া পর্যন্ত তার পেট ভরবে না।

সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা স্বভাবজাত ও জন্মগত। একদিকে আল্লাহ তাআলা এমন ফিৎরত দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। অন্যদিকে তিনিই বুদ্ধিমান আখ্যা দিচ্ছেন তাদেরকে, যারা এ ফিতরাতের মুকাবালা করতে পারে।

আর যারা সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, যাকাত আদায় করে না, সম্পদ জমা করে রাখে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছেন— فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, জাহান্নামের আগুনে সে সম্পদগুলো পুড়িয়ে প্রচণ্ড উত্তপ্ত করা হবে। তারপর? فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

তারপর উত্তপ্ত সম্পদগুলো দিয়েই, সেই সব সোনা-রূপা দিয়েই তাদের চেহারায়, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। শুধু কি এতটুকু? বরং মুখের ভাষা দিয়েও তাদেরকে সীমাহীন যন্ত্রণা দেয়া হবে। এ কঠিন শাস্তি চলাকালে তাদের বলা হবে—

هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

এ হল তোমাদেরই জমানো সম্পদ। সম্পদ জমিয়ে রাখার কী মজা, বোঝ এবার।

যারা সম্পদ জমিয়ে রাখে এবং কিছুদিন পরপর জমানো সম্পদের হিসাব করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলছেন, এরা মনে করে, এদের সম্পদ এদেরকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে। কিছুতেই না, কখনোই না, এরা তো নিক্ষিপ্ত হবে এমন কঠিন আগুনে, যে আগুন তাদের কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যে আগুন তাদেরকে নির্মমভাবে ঝলসে দেবে। ●

আলকুরআন : বিকৃতি যাকে স্পর্শ করতে পারে না

মাওলানা মোসাদ্দিক হুসাইন

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমকে শব্দ ও অর্থ দু'দিক থেকেই হেফাযত করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবেন। শাব্দিক সংরক্ষণের দিকটি সাধারণ-বিশিষ্ট সকলের কাছে স্পষ্ট। তবে অর্থ সংরক্ষণের দিকটি যেহেতু উলামায়ে কেরাম এবং তাঁদের কুরআন কেন্দ্রিক উলূম ও মাআরিফ চর্চার সাথে সম্পৃক্ত, তাই অনেকে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে নানা সময় বিভিন্ন আয়াতের মর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে। যুগে যুগে উলামায়ে কেরামের মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন– ইনশা আল্লাহ।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্বের জন্য নবী করে প্রেরণ করেছেন। বনি ইসরাইল গোত্রের শেষ নবী ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গোত্রভিত্তিক নবী প্রেরণের ধারার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আগের সব ধর্মকে রহিত করেছেন। সকলের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত শেষ নবীর আনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও শরীয়তকে গ্রহণ ও পালনকে ফরয করেছেন। সত্যান্বেষী যে সকল মানুষ তা বুঝতে পেরেছেন এবং আল্লাহর দেয়া কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক দলিল-প্রমাণসমূহ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে, তারা প্রথম দিন থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হঠকারিতাসহ আরো নানা কারণে যারা বুঝতে পারেনি তারা রয়ে গেছে তাদের পুরনো ধর্ম ও বাদ-মতবাদে। তাদের কেউ কেউ ইসলামকে একটি ধর্ম বা মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে (বিশ্বজনীন হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে) সম্মান করে যাচ্ছেন। আবার কিছু মানুষ করছে বিরোধিতা। যারা বিরোধিতা করছে তারা দু'ভাগে বিভক্ত। একদল তো সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে। আরেকদল নেমেছে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়েরই ধারাবাহিকতায় কেউ কেউ ইসলাম ও কুরআনের বিকৃত, ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করছে ও প্রচারে আনছে। এদের মধ্যে খ্রিস্টানজগতের কিছু ধূর্ত মানুষ কুরআনের অপব্যাখ্যার কাজ করছে দীর্ঘদিন যাবৎ। শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. তাদের অপব্যাখ্যাগুলোর জবাবে একটি চমৎকার গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح নামে। খ্রিস্টসমাজের বিভ্রান্তির সাথে সম্পৃক্ত আরো অনেক মূল্যবান আলোচনা তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে খ্রিস্টানদের একটা অপব্যাখ্যা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। নানা ছোট ছোট পুস্তিকা ও লিফলেট ইদানিং আমাদের হাতে আসছে; যাতে তারা সরলমতি মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এ সকল অপব্যাখ্যার দ্বারা। আল্লাহ সকল মুসলমানের ঈমানের হেফাযত করুন! খ্রিস্টানসমাজকেও হেদায়াত দান করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসুন, আমীন!

তাদের ওই অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সামনে উল্লেখ করব। প্রথমে সহীহ আকীদা উল্লেখ করছি।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল জাতির নবী, সর্বকালের নবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা পৃথিবীর সকল জাতির, সকল ভাষার ও সকল স্থানের মানুষের নবী। দলিলগুলো কুরআন ও হাদীসে নিম্নরূপ:

১. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যার আয়ত্বে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব।' –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৮

২. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

'আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকেও সতর্ক করি এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকেও।' –সূরা আনআম (৬) : ১৯

৩. تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

'মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দার প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য হয় সতর্ককারী।' –সূরা ফুরকান (২৫) : ১

৪. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا

'আর কিতাবীদেরকে এবং (আরবের মুশরিক) নিরক্ষরদেরকে বলে দাও, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করলে? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হেদায়াত পেয়ে গেল।' –সূরা আলে-ইমরান (৩) : ২০

৫. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

'(হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল

রহমত করেই পাঠিয়েছি।' -সূরা আম্বিয়া (২১) : ১০৭

৬. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

'এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।' -সূরা সাবা (৩৪) : ২৮

এসকল আয়াত দ্বারা বোঝা গেল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত সর্বজনীন এবং বিশ্বজনীন।

৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কাউকে (নবী) দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবী নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হতেন আমাকে সকল শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের নিকট (সকল মানুষের নিকট) প্রেরণ করা হয়েছে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৯১

(৮) কুরআনে ইহুদী, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজারী সকলকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এটাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত বিশ্বব্যাপী হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

(৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সকল জাতির কাছেই ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৭৪) পক্ষান্তরে বাইবেলে ঈসা আলাইহিস সালামের বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে: তোমরা অ-ইহুদীদের কাছে বা সামেরীয়দের কোনো গ্রামে যেও না, বরং ইসরাইল জাতির হারানো ভেড়াদের কাছে যেও। -মথির ইঞ্জিল: অধ্যায় ১০, পদ ৫, ৬

এভাবে কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে (কিছু আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি) একথা স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল জাতির নবী। সকল জাতির মধ্যে মক্কাবাসীগণ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের আরবগণও অন্তর্ভুক্ত। আবার বাইরের অনারব লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীমের কোন কোন আয়াতে বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে, মক্কাবাসীদের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতগুলোতে একথা উল্লেখ করা হয়নি যে, কুরআন শুধু মক্কাবাসীদের দাওয়াত দেয়ার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে। আয়াতগুলো এই:

(১) وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

'আর যাতে তুমি এর মাধ্যমে জনপদসমূহের কেন্দ্র (মক্কা) ও তার আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক কর।' -সূরা আনআম (৬) : ৯২

(২) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ

'যাতে তুমি সতর্ক কর এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের বাপ-দাদাদেরকে আগে সতর্ক করা হয়নি।' -সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ৬

(৩) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ

'যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি।' -সূরা কাসাস (২৮) : ৪৬

আয়াতগুলোতে এ কথা তো বলা হয়েছে যে, কুরআনের মাধ্যমে মক্কাবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। (যাদের পূর্বপুরুষদের নিকট ইসমাইল আলাইহিস সালামের পর দীর্ঘসময় পর্যন্ত কোন নবী আসেননি) কিন্তু এ আয়াতগুলোতে এ কথা বলা হয়নি যে, একমাত্র তাদেরকেই দাওয়াত দেবে, অন্যদের নয়। অথচ খ্রিস্টানগণ এখানে নিজেদের পক্ষ থেকে "একমাত্র তাদেরকেই" বিষয়টি যোগ করে প্রচার করে। যা সরাসরি কুরআনের অর্থগত বিকৃতি। কুরআন বারবার ঘোষণা করেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল জাতির নবী এবং কুরআন সকল মানুষের জন্য পথপ্রদর্শকগ্রন্থ। যে ব্যক্তি বা যে কোন সম্প্রদায় তাকওয়া অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহকে পেতে চায়, তাদের জন্য এখন একমাত্র হেদায়াতনামা আলকুরআনই। উল্লেখিত আয়াতের সাথে আরো কিছু আয়াত পাঠ করুন:

১. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

'এটি এমন একটি কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হেদায়াত ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য।' -সূরা বাকারা (২) : ২

২. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

'রমযান মাস- যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত।' -সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

৩. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم

'হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে যে কিতাব (পূর্ব থেকে) আছে তার সমর্থকরূপে (এবার) আমি যা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে ঈমান আন।' -সূরা নিসা (৪) : ৪৭

৪. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

'হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো (কুরআন) পাঠিয়ে দিয়েছি (যা পথকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে)।' -সূরা নিসা (৪) : ১৭৪

৫. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

'হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট আমার (এই) রাসূল এসে পড়েছে, যে (তাওরাত ও ইনজীল)

গ্রন্থের এমন বহু কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে, যা তোমরা গোপন কর এবং অনেক বিষয় এড়িয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব (কুরআন) এসেছে, যা (সত্যকে) সুস্পষ্ট করে।' −সূরা মায়িদা (৫) : ১৫

৬. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'এটা (কুরআন) এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং এর অনুসরণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ হয়।' −সূরা আনআম (৬) : ১৫৫

৭. اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

(হে মানুষ!) তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর। −সূরা আরাফ (৭) : ৩

৮. الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

আলিফ, লাম, রা (হে নবী!) এটি এমন এক কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর ভেতর নিয়ে আসতে পার। −সূরা ইবরাহীম (১৪) : ১

৯. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

আর ওই সব দলের মধ্যে যে ব্যক্তি একে (কুরআন) অস্বীকার করে, জাহান্নামই তার নির্ধারিত স্থান। −সূরা হুদ (১১) : ২০

১০ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

আরবী কুরআনরূপে এটি এমন কিতাব, জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। −সূরা হা-মীম সাজদা (৪১) : ৩

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ নবী নন। তাঁর পরে আর একজন নবী আসবেন। খৃষ্টানরা তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এটাই খোদায়ী বিধান ছিল− এক নবীর আগমন অন্য নবীর আগমনের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। আর তা না হলে মূসা, ইউশা, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালাম-এর মত নবী বনী ইসরাইলে আসার পর ঈসা আলাইহিস সালাম আসার এবং খ্রিস্টানরা তাঁকে মানার প্রয়োজন ছিল না। তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। বাইবেলেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যবানে উদ্ধৃত হয়েছে: আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। −ইউহান্নার ইঞ্জিল, অধ্যায়: ১৪; পদ: ১৬

এ বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়:

১. ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ নবী নন।
২. তাঁর পরে আরেকজন সাহায্যকারী (নবী) আসবেন।
৩. পরবর্তীজনের সময়কাল কেয়ামত পর্যন্ত হবে।
৪. কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালের জন্য আর নবীর প্রয়োজন হবে না।
৫. পরবর্তীজন অবশ্যই শেষ নবী হচ্ছেন।
৬. খ্রিস্টানদের তাঁর আনুগত্য করতে হবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আনুগত্য যথেষ্ট হবে না।

খ্রিস্টানদের প্রতিও প্রেরিত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ্রিস্টানদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি খ্রিস্টসম্প্রদায়ের নিকটও প্রেরিত−

১. যেমনটা কুরআন মজীদের উপরোক্ত অনেক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে।

২. তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিভিন্ন ভাষায় শেষ নবী (আহমদ ও মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ এবং তাঁর আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে। (দ্র. মাওলানা আব্দুল মতিন ছাহেব রচিত 'বাইবেল বিকৃতি : তথ্য ও প্রমাণ')

৩. নাজারান অঞ্চলের খ্রিস্টানদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৪৯) এবং খ্রিস্টসম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই সর্বপ্রথম জিযিয়া আদায় করে। −সুনানে আবু দাউদ ৩০৪৩

৪. মিসরের খ্রিস্টান সম্রাট মুকাওকিস-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তিনি পত্র প্রেরণ করেন এবং সম্রাট তাঁর পত্রকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। −সীরাতে ইবনে হিশাম ৬/১৪

৫. রোমেরই খ্রিস্টান সম্রাট হিরাকলের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনিও নিজের ধর্মীয় জ্ঞানের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে গুরুত্বের সাথে নেন। −সহীহ বুখারী, হাদীস ৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৭৩

৬. হাবাশার খ্রিস্টান বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৬/১৪) নাজাশী ইসলাম কবুল করেন এবং মুহাজির সাহাবীদের নিজের কাছে সম্মানের সাথে রাখেন।

৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইহুদী অথবা নাসারা অথবা আমার উম্মতের যে কেউ আমার (আমার দাওয়াত) ব্যাপারে শুনল (জানলো) এরপর সে ঈমান আনলো না, এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। −সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৩

আল্লাহ তাআলা সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন এবং আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল রাখুন। আমীন! ●

১৯ সংখ্যাও কি কুরআনী মুজেযা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد:

অনেক দিন আগে, মনে নেই কবে কখন এ কথা শুনেছিলাম– ১৯ সংখ্যা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই ১৯ সংখ্যা কুরআনে কারীমের মুজিযা– কুরআনের সকল সংখ্যাগত ফল উনিশ দ্বারা বিভাজ্য!!

কোনো একজন তো কিছু হিসাব করে বলেও দিয়েছেন, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -এর মোট হরফ ১৯ টি। কুরআন মাজীদের মোট সূরা ১১৪ টি, যা ১৯ দ্বারা পূর্ণ-বিভাজ্য।

যাই হোক, কথাটি শুনেই আমার কাছে তা আপত্তিকর মনে হয়েছে। কারণ, এ ধরনের বিষয় তো কখনো কখনো এমনিতেও ঘটতে পারে। তো এগুলোকে মুজিযা বলা যাবে কীভাবে?

এ ধরনের যে সকল বিষয় অনুকরণ সম্ভব, এগুলোকে যদি মুজেযা বলা হয় তাহলে তো গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত খোদাদ্রোহীর বেদ্বীন অনুসারীদের সুযোগ সৃষ্টি হবে– তারাও হিসাব কষে তাদের 'গুরু'দের কোনো কিতাব থেকে এ ধরনের কোনো কিছু বের করে আনবে এবং এর মাধ্যমে বাতিলকে হক প্রমাণ করতে চাইবে।

পরে কোনো এক বইয়ে যখন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পড়লাম, দেখলাম বিষয়টি পুরোই ভিত্তিহীন। যেখানে যেভাবে ইচ্ছা একটি ভিত দাঁড় করিয়ে ১৯ -এর হিসাব পুরো করতে পারলেই যেন চলে। যেমন ধরুন, সূরার মোট সংখ্যা উল্লেখ করে ১৯ এর হিসাব মিলানো হয়েছে। কিন্তু মোট আয়াত সংখ্যা তো উল্লেখ করেননি– তা কেন? এখানেও দেখান, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ কি ১৯ দ্বারা পূর্ণ-বিভাজ্য হয়?

আর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -এর মোট হরফ কি ১৯, না ২০, না ২১ ? 'খাড়া যবর' তো মূলত আলিফ, একেও হিসাব করা হলে মোট হরফ সংখ্যা হবে ২১। ১৯ তত্ত্বের লোকেরা হরফ গণনার সময় কখনো লিপিশৈলী আবার কখনো উচ্চারণকে বুনিয়াদ বানান। যেখানে যে মানদণ্ড অবলম্বনের মাধ্যমে ১৯ -এর হিসাব মিলে যায় সেখানে তারা তাই করেন!!

এরপর জানা গেল, এ মতবাদের আবিষ্কারক হলেন মিশরের ড. রাশাদ খলীফা। এ বিষয়ে তার একটি পুস্তিকাও রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে জুমাদাল উলা ১৪০৩ হিজরী মোতাবেক মার্চ ১৯৮৩ সনে যার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদটি আনা হলে তাতে দেখলাম, লেখকের নাম লেখা হয়েছে, রশীদ খলীফা। অবশ্যই এটা ভুল। ঐ ব্যক্তির নাম রাশাদ খলীফা, রশীদ নয়। কিন্তু 'রুশদ' এর সিফাত তার মাঝে একেবারেই নেই।

পুস্তিকাটির অনুবাদ 'আশ্চর্য এই কোরান' পড়ে তো খুবই আশ্চর্য হলাম। এর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল, পুরা থিউরিটাই বিকৃতি-নির্ভর। সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (৭৪ : ৩০)সহ পরের কয়েকটি আয়াতের তাহরীফ ও অপব্যাখ্যা করে ১৯ সংখ্যাকে কুরআনের রহস্য বানানো হয়েছে। এটা দেখে পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল, এগুলো ধোঁকা ও ধাঁধাঁ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরে যখন ড. গানেম কাদ্দুরীর কিতাব 'আবহাসুন ফি উলূমিল কুরআন' মুতালাআর সুযোগ এলো, তাতে দেখলাম তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ মতবাদের শক্ত খণ্ডন করেছেন। পাশাপাশি কয়েকটি নির্ভরযোগ্য কিতাবেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে সাথীরা বললেন, ইন্টারনেটে এ মতবাদের প্রমাণভিত্তিক খণ্ডন সম্পর্কিত কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে।

ড. গানেম কাদ্দুরীর কিতাব থেকে এ-ও জানা গেল, রাশাদ খলীফা বাহায়ী ফিরকার একজন লোক, যে ফিরকাটি একেবারেই মুলহিদ ও মুরতাদ ফিরকা। বাহায়ীদের কাছে ১৯ সংখ্যাটি খুবই পবিত্র সংখ্যা। এদিকে রাশাদ খলীফা নবুওতের মিথ্যা দাবি করে নিজেকে চূড়ান্তরূপে লাঞ্ছিতও করেছে। ড. গানেম কাদ্দুরী নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির ভিত্তিতে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, রাশাদ তার ১৯ তত্ত্বে হিসাব কষার সময় বিশেষ কোনো মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখেনি। তাছাড়া তার অনেক পরিসংখ্যান বাস্তবতা-বিরুদ্ধও হয়েছে।

আরেকটি কথা বলে শেষ করছি। রাশাদ খলীফা দাবি করেছে যে, কুরআন মাজীদের যে অংশ সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে (সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত) তার শব্দ সংখ্যা ১৯, আর সূরা আলাকের মোট আয়াত সংখ্যাও ১৯।

অথচ এই পাঁচ আয়াতের মোট শব্দ সংখ্যা ২০, ১৯ নয়। কারণ, من ، ما ، لم প্রত্যেকটিই তো ভিন্ন

ভিন্ন শব্দ। আর হরফে যর (ـِ) এবং হরফে আতফ (و) -কেও গণনা করা হলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২৩। তাছাড়া প্রথম ও তৃতীয় আয়াতে ربك -কে দুই শব্দ ধরলে (অর্থের দিক থেকে বিষয়টি এমনই।) মোট শব্দ সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫। মোটকথা ১৯ কোনোভাবেই সঠিক নয়।

এমনিভাবে সূরা আলাকের মোট আয়াত সংখ্যা কূফী ও বসরী গণনা অনুযায়ী তো ১৯-ই। কিন্তু মক্কী ও মাদানী গণনা অনুযায়ী মোট সংখ্যা ২০ এবং শামী গণনা অনুযায়ী ১৮। তাহলে ১৯-এর হিসাব আর কোথায় ঠিক থাকল।

ড. গানেম এ মতবাদ খণ্ডনে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোকে বিশেষভাবে উদ্ধৃত করেছেন-

১. 'লাইসা ফিল ইসলামি তাকদীসুন লিলআরকাম', (১৯৮০ ঈ.) উস্তায ইদরীস

২. 'তিসআতা আশারা মালাকান', (১৯৮৫ ঈ.) হোসাইন নাজী মুহাম্মদ মহিউদ্দীন

৩. 'ফিতনাতুল কারনিল ইশরীন, প্রাগুক্ত

৪. 'ইজাযুল কুরআনিল কারীম', (১৯৯১ ঈ.) ফযল হাসান আব্বাস

৫. 'আলবয়ান ফি ইজাযিল কুরআন', (১৯৯২ ঈ.) সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আলখালেদী

সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আলখালেদী তার কিতাবে এ মতবাদের খণ্ডনে লিখিত আরো কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধের উল্লেখ করেছেন।

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লেখিত মতবাদের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর বিশেষ প্রয়োজনও নেই। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের তালেবানে ইলম যেন ভিত্তিহীন বিষয়ের ধোঁকায় না পড়ে। কুরআন মাজীদের সত্যতা অসংখ্য অকাট্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত। কুরআনে কারীম মুজিযা হওয়ার কারণ অসংখ্য, পরিভাষায় যাকে 'উজুহুল এজায' বলা হয়। কুরআনের সত্যতার দলীল কুরআন নিজেই। এই অকাট্য ও সুস্পষ্ট বাস্তবতা প্রমাণের জন্য এ ধরনের ভিত্তিহীন মতবাদের পিছনে পড়া আদৌ উচিত নয়। ●

কোরআন হেফয করার দিনগুলো

মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল

মানুষ পৃথিবী দেখে নিজের চোখে, উপলব্ধি করে নিজের মনে,চারপাশের কোলাহল শোনে নিজের কানে। অন্যের ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা, শোনা ও উপলব্ধি করা অসম্ভবই বলা চলে। বিশাল পৃথিবী, নাতিদীর্ঘ জীবনের উপলব্ধি আর কোলাহলমুখর চারপাশ অনেক আনন্দ-বেদনার স্মৃতি আর সঞ্চয় দিয়েছে, যে স্মৃতিতে ভুল আছে, আছে জীবনপোড়ানো উদাসীনতা, সে সঞ্চয়ে পাওয়া আছে, পাওনা আছে, কষ্টে-সৃষ্টে ধার দেনা করা জিনিসও আছে। সব মিলিয়ে অন্য দশজন মানুষের মতোই জীবনের গতি বহমান। সেই গতি থেমে থাকে না, মন্থরও হয় না। কর্মের ক্লান্তি আর রোগ-বিমারি দেহকে শ্লথ করে দিলেও জীবন থেমে থাকে না, সময়ের পিঠে সওয়ার হয়ে এগিয়ে চলে মহাপরিণতির দিকে। সেই পরিণতিকে সুপরিণতি দিতে বিশ্বাসী মানুষগুলো আমল করে চলেছে। জীবনের পথ চলতে চলতে পেছনে ফিরে তাকালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে দৃষ্টি থেমে যায়, যেখানে আমার জন্ম, যেখান থেকে আমার জীবনের শুরু। সামনের দিকে তাকালে দেখি অন্তহীন জীবন্ত পৃথিবীর অজানা ভবিষ্যৎ, মৃত্যু, কবর, মুনকার-নাকীরের সওয়াল জওয়াব ও হাশর-নাশর...দৃষ্টি শেষ সীমানায় পৌঁছতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিকে একটি পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্য অতীতের দীর্ঘ সময় জুড়ে পড়া কোরআন হাদীসের আশ্রয় নিই। কোরআন-হাদীসে বিশ্বাসীদের ঠিকানা জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। সে জান্নাত-চিরকালের, সে জান্নাত চিরদিনের। এখানে এসে দৃষ্টিকে থামাতে চাই। সুখ আর কল্পনাপ্রবণ মন জান্নাতের প্রতিটি অলি-গলিতে ঘুরে আসতে চায়। অথচ জান্নাত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে−

مالاعين رات ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر

'জান্নাতে যা আছে তা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কানও শুনেনি,কারও মন জান্নাতের শোভা সৌন্দর্য কল্পনাও করতে পারেনি।'

সূরা হামীম সাজদায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন−

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

'চোখ শীতলতার কোন কোন বস্তু বিশ্বাসীদের জন্য উহ্য রাখা হয়েছে কেউ জানে না।'

কিন্তু তাড়াহুড়োপ্রবণ মন আর ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি বর্তমানে দেখার মানসিকতা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মুমিনের চূড়ান্ত প্রাপ্তি জান্নাতের দিকে। এ তো গেল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকার কথা, সেদিকে তাকালে দৃষ্টি ফেরাতে না পারার কথা। অনেক সময় আমার দৃষ্টি অতীতের কিছু দৃশ্য, অতীতের কিছু স্মৃতির মাঝে বেশ ভালো রকমেই আটকে যায়। সময়ের হিসেবে সে দৃশ্য ও স্মৃতি অনেক দূরের কিন্তু নির্জনে মাঝে মাঝেই মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে সেই মুগ্ধকরা দৃশ্যগুলো, ভালো লাগার স্মৃতিগুলো। শুরু-বসন্তের মধ্যরাতে শীতের আমেজ এখনো বাকি আছে। কিন্তু স্মৃতিরা আমাকে হাজির করে মরুময় আরবের মধ্যদুপুরে। গনগনে রোদ জ্বালিয়ে দিতে চায় সবকিছু। বাবা আমাকে নিয়ে হাজির হয়েছেন জেদ্দার বাংলাদেশ এ্যাম্বেসি স্কুলে। কয়েক দিন ধরেই বাবাকে বলছিলাম আমি স্কুলে ভর্তি হব।

ঘটনাটা একটু আগ থেকে বলা যায়, ধরতে গেলে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার একটি গ্রাম থেকে বাবা মাসহ আমাদের ভাই-বোন সবাইকে সৌদিআরব উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বয়স এবং সময়টা ছিল এমন যে ঢাকা শহর দেখেই মুগ্ধতা শেষ হতো না। সেই বয়স আর সেই সময়ে বাবা আমাদের নিয়ে হাজির করলেন একুশ শতকের সেরা শহরের তালিকায় থাকা জেদ্দায়। ঝলমলে সুবিশাল এয়ারপোর্ট, আলোর বন্যায় ভাসতে থাকা সড়ক-মহাসড়ক, নিয়ন সাইন, বাহারি রকমের দালান কোঠা-আর দোকান পাট ও মার্কেট দেখতে দেখতে ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠেই জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখছিলাম, শহরের পথ-ঘাট ও মানুষ। যে ছেলেটি গ্রামের স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করত কে কত বার ঢাকা গিয়েছে তা নিয়ে, সেই ছেলেটি পৃথিবীর এত বড় শহরে আসতে পেরে কতখানি যে মুগ্ধ তা বলাই বাহুল্য। বাবা, মায়ের কাছে যে কত রকমের প্রশ্ন। বাবা প্রশ্নগুলোর কত ধৈর্যসহ সুন্দর করে উত্তর দিতেন! প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন। বাবা উত্তর দেন। বাবার মুখে হাসি। বিরক্তির ছাপ নেই। সময়ের ব্যবধানে এখন বাবা আমাকে প্রশ্ন করেন। এত বেশি না। উত্তর দিয়ে যাই হাসিমুখে। কিন্তু কোনো কোনো সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চায়। নিজেকে সংবরণ করি। বাবা যে এককালে আমার হাজারো

প্রশ্নের উত্তর দিতেন হাসিমুখে, তা নিয়ে ভাবি। তখন বাবার মুখে হাসি থাকত আরও থাকত তৃপ্তি। এমন সব মুহূর্তে নিজেকে পরাজিত মনে হয়। বাবারা তো সন্তানের কাছে সবসময়ই ইচ্ছে করেই হেরে যান। সন্তান বাবাকে পরাজিত করে হাসে বিজয়ীর হাসি। পরাজয় যে বাবারা বরণ করে নেন সন্তান তা বোঝে না বাবা হওয়ার আগে। ধৈর্যচ্যুতি ভাবের কারণে পরাজয়ের অনুভূতি যখন হয়, তখন বাবাকে বিনম্র শ্রদ্ধায় সালাম করি। আল্লাহর কাছে নিবেদিত মনে প্রার্থনা করি, আর জয়ী নয়, এখন আমি পরাজিত হতে চাই আমার বাবার কাছে।

দু-তিনটা দিন গেল বিশ্রাম করেই। তখনো বাবা পড়া-শোনার কথা ওরকম বলেননি। গ্রামের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তাম। দাদার কাছে পড়তাম কোরআন শরীফ। দাদা প্রতিদিন ফজরের পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুর করে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আমি ও আমার এক চাচাতো বোন হতাম দাদার সঙ্গী ও শিষ্য। দাদা জানালার পাশে একটু আলোতে বসতেন, আমরা বসতাম দাদার ডান পাশে। দাদার পাশের আসনটির মর্যাদা ছিল ফার্স্ট টুল, পরেরটির মর্যাদা ছিল সেকেন্ড টুল। সেকেন্ড হলেও এটাই শেষ, এটাই সবচেয়ে নিম্নস্তরের, তাই ফার্স্ট টুলে বসা নিয়ে দুজনের মধ্যে চলত তুমুল প্রতিযোগিতা। ঘুম থেকে আগে উঠে আসন দখলের চেষ্টা শেষ দিন পর্যন্ত ছিল সমানভাবে। কখনো কখনো তাহাজ্জুদের সময় উঠে ফার্স্ট টুলে শুয়ে থাকতাম। কিন্তু বোনটি বয়সে ছোট ছিল বলে অনেক সময় গাল ফুলিয়ে ফার্স্ট টুল অধিকার করে নিত। তখন গজর গজর করে সেকেন্ড টুলে বসা ছাড়া উপায় থাকত না। কখনো কখনো ফার্স্ট টুলে দখল দিতে এসে মুখোমুখি হয়ে যেতাম দুজনে। মীমাংসা করতে দাদাও হিমশিম খেতেন। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে বয়সে ছোট বলে ফয়সালা ওর পক্ষেই যেত বেশি। আলিফ বা তা ছা থেকে নিয়ে কোরআন পর্যন্ত দাদার কাছেই পড়েছি। অবশ্য কোরআন শরীফের প্রথম সবক নিয়েছিলাম বি.বাড়ীয়ার বড় হুযুরখ্যাত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম রহ.এর কাছ থেকে। মা মামাকে সঙ্গে করে আমাদের দুভাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন হুজুরের কাছে। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে জীবনের এ পর্যায়ে এসেও বড় হুজুরের কাছ থেকে কোরআনের সবক নেওয়ার বরকত অনুভব করি।

এরপর বাবা আলোচনা শুরু করেন আমাদের পড়াশোনা নিয়ে। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ বাবাকে ভালোই ভাবিয়ে তুলেছিল আমাদের পড়াশোনা। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, আমরা হেফজ পড়ব। ভাইয়া বেশ কয়েক পারা হেফয দেশ থেকেই করে এসেছেন। তিনি শুরু করে দিলেন পুরোদমে। বিপত্তি বাঁধল আমাকে নিয়ে। একে তো কোরআন শরীফ নাজেরা পড়ে শেষ করিনি, স্কুলে পড়ার দরুন মাদ্রাসার পরিবেশ অচেনা। তাই হেফয না পড়ার বায়না ধরলাম। একবার মা বোঝান, আরেকবার বাবা বোঝান, আরেকবার বোঝান চাচা। বায়নার ধরন দেখে ভাই-বোনেরা অনেকটাই আমার পক্ষে চলে এসেছিল। এমন করতে করতে দিন চলে যাচ্ছিল। বাবা হয়ে উঠছিলেন অস্থির। শেষ পর্যন্ত বাবা হার মানলেন আমার কাছে। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন স্কুলে ভর্তি করাতে। প্রথমে নিয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ অ্যাম্বেসী স্কুলে। ভর দুপুর। তখন ক্লাস চলছিল। কেন যেন পরিবেশটা পছন্দ হলো না। আমার মুখের অভিব্যক্তি দেখে বাবা অনেকটা খুশিই হয়েছিলেন। এরপর বাবা বেশ কয়েকটি স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কী যে হয়েছিল সেদিন আল্লাহ মালুম! সব দেখে বাবাকে বললাম, আমি হেফয পড়ব। আমার কথা শুনে বাবা যে আমার কতো খুশি হয়েছিলেন! সরাসরি হেফয শুরু করিয়ে দিলেন নিজের কাছে। এক পৃষ্ঠা নাজেরা পড়াতেন, এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করাতেন। মাদরাসা থেকে পড়িয়ে এসে সারাদিন বাবা আমাদের পড়াতেন। প্রথম প্রথম মুখস্থ করতে কষ্ট হতো। ভুলে যেতাম। মনে হতো, আমাকে দিয়ে হবে না। বাবার কাছে অভিযোগ করলে বাবা বলতেন, আল্লাহর কাছে দুআ করো, আল্লাহর কাছে চাও দেখবে আল্লাহ দিয়ে দিবেন। বাবা সুর করে আরবী কবিতা শোনাতেন–

بقدر الكد تكتسب المعالي • ومن طلب العلى سهر الليالي

সাধনার পরিমাণ অনুপাতে মর্যাদা লাভ হয়/যে মর্যাদা খোঁজে সে রাত জেগে সাধনা করে।

এই আরবী কবিতা বাবার মুখে শুনেই আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। যখন হতাশ হয়ে যেতাম, মুখস্থ না হওয়া এবং মুখস্থ না থাকার দরুন গাল ফুলিয়ে, চোখ ভিজিয়ে বসে থাকতাম বাবা তখন সুর দিয়ে শোনাতেন–

رضينا قسمة الجبار فينا • لنا علم وللأعداء مال

খোদা আমাদের ভাগে যা দিয়েছেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট/আমাদের ভাগে পেয়েছি জ্ঞান, শত্রুদের ভাগে পড়েছে ধন।

বাবার সুরে যতটা না মধুরতা তারচেয়ে বেশি আন্তরিকতা। বাবা বলতেন শোনো, রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ নেমে আসেন প্রথম আসমানে।

বান্দাদের ডেকে বলেন, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী? আমি ক্ষমা করব। কে আছ মুখাপেক্ষী? আমি প্রয়োজন মিটিয়ে দেব...তুমিও শেষরাতে উঠো, দুআ করো আল্লাহর কাছে। এবার বাবা উর্দু শের শোনান–

ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہیں • جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہیں

হে আল্লাহ তুমি তো সব সময় দিতে প্রস্তুত/যে তোমার কাছে চায় না তার প্রতি তোমার অসন্তোষ।

শেষ রাতে বাবা আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। নিজের পাশে দাঁড় করাতেন নামাযে। শিখিয়ে দিতেন দুআ। মনে হতো, বাবা আমাকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়েছেন, শিখিয়ে দিচ্ছেন কী কী চাইতে হবে আল্লাহর দরবারে। এভাবে দিনের বেলা চলত মুখস্থ করার চেষ্টা, রাতের বেলা নিয়মিত অনিয়মিত দুআ। তখন বাবা আমাদের মক্কা শরীফ নিয়ে যেতেন। কত ধরনের দুআ যে শিখিয়ে দিতেন। বলতেন, হারাম শরীফে বসে মুখস্থ করো মনে থাকবে। প্রথমবার কাবা শরীফ দেখে আমার কী যে অনুভূতি হয়েছিল তা বোঝাতে পারব না, তাকিয়েই ছিলাম। বিহ্বল যাকে বলে ঠিক তা-ই। সেবার শুধু মনে পড়ছিল, এক কৃতদাস কাবা শরীফ দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছিল। ডুব দিয়েছিল প্রেমের অথৈ সাগরে। বার বার মনে হচ্ছিল, সেই কৃতদাসের মতো আল্লাহপ্রেমিক কেন হতে পারলাম না। এখন বুঝি, আসলে এসব কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আল্লাহ যাকে যেমন হালত দান করেন। আমাদের করণীয় শুধু আমল করে যাওয়া। একের পর এক সিঁড়ি অতিক্রম করে উন্নতির শীর্ষ শিখরে পৌঁছার চেষ্টা করে যাওয়া।

যাহোক, এমন করতে করতে কয়েক পারা হলো। আব্বার ব্যস্ততা বাড়ল। আগের মতো এত সময় দিতে পারেন না। তাই আমাদের ভর্তি করিয়ে দিলেন মাদরাসা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরে। সে সময় মাদরাসাটি ছিল সারা জেদ্দায় বেশ নামকরা। মাদরাসাটির পরিচালক ও বেশির ভাগ শিক্ষক ছিলেন পাকিস্তানি। দুয়েকজন বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান ও আফগান ছিলেন।

যেদিন বাবা প্রথম মাদরাসায় নিয়ে যান মনে হচ্ছিল আমার পৃথিবী শূন্য হয়ে যাচ্ছে, বুকটা একেবারে খালি হয়ে আসছে, কোথাও কেউ নেই আমার। বাবাকে কত করে বোঝাই মাদরাসায় না নিতে। বাবা কোনো কথাই শোনেন না। মায়ের দিকে তাকাই করুণা লাভের আশায়। মা আদুরে গলায় আমাকে মাদরাসায়ই যেতে বলেন। অসহায় আমি বাবাকে অনুসরণ করি। বাবা মাদরাসায় দিয়ে চলে আসলে আমার যে কী কান্না! প্রথমদিন হিসেবে হুজুরদের সাথে কী পরিচিত হবো, কোনো দিকে তাকাতেই পারছিলাম না। কতজন যে কতভাবে বোঝালো কিন্তু আমার মনের হাহাকার আর শূন্যতা শেষ হয় না। এ অবস্থা বহাল থাকল মাদরাসা ছুটি পর্যন্ত। বাবাকে পেয়ে দেহে প্রাণ ফিরে এল। আমার শূন্য পৃথিবী পত্রপল্লবে আবার সুশোভিত হলো। অনেকদিন মনের অবস্থা এমনই ছিল। ধীরে ধীরে কেটে গেল এ অবস্থা। আমি হয়ে উঠলাম মাদরাসা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর মনোযোগী ছাত্র।

মাদরাসার সময় ছিল সকাল সাতটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত। প্রথমে সবক তারপর সাত সবক এরপর আমুখতা। একেকজন হুজুরের কাছে সর্বোচ্চ পনেরো জন ছাত্র পড়ত। এই সময়ের মধ্যেই হয়ে যেত সবার শোনানো। সবক, সাতসবক ও আমুক্তা সবই আমি বাসা থেকে তৈরি করে আসতাম। মাদরাসায় এসে শুধু শোনাতাম। হুজুররা সবাইকে বাসা থেকে পড়া তৈরি করে আসতে বলতেন। কেউ কেউ শিখে আসত আর অনেকে শিখে আসত না। যারা শিখে আসত না তারা আসলে শিখে আসতে পারত না। এর অন্যতম কারণ ছিল, ঘরের পরিবেশ। বেশিরভাগ ছেলের ঘরের পরিবেশ ছিল বেপর্দা আর টিভি-সিনেমার। অনেক ছেলের ব্যাপারে জানতাম, তারা বাসায় সিনেমা দেখার সুযোগও পেত আবার বাসায় পড়ার জন্য মারও খেত। ঘরের এই বিপরীতমুখী পরিবেশের দরুন অনেক ছেলেই হাফেয হতে পারেনি। আমাদের বাসায় টিভি নেই শুনলে ছাত্ররা যারপরনাই বিস্মিত হতো। এক ছেলে আরেক ছেলেকে দেখিয়ে বলত, ওই যে ছেলেটি দেখছ, ওই ছেলেটির বাসায় টিভি নেই। বাবাকে এসব বললে বাবা আমাদের ইমাম শাফেঈ রহ.এর কবিতা পড়ে শোনাতেন–

شكوت إلى وكيع سوء حفظي • فأوصاني إلى ترك المعاصي
فإن العلم نور من الهي • ونور الله لايعطى لعاصي

উস্তাদ ওয়াকি'র কাছে অভিযোগ করলাম স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার/ তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার।
কারণ ইলম তো আমার প্রভু প্রদত্ত আলো/ কোনো পাপীর তো প্রভুর সেই আলো লাভ হয় না।

বাবার কাছ থেকে শুনে শুনেই কবিতাটি মুখস্থ করেছিলাম। মাদরাসাটি ছিল দুতলা। গেইট দিয়ে ঢুকতেই প্রধান শিক্ষকের অফিস। সবাই তাঁকে আজম সাহেব বলে ডাকত। তাঁর আজম সাহেব নাম প্রধান শিক্ষক হওয়ার কারণে, না তাঁর নামই ছিল আজম সাহেব তা নিয়ে তখনো সন্দেহ ছিল, এখনো সন্দেহ আছে। নীচ তলায় তিন/চারটি হালাকা আছে, আছে

ক্যান্টিন। দুতলায় বসে চার/পাঁচটি হালাকা। পারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের হালাকাও পরিবর্তন হতে থাকে। পাঁচ পারা পর্যন্ত এক হুজুরের হালাকা। দশ পারা পর্যন্ত আরেক হুজুরের হালাকা। পনেরো পারা পর্যন্ত আরেক হুজুরের হালাকা। এভাবে চলতে চলতে হাফেজ ছাত্রদের জন্য আলাদা হালাকা। যতটুকু মনে পড়ে শুরু হতো হাফিজুল্লাহ সাহেবের হালাকা থেকে। শেষ হতো ক্বারী মুমতাজ সাহেবের হালাকায় গিয়ে। ওখানে হাফেজ সাহেবদের ক্বারী সাহেব বলা হয়। যেসব হুজুরদের নাম এখনো মনে পড়ে তাঁরা হলেন ক্বারী নুরুল হক সাহেব, ক্বারী জালালুদ্দিন সাহেব, ক্বারী সেলীম সাহেব, ক্বারী জান্নাত সাহেব, ক্বারী আব্দুল জলীল সাহেব, ক্বারী আব্দুল্লাহ জাফর সাহেব। ক্বারী আব্দুল জলীল সাহেব ছিলেন আফগানিস্তানের। ক্বারী জাফর সাহেব ছিলেন বাংলাদেশের। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে সুখে-শান্তিতে, সহীহ-সালামতে রাখুন।

আমি ক্বারী হাফিজুল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে পড়া শুরু করে ক্বারী আব্দুল জলীল সহেবের হালাকা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তার কাছে বিশ পারা পর্যন্ত পড়ি। তিনি বেশ কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। হালাকার প্রত্যেকেই পড়া শিখে আসত। মারতেন কম তবুও ছাত্ররা ভয় পেত। তবে যার কপালে একবার মার জুটত, সে চিরকাল মনে রাখত। পড়ায় যত্নবান ছিলাম বলে শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো না। একদিন হঠাৎ হুজুর আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতেই কষিয়ে দিলেন এক চড়। পরিণত আফগান হাত আর বাঙালি কঁচি খোকার চেহারা! আমার একেবারে বেহাল দশা। কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মন হুজুরের প্রতি বিদ্রোহী বা বিষিয়ে উঠল না। করুণ ও বিনয় ভরা দৃষ্টিতে হুজুরের দিকে তাকালাম। এতটুকুই জিজ্ঞাসা, অপরাধ বললে শুধরে নেব। মনের এই বিনয়ভাব আমার মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন বাবা! বাবা বলতেন, শিক্ষকের শাসন নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করবে। ন্যায়-অন্যায় খুঁজতে যেয়ো না।

বিশ পারার পর আর মাদরাসায় যাওয়া হয়নি। আবার বাসায় পড়া শুরু করি। এর কিছুদিন পর হুজুরও জেদ্দা ছেড়ে মদীনা চলে যান। আবার বাবার কাছে সবক শোনানো। বেশি বেশি সবক দিয়েছি দ্রুত হাফেয হওয়ার জন্য। আরেকটি কারণ ছিল প্রতি পারা শেষে বাবার ঘোষিত পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা। শেষ সবক ছিল, প্রথম পারা আলিফ-লাম-মীম। সৌদি আরবে প্রায় সবাই শেষের দিক থেকে হেফয শুরু করে। শেষ করে শুরুর দিকে এসে। কেউ একেবারে বিপরীত দিক থেকে সূরার পরে সূরা পড়ে। কেউ আবার পারার পরে পারা পড়ে। আমার কাছে এভাবে মুখস্থ করা কিছুটা সহজ মনে হয়। অবশ্য বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হেফয করে ছেলেরা ভালোই করছে। ফজরের পর একটানা পুরো পারা সবক শুনিয়েছিলাম। সেদিন দেখেছি বাবা আনন্দিত হয়েছিলেন আমার চেয়ে বেশি আর পারা শেষ হওয়ার আগেই বাবা প্রস্তুত রেখেছিলেন আমার পুরস্কার। স্বাভাবিকভাবে মাও সেদিন বেশ খুশি হয়েছিলেন, কয়েকটি কথা বলেছিলেন। মা বলেছিলেন, 'দায়িত্ব এখন অনেক বেড়েছে। সারা জীবন এই মহা নেয়ামতের যত্ন করতে হবে, নিয়মিত চর্চা করতে হবে, এই গুরুভার আল্লাহর কাছে চেয়েছ, সৌভাগ্য তোমার তুমি পেয়েও গেছ তাই এই গুরুভার সযত্নে বহন করতে হবে, এই মহা দায়িত্বের মর্যাদা ধরে রাখতে হবে, তাহলেই পরকালের পথে সফলভাবে চলতে পারবে এবং সফলও হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।'

হেফয সমাপ্ত করার পর থেকে নিয়ে জীবনের এ পর্যন্ত মা এমন অনেক কথা আমাকে বলেছেন। এখনো বলেন। মাঝে মাঝেই হেফযের মধ্য দিয়ে লাভ করা গুরুভারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এতটুকু মর্যাদা লাভের পর সে মর্যাদা ধরে রাখা এবং আরও অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন। মায়ের সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনি। শুনি আমল করার নিয়ত নিয়েই। কারণ, জীবনের স্বল্প পথ পাড়ি দিয়ে মহাকালের দিকে যে আমরা ছুটে চলেছি সে পথের পাথেয় শুধুই নেক আমল। সে পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতেই যেহেতু হচ্ছে তাই ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বার বার সেই পাথেয় জোগাড় করার চেষ্টা নিয়ে চলছি। সে পথচলা পাথেয়সহ হোক, সে পথচলা সফলভাবে হোক, সে পথচলা জান্নাতে উপনীত করুক। আমীন।

এখানে একটি কথা বলা দরকার তা হল, সৌদী আরবে আমরা যে হিফযখানায় পড়েছি, সেটির শিক্ষকগণ উপমহাদেশীয় হওয়ায় তার রীতিনীতিও অনেকটা আমাদের দেশের মতোই ছিল। কিন্তু আরবের হিফযখানাগুলো আবার এ ধরনের নয়। সেগুলোর বেশির ভাগই অনাবাসিক এবং সান্ধ্যকালীন। তাই ঐসব দেশে স্কুল পড়ুয়া ছাত্ররাও হিফয করার সুযোগ পায়। আর ছাত্রদের মারপিট বা শারীরিক শাস্তির কোনো বালাই সেখানে নেই। মারপিট ছাড়া হাফেয হওয়া যায় না বা হাফেয বানানো যায় না এমন ধারণার সাথে তারা পরিচিত নয়। ●

পবিত্র কুরআনে সফল মুমিনের বর্ণনা

মাওলানা শিব্বীর আহমদ

সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের নিকট সফলতা পরম কাঙ্ক্ষিত এক বিষয়। মানুষ সফল হতে চায় আপন কর্মে আপন ক্ষেত্রে। যেখানেই সে বিচরণ করে, সেখানেই সফলতা অর্জন করতে চায়। এ সফলতা ব্যক্তি-ক্ষেত্র-লক্ষ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই একজন মুমিনও সফল হতে চাইবে তার জীবনে। সে বিশ্বাস করে–এ জীবনের সীমা খুব দূরে নয়। এরপর শুরু হবে এক অসীম জীবনের পথে চলা। মনে প্রাণে যে এ বিশ্বাস লালন করে, তার মূল লক্ষ্যই তো হচ্ছে আখেরাতের জীবন। হয়তো সে সফলতা কামনা করবে দুই জীবনেই। কিংবা সসীম দুনিয়ার জীবন কোনোভাবে শেষ হয়ে গেলেও তার চূড়ান্ত চেষ্টা-সাধনা ও কামনা–অসীম পরকালীন জীবনে যেন সে ব্যর্থ না হয়। দুনিয়ার জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই এর সফলতাও ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত সফলতা হচ্ছে আখেরাতের সফলতা। তাই যদি কেউ আখেরাতের অনন্ত অসীম জীবনে সফলতা ও মুক্তি না পায়, তাহলে দুনিয়াতে সে যতই সুখ বিলাসিতা ও আরামে কাটাক না কেন, সে সফল নয়। আর যদি কোনো মুমিন দুনিয়ার অস্থায়ী ও স্বল্পকালীন জীবনটাকে কষ্টের ভেতর দিয়েও কাটায়, কিন্তু আখেরাতে সে জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতরাজি লাভ করতে পারে, তাহলে সেই সফল।

পবিত্র কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সফল মানুষের পরিচয় বলে দিয়েছেন। সেখান থেকে যে কেউ তার সফলতার পথ খুঁজে নিতে পারে। মহান স্রষ্টার দেখানো যে পথ, তার চেয়ে উত্তম ও যথার্থ আর কোন পথ হতে পারে? সফলতার সন্ধানে আমরা সে পথেই ফিরে যাচ্ছি।

দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে সফলতার প্রথম ও প্রধান শর্ত ঈমান। দেখুন, সূরা বাকারার শুরুতেই কত সুস্পষ্টভাবে ঈমানদার বান্দাদের সফলতার কথা বলা হয়েছে–

الٓمٓ ۞ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

আলিফ-লাম-মীম। এটাই ঐ কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়েত। যারা না দেখা বিষয়ে ঈমান আনে, যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে এবং আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে খরচ করে; আর যারা তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে, আর তারা আখেরাতের প্রতিও ঈমান আনে। এরাই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত হেদায়েতের ওপর এবং এরাই সফলকাম। (আয়াত : ১৫)

পবিত্র কুরআনের সুরা মুমিনূনের প্রথম আয়াতের পরিষ্কার ঘোষণা– قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ! (আয়াত : ১)

ঈমানদার তথা মুমিন বান্দাদের এ সফলতা বিশেষ কোনো ক্ষেত্র বা কালে আটকে রাখা হয় নি। এ সফলতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে। দেখুন–

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

স্মরণ রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না। তারা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর কথায় কোনো পরিবর্তন হয় না। এটাই মহাসাফল্য।–সূরা ইউনুস : ৬২৬৪

লক্ষ করুন, আল্লাহ তায়ালার বাণী এখানে কেমন দ্ব্যর্থহীন–যারা মুমিন ও মুত্তাকী, তারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের জন্যে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই রয়েছে সুসংবাদ।

ওপরে সূরা বাকারার যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে না-দেখা বিষয়ে ঈমান আনার কথা। এই না-দেখা বিষয়গুলো কী কী, তা বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীতে। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীস–জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হয়ে বললেন : আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন–

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

ঈমান হল তুমি আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, (আল্লাহর প্রেরিত) কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলগণের ওপর এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনবে আর তুমি তকদিরের ভালো মন্দের ওপরও ঈমান আনবে।—সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮

পবিত্র কুরআনে ঈমান আনয়নের একটি দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে—

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, যা তাঁর ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সঙ্গে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না (যে, কারও প্রতি ঈমান আনব এবং কারও প্রতি ঈমান আনব না)।—সূরা বাকারা : ২৮৫

ঈমানের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত হল নামাজ। একজন মানুষের সফলতার সঙ্গে ঈমানের পাশাপাশি উল্লেখ হয়েছে নামাজের কথাও। সূরা বাকারার শুরুর যে আয়াতগুলো আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি, সেখানে না দেখা বিষয়ে ঈমান আনার পরই যথাযথভাবে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। সূরা মুমিনূনের প্রথম আয়াতেই যেখানে মুমিনদের সফলতার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বিতীয় আয়াত থেকে সফল মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে। সেখানেও প্রথমেই বলা হয়েছে নামাজের কথা। দেখুন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ! যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত।—সূরা মুমিনুন : ১২

একইপ্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান।—সূরা মুমিনূন : ৯

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের দ্বিতীয়টি হচ্ছে নামাজ। কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের নানান জায়গায় নানানভাবে উল্লেখ হয়েছে নামাজের গুরুত্বের কথা। যত তাগিদ ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এ নামাজের ক্ষেত্রে, তা অন্য কোনো ইবাদত কিংবা বিধানের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পবিত্র কুরআনের প্রায় ৮০ জায়গায় বলা হয়েছে নামাজের কথা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

সন্দেহ নেই, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হল তার নামাজ, যদি তা সঠিক হয় তাহলে সে সফলকাম, আর যদি তা বিনষ্ট হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত।—জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪১৩

নামাজ না পড়া কত জঘন্য অপরাধ তাও হাদীসে স্পষ্ট—

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

নিশ্চয়ই ব্যক্তি ও শিরিককুফরের মাঝে ব্যবধান হল নামাজ ছেড়ে দেয়া।—সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮২

এরকম আরও অসংখ্য হাদীস নামাজের গুরুত্ব নির্দেশ করে। কিন্তু আমাদের উল্লিখিত আয়াতে শুধুই নামাজের গুরুত্বের কথা বলা হয়নি। কিংবা বলা যায়, সফল মুমিনের গুণ হিসেবে এখানে শুধু 'তারা নামাজি' এতটুকু বলেই কথা শেষ হয়নি। বরং সফল মুমিনের পরিচয় হিসেবে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে বিনম্র নামাজের প্রতি; আন্তরিকভাবে বিনীত নামাজের প্রতি এবং নামাজে যত্নবান হওয়ার প্রতি, যে নামাজে বান্দা তার প্রভুর দরবারে দেহ মন সঁপে দেয় সে নামাজের প্রতি।

খুশু-খুযু অর্থাৎ আন্তরিক বিনয়ের সাথে নামাজ পড়ার অর্থ হচ্ছে—নামাজে অন্তর স্থির থাকবে আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে অন্তর থাকবে মুক্ত ও পবিত্র। অন্তরের পাশাপাশি দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকেও বিরত রাখতে হবে অনর্থক নড়াচড়া থেকে। আশেপাশে এদিক-সেদিক না তাকিয়ে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে সিজদার স্থানে। নামাজের মধ্যে যে কেরাত ও দোয়াসমূহ পড়া হয়, সেগুলোর দিকেও মনোযোগী হতে হবে এবং নামাজ হবে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই, সেখানে মানুষকে দেখানোর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। সর্বোপরি নামাজ আদায় করতে হবে অত্যন্ত মনোযোগ ও যত্নের সঙ্গে। নামাজে কোনো ধরনের উদাসীনতা ও অলসতা যেন করা না হয়। কুরআনে কারীমেই মুনাফিকদের নামাজের কথা উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—তারা নামাজে দাঁড়ায় অলসভঙ্গিতে। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। আর তিনিও তাদেরকে এর শাস্তি দিয়ে থাকেন। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন নামাজে দাঁড়ায় অলসভঙ্গিতে। তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে থাকে।—সূরা নিসা : ১৪২

যারা নামাজ পড়ে ঠিকই, কিন্তু অবহেলা ও উদাসীনতার সঙ্গে, তাদের এ নামাজই তাদের জন্যে ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সূরা মাউনে ইরশাদ হয়েছে—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

সে নামাজিদের জন্যে ধ্বংস, যারা তাদের নামাজে গাফিলতি করে; যারা নামাজ পড়ে মানুষকে দেখানোর জন্যে। (আয়াত : ৪-৬)

তাই প্রতিটি মুমিনকেই এ বিষয়ে সদাসচেতন থাকতে হবে, যেন তার নামাজে কোনো ধরনের আলসেমি সৃষ্টি হয়ে তা মুনাফিকদের নামাজের সদৃশ না হয়ে যায়। নামাজে অবহেলার কারণে যেন নামাজই আবার ধ্বংসের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

নামাজ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সামনে মানুষের দাসত্ব ও গোলামি প্রকাশের সর্বোচ্চ মাধ্যম। তাঁর সামনে সবিনয়ে সোজা দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে এর সূচনা হয়। আর পরিপূর্ণতা পায় সিজদার মাধ্যমে। হাদীস শরীফে আছে—

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

বান্দা যখন সিজদাবনত হয়, তখনই সে হয় তাঁর প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী।—মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ ও সহীহ মুসলিম

কিন্তু এ গোলামি প্রকাশের জন্যে যদি কেউ নামাজে দাঁড়িয়ে ইচ্ছাকৃত নানান বিষয় চিন্তা করতে থাকে, তাহলে তা তো আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। তখন তার এ ইবাদত কবুল হওয়ার আশা করা যায় কতটুকু?

বিনয় ও যত্নের সঙ্গে নামাজ পড়া যদিও নামাজের কোনো ফরজ বিষয় নয়, অর্থাৎ উদাসীনতার সঙ্গে নামাজ আদায় করলেও সে নামাজ আদায়ের ফরজ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে; কিন্তু নামাজ আল্লাহর কাছে গৃহীত ও কবুল হওয়ার জন্যে আন্তরিক বিনয় ও নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

নামাজের পরই আসে যাকাতের কথা। পবিত্র কুরআনে যেখানেই নামাজের কথা বলা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামাজের সঙ্গে সঙ্গে যাকাতের কথাও বলা হয়েছে। উপরোক্ত সূরা বাকারা ও সূরা মুমিনূনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। সূরা বাকারায় আয়াতটি এমন— وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

যারা যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

সূরা মুমিনূনে সফল মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

এবং যারা যাকাত আদায় করে।—সূরা মুমিনূন : ৪

নামাজের মতোই যাকাতও ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। নেসাব পরিমাণ সম্পদের কেউ মালিক হলে বছরে একবার তাকে যাকাত আদায় করতে হয়। কেউ যদি এ যাকাত আদায় না করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে, তার সম্পর্কে কুরআন উচ্চারণ করেছে কঠোর সতর্কবাণী—

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দাও; যেদিন সে ধনসম্পদ দোজখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্যে পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তার মজা ভোগ কর।—সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫

সফল মুমিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নামাজের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছে অনর্থক বিষয়াদি এড়িয়ে চলার কথা। মহান আল্লাহর ইরশাদ—

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

... এবং যারা অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলে।—সূরা মুমিনূন : ৩

পবিত্র কুরআনের আরেক জায়গায় আলোচিত হয়েছে আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য। শুরুটা হয়েছে এভাবে—

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

আর দয়াময়ের বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে হাঁটে।—সূরা ফুরকান : ৬৩

এপ্রসঙ্গেই বলা হয়েছে—

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝

যখন তারা অনর্থক বিষয়ের পাশ দিয়ে যায় তখন ভদ্রজনোচিতভাবে চলে যায়।—সূরা ফুরকান : ৭২

মহান আল্লাহর যথার্থ বান্দা যারা, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— তারা নিজেরা যেমন অনর্থক

কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে না, তেমনি অনর্থক কাজে লিপ্ত কারও পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না, বরং তারা ভদ্রতার সাথে সেখান থেকে সরে পড়ে।

যারা পূর্ববর্তী কোনো আসমানি কিতাবের অনুসারী ছিল, কুরআনের ভাষায় তারা 'আহলে কিতাব'। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তাদের কেউ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, কেউ আনে নি। যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, সেই আহলে কিতাব মুমিনগণের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে আরেক স্থানে। সেখানে বর্ণিত তাদের একটি গুণ–

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۝

আর যখন তারা কোনো অর্থহীন কথাবার্তা শোনে, তখন তা এড়িয়ে চলে আর বলে, আমাদের আমল আমাদের, তোমাদের আমল তোমাদের, সালাম তোমাদের, আমরা অজ্ঞদের সঙ্গে জড়িত হতে চাই না।–সূরা কাসাস : ৫৫

এখানেও একই কথা, ঈমান নিয়ে যারা অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্ত, তাদের সঙ্গে কোনোরূপ তর্ক বিতর্কে তারা জড়িয়ে পড়ে না। প্রকারান্তরে তারা যেন এই দোয়াই করছে–আল্লাহ যেন তাদের সঠিক পথ অনুসরণের তৌফিক দেন, তাদের পরকালও যেন নিরাপদ হয়।

হাদীসের মধ্যে এ আয়াতগুলোর মর্মের প্রতিধ্বনি ঘটেছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

অর্থহীন বিষয়াদি বর্জন করা একজন মুসলিমের অন্যতম সৌন্দর্য।–জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৩১৭

সফল মুমিনের আরেক বৈশিষ্ট্য–তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। সৃষ্টি ও স্বভাবগতভাবেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের চাহিদা অনুভব করে। সে চাহিদা নিবারণের জন্যে সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভুর পক্ষ থেকেই রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এ চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই টিকে থাকে প্রাণীকুলের বংশধারা। তবে এজন্যে অন্যায় কোনো পন্থা বেছে নেয়া, আল্লাহ নির্দেশিত পথের বাইরে কোনো পথ তালাশ করা চরম নিন্দিত বিষয়। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۝

এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে আপন স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না। তবে যে এর বাইরে কোনো পথ তালাশ করবে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।–সূরা মুমিনূন : ৫৭

আপন লজ্জাস্থানের হেফাজত করা সর্বযুগেই ছিল কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত। এর বিপরীত করা একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘৃণিত কাজ হিসেবে বিবেচিত হত। স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বাবা ছাড়াই সৃষ্টি করলেন এবং তাকে নিয়ে তার মা মারয়াম স্বজাতির কাছে এলেন, তখন হাকীকত না জানার কারণে তারা তার কঠোর নিন্দা করেছিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۝ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۝

তারপর সে তাকে (অর্থাৎ শিশুটিকে) নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এল। তারা বলে উঠল, 'মারয়াম! তুমি তো বড় খতরনাক কাজ করলে! হে হারুনের বোন! তোমার বাবা তো কোনো খারাপ মানুষ ছিলেন না এবং তোমার মাও তো অসৎ নারী ছিলেন না!'–সূরা মারয়াম : ২৭২৮

আপন লজ্জাস্থানের হেফাজতের বিষয়ে নারী পুরুষ সকলেই সমান দায়িত্বশীল। বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতে এ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দৃষ্টি হেফাজতের আদেশও দেয়া হয়েছে। কারণ দৃষ্টিই যে লজ্জাস্থানের অন্যায়ের পথ খুলে দেয়! কুরআনের ভাষায়ই শুনুন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

(হে নবী!) তুমি মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট পন্থা। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে... ।–সূরা নূর : ৩০৩১

আরেক আয়াতে অবৈধ যৌনাচারের দিকে টেনে নিয়ে যায় এমন সব কিছু থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। দেখুন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۝

এবং তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা এবং বিপথগামিতা।–সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২

একদিকে সংরক্ষণের আদেশ, আরেকদিকে অন্যায় আচরণের নিষেধাজ্ঞা–লজ্জাস্থানের বিষয়ে পবিত্র কুরআন আমাদের এভাবেই সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করেছে। দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা পেতে হলে এ নির্দেশনা অনুসরণ অপরিহার্য।

সফলতার আরেক ধাপ নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। বিষয়টিকে আমরা 'তাযকিয়ায়ে নফস'ও বলে থাকি। আত্মা পরিশুদ্ধ করার অর্থ হল, অন্তরে যে ভালো কাজের আগ্রহ ও প্রেরণা জাগে মানুষ তাকে আরও উজ্জীবিত করে সে অনুযায়ী কাজ করবে আর যেসব মন্দ চাহিদা দেখা দেয় তা দমন করে চলবে। এভাবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চলতে থাকলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ ভিন্ন পথে চলে, পাপকাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় সে কেবল ব্যর্থই হবে। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

সেই সফলকাম, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। আর ব্যর্থ সেই, যে তাকে (গোনাহের মাঝে) ধ্বসিয়ে দেবে।–সূরা শামস : ৯১০

বাবা হযরত ইবরাহীম আ. আর ছেলে হযরত ইসমাঈল আ. মিলে নির্মাণ করেছিলেন আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা। নির্মাণকাজ শেষে তারা বিনীতভাবে আপন প্রভুর দরবারে দোয়া করছিলেন। সেই দোয়ায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল আত্মা পরিশুদ্ধ করার বিষয়টিও। কুরআনের ভাষায়ই শুনুন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

হে আমাদের প্রভু! এবং আপনি তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াত পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শেখাবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন।–সূরা বাকারা : ১২৯

সফল মুমিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে। সফল মুমিনের পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা–

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে।–সূরা মুমিনূন : ৮

মানুষে মানুষে মিলেই সমাজ। একসঙ্গে শান্তিপূর্ণ বসবাসের জন্যে প্রয়োজন পারস্পরিক বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসের ওপর ভর করেই মানুষ একে অন্যের নিকট নিজের সম্পদ আমানত রাখে, একে অন্যের কাছে নানান রকম প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআনে কারীমে এ আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তেমনি এর ব্যতিক্রম কেউ করলে তার জন্যে কঠোর হুঁশিয়ারিও উচ্চারিত হয়েছে হাদীস শরীফে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানত ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের আলামত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি–যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট কোনো কিছু আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত করে। (হাদীস : ৩৩)

মুমিন কীভাবে সফলতা অর্জন করবে সে বিষয়ে হেদায়েতমূলক আরও কিছু আয়াত তরজমাসহ লক্ষ করুন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।–সূরা আলে ইমরান : ১০৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।–সূরা আলেইমরান : ১৩০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।–সূরা বাকারা : ২৭৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তীর এসবই অপবিত্র শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।−সূরা মায়েদা : ৯০

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট আছে, লিপিবদ্ধ পাবে, যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবে আর নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবে এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।−সূরা আরাফ : ১৫৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।−সূরা হজ : ৭৭

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া। এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগনে, আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন, যৌনকামনাবিহীন খেদমতগার এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।−সূরা নূর : ৩১

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

সুতরাং আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।−সূরা রূম : ৩৮

সফলতা অর্জনের জন্যে পবিত্র কুরআনে বারবার যে বিষয়টি উক্ত হয়েছে সেটি হল তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করা এবং যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ। যেমন দেখুন−

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন সফল হতে পার।−বাকারা : ১৮৯

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

আর তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যেন সফল হতে পার।−সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৫

এ দুটি বিষয়ের বিস্তৃতি এতটাই ব্যাপক, যদি কেউ এ দুটি গুণ অর্জন করতে পারে, মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকে আর আল্লাহকে স্মরণ করে চলে, তাহলে উপরোক্ত বিষয়গুলোসহ যে কোনো ভালো কাজের দিকেই সে এগিয়ে যাবে। যে কোনো ধরনের অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে এগুলো তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

সফলতার এ রাজপথের সন্ধান দিয়েছেন খোদ আল্লাহ, মহামহিম প্রভু। আপন প্রভুর দেখানো এ রাজপথে যারা চলবে, তারাই তো তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সফলতার নাগাল পাবে। সফল মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করার পর তাই ইরশাদ হয়েছে−

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

এরাই তো উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।−সূরা মুমিনূন : ১০।১১

এ জান্নাতুল ফিরদাউসই যে একজন মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য! ●

আলকোরআন অ্যাপস
ব্যবহারে প্রয়োজন সতর্কতা ও সচেতনতা

মাওলানা আবদুল মুমিন

তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতি আমাদের জীবনে অনেক গতি এনেছে। একসময় যা অসম্ভব মনে হতো তা-ই এখন সহজ ও সম্ভব। বিশেষত যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান, সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন এখন খুবই সহজ। পড়াশোনা ও জ্ঞানচর্চাও এখন অনেক সহজ। অনুসন্ধানী, উৎসুক ও গবেষকের জন্য সাধারণ জ্ঞান যেমন সহজলভ্য হয়ে উঠেছে তেমনি সহজলভ্য হয়ে উঠছে ইসলামী জ্ঞান। মাকতাবা শামেলাসহ কিতাবাদির ই-সংস্করণের কল্যাণে কোরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অনুসন্ধান এখন হাতের মুঠোয়। এটি প্রযুক্তির সুন্দরতম দিক। তবে একটি কথা হলো, সহজলভ্য বলে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়া নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সচেতনতা প্রয়োজন। অনেকেই এ বিষয়টি খেয়াল না করার কারণে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। অনুসন্ধান করলে এ বিষয়ে দীর্ঘ নিবন্ধ হতে পারে। তবে আজকের আলোচ্য বিষয় কেবল ই-কোরআন বা আলকোরআন অ্যাপস।

স্মার্টফোন ব্যবহারকারী সব মুসলমানই আলকোরআন অ্যাপস সম্পর্কে অবগত আছেন। যারা কিছুটা ধর্ম-কর্ম করেন তারা শুধু জানেনই না; তাদের মোবাইলে আলকোরআন অ্যাপ অবশ্যই থাকে। যারা আরেকটু অগ্রসর ও আগ্রহী, তাদের সংগ্রহে কোরআনের অনুবাদ, তাফসীরসহ অন্যান্য ইসলামী অ্যাপসও থাকে। গুগল প্লে স্টোর বা অন্য কোনো সাইট থেকে এ ধরনের অ্যাপ খুব সহজেই ডাউনলোড করা যায়। কোরআন, তাফসীর ও হাদীসের প্রতি আমাদের এ আগ্রহ বড়ই প্রশংসনীয়। তবে এসব অ্যাপ একটু সচেতনভাবে ব্যবহার করা জরুরি।

মুসলিম শরীফে ইমাম ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

এ ইলম দীনের অংশ। তাই তোমরা তোমাদের দীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ তা খেয়াল রেখো।

কোরআনের যে অনুবাদ আমি পড়ছি তা সহীহ কি না, যে হাদীসের কিতাব বা তার অনুবাদ পাঠ করছি কোনো বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ ছাড়া তা পড়া আমার জন্য ঠিক হবে কি না? এ তো গেল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়। আর আরবী কোরআনের যে অ্যাপ আমরা তিলাওয়াত করছি তাও যাচাই করা জরুরি।

একবার পরিচিত কয়েকজনের মোবাইলে আলকোরআন অ্যাপ দেখলাম। তারা সবাই দীনদার, আলেম নয়। সব অ্যাপেই মারাত্মক কিছু ভুল নজরে পড়ল। এর আগেও অ্যাপের দুয়েকটি ভুল নজরে পড়েছিল। তখন ভেবেছিলাম, এমন দুয়েকটি ভুল থাকতেই পারে। এরপর অনুসন্ধান করে দেখলাম, ভুলেভরা কোরআন অ্যাপসের ছড়াছড়ি।

বিষয়টি একটু খোলাসা করেই বলি–

এক. আলকোরআন অ্যাপসে যেসব ভুল দেখেছি তার একটি হলো, লিপিগত ভুল। সাধারণ দীনদার ভাইদের হয়তো অনেকেই জানেন না, কোরআনের বিশেষ রসমে খত বা লিপিপদ্ধতি রয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ আরবী লিপিপদ্ধতি ও কোরআনের লিপিপদ্ধতিতে ছয় ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। কোরআনে কারীম সুদীর্ঘকাল থেকে এ লিপিপদ্ধতির অনুসরণেই লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে। পরিভাষায় এটাকে বলা হয়, তাওকীফী। অর্থাৎ কোরআনের বিশেষ এ লিপিপদ্ধতি শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।

কিন্তু আলকোরআনের অনেক ই-সংস্করণেই এ লিপিপদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ :

সূরা আররাহমান-এর ৩১ নং আয়াত হলো–

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

আরবীর সাধারণ লিপিপদ্ধতি অনুযায়ী এখানে أَيُّهَ এর স্থলে أَيُّهَا হওয়ার কথা। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোরআনের বিশেষ লিপিপদ্ধতি। কোরআন শরীফে এখানে লিপিনীতি অনুসরণ করেই লিখতে হবে। কোনো কোরআন অ্যাপে লেখা হয়েছে–

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ

এখানে উদাহরণ হিসেবে মাত্র একটি আয়াত পেশ করা হলো। অনেক আলকোরআন অ্যাপেই এ ধরনের অসংখ্য ভুল রয়েছে।

দুই. কোনো কোনো অ্যাপে হরকত ছুটে যায়। হরকত না থাকার কারণে হাফেয বা আলেম নন

এমন কারও জন্য সঠিক উচ্চারণ মুশকিল হয়ে পড়ে। বরং তারা বুঝতেও পারেন না, তারা ভুল পড়ছেন। উদাহরণ : একটি অ্যাপ-এর হুবহু চিত্র–

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنْفِقُونَ

এখানে الَّذِينَ শব্দের 'ইয়া', يُؤْمِنُونَ শব্দের 'ওয়াও', يُقِيمُونَ শব্দের 'ইয়া' ও 'ওয়াও', يُنْفِقُونَ শব্দের 'ওয়াও' এর মধ্যে কোনো প্রকার হরকত, জযম, তাশদীদ নেই। এ শব্দগুলো কীভাবে উচ্চারণ করা হবে যে হরফের ওপর কিছু নেই তা যদি উচ্চারণ না করে পড়া হয় তাহলে কি এক হরফ বাদ পড়ার কারণে শব্দটি বিকৃত হয়ে গেল না। আয়াতটি হবে এমন :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنْفِقُونَ

তিন. অনেক অ্যাপেই খাড়া যবর, খাড়া যের বা উল্টা পেশ এর স্থলে কেবল যবর, যের ও পেশ দেওয়া থাকে। যারা কোরআন তিলাওয়াত করতে জানেন তাদের ভালোভাবেই জানা আছে, খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ হলে মদ হয় অর্থাৎ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। পক্ষান্তরে যবর, যের ও পেশ-এর উচ্চারণ কোনো টান ব্যতীত দ্রুত পড়তে হয়। এতে অর্থ-বিকৃতি ঘটে। কেউ খাড়া যবরের স্থলে টেনে না পড়লে ভুল হবে। অনেক ক্ষেত্রে এর কারণে অর্থবিকৃতিও ঘটতে পারে। কিন্তু কোরআন শরীফের পৃষ্ঠাতেই যদি খাড়া যবরের স্থলে যবর ও খাড়া যেরের স্থলে শুধু যের থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ তো এ অনুযায়ীই পাঠ করবেন এবং নিজেদের অজান্তেই বড় ধরনের ভুলের শিকার হবেন। উদাহরণ : একটি অ্যাপ এর হুবহু চিত্র দেওয়া হলো–

খাড়া যবর ও উল্টা পেশ এর স্থলে যবর ও পেশ দেওয়া : وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
এখানে اللَّهُ শব্দের 'লাম' এ খাড়া যবর হবে এভাবে– اللّٰهُ। আর عِنْدَهُ এর 'হা' এর উপর উল্টা পেশ হবে এভাবে– عِنْدَهٗ।

খাড়া যের এর স্থলে সাধারণ যের :

وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

এখানে فِيهِ এর 'হা' এর নিচে খাড়া যের হবে এভাবে– فِيْهٖ।

চার. এমনি আরেকটি বিষয়, যা আরবের প্রচলিত নিয়ম হলেও আমাদের দেশে অপরিচিত হওয়ার দরুন তাতে অনেকেই ভুল করেন। আরবের ছাপা কোরআনে কারীমে কোনো কোনো আলিফের ওপর পেশ-এর কাছাকাছি একটি চিহ্ন দেখা যায়। যাকে সাধারণ মানুষ পেশ হিসেবেই উচ্চারণ করে থাকে। যেমন :

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

আমাদের দেশে প্রচলিত কোরআনে কারীমে এভাবেই লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু আরবের ছাপা অনেক কোরআনে লেখা হয়– خَتَمَ اللَّهُ। দেখা যাচ্ছে 'আল্লাহ' শব্দের আলিফের ওপর পেশের মতো একটি চিহ্ন রয়েছে যা আমাদের প্রচলিত কপিতে নেই। এটাকে অনেকেই পেশ মনে করে পেশের উচ্চারণে তিলাওয়াত করেন। অথচ এটি পেশ নয়। এটি 'সোয়াদ' অক্ষরের মাথা। এ চিহ্নটি দেওয়া হয়ে থাকে 'হামযায়ে ওয়াসল' এর ওপর। অর্থাৎ এ ধরনের হামযা মিলিত অবস্থায় উচ্চারিত হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা না বুঝে পেশের উচ্চারণে পড়ে। ফলে শব্দ পরিবর্তন হয়ে অনেকাংশেই অর্থবিকৃতি ঘটে।

অ্যাপস-সংক্রান্ত এ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হলো। এ নিয়ে আরও দীর্ঘ গবেষণা ও দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন, যার মধ্যে অ্যাপস নির্মাতা ও ব্যবহারকারী সবার জন্য দিক-নির্দেশনা থাকবে। আশা করি সচেতন গবেষকগণ এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ে গবেষণার পথে অগ্রসর হবেন এবং সবাইকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেবেন।

পাঠকের প্রতি অনুরোধ হলো, কোরআন কারীম, এর তরজমা বা তাফসীর সংশ্লিষ্ট কোনো অ্যাপ ব্যবহারের আগে বিজ্ঞ কোনো আলেম বা হাফেয সাহেবকে দেখিয়ে যাচাই করে নিন। বই-পুস্তকের কাগজে সংস্করণের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে বহু ইসলামিক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের ব্যাপারে বলা যায়, এ প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশনীর বই পুস্তক নিশ্চিন্তে সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামিক অ্যাপসের বেলায় এমন কথা বলার সুযোগ এখনো হয়ে উঠেনি। গুগলের প্লে স্টোরে ইসলামিক কোনো অ্যাপ থাকলেই ত্রুটিমুক্ত হবে এমন নয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আলকোরআনের বাংলা অনুবাদসহ গুগল প্লে স্টোরের অ্যাপের কপিতেই বহু ভুল রয়েছে। তাই সতর্কতা অবলম্বন বেশ জরুরি। এরপরও নিম্নে দুটি লিংক দেওয়া হলো। এ দুটি লিংকে যে অ্যাপ পাওয়া যায় তা প্রবন্ধে উল্লেখিত ভুল ও সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত। ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.labs.androidquran.naskh&hl=en

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naushad.miii

মাসিক আলকাউসারে প্রকাশিত
কুরআন বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ

২০০৫

আল-কুরআন : অন্ধকার তিমিরে চিরন্তন আলোর মিনার
মাওলানা আবু তাসনীম *(ফেব্রুয়ারি)*

আলকুরআনে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী রাহ. *(এপ্রিল মে)*

কুরআনে কারীম বোঝার দুটি স্বভাবগত পদ্ধতি
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. *(এপ্রিল)*

সহীহ তেলাওয়াতের গুরুত্ব : এ ব্যাপারে আমাদের কী দায়িত্ব
মাওলানা নূর মুহাম্মদ *(জুন)*

২০০৬

আলিফ বা তা পড়িয়ে কপালে হাফেজ্জী হুযূরের চুমু খেয়েছি
প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান *(ফেব্রুয়ারি)*

অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যায় কি?
মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ

কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা
প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান *(জুলাই)*

ভ্রূণতত্ত্ব ও মানব প্রজনন সম্পর্কে আলকুরআনের ভাষ্য
মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া *(সেপ্টেম্বর)*

আপনি কুরআন তেলাওয়াত করবেন যেভাবে
মাওলানা খন্দকার মনসূর আহমদ *(অক্টোবর-নভেম্বর)*

২০০৭

পবিত্র কুরআনে আম্বিয় আলাইহিমুস সালামের দুআ
জুবাইর আহমদ আশরাফ *(জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি)*

রাশিনামা নয় চাই আলকুরআন
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন *(ফেব্রুয়ারি)*

কুরআনের আলোকে নেককারদের সোহবত : গুরুত্ব ও ফলাফল
প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান *(মে)*

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত দুআ
জুবাইর মুহাম্মাদ আশরাফ *(নভেম্বর)*

২০০৮

আলকুরআনের অলৌকিকত্ব
আবু জাফর *(জুলাই)*

আলকুরআনের এই কী মর্যাদা আমাদের কাছে!
মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ *(অক্টোবর)*

২০০৯

শিক্ষানীতি ও কুরআন মজীদের কিছু আয়াত
মুহাম্মাদ ফজলুল বারী *(অক্টোবর)*

২০১১

আয়াত ও হাদীস এবং সালাফের বাণী মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক *(জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি)*

কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক *(মে)*

কুরআনে নারীর অধিকার : প্রসঙ্গ মোহর
(মে)

২০১২

কুরআন কীভাবে বুঝব?
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী *(অক্টোবর)* ●

কুরআন একটি স্বচ্ছ আয়না ...
(২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

সাথে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং এ সকল নমুনা সর্বযুগের সকল ভূখণ্ডের মানুষের মানবীয় নানা দুর্বলতা ও অবনতির প্রতিনিধিত্ব করেছে।

কুরআনুল কারীম এ সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠির পরিণতি নিয়েও আলোচনা করেছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছে যারাই এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে এবং এদেরকে নিজের নেতা ও আদর্শ বানাবে, তাদের পরিণতিও এদের মতোই ভয়াবহ হবে।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কুরআনুল কারীমের এ স্বচ্ছ আয়নায় আত্মদর্শন করে সংশোধিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। ●

-সূত্র : ৫৬-৫৬১ قرآنی افادات

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান